নবপ্রভা। ১

১৩০৭-৮

মাসিক পত্রিকা।

১ম খণ্ড। | কলিকাতা, ফাল্গুন ১৩০৭ সাল | ১ম সংখ্যা।

নবপ্রভার প্রার্থনা।

এক্ষণে বঙ্গবাসী, হিতবাদী ও বসুমতী সংবাদপত্র দশ বিশ হাজার পাঠক পড়েন। এমন দিন কবে হইবে যে, বাঙ্গালা মাসিক পত্রও দশ বিশ হাজার লোকে পড়িবে? দশ বিশ হাজার কেন, লক্ষ লোক পড়িবে, চিন্তা করিবে। এমন দিন কবে হইবে যখন দেশের সাধারণ লোকের অভাব জ্বালা, সুখ দুঃখ, হাসি কান্নায় সাহিত্যের জীবন স্পন্দিত হইবে? এমন দিন কবে হইবে যখন সাময়িক পত্র আপামর সাধারণ লোকের হৃদয়স্পর্শ করিবে? তখন মাসিক পত্রিকার জন্য লোকে পথ চাহিয়া থাকিবে। তখন মাসিক পত্রিকা হাতে আসিলে প্রিয়তম বন্ধুর মত তাহা লোকে আলিঙ্গন করিবে, ব্যগ্র হইয়া পড়িবে। তখন মাসিক পত্রিকা পাইবাই যেন বলিবে, "প্রাণের বন্ধু, এক মাস পরে, তুমি আমার সহিত আবার দেখা করিতে, কথা কহিতে আসিয়াছ। বল, তোমার কথা শুনি। তুমি আমার ব্যথার ব্যথী; তাই, তুমি আসিলে আমার ক্ষুদ্র জীবনে, আমার আঁধার কুটীরে আলো ফুটে। দুর্ব্বল হৃদয়ে একটু বল ভরসা পাই। বুঝিতে পারি, অনুভব করি, দূরে সুদূরে, নির্জ্জন গৃহে, নিশীথের নির্ব্বাতদীপালোকে আমারই জন্য, আমাকে প্রফুল্ল করিবার জন্য, আমাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য, আনন্দ দিবার জন্য, আমার সুখ দুঃখের কথা জন্য আর একজন ভাবেন। তিনি আমার স্বদেশীয়, তিনি আমার

ভ্রাতা। আমার সহিত অদৃশ্য দৃঢ় অচ্ছেদ্য শোণিতবন্ধনে বদ্ধ। তিনি দূরে, তথাপি আমার মন তাঁহার মনের সহিত কথা কহিতে চাহে, তথাপি তিনি আমার অশ্রুর সহিত অশ্রু ফেলিয়া থাকেন, আমার হৃদয়ের স্পন্দনের সহিত তাঁহার হৃদয় স্পন্দিত হইয়া থাকে। তাঁহারই এই লেখা, তাঁহারই হৃদয়ের কথা, তাঁহার চিন্তার সার, তাঁহার প্রীতির সম্ভার, তাঁহারই বিনীত নিবেদন—তাঁহারই প্রিয়তম সম্ভাষণ এই পত্রিকা।"

সেই দিন কবে হইবে, যখন পাঠক, লেখকের সম্বন্ধে এই কথা হৃদয়ের সহিত বলিতে পারিবেন? যখন পাঠক এবং লেখকের সহিত এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইবে? তখন মাসিক পত্রিকা দেশে নবজীবন সঞ্চার করিরে। তখন হৃদয়বান্ লেখকের নিভৃত কক্ষ হইতে চিন্তার তরঙ্গ, ভাবের বন্যা, দেশকে প্লাবিত করিবে। তখন আবার লাখ লাখ পাঠকের উন্মেষিত বুদ্ধি, উচ্ছ্বসিত ভাব লেখককে প্রতিঘাত করিবে এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে লইয়া যাইবে। চাহি না জ্ঞান, চাহি না পাণ্ডিত্য, চাহি না বিদ্যা; চাহি বঙ্গের জনসাগরের প্রাণে প্রাণে মিশিয়া যাইতে। চাহি সেই ভাষা, সেই সাহিত্য, যাহা ছয় কোটি বঙ্গবাসীর সুখ দুঃখ মুখরিত করিবে। চাহি সেই ভাষা, যাহা ছয় কোটি লোকের মঙ্গলের ইচ্ছায় নিত্য জীবন্ত থাকিবে। চাহি সেই মতি, যাহা সাময়িক পত্রিকাকে ভ্রাতা ও ভগিনীর সেবার একটা উপায় মনে করিয়া কার্য্য করিবে।

প্রিয় পাঠক, মাননীয়া পাঠিকা, যদি আপনাদিগের সহিত আমার সহানুভূতি ও সহৃদয়তা থাকে, আপনি দেখিবেন, আমি আপনার নিকট অপরিচিত হইয়াও আমি আপনার নিতান্ত আত্মীয় বন্ধু। আপনি কোন দিন আমাকে কোন কথা বলেন নাই, আপনি আমাকে কখন পত্র লেখেন নাই, তথাপি আপনি দেখিবেন যে, আমি আপনার জীবনের গূঢ় কথা, মর্ম্মের ব্যথা জানি। কেন না প্রীতি ও সহানুভূতিতে, দিব্য চক্ষু দান করে। নাই প্রীতি, তাই অন্ধ; থাকে না যখন সহানুভূতি, তখনই অন্যের চরিত্র দুজ্ঞের্য়। স্বার্থপরতার চোখের ঠুলি যখন খসিয়া যায়, তখন মনুষ্যহৃদয় যেন স্বচ্ছ হইয়া যায়, তখন সমুদয় ধরা এফোঁড় ওফোঁড় পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। কি চমৎকার পদার্থ এই সহানুভূতি! এই নির্ম্মল ভালবাসা! ইহা

অনুবীক্ষণ, না দুরবীক্ষণ, না রণ্টজেন কিরণ (Rontgen Rays), না দৈবশক্তি, না যোগবল!

যদি আমার আপনার সহিত সহানুভূতি থাকে, যদি আমি নিঃস্বার্থ হইয়া আপনার হিতার্থে, আপনাদিগের দশজনের হিতার্থে, আমাদিগের ভাগ্যহীন দেশের হিতার্থে, লিখিতে পারি, খাটিতে পারি, তাহা হইলে আমি জানি, নিশ্চিতই জানি, আজই হউক বা কালই হউক, আমার লেখা আপনি পড়িবেন, আমার সহিত আপনি চিন্তা করিবেন, আমাকে সুহৃৎ বলিয়া আপনি চিনিবেন। আপনি আমার চিন্তা লইবেন, আপনার চিন্তা আমাকে দিবেন। আপনার ও আমার মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক আদান প্রদান হইবে। তখন, কেবল চিন্তার আদান প্রদান নহে, ভালবাসারও আদান প্রদান প্রীতিরও বিনিময় হইবে, তখন আমাদিগের সকলের মধ্যে চিন্তা ও ভাবের ঐক্য হইবে,—ভ্রাতৃমণ্ডলী গঠিত হইবে। তখন আমরা সকলে, চিন্তাময় মস্তিষ্কে, আবেগময় হৃদয়ে, কার্য্যময় হস্তে, সম্মিলিত হইব; এবং দ্রুতপদে উন্নতির পথে ধাবমান হইব।

বক্তৃতা, সাময়িক পত্র, সংবাদ পত্র যাহাই বলুন, সকলেরই এই এক উদ্দেশ্য। সকল বক্তা, সকল লেখক, নিজের নিজের যেমন জ্ঞান, যেমন প্রীতি, সেই মত, সেই পরিমাণে, সহানুভূতি প্রীতি ও জ্ঞানের রাজ্য বিস্তৃত করিতে নিযুক্ত আছেন। হতভাগ্য লেখক আমি যদি কখন এই মহদুদ্দেশ্য ভুলিয়া যাই। আমরা সকলেই একই ক্ষেতের মজুর। সহযোগী ভ্রাতা ও ভগিনীগণ, লেখক ও লেখিকাগণ, আমরা আপনাদিগের সঙ্গে সাহিত্যের ক্ষেতে মজুরি খাটিতে চাই—আপনাদিগের দলে কি আমাদিগকে লইবেন? পাঠকগণ ও পাঠিকাগণ, আপনাদিগের সেবাকার্য্যে আমাদিগকে কি নিযুক্ত করিবার যোগ্য বিবেচনা করিবেন? ভগবানের আশীর্ব্বাদে, বঙ্গদেশে পাঠকের সংখ্যা, সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা, লেখকের সংখ্যা বৃদ্ধি হউক, এবং জ্ঞানের, সুচিন্তার, এবং সৎপ্রবৃত্তির বৃদ্ধি ও বিস্তার হউক, **প্রীতির নবপ্রভা** দেশের কুটীরে ও প্রাসাদে প্রভাকরের অপক্ষপাতী কিরণের ন্যায় সমভাবে সর্ব্বত্র প্রতিভাত হউক ইহাই

'নবপ্রভার' প্রার্থনা।

স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া।

আজ এক মাসের অধিক হইল মহারাণী ভিক্টোরিয়া এই নশ্বর চঞ্চল সংসারের সম্পদ—ঐশ্বর্য্য, ধনজনগৌরব, স্নেহসম্মান, তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের গুরুভার ও চিন্তা, এই সকলের নিকট শেষ বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছেন। আজও আমরা, মহারাণীর কীর্ত্তিকলাপ, পবিত্র চরিত্রগরিমা, কোমল হৃদয়মাধুর্য্য, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, বৈধব্যজনিত কঠোর স্বার্থত্যাগের কথা বার্ত্তা লইয়া কালক্ষেপ করিতেছি। হিন্দু,—সরল বিশ্বাসী-ভক্ত-কৃতজ্ঞ হিন্দু, নিজের দেশের নিষ্ঠাবান্—অতীব পুরাতন বনিয়াদী ব্রাহ্মণ জমীদারকে, পরাধীন ও প্রকৃত রাজশক্তি শূন্য হইলেও, রাজা "মহারাজা" আখ্যায় ভূষিত করিয়া কতই না সম্মান করে। দোল দুর্গোৎসব উপলক্ষে বংশপরম্পরা প্রথায় পরিচালিত হইয়া, যখন "দেশের রাজা" বা "মহারাজা," নগর প্রদক্ষিণ মানসে, "সুখাসনে" সমারোহে বাহির হন, তখন কতলোক, রাস্তায়, ছাদে, আশেপাশে শিক্ষিত অশিক্ষিতে,—সেই রাজা বা মহারাজার পূর্ব্বকীর্ত্তি বদান্যতা মহানুভবতা স্মরণ করিয়া নমস্কার করে,—হয়তো দুই এক ফোটা চখের জল ফেলে; আর দেবী সদৃশী হিন্দু রমণী দেশের রাজাকে দেবতাজ্ঞানে ভাবে গদ্‌গদ হইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া হুলুধ্বনি করিয়া থাকেন। ভক্তি-প্রবণতা হিন্দুহৃদয়ে এতই প্রবল; নিজের ভক্তি শ্রদ্ধা সম্মান অপরের পাদমূলে উছলিয়া গড়াইয়া পড়িতে সততই আগ্রহপূর্ণ। এই সদ্ভাবের ফলে, কলিকাতার বিস্তৃত শ্যামল "ময়দানে" বিষণ্ণ কাতর অশ্রুসিক্ত নগ্নপদ চারিলক্ষ হিন্দুর নিস্তব্ধ নীরব সমাবেশ। আর এই সমবেত হৃদয়ের শোকোচ্ছ্বাস-ফলেই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইল, যে ভারতবাসী অকৃতজ্ঞ, অবিশ্বাসী বিদ্রোহী নহে। এই ভাবের বন্যায়, বর্ণের বিসদৃশতা, পদগৌরবের বিভিন্নতা, জেতা বিজিতের ভাব, কোথায় ভাসিয়া চলিয়া গেল। তাই, এই ভাবের বন্যায়, ভারতের রাজকীয় প্রাসাদ টলিল; তাই, ভারতেশ্বরীর প্রতিনিধিবর্গকে ভারতেশ্বরীর সর্ব্বব্যাপী আত্মা বলিয়া দিল, "আজকার দিনে, অন্ততঃ, নিজেদের পদমর্য্যাদা ভুলিয়া যাও, জেতার ব্যবধান ফেলিয়া দাও;—যাও, আমার প্রিয় ভারতপ্রজাবর্গের শোকোচ্ছ্বাসে তোমাদের শোকোচ্ছ্বাস

মিশাইয়া দাও; হায়, ভগবানের নামসংশ্লিষ্ট, আমার গম্ভীর বজ্রনির্ঘোষ ঘোষণা এখনও অপূর্ণ রহিল; আজি, এই বিশাল শোকের দিনে, চুপ করিয়া দূরে দাঁড়াইয়া থেক না; জেতা বিজিতের চোখের জলে আমার ভবিষ্যৎ ভারত সাম্রাজ্য সুদৃঢ় হউক"। এই কারণেই বুঝি, বিশাল ময়দানে সুমহতী জনতার মধ্যে নিবিড় ভিড়ের ভিতর, ভারতের ও বঙ্গের শাসনকর্ত্তা ইংরেজ মহাপুরুষগণকে ভ্রাম্যমাণ দেখিতে পাইয়াছিলাম। জানিনা, এই সম্মিলিত অশ্রুরাশির পরিণামে আশার ফুল ফুটিবে কি না। জানি না, গরিব নিরন্ন সরল দেবোপম কৃষক সুখসম্পদে আবার হাসিবে কি না।

মহারাণী ভারতেশ্বরীর রাজশক্তি নিতান্ত সীমাবদ্ধ ছিল। ইংলণ্ডের রাজা বা রাণী, আজ প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া, প্রজাবর্গের পুঞ্জীভূত শক্তি বা ইচ্ছার বিপরীত দিকে অগ্রসর হইতে সাহসী হন না। ইংলণ্ডের দিগন্তপ্রসারী সম্রাজ্যের শাসনভার প্রধানতঃ তাঁহার ইংরেজ প্রজাপুঞ্জ কর্ত্তৃক নিয়মিত ও পরিচালিত হইয়া থাকে। ইংরেজ মন্ত্রীবর্গ ইংরেজ প্রজাপুঞ্জের দাস; এবং মন্ত্রীবর্গের শাসনদণ্ডের ভার, ইংরেজ প্রজাপুঞ্জের হস্তেই ন্যস্ত। সুতরাং এমন দুর্ব্বল, শক্তিবিহীন রাণীর মৃত্যুতে আজ এত আক্ষেপ কেন? ইংরেজ—দ্বীপমালায়, রাস্তায়, প্রাঙ্গণে, উদ্যানে, প্রমোদগৃহে, নাট্যশালায়, বিদ্যালয়ে, ধর্ম্মমন্দিরে, বিষণ্ণতার কালিমা ঢাকিয়া ফেলিল কেন? সংবাদ আসিল, সর্ব্বত্র ঘরে বাহিরে, ধনী নির্ধন কৃষ্ণপরিচ্ছদপরিহিত, বিষণ্ণতায় মলিন; মহারাণীর মৃত্যুসংবাদ টাইমস্ পত্রিকায় প্রকাশিত হইল, ইস্কুলের ছেলেরা খেলার সময় আর তেমন খেলিল না, ছুটীর সময় তাহাদের উদ্দাম হাস্য উৎসাহ কোথা চলিয়া গেল।

ইহার পূর্ব্বেও, ইংরেজ সম্রাট রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং রাজত্ব করিয়া জীবনসূর্য্যও অস্তমিত হইয়াছিল। কিন্তু এমন শোকোচ্ছ্বাস কখন হয় নাই। লোক আসে, লোক যায়; রাজা আসে, রাজা চলে যায়। এই প্রকার একটা তাচ্ছিল্যের ভাব ইংরেজরাজ্যে, ইংরেজদিগের ভিতর বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। রাজা প্রজাপুঞ্জের সুখদুঃখের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া প্রজার ক্ষমতা ও অধিকার খর্ব্ব করতঃ, নিজের রাজশক্তি অবাধ ও অপ্রতিহত রাখিতে সদা ব্যগ্র। সুতরাং স্বাধীন ইংরেজপ্রজাবৃন্দ এ প্রকার অবৈধ রাজ-

শক্তির পরিচালনে সর্ব্বদাই খড়্গহস্ত, আবার একথাও নিতান্ত সত্য যে যদি এমন রাজা বা রাণী পাওয়া যায় যিনি নিজের কর্ত্তব্য, ক্ষমতা, অধিকার বুঝিয়া চলিতে জানেন, অপরের দুঃখ কষ্ট অনুভব করিতে পারেন, ধনমদে গর্ব্বিত বা স্ফীত না হইয়া, চরিত্রকে নিষ্কলঙ্ক শুদ্ধ শুভ্র রাখিতে সক্ষম হন; তাহা হইলে, লোকে তাঁহাকে দেবতা বা দেবী জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে। তবে এ সংসারে, এ রকম পূজনীয় ব্যক্তি নিতান্ত দুর্লভ। নিতান্ত সৌভাগ্যের কথা, মানব মাহাত্ম্যের গৌরবের বিষয়, আমাদের স্বর্গীয় মহারাণী এই দুর্লভ গুণ সমূহে সমালঙ্কৃতা ছিলেন।

স্বর্গীয়া মহারাণীর জীবনী আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, কত কথাই মনে হয়। শৈশবে তাঁহার স্নেহময়ী মাতা ডচেস্ অব কেণ্ট্ একমাত্র সন্তানের জন্য কতই না যত্নবতী ছিলেন; কন্যা ভিক্টোরিয়া কি প্রকারে সংসারের সর্ব্বপাপ হইতে, বিশেষতঃ রাজদরবারের কলুষ পঙ্ক হইতে দূরে থাকে, কন্যাকে সেই সময়কার ইংরেজ প্রাসাদের দূষিত বায়ুর সংস্পর্শে কখন কোন প্রকারে না আসিতে হয়; ইংলণ্ডের ভাবী রাজচ্ছত্রদণ্ড, শৈশব হইতে, কন্যার মন অধিকার করিতে না পারে; তাহার জন্য মহারাণীর মাতাকে কতই না যত্ন, পরিশ্রম ও চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। কন্যার শিক্ষা, লেখা পড়ার জন্য চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটি হয় নাই। মহারাণী ক্লাসিক্স্, ফ্রেঞ্চ, জারম্যান্, ইটালিয়ান, প্রভৃতিতে ব্যুৎপন্ন এবং চিত্র ও সঙ্গীতে নিপুণ ছিলেন।

আজ, ২০এ জুন ১৮৩৭ সাল—গ্রীষ্মকাল। আকাশ নির্ম্মল। অতি প্রত্যূষে মন্ত্রী ও দূত আসিয়া খবর দিলেন, যে মহারাণীর পিতৃব্য চতুর্থ উইলিয়ম ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। মহারাণীর যৌবনস্বপ্নমাখা আঁখি-পল্লব দুটী অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। তার পরদিন, যখন, ইংলণ্ডের অধিশ্বরী হইয়া, সুমোহন তুরঙ্গযোজিত অপরূপ সাজে সজ্জিত উন্মুক্ত শকটে কেন্সিংটন্ হইতে হাইড্পার্কের ভিতর দিয়া সেণ্টজেমস্ প্রাসাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন, তখন প্রজাবর্গের উৎসাহ ও আনন্দের আর সীমা থাকিল না; ঘন ঘন আনন্দ ও জয়সূচক ধ্বনিতে আকাশ ফাটিয়া গেল, ভিক্টোরিয়া অশ্রুপরিপ্লুত-নয়নে প্রাসাদে আসিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন; কবি এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিংও চক্ষের জলে গাইয়া উঠিলেন—"*She wept to wear a crown*"।

আজ ২৪শে জুন ১৮৩৮ সাল। কুইন্ ভিক্টোরিয়ার উল্লাসময় উৎসবময় রজ্যাভিষেক। হোয়াইটহল্, এবি, রাস্তায় লোকে লোকারণ্য। মহারাণী মণিমুক্তাখচিত রত্নসিংহাসনে সমাসীনা; মোহন যৌবন রূপলাবণ্যে প্রীতিময়ী দেবী সদৃশী প্রতীয়মানা। ইংরেজ দ্বীপপুঞ্জের ছোট বড় রাজা রাজড়া লর্ড প্রভৃতি মহারাণীকে সম্মান অভিবাদন করিতে আসিয়াছেন। লর্ড রোল্ বলিয়া একজন বৃদ্ধ স্থূলকায় ওমরাহ স্বয়ং সোপানাবলি অতিক্রম করিয়া মহারাণীর নিকট উপস্থিত হইয়া অভিবাদন করিতে অক্ষম। ইংরেজ রাজ্যের প্রথানুসারে এই রাজ্যাভিষেকের সময় ওমরাহগণের (Lords) মহারাণীর হস্ত চুম্বন করিতে হয়। বৃদ্ধ লর্ড রোল্ দুই জন ওমরাহ (Lord) সাহায্যে সোপানাবলির কিয়দ্দূর উঠিয়া পড়িয়া গেলেন। স্থবির নিতান্ত স্থূলকায় লর্ড রোল্ দ্বিতীয় বার উঠিবার চেষ্টা করিলেন। সেবারও পড়িয়া গেলেন। মহারাণীর মনে বড়ই আঘাত লাগিল। চিরপ্রথা বা কায়দায়, সিংহাসন হইতে উঠিবার যো নাই। কিন্তু যখন দেখিলেন যে বৃদ্ধ অক্ষম লর্ড রোল্ আবার উঠিতে চেষ্টা করিতেছেন, তখন আর থাকিতে পারিলেন না। প্রধানমন্ত্রী লর্ড মেল্‌বোর্ণকে কি আস্তে আস্তে বলিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে চিরন্তন প্রথা উপেক্ষা করিয়া, সিংহাসন ত্যাগ করিয়া, নিজের কোমল পদ্মহস্ত বৃদ্ধের সম্মুখে প্রসারণ করিয়া দিলেন। বৃদ্ধ মহারাণীর সদয় প্রসারিত হস্ত চুম্বন করিয়া নিতান্ত সম্মানিত ও কৃতার্থ হইলেন।

তাই ভাই, বলিতেছিলাম যে মহারাণীর সৌন্দর্য্য, তাঁহার সজল অশ্রুপূর্ণ আঁখি দুটী। ভাই চক্ষের জল বড় একটা তুচ্ছ সামগ্রী নহে। পরের দুঃখ, পরের শোক, যাহা কিছু নিতান্ত সুখকর বা পবিত্র বা সুন্দর তাহা দেখিয়া অনুভব করিয়া কাঁদিয়া ফেলা, উপেক্ষা অবহেলার বিষয় নহে। একজন পরম শ্রদ্ধেয় স্বামীজী বলিয়াছিলেন যে "যে বাস্তবিক সরলভাবে কাঁদতে পারে সে তো অনেক দূর এগিয়েছে।"

মহারাণীর জীবনটা ভালবাসায় মাখান ছিল। প্রিন্স কনসর্টের প্রতি মহারাণীর অনুরাগ ও ভালবাসা উপন্যাসের কল্পনার চেয়ে মধুর। স্বাধীন সভ্য ইউরোপে যেখানে বিবাহের পূর্ব্বে, স্ত্রী পুরুষে দেখা সাক্ষাৎ প্রণয় পছন্দ বিজ্ঞাপন প্রচলন, সেখানেও রাজা রাণীর বিবাহ সাধারণতঃ

তাঁহাদের নিজেদের ক্ষমতার বহির্ভূত; অর্থাৎ পূর্ব্বরাগের (Courtship) অনুবর্ত্তী হইয়া সম্পন্ন হয় না। কিন্তু মহারাণীর বিবাহ ব্যাপার সকলই নূতন ও সুন্দর। প্রিন্স এলবার্টের উপর গাঢ় অনুরাগ ও ভালবাসা; প্রিন্স এলবার্টের নিজের অযোগ্যতা নিবেদন এবং উৎফুল্ল প্রেমে আত্মবিস্মৃতি, পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় আরক্তিমগণ্ডে উদ্বেলিত হৃদয়ে নিজের বিবাহসম্বন্ধ বিজ্ঞাপন; উদ্বাহ-বন্ধনে অতুলনীয় সুখ ও প্রেমপূর্ণ নির্ভরতা এবং পুত্রলাভে দম্পতী-জীবনের সম্পূর্ণ সফলতা এই সকল বিষয় ভাবিলেও সুখ আছে। বিবাহকালে প্রিন্স এলবার্ট ও মহারাণীর বয়স এক সমান ছিল। বিবাহকালে উভয়েরই বয়স ন্যূনাধিক ২০ বৎসর। বিবাহিত জীবনের ২১ বৎসর সুখসম্পদ, পারিবারিক জীবনের পবিত্র স্নেহপূর্ণ মধুরতা সম্ভোগ করিয়া, মহারাণীর জীবনের অবশিষ্ট ভাগ,—প্রায় ৪০ বৎসর নিদারুণ বৈধব্যে সমস্ত উৎসবসমারোহ বিভ্রমবিলাস হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। বৈধব্যে, মহারাণী, পবিত্র চরিত্রমাহাত্ম্যে, চিত্তশুদ্ধি এবং ত্যাগস্বীকারে, হিন্দু বিধবার আদর্শস্থানীয়া ছিলেন। মানুষের প্রধান গৌরব ও সম্পদ, পবিত্র চরিত্র, চিত্তশুদ্ধি। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত লোকে, সম্পদ প্রলোভনে না পড়িয়াও, অনেক সময় চরিত্র ও চিত্তশুদ্ধি রক্ষা করা নিতান্ত সুকঠিন বিবেচনা করিয়া থাকেন। আর মহারাণী অতুল সম্পদের অধিকারিণী হইয়াও ইংরাজ রাজপরিবার বংশপরম্পরাসঞ্চিত আবর্জ্জনাসঙ্কুল বিলাসলালসাসম্ভোগপূর্ণ রাজসিংহাসনে সমারূঢ়া হইয়া বিনম্রা মল্লিকাশুভ্রা হিন্দু বিধবার ন্যায় কাল কাটাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহা কম গৌরবের বিষয় নহে।

মহারাণী ৬৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া ৮১ বৎসর বয়সে এই সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন। সংসারে যাহা কিছু সুখের, যাহা কিছু গৌরবের, ঈশ্বরের অনুগ্রহে সকলই তাঁহার ছিল। অতুলসৌন্দর্য্যসম্পন্ন চরিত্রবান্ মেধাবী বিদ্বান্ প্রেমপূর্ণ স্বামী, স্নেহের আধার পুত্রকন্যা পৌত্র দৌহিত্রাদি, অসংখ্য প্রজার ভক্তিশ্রদ্ধা এই সমস্তই পাইয়াছিলেন। তবে আজ মহারাণীর মৃত্যুতে সমস্ত সভ্যজগৎ শোকে মলিন ম্রিয়মাণ কেন? মহারাণী তো বেশ্ই গিয়াছেন। মহারাণীকে কখন দেখি নাই; কখন চক্ষের দেখাও দেখি নাই—আজ আমরা কেবল তাঁহার সুমহান্ শুদ্ধ চরিত্র, দয়াপূর্ণ সহৃদয়তা, আড়ম্বরবিহীন

সরল কার্য্যপূর্ণ জীবন, স্মরণ করিয়া শোক প্রকাশ করিতেছি। প্রোষিত ভারতবাসী লণ্ডনের কোন রাস্তায় আহত হইল, সংবাদপত্রে পড়িলেন; অমনি গাড়ী করিয়া, তাহার কুশলবার্ত্তা জানিবার জন্য স্বয়ং সেই গরিবের দ্বারস্থ হইলেন। বিশাল রাজ্যের কোন্ প্রান্তে কে কোথা শোক পাইল; অমনি, সেই দুঃখক্লিষ্টকে মহারাণীর সুমধুর আশ্বাস সান্ত্বনা-পূর্ণ লিপি প্রেরিত হইল। আর, আমরা নিজের সংসার নিজের সুখদুঃখ লইয়াই বিব্রত; বিদেশে ভাই বন্ধুর বিপদ হইলে একখানা সান্ত্বনাপূর্ণ পত্রও লিখিয়া উঠিতে পারি না। আমরা অবস্থার বৈগুণ্যে, কখন বা "শিক্ষিতা" স্ত্রীর সঙ্কীর্ণ নির্ম্মম প্রতি-রোধিতায়, অন্যকে "সোনা দানা" দিতে পারি না, অন্যেও তাহা প্রত্যাশা করেনা; হায় কিন্তু কত সময়, আলস্যে অনবধানে, বন্ধু ভ্রাতার বিপদ সময়ে, হৃদয়শূন্যতাপ্রযুক্ত একবার "খোঁজও" লইতে পারি না।

মহারাণী নিজে যেমন শুদ্ধ নির্ম্মল-চরিত্রগুণে গৌরবময়ী, তেমনি তাঁহার নিকট পবিত্র চরিত্রবান্ পুরুষের বিশেষ আদর ছিল। মহারাণী কোন সময়েই ধনগৌরব, চাকচিক্যময় আড়ম্বর ঐশ্বর্য ভাল বাসিতেন না। ধনীই হউন আর মেধাবী বুদ্ধিমানই বা হউন না কেন, যদি তাহার চরিত্রবল না থাকিত, তাহা হইলে তিনি মহারাণীর নিকট আদৃত হইতেন না; তাঁহার ভাগ্যে, মহারাণীর ঘৃণার কঠোর কটাক্ষ নিপতিত হইত। লণ্ডন টাইম্স্ যথার্থই বলিয়াছেন, "We have to thank the Queen for influence of the most potent kind, conscientiously and vigorously used to enforce high ideals of social and personal virtue. Her own life was by choice one of almost austere simpilicity and homeliness. Her whole life, public and private, has been one great and abiding lesson upon the paramount importance of character. No lesson is more needed in days when superficial cleverness or real ability untrammelled by scruple,too often fills the public eye by the meretricious aid of the self-advertisement, *which the Queen abhorred,* Her triumphs have been won by sheer force of character."—ভাই ভগিনি, আজ কাল, আমরা চরিত্রের আদর করিতে ভুলিয়া গিয়াছি। ধনই আদর ও সম্মানের কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিয়াছে। অসদুপায়ে, লোক্‌কে ঠকাইয়া, সুদের সুদ খাটাইয়া, যদি কিঞ্চিৎধন অর্জ্জন

করিতে সক্ষম হই, আর, তাহার পর যদি সরকার বাহাদুরকে ফাঁকিঝুকি দিয়া একটা খেতাব আদায় করিতে পারি,—আমার পূর্ব্বপুরুষ বাজার সরকার বা যাহাই হউক না কেন, আর আমি নিজে চোর চামার মদ্যপায়ী "মফিলে" বা নাচে বা বাগানে বারবণিতা লইয়া কুৎসিত রঙ্গরসে নিমজ্জিত হই না কেন,—তাহা হইলে, তুমি সচ্চরিত্র সরল হিন্দুই হওনা কেন বা আনুষ্ঠানিক স্বরুচি-পূর্ণ ব্রাহ্মভ্রাতাই হওনা কেন, সেই রহস্যপূর্ণ হাস্যরস-সঙ্কুল ন্যক্কৃত খেতাবধারীকে কতই না সম্মান ও আদরে অভিবাদন কর। এই তো আমাদের দেশে শোচনীয় অবস্থা। তাই বলি, মহারাণীর জীবনী আলোচনায় ফল আছে; আমরা অনেক শিক্ষালাভ করিতে পারি।

আজ, আমাদের আদর্শ-নারী মহারাণীর মৃতদেহ মৃত স্বামীর পার্শ্বে, আড়ম্বরবিহীন ঐশ্বর্য্যশূন্য ফ্রগ্‌মোরে চিরশায়িত। একদিনের তরেও, স্বামী-চিন্তা মহারাণীর সাধ্বীহৃদয় হইতে বোধ হয়, অপসৃত হয় নাই। স্বামী—প্রিন্স কনসর্টের সমাধিক্ষেত্রে, স্বামীর সমাধি মন্দিরে, স্বর্গীয় পতির কল্যাণ ও স্মৃতির উদ্দেশে, কতবারই না মহারাণী, ভগবানের নিকট প্রার্থনার অশ্রু-সিক্ত পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছিলেন। তাই আজ, তাঁহার অভিলাষানুসারে আমাদের মহারাণী স্বামীর সান্ত্বনাময় ক্রোড়ে সংরক্ষিত। আজ আদর্শ যুগলের আত্মা ঈশ্বরে সম্মিলিত। ভগবান্ তাঁহাদের মঙ্গল বিধান করুন এবং স্বর্গীয়া মহারাণীর প্রজাবর্গকে সচ্চরিত্র, নিষ্ঠাবান্, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও সুখী করুন।

শিক্ষা ও অন্নসংস্থান।

"ফেলো" উপাধি মৃগয়া।

"I accept without qualification the first principle of our forefathers that every boy born into the world should be put in the way of maintaining himself in honest independence. No education which does not make this its first aim is worth anything at all." *Froude.*

কলিকাতা হারিসন রোডের একটী দ্বিতল বাটীতে বৈঠকখানায় একটী এম্, এ, উপাধিধারী শিক্ষক প্রাতে "ষ্টেটসম্যান" সংবাদপত্র পড়িতেছেন।

এমন সময়ে একজন হাইকোর্টের উকিল, একটী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও একজন মুন্সেফ সে ঘরে প্রবেশ করিলেন। শিক্ষক (উঠিয়া সকলের সহিত সেকহ্যাণ্ড করিয়া বলিলেন)— আসুন, আসুন। আপনারা আসিয়াছেন, আমার পরম সৌভাগ্য।

ডেপুটী। আমাদিগের আগমন বস্তুতঃ আপনার "পরম সৌভাগ্য" হউক আর না হউক, আপনার অনুগ্রহে প্রকৃতই আমাদিগের, অর্থাৎ এই উকিল বাবুর, "পরম সৌভাগ্য" ঘটিতে পারে।

শিক্ষক। সে কি?

মুন্সেফ। সত্য!

ইনি হাইকোর্টের উকিল, ইউনিভার্সিটীর গ্রাডুয়েটদিগের মধ্যে একটী রত্ন, মেডালিষ্ট, ইনি এই বৎসর একটী "ফেলোসিপের" প্রার্থী।

শিক্ষক। ভালইত! বোধ করি শিক্ষা বিষয়ে ইঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানা শুনা আছে।

ডেপুটী। হাঁ। ইনি কলিকাতার—প্রধান কলেজের কিছুকাল প্রিন্সিপাল ছিলেন।

শিক্ষক। তাহা হইলে উনি অবশ্য শিক্ষা বিষয় অনেক চিন্তা করিয়াছেন। মহাশয়েরা যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ক্ষমা করেন, তাহা হইলে আমি দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

মুন্সেফ। (ভোট প্রার্থী উকিলের প্রতি হাসিতে হাসিতে বলিলেন)— যখন বিলাতের মত ভোটের জন্য ক্যানভাস (canvass) করিতে আসিয়াছেন বিলাতের মত ইলেকটর (elector) দিগের নিকট পরীক্ষা দিতে হইবে। "ফেলো" হওয়া নহে, এক্ষণে দেন পরীক্ষা।

উকীল। (স্বগত) ভাল গ্রহ, মাষ্টারটা কি জিজ্ঞাসা করিবে তাত বুঝিতেছি না।

শিক্ষক। আপনি কেন "ফেলো" হইবার ইচ্ছা করিতেছেন?

উকীল। সম্মানের জন্য।

শিক্ষক। কোন সম্মানের জন্য? "ফেলোদিগের" কি কোনও কর্ত্তব্য নাই।

উকিল। আছে বই কি। পরীক্ষা ইত্যাদির দ্বারা শিক্ষা বিষয়ে যতদূর সুব্যবস্থা করা যাইতে পারে তাহা করা অনেকটা ফেলোদিগের হস্তে।

শিক্ষক। শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা করিবার জন্য আপনি ওকালতি ব্যবসায়ের মধ্যে অবসর পাইবেন কি?

উকিল। আশাত করি পাইব।

শিক্ষক। মহাশয়ের আশা থাকিলেই ভাল। আমার সে বিষয় ভরসা কম।

উকিল। কেন?

শিক্ষক। মহাশয় ইহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর যে কয়েক জন আমার নিকট ভোটের জন্য আসিয়াছিলেন, এবং পরে "ফেলো" হইয়াছেন, শিক্ষা সম্বন্ধে কোনও গুরুতর বিষয় তাঁহাদের আলোচনা করিতে দেখিতে পাই নাই।

উকিল। হাঁ, আমাদিগের ব্যবসায়ের বেশ পশার হইলে অবসর কম বটে।

শিক্ষক। মহাশয় আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আমাদিগের দেশে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহাতে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের কি ভাল উপায় হইতেছে?

উকিল। যাহারা পরীক্ষা পাস করিতে পারে, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই গবর্ণমেণ্টের চাকুরি পাইতেছে। উকালতী, মোক্তারি, ডাক্তারি করিতেছে।

শিক্ষক। যাহারা গ্রাডুয়েট ও অণ্ডার গ্রাডুয়েট হইতেছে, তাহাদিগের পক্ষে চাকুরি পাওয়া, ওকালতিতে পশার হওয়া, দিন দিনই কি কঠিন হইতেছে না?

উকিল। তাত হবেই। তাহা বলিয়া আপনি শিক্ষা উঠাইয়া দিতে চাহেন না কি?

শিক্ষক। (হাঁসিয়া) তাহা হইলে আমার রুটী মারা যাইবে যে। তাহা আমি বলিতেছি না। আপনি জানেন এক্ষণে বি এ, এম এ, বি এল, প্রভৃতি পাশ করিয়া কত লোকে দুয়ারে দুয়ারে হা অন্ন, হা অন্ন, কোথা চাকুরি, কোথায় মক্কেল করিয়া, হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছে।

উকিল। জানি।

শিক্ষক। ইহারা কেন বি এ, এম এ, পাশ করিয়াছিল?

উকিল। জীবিকা নির্ব্বাহ ও অর্থ উপার্জ্জন করাই অবশ্য পাশ করিবার প্রধান উদ্দেশ্য। চিরকালই সকল দেশে অর্থ উপার্জ্জন করিবার জন্য লোকে লেখা পড়া করে।

মুন্সেফ ও ডেপুটী। তা বটেই ত। আপনি যে শিক্ষালাভ করিয়াছেন তাতে কি আপনি অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন না?

শিক্ষক। আমি তুচ্ছ ব্যক্তি। আমার কথাটা এক্ষণে থাকুক। (উকিলের প্রতি) আপনি বলিতেছেন যে লোকে চিরকালই টাকার জন্য লেখা পড়া করে?

উকিল। আপনি দেখান যে তাহা করে না। এক্ষণে প্রমাণের ভার আপনার উপরে।

মুন্সেফ মহাশয়! "ইসুটা" কি হইল ভাল করিয়া শুনা কর্ত্তব্য।

ডেপুটী। থামুন। এত আর দেওয়ানি মামলা নহে যে "ইসু" ঠিক হইয়া ডিক্রি কি ডিসমিস হইবে।

শিক্ষক। (উকিলের প্রতি) আপনি প্রমাণের বোঝা আমার ঘাড়ে চাপাইতেছেন। ভাল। পূর্ব্বে আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের কি ব্যবসায় ছিল?

উকিল। ভিক্ষা।

শিক্ষক। ভিক্ষাতে কি বিশেষ ধনলাভ হয়?

মুন্সেফ। "নৈবচ নৈবচ।"

শিক্ষক। তবে প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ যে ধনলাভের জন্য বিদ্যা উপার্জ্জন করিতেন না তাহা আপনি স্বীকার করিলেন। আপনি দেখিতেছেন, আমাদিগের দেশে এমন এক সময় ছিল যখন লোকে কেবল জ্ঞানলাভের জন্য বিদ্যা উপার্জ্জন করিত।

উকিল। এটা কেবল ভারতবর্ষে দেখা যায়। অন্য দেশে কোথাও এরূপ দেখা যায় নাই।

শিক্ষক। আপনি প্রিন্সিপাল ছিলেন, আপনি মহাশয় ব্যক্তি। আপনি, কিরূপে এরূপ কথা বলিলেন, আপনি কি সব ইতিহাস ভুলিয়া যাইতেছেন?

উকিল। আপনি ইয়ুরোপ বা আমেরিকাতে এরূপ দেখান দেখি।

শিক্ষক। হাঁ মহাশয়। আমি ইয়ুরোপেই দেখাইতেছি। প্রাচীনকালে আমাদিগের দেশে যেমন লেখাপড়া ও শাস্ত্রাধ্যয়ন ধর্ম্মযাজকদিগের মধ্যেই ছিল ইয়ুরোপেও তেমনি পূর্ব্বে লেখা পড়া ও শাস্ত্রানুশীলন কেবল পুরোহিতদিগের মধ্যে ছিল। আমাদিগের দেশে ছাত্রগণ, পণ্ডিতগণ, যেমন দরিদ্র ছিলেন, সন্ন্যাসীর মত ছিলেন, ইয়ুরোপেও অধিকাংশ তেমনি এককালে ছিলেন। এমন কি যদিও ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা ইউরোপে সাধারণ লোকের পক্ষে নিষিদ্ধ ও বেআইনি, তথাপি বিদ্যার্থী ব্যক্তিদিগের পক্ষে ভিক্ষা নিষিদ্ধ ছিল না।

ডেপুটী। তবে কিরূপ ছিল?

শিক্ষক। তাহারা যেখানে সেখানে ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিতে পারিত। ইউরোপের নানা দিক্‌দেশ হইতে প্যারি নগরে পণ্ডিত এবিলার্ডের মধুর বক্তৃতা শুনিতে যে ত্রিশ হাজার ছাত্র সম্মিলিত হইত তাহারা রাস্তায় ভিক্ষা করিতে করিতে আসিত। তাহাদিগের সঙ্গে পেটরা বা তুরঙ্গ বা পোর্টম্যানটু বা গ্লাডষ্টোনব্যাগ কিছুই থাকিত না। যা কিছু কাপড়, পৃষ্ঠের উপরেই থাকিত।

ডেপুটী। তবে বোধ হইতেছে, যাহারা খাইতে পাইত না, যাহাদিগের এক কড়া কানা কড়িও থাকিত না, তাহারাই ইউরোপে লেখা পড়া শিখিতে প্রবৃত্ত হইত।

শিক্ষক। তাহা নহে মহাশয়! বড়মানুষের ছেলেও কখন কখন ইচ্ছাপূর্ব্বক পুরোহিত সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতেন। যাঁহারা পুরোহিত হইতেন তাঁহারা সন্ন্যাসীর কঠোর জীবন অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন।

মুন্সেফ। যে সকল ছাত্র শিক্ষালাভের জন্য দূরে বা বিদেশে আসিত তাহার সংখ্যা নিতান্ত কম।

শিক্ষক। যদি তাহা হইত একমাত্র প্যারি নগরে কেমন করিয়া এবিলার্ডের (Abelard) ত্রিশ হাজার ছাত্র হইয়াছিল?

উকিল। আপনি কি তবে বলেন যে জীবিকা নির্ব্বাহ শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে?

শিক্ষক। না। আমি তাহা বলি না। আমি তাহার বিপরীত কথাই বলিতেছি। আমি বলিতেছি যাহাতে খাওয়া পরার সংস্থান হইতে পারে তাহা শিক্ষার প্রথম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। লোক যদি এম, এ, হইয়া খাইতে না পায়, তাহা হইলে সে বাঁচিয়া থাকিবে কেমন করিয়া?

উকিল। এমন কি হইতে পারে যে এম, এ, পাশ করিয়া একেবারে খাইতে পায় নাই, অথবা খাইতে পাওয়ার জন্য তাহাকে কুলি মজুরের কাজ করিতে হইয়াছে?

শিক্ষক। হইয়াছে বই কি।

উকিল। আমাদের দেশে?

শিক্ষক। আজিও হয় নাই, শীঘ্র হইবে।

উকিল। তবে কোথায় হইয়াছে যে এম, এ, পাশ করিয়াও কুলী মজুর খাটিয়াছে?

শিক্ষক। সভ্য বিলাতে।

উকিল। আমিত কোন স্থানে একথা শুনি নাই, বা পড়ি নাই।

শিক্ষক। কি করিব, আপনি যদি না পড়িয়া থাকেন সে দোষ আমার নহে। আমি পড়িয়াছি। বিলাতে এম, এ, পাশ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের কোন উপায় হয় নাই, পরে অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়া রাস্তায় পাথর ভাঙ্গিতে হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্তও দেখা গিয়াছে।

উকিল। আচ্ছা তা যেন হ'ল। কিন্তু চাকুরী ও ওকালতী প্রভৃতির কয়েকটী বিষয়ে সুবিধা হওয়া ব্যতীত, আবার আর কিসে, স্কুল কলেজের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের সুবিধা হইতে পারে?

শিক্ষক। স্কুল কলেজে কৃষি শিল্প বাণিজ্য বিষয় শিক্ষা দেওয়া যায় না?

উকিল। উদার সাধারণ শিক্ষা (Liberal education) এবং ব্যবসায় শিক্ষা (Technical education) এর ভিতর একটী প্রভেদ নাই কি? যাহা বলিতেছেন তাহা ত ব্যবসায় শিক্ষা।

শিক্ষক। হ'লই বা। নামে কি আসে যায়?

উকিল। আপনি কি বলেন উদার শিক্ষা (Liberal education) উঠিয়া যাউক?

শিক্ষক। কখনই না। আপনি শিক্ষাকে যত উদার (Liberalise) করিতে ইচ্ছা করেন করুন তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। আমি বলি, সাধারণ শিক্ষা এবং ব্যবসায়সাধক শিক্ষা একত্রে দিলে আরও ভাল হইতে পারে। কেননা চিন্তা কার্য্যেই পূর্ণাঙ্গ হয়। মন যাহা শিখিল চক্ষু তাহা দেখিল, হাত তাহা গড়িল। যাহা শেখা যায়, যতক্ষণ তাহা কার্য্যে পরিণত না করা যায় ততক্ষণ তাহা ঝাপসা ঝাপসা বোধ হয়।

মুন্সেফ। মাষ্টার মহাশয়, আপনি একটা নূতন কথা বলিতেছেন। ইউরোপে কোনও স্থানে উদার শিক্ষা (Liberal education) ও ব্যবসায় শিক্ষা (Technical education) এক সঙ্গে হয় না। স্বতন্ত্র স্কুল কলেজ আছে। সাধারণ শিক্ষা ও ব্যবসায়িক শিক্ষা এক সঙ্গে হইতে পারে একথা কোন বড় সাহেব বলেন নাই।

শিক্ষক। আমার একথা নূতন নহে। আমি যাহা বলিতেছি, বিখ্যাত ইতিহাসলেখক মনস্বী ফ্রুড (Froude) সাহেব তাহাই বলিয়াছেন। জর্ম্মাণ দেশ ইহা বুঝিয়াছে এবং অন্যান্য কতকগুলি দেশ বুঝিতেছে। ফ্রুড সাহেব বলিয়াছেন যে, যে সকল জ্ঞানে জীবিকা নির্ব্বাহ হয় তাহার প্রায় সকল-গুলিতেই বেশ বুদ্ধি বৃত্তি মার্জ্জিত হইতে পারে।

ডেপুটী। কেমন করিয়া ?

শিক্ষক। দেখুন। কৃষিকার্য্য। অতি মূর্খ লোকেও করিতেছে, কিন্তু দেখুন, রসায়ন বিদ্যা, উদ্ভিদ তত্ত্ব, ঋতুর সহিত শস্যের সম্বন্ধ, ইত্যাদি কত বিষয়ের সহিত ইহার সংযোগ রহিয়াছে। কৃষিকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে এইগুলি আলোচনা করিলে কি ইহাতে বুদ্ধির বিকাশ হয় না ?

উকিল। আমাদের স্কুলে কলেজে সে শিক্ষা কেমন করিয়া হইবে ?

শিক্ষক। কেন, প্রত্যেক স্কুলে ও কলেজে প্রত্যেক ছাত্রকে সাধারণ শিক্ষার সহিত কোন না কোনও একটা শিল্প বা ব্যবসায় শিক্ষা করিতে হইবে, এই একটী নিয়ম করিলেই হইতে পারে।

মুন্সেফ। শিল্প বা ব্যবসায় শিখিলে কি হইবে? বাজারে ইউরোপ বা আমেরিকার কলের নির্ম্মিত সস্তা মাল থাকিতে আমাদিগের দেশীয় হস্ত নির্ম্মিত জিনিস কাটিবে কি ? আর আমরা কল কারখানা করিব সে মূলধন কৈ ?

শিক্ষক। মূলধনের সংস্থান হইতে পারে না এমন নহে। চেষ্টা করিলে মূলধন জুটিবে। তবে সে কথা পরে হইবে। শ্রীযুক্ত টাটা (Tata) দেখাইয়াছেন, যে ভারতবর্ষে এমন অনেক জিনিষ আছে যাহা ভারতবাসিগণ প্রস্তুত করিয়া স্বদেশে এবং বিদেশে বিক্রয় করিয়া লাভকরিতে পারেন। কিন্তু ইহার জন্য প্রথমে সেই সেই বস্তু সংক্রান্ত ব্যবসায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানা আবশ্যক।

মুন্সেফ। বোম্বাইবাসীদিগের কথা ছাড়িয়া দেন, তাহারা প্রায় সাহেব-দিগের মতন ব্যবসায় বাণিজ্য এবং কল কারখানা করিতেছে। বাঙ্গালীর কথা বলুন।

শিক্ষক। বাঙ্গালা দেশেও এমন অনেক বস্তু আছে যাহা এক্ষণেও এখানেই প্রস্তুত হয়। এই সকল ব্যবসায় করিবার জন্য অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক বাধ্য হইয়া, দোকান খুলিতেছেন, কারিকর রাখিয়া কাজ করান। কিন্তু এই সকল ব্যবসায় কিছুমাত্র না জানায়, দ্রব্যাদির গুণাগুণ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকায় ভাল জিনিষ করাইয়া লইতে পারেন না, অথবা খরচা অনেক পড়িয়া যায়। অথবা কোন্ জিনিষ কোথায় কি করিলে অধিক কাট্‌তী হইতে পারে তাহার সন্ধান রাখেন না, সুতরাং ভদ্রলোক দোকান করিলে অধিকাংশ স্থলে এক্ষণে লোকসান হয়, চলে না। শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্য জানা থাকিলে এরূপ হয় না। বরঞ্চ শিক্ষিত লোক মূর্খ কারিগরদিগকে ভাল করিয়া চালাইতে পারেন, শিল্প ও ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে পারেন। এবং যে সকল ব্যবসায়ে কলের অপেক্ষা হাতের কসলং অধিক দরকার, তাহাতে বিশেষ লাভ হইতে পারে।

ডেপুটী। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কি আমাদের কথায় এরূপ স্কুল করিবেন?

মুন্সেফ। গবর্ণমেণ্ট শিল্প ব্যবসায় সম্বন্ধে যে আইন করেন তাহাতে উন্নতির ব্যাঘাত হয় এই বলিয়া সংবাদ পত্রগুলিও চিৎকার করিয়া থাকে।

শিক্ষক। হাঁ অবাধ বাণিজ্যের দোহাই দিয়া মধ্যে মধ্যে যে ব্যবস্থা হয় তাহা ভারতবাসীর পক্ষে সুবিধা নহে।

উকিল। তবে, মহাশয়, আর আশা কোথায়?

শিক্ষক। বাঙ্গালা শিক্ষা প্রণালী গবর্ণমেণ্ট যেরূপ সংশোধন করিতে চেষ্টা করিতেছেন এবং উচ্চ শিক্ষাকে দ্বিবিধ করিবার যে ভিত্তি সংস্থাপনের সূচনা

হইতেছে তাহা আশাপ্রদ নহে কি? আর দেখুন, যদি আমাদের চেষ্টা, যত্ন, প্রতিজ্ঞা থাকে, তাহা হইলে আমরা বাধা বিঘ্ন অনেক পরিমাণে কাটিয়া উঠিতে পারি। প্রমাণ বোম্বাই পার্শিগণ। মহাশয়, অদ্য আমার স্কুলের বেলা হইল।

ডেপুটী। ভোটের কি হইল?

শিক্ষক। ক্ষমা করিবেন। অদ্য বলিতে পারি না। যাঁহারা ভোট দেন তাঁহাদের একটা দায়িত্ব আছে।

মুন্সেফ। বটেইত।

ডেপুটী। উকিল বাবুর আবার কি পরীক্ষা দিতে হইবে?

শিক্ষক। অন্যায় কথা। আমি মূর্খ মাষ্টার! আপনারা সকলেই বিদ্বান্ ও পদস্থ। আপনাদিগের পরীক্ষা করিবার স্পর্দ্ধা করি না। তবে, আর এক দিন আমার কুটীরে পদধূলি পড়িলে অনুগৃহীত হইব।

উকীল, ডেপুটী ও মুন্সেফ। তবে, মহাশয়, অদ্য চলিলাম। (সেক-হ্যাণ্ড)—উকিল, ডেপুটী ও মুন্সেফ চলিয়া গেলেন।

শিক্ষকের কন্যা অন্য ঘর হইতে আসিয়া বলিলেন, বাবা ভাত ঠাণ্ডা হইয়া গেল। স্নান করিতে আসুন।

শিক্ষক। যাই মা।

কন্যাটীর বয়স বার তের বৎসর। বিবাহ হয় নাই, পাত্রের সন্ধান হইতেছে। একটী বিএ, পাশ করা যুবার সহিত বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতেছে। পাত্রটী দেখিতে সুন্দর, অবস্থাও ভাল। তথাপি কন্যার পিতা বলিয়াছেন, কোন একটা শিল্প বা ব্যবসায় না শিখিলে ও পাত্রে আমি কন্যা দিব না। এই মেয়েটীর সহিত পাঠকের আবার সাক্ষাৎ হইতে পারে।

"ফেলো" হওয়া সম্বন্ধে উপরে যে কথোপকথন লিখিত হইল, তাহা কাল্পনিক নহে, যথার্থ ঘটিয়াছিল। বড়লাট লর্ড কর্জ্জন সম্প্রতি গ্রাডুয়েট দ্বারা ফেলো নির্ব্বাচন করা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। যেরূপ উপরোধ অনুরোধে ফেলো নির্ব্বাচন হইত, তাহাতে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। তবে আমরা ভরসা করি, তিনি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে নূতন সুব্যবস্থা করিবেন। আমাদিগের প্রস্তাব, এইরূপ নিয়ম করা উচিত যে, যাঁহারা ফেলোসিপের প্রার্থী হইবেন

তাঁহাদিগের প্রত্যেককে শিক্ষা সংক্রান্ত কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে একটী প্রবন্ধ, এবং নিজের নিজের মনোনীত, এম এ পরীক্ষার পাঠ্য, কোন বিষয়ে আর একটী প্রবন্ধ লিখিতে হইবে। এই দুই প্রবন্ধ ছাপাইয়া প্রত্যেক ভোটদাতার নিকট পাঠাইতে হইবে। ভোটদাতা, প্রত্যেক প্রবন্ধের দোষগুণ লিখিয়া, যাঁহার প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে করিবেন, তাঁহাকে ভোট দিয়া, তাঁহার নাম লিখিয়া পাঠাইবেন।

"আর কতদিনই বা"।

জানিনা, কেন আজকাল মনে হয়, "আর কতদিনই বা"? সুখে হউক আর দুঃখেই হউক,—যাঁহারা যৌবন কাটাইয়া চল্লিশের কাছাকাছি পঁহুছিয়াছেন, "আর কতদিনই বা" এই প্রশ্ন ও সংশয়ের ভাব,—তাঁহাদের অনেকের জীবনটাকে, আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে যেন একটু উদ্ভ্রান্ত ও উদ্বেলিত করিয়া তুলে।—শৈশবের কথা মনে হয় না কি?—সেই পুকুরের পাড়ে খেলা, সেই পূজার সময় কত আনন্দ, সেই নূতন জুতা, নূতন কাপড় পাইয়া কত আহ্লাদ, সেই ভাইভগিনীতে মিলে ঝাউগাছের নীচে, আমগাছের তলায় কত হাসিখুসি; সেই উৎফুল্ল হাস্যময় কলরবপূর্ণ ছুটাছুটী, সেই আনন্দ, হাস্য, ছুটাছুটির ভিতর অবশ্য "আর কতদিন" বিষাদের ছায়া, কখন উপস্থিত হইত না।—কৈশোরে, লেখা পড়ার উৎসাহে, বন্ধুত্বের উচ্ছ্বাসে, সঙ্গিগণের স্নিগ্ধ-সংসর্গ মধুরতায় কখন মনে হইত না যে "আর কত দিনই বা।" অধিকাংশের পক্ষে, এ কথাও অবিসংবাদী যে, যৌবনে, চঞ্চল চিন্তায়, ব্যগ্র সুখ সম্ভোগে, উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে ভালবাসার আদান প্রদানে, বিরহ বিচ্ছেদে, কখন মনে হইত না, যে "আর কতদিনই বা, দুদিন আগে বা দুদিন পরে এ সংসার তো ছাড়িতেই হইবে।"

তুমি এক সময় ভাবিয়াছিলে, "উপাধিধারী হইয়া রোজগার করিয়া স্ত্রী পুত্র লইয়া কতই বা সুখী হইবে।—"পাশও" করিলে, হাকিমও হইলে, কিম্বা

উকীল বা ডাক্তারই বা হইলে, দুপয়সা বেশ রোজগারও করিলে; সকলই হইল, সুন্দরী সঙ্গীতপটু স্ত্রীও পাইলে, গোলাপ ফুলের মতন পুত্ররত্নও গৃহ-আলোকিত করিল। সংসারে অভাব নাই; সুখ আছে, আনন্দ আছে, হাস্য পরিহাসের হিল্লোল আছে। আবাসগৃহের নিকট বীচিমালা গঙ্গা আছে; গঙ্গার ওপারে গণ্ডগ্রাম আছে; সেই গ্রামের বিস্তীর্ণ হরিৎক্ষেত্রে সরল কৃষকের ছেলেপিলেদের নির্দ্দোষ হাস্যপূর্ণ খেলাধূলা আছে। তুমি শুয়ে শুয়ে গঙ্গা দেখ; গঙ্গার পরপারে স্নিগ্ধ-শ্যামল-ক্ষেত্রে কত স্বপ্নময় আন্দোলন অনুভব কর, জাহ্নবী সংলগ্নসৌধে, ছাদে বেড়াইতে বেড়াইতে নির্ম্মল নীলাকাশে শান্ত সুস্নিগ্ধ তারকামালা বেষ্টিত সুমধুর চন্দ্রমা নিরীক্ষণ কর; কিন্তু এই সকল দেখিয়া অনুভব করিয়া, মনে হয় না কি, এই যে এত সুখ এত সৌন্দর্য্য কত দিনের জন্য। প্রত্যুষে বামাকণ্ঠের সঙ্গীতঝঙ্কারে জাগিয়া উঠিলে, ছেলে মেয়ে সুকোমল-ঢল-ঢল-মুখমণ্ডলে ততোধিক সুকোমল-সুমধুর-সুস্নিগ্ধ-অধরে তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহাদেরই প্রাণা-লোড়ী ঝঙ্কার তোমার প্রাভাতিক অস্তিত্ব সুখময় স্বপ্নময় করিয়া তুলিল। আবার সন্ধ্যার পর, নীচেকার-ঘরে কাজ করিতে বসিয়াছ, উপরে-দোতলায়, হারমোনিয়ম্ বাজিল, তোমার ন-বছরের ছেলে ও সাত-বছরের মেয়ে তাহা-দিগের কোমল হইতেও কোমলতর কণ্ঠে তাহাদিগের মার সহিত গাহিয়া উঠিল;—

"তাঁহার আনন্দধারা, জগতে যেতেছে বয়ে
এস সবে নরনারী, আপন হৃদয় লয়ে।"

তুমি কাজে নিবিষ্ট ছিলে; তোমার শুষ্ক নীরস ব্যবসায়, কঠোর নিয়ম Indenture আর Mortgage, এই সঙ্গীত কম্পনে ত্রস্ত হইয়া কোথায় ভাসিয়া চলিয়া গেল; একবার পদপ্রান্তে কুলুকুলু-শব্দময়ী নদীর দিকে চাইলে; নদী-সংলগ্ন ফুলবাগানে,—নদীর ধারে আসিয়া দাঁড়াইলে;—দেখিলে, অনুভব করিলে কি? জ্যোৎস্নাবিধৌত—নীলিমাময়ী আকাশ, সুমন্দস্নিগ্ধ-মারুৎহিল্লোল, বৃক্ষাদির মরমর-শব্দ ও নদীবক্ষে উজ্জ্বল তরঙ্গমালার নৃত্য;—আর উপরে দ্বিতলগৃহপ্রকোষ্ঠ নিঃসৃত সম্মিলিত তিনটী গলার সুললিত অতি সুকোমল ধীরতরঙ্গায়িত সঙ্গীত;—মনে হইল কি?—দেশের বাড়ী ঝাউগাছের শোঁ শোঁ

শব্দ, সেই পুষ্পবাটিকা, সেই পুকুরের ধারে, সেই যৌবনের ভালবাসা ও স্বপ্ন ও প্রহেলিকা ; সেই ভ্রাতৃগণের স্নেহ, সেই তিরোহিত আনন্দের হাস্যময়ী স্নেহময়ী প্রতিমূর্ত্তি পরলোকগতা স্বর্গীয়া ভগিনী, আর স্বর্গীয় দেবোপম-জনকজননী। কত কথা মনে হইল, আবার সম্মিলিত সুকণ্ঠ, তাহার সঙ্গীত হিল্লোলে, পূর্ব্ব-স্মৃতির স্বপ্ন কোথায় তাড়াইয়া দিয়া গাইয়া উঠিল ;—

"সে আনন্দে উপবন, বিকশিত অনুক্ষণ
সে আনন্দে ধায় নদী, আনন্দ বারতা করে।"

মনে হইল এই "আনন্দধারা" আর কতদিন, এই উদ্দাম সুখপূর্ণ জীবন আর কতদিন—এই সকল সুখের সার সঙ্গীত সৌন্দর্য্যই বা "আর কতদিন।"

*　　*　　*　　*　　*

এই পরস্পর-আলিঙ্গিত সঙ্গীতসৌন্দর্য্য-শিহরিত, বীচিমালায় প্রোদ্ভিন্ন চঞ্চল জ্যোৎস্নোদ্ভাসিত পূর্ণশরীরা ভাগীরথীর দূর-সৈকতে শ্মশানে অন্তিম সংকারের আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল—আগুনটা জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিভিয়া গেল। সঙ্গীতও থামিল।—এত যত্নের মানবদেহ, এত ক্লেশের কারণ দ্বেষ রেশারিশি, এত আগ্রহপূর্ণ আশা ভরসা আকাঙ্ক্ষা, সব ভস্মীভূত স্তূপ-রাশিতে পরিণত হইল। তখন ঘরে আসিয়া আবার বসিলে। সামনে আলো জ্বলিতেছে ; মাথার উপর ঘড়ীটা টিক টিক করিয়া চলিতেছে। চতুর্দ্দিক নীরব নিস্তব্ধ। বুঝিলে, বাস্তবিকই, এ সংসারের সুখসম্ভোগ, রমণীর সুকণ্ঠ, শিশুর আন্দোলিত মুখমণ্ডল, সংসারের হাস্য-পরিহাস কয় দিনের জন্য। মনে হইল ঠিক কথা, "আর কতদিনই বা।" ভাই, যদি চল্লিশের কাছাকাছি এসে থাক, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, আমার মনের ভাব—"আর কতদিন, সময়তো হয়ে এলো,—ঈশ্বরের কিছু কায করি।"

উপনিষদের কথা।

(উপক্রমণিকা।)

মূল—বেদ।

কোন্‌টী সৎ কোন্‌টী অসৎ মনুষ্যগণ সহজে তাহা বুঝে না। তাহাদিগের ঐহিক ও পারলৌকিক হিতকামনায় যে সকল শাসন বাক্য বা উপদেশ পরম্পরা ঋষি বা ঋষিতুল্য ব্যক্তিগণের অনুগ্রহে, সন্নিবদ্ধ হইয়া, জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছে, সেই সকল শাসন বাক্য ও উপদেশ পরম্পরাই সর্ব্বত্র 'শাস্ত্র' নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। সেই সকল শাস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন পথ প্রদর্শক। কিন্তু তাহারা পরস্পরে যতই পৃথক্‌ বা ভিন্ন মতের হউক না কেন, সকলেরই একমাত্র মূলভিত্তি বেদ। যেমন প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের শাখা প্রশাখা সকল পরস্পর অসম্মিলিত ও ভিন্নদিগ্‌বর্ত্তী হইয়াও একই মূলদেশের আশ্রয়ে জীবন ধারণ করে; তেমনি বিশাল আর্য্যশাস্ত্র সকল, আপাততঃ বিভিন্ন পথগামী বলিয়া প্রতীত হইলেও, ফলতঃ কেহই বেদরূপ মহামূলের আশ্রয় ব্যতীত, প্রামাণ্য স্বরূপ জীবন লাভ করিতে পারে না।

শাখা—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ।

সর্ব্বশাস্ত্রের মূল ও সর্ব্বজ্ঞানের আকর সেই বেদ মূলতঃ এক হইলেও মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভেদে দুইভাগে বিভক্ত। শ্রৌত সূত্রকার আপস্তম্বের "মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্‌" এই সূত্র হইতেও বেশ বুঝা যায় যে, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই সন্দর্ভ সমষ্টির নামই বেদ, তদ্ব্যতীত 'বেদ' নামক আর কোন পদার্থ নাই।

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের প্রভেদ।

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণে স্থূলতঃ এইমাত্র প্রভেদ যে, অধিকাংশ মন্ত্রভাগই প্রধানতঃ কর্ম্ম ও কর্ম্মোপযোগী বিষয় নিরূপণে পর্য্যবসিত ও 'সংহিতা' নামে পরিচিত; আর অধিকাংশ অথবা সমস্ত ব্রাহ্মণভাগই মন্ত্রার্থ ব্যাখ্যায়, ইতিবৃত্ত কথনে ও জ্ঞানোপদেশে পর্য্যাপ্ত, এবং 'ব্রাহ্মণ' নামে অভিহিত।

ব্রাহ্মণ নাম কেন?

সাধারণতঃ লৌকিক ব্রাহ্মণগণ, যেরূপ নিজ নিজ ব্যাখ্যাকৌশলে, বাক্যের নিগূঢ় তাৎপর্য্য উদ্ভিন্ন করিয়া সহৃদয় মানবমণ্ডলীর হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ-

স্রোতঃ উদ্বেলিত করিয়া দেন, সেইরূপ বেদের ব্রাহ্মণ ভাগও, মন্ত্ররাশির নিগূঢ় রহস্য সকল উদ্ঘাটিত করিয়া, বিস্ময়বিমুগ্ধ মানবগণের তমোময় হৃদয়কন্দরে সমুজ্জ্বল বিবেকদীপ প্রজ্বলিত করিয়া দেয়, এই ব্রাহ্মণসমুচিত কার্য্যবলেই মন্ত্রেতর বেদভাগ 'ব্রাহ্মণ' সংজ্ঞালাভ করিয়াছে।

উপনিষৎ কি ?

(১) প্রোক্তবিভাগ সম্পন্ন বেদের মধ্যে যে যে অংশে জীব, জগৎ, ঈশ্বর, ব্রহ্ম, এবং বন্ধ ও মোক্ষ ইত্যাদি অধ্যাত্মতত্ত্ব সকল উত্তমরূপে বিচারিত ও মীমাংসিত হইয়াছে, সেই সকল অংশ আবার "উপনিষৎ" সংজ্ঞালাভ করিয়াছে। 'উপনিষৎ' শব্দের যৌগিকার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও উক্তবিধ অর্থই সমধিক প্রীতিকর বলিয়া মনে হয়।

(২) 'উপনিষৎ' শব্দটী উপ-নি-পূর্ব্বক 'সদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহার প্রত্যেক অংশের অর্থ এইরূপ,—উপ = সমীপ ও শীঘ্র। নি = নিশ্চয় বা নিঃসংশয়। সদ্ = অবসাদন বা শিথিলীকরণ ও গতি। সুতরাং সম্মিলিত অর্থ এই,—যাহা অবিলম্বে নিঃসংশয়রূপে (সংসার ও তৎকারণ অজ্ঞানকে) অবসন্ন অর্থাৎ শিথিল করে, অথবা উপাসক যাহা দ্বারা অবিলম্বে নিঃসংশয়রূপে ব্রহ্ম সমীপে উপস্থিত হন, এখানে তাহাই প্রকৃত 'উপনিষৎ' বলিয়া গ্রহণীয়। এই যৌগিকার্থবলেই মহাভারতীয় "ভগবদ্গীতা" ও "সনৎসুজাতীয় সংবাদ" প্রভৃতি কতকগুলি আর্ষগ্রন্থও 'উপনিষৎ' শ্রেণীর মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। বলা আবশ্যক যে এখানে প্রথমোক্ত উপনিষদেরই গল্প সকল যথাসম্ভব সংগৃহীত হইবে।

উপনিষদে মনোহর আখ্যায়িকা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জীব কি ? জগৎ কি ? বন্ধ কি ? মোক্ষ কি ? ব্রহ্ম কি ? ইত্যাদি অধ্যাত্মতত্ত্ব লইয়াই সমস্ত উপনিষৎ শাস্ত্র পরিসমাপ্ত হইয়াছে। দুর্ব্বিজ্ঞেয় সেই সকল তত্ত্ব, স্বল্পবুদ্ধি জিজ্ঞাসুগণের হৃদয়ে অনায়াসে প্রতিফলিত করিবার আশায়, লোকহিতৈষিণী শ্রুতি যে সকল রমণীয় আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়াছেন, "নবপ্রভায়" তাহারই কিছু কিছু আভাস দিব।

শ্রীদুর্গাচরণ বেদান্ত সাংখ্যতীর্থ।

হাসির গান।

ভদ্রগণ! প্রস্তাব করিতে আমি চাই—
"এ জগতে একটিও সাধু ব্যক্তি নাই,
সকলেই মিথ্যাবাদী ভণ্ড আর চোর,
সকলেই অধার্ম্মিক, কুচরিত্র ঘোর,
আছে—একটি ধার্ম্মিক সাধু সত্যপথগামী,
আর—এঁহেঁ—সে আমি"
(Chorus)— সে আমি সে আমি সে আমি।

দ্বিতীয়তঃ, হয় মনে অতিশয় দুঃখ—
"এ জগতে সকলেই ভয়ানক মূর্খ;
সকলেই নিরেট নির্ব্বুদ্ধি নিঃসন্দেহ,
প্রমাণ—আমারে তারা বুঝিলে না কেহ,
আছে—একমাত্র বিদ্যাবুদ্ধি রত্ন অতি দামী
আর—এঁহেঁ—সে আমি"
(Chorus)— সে আমি সে আমি সে আমি।

তৃতীয়তঃ, এটি ভেবে দেখেছেন শর্ম্মা
"ইনি অতি বেঁটে আর উনি অতি লম্বা,
এঁর চক্ষু ছোট, ওঁর নাক নহে ভালো,
অমুক কি কটা আর অমুক কি কালো,
আছে—এক সুপুরুষ—যেন মূর্ত্তিমান কামই
আর—এঁহেঁ—সে আমি"
(Chorus)— সে আমি সে আমি সে আমি।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

রাজনৈতিক ভূমিকম্প।

ফরাসীবিপ্লব।

"The French Revolution was to Carlyle a great moral event which proved the truth he was trying to teach—that blind selfishness can end only in ruin; that the individual, or the nation that loves pleasure and not God is sure to be overtaken in time by Divine Justice."—*Ward.*

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, পাঠক, একবার ফ্রান্সের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে জানুয়ারি প্রাতে দশ ঘটিকার সময়, দেখুন, ফ্রান্সের অদ্বিতীয় অধীশ্বর ষোড়শ লুই গিলোটিন-মঞ্চে আরোহণ করিতেছেন। তাঁহার একদিকে এজওয়ার্থ নামক পুরোহিত, অন্যদিকে কালান্তক ঘাতক সমূহ। চতুর্দিক পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যে সমাচ্ছন্ন। উর্দ্ধে অজস্র সঙ্গীন, নিম্নে অসংখ্য কামান শ্রেণী সজ্জিত। কোন পার্থিব শক্তি দ্বারা নৃপতির উদ্ধার সাধন এককালেই অসম্ভব হইয়াছে।

পাঠক, ব্যাপার অতি ভীষণ বটে, কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। পূজনীয় ঋগ্বেদশাস্ত্রে একস্থানে কথিত হইয়াছে,

ওঁ আ ত্বা হাষমন্তরেধি
বিশস্ত্বা সর্ব্বা বাংছন্তু॥

আমরা তোমাকে এই রাজপদে অভিষিক্ত করিলাম, যাবৎ সকলে ইচ্ছা করে, তাবৎ এই স্থানে উপবেশন কর।

রাজা প্রজার এই প্রকারই সম্বন্ধ। আমরা প্রজা, আমাদের প্রত্যেকের শক্তি সংগ্রহ পূর্ব্বক তোমাতে স্তূপীকৃত করিয়া রাখিয়াছি, তাই তুমি অপূর্ব্ব শক্তিমান্ হইয়াছ, রাজা হইয়াছ; যদি তুমি সেই মহাশক্তির অপব্যবহার কর, তাহা হইলে আমরা স্ব স্ব শক্তি তোমার নিকট হইতে ফিরাইয়া লইব, তখন তুমি দেখিবে 'যা গতিঃ সর্ব্বভূতানাম্" তোমারও সেই গতি উপস্থিত হইয়াছে। তুমি দেখিবে জাতীয় মহাশক্তি তোমার বিরুদ্ধে সমুত্থিত, আর কোন

নরশক্তিতে তোমাকে রক্ষা করিতে পারে না। তখন তুমি সাধারণ অপরাধীর ন্যায় বধ্যভূমিতে আগমন করিয়াছ বলিয়া কি নিরতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইবে ?

কিন্তু লুইএর পাপ অতি সামান্য। তিনি তাঁহার পিতৃপৈতামহিক পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে আসিয়াছেন। চিন্তাশীল ইতিবৃত্ত লেখকেরা বলেন, লুই উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে যেমন ফ্রান্সের বিপুল বিশাল রাজ্য পাইয়াছিলেন, তেমনি তিনি একটী নিদারুণ উপপ্লবও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভূগর্ভ-নিহিত শ্যামায়মানপৃষ্ঠ আগ্নেয়গিরি সদৃশ সেই উপপ্লব যখন অগ্নি উদ্বমন করিতে আরম্ভ করিল, তখন অগ্রে লুই, তৎপরে তদীয় মহিষী, তৎপরে রাজবংশীয় প্রধান প্রধান লোক, ফ্রান্সের অভিজাত তন্ত্র ও পুরোহিত সম্প্রদায়, সকলেই একে একে বধ্যভূমিতে আনীত হইলেন। সেই ভীষণ অগ্নি দেখিতে দেখিতে ফ্রান্স অতিক্রম করিয়া ইউরোপের সর্ব্বস্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। আফ্রিকার কিয়দংশ ভস্মীভূত হইয়া গেল, ভয়ে এসিয়া কম্পান্বিত হইল। রাজা প্রজা কেহই তাহার হস্তে অব্যাহতি পাইলেন না। লক্ষ লক্ষ গ্রাম নগর রাজধানী উৎসাদিত করিয়া সেই সুভীষণ কালাগ্নি শত লক্ষ লোকের প্রাণবিনাশ পূর্ব্বক বিশ বৎসর পরে ওয়াটার্লুর যুদ্ধে কথঞ্চিৎ নির্ব্বাপিত হইয়াছিল।

সভা ও রাজার বক্তৃতা।

লুই নিজে রাজশ্রীসম্পন্ন সরলপ্রকৃতি এবং স্বভাবতঃ দয়ালু নরপতি ছিলেন। রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কি প্রকারে সর্ব্বসাধারণের সুখসংবিধান করিতে পারেন তৎপ্রতি তাঁহার সবিশেষ দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল। কিছুদিন রাজ্য-শাসনের পর তিনি যখন জানিতে পারিলেন যে, আসন্ন-উদ্বমন আগ্নেয়গিরির পার্শ্বে তাঁহার সিংহাসন সংস্থাপিত, তখন আর কালবিলম্ব না করিয়া ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে তারিখে ষ্টেট্‌স জেনারল্ নামক মহাসভার আহ্বান করিলেন। ফলতঃ এই ৫ই মেই ফরাসী উপপ্লবের প্রথম দিন বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

মহাসমৃদ্ধি সহকারে সভাগৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। সিংহাসনের দক্ষিণভাগে পুরোহিত সম্প্রদায়ের স্থান হইল, বামভাগে অভিজাততন্ত্র এবং সম্মুখভাগে সাধারণতন্ত্র উপবিষ্ট হইলেন। সকলে যথোপযুক্ত স্থানে আসনগ্রহণ

করিলে সানুচর রাজা, রাজমহিষী এবং রাজসন্ততিগণ সভাগৃহ উজ্জ্বল করিলেন।

অনন্তর রাজা রাজাসনে উপবিষ্ট হইয়া সভ্যদিগকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক এই মর্ম্মে বক্তৃতা করিলেন, "মহাশয়গণ! আজি বড় শুভদিন, এই দিনের জন্যই আমার চিত্ত এতদিন লালায়িত ছিল। অদ্য আমি আমার চতুঃপার্শ্বে জাতীয় প্রতিনিধিদিগকে দেখিয়া নিরতিশয় আনন্দ ও গৌরব বোধ করিতেছি। জাতীয় সৌভাগ্য সংস্থাপন মন্ত্রণায় আপনারাই প্রধান সহায়। সাধারণের মঙ্গলবিষয়ক কার্য্যে, প্রজার অতীব হৃদয়ঙ্গম বন্ধুর নিকট যাহা যাহা প্রত্যাশা করা যায়, সে সমস্ত আপনারা আমার নিকট প্রত্যাশা করিতে পারেন।"

এই সমস্ত উদার বাক্যে প্রথমতঃ সকলেই বিমুগ্ধ হইলেন বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু কতিপয় প্রতিনিধি সবিশেষ আলোচনার পর স্থির করিলেন, রাজার কথার কোন অর্থ নাই। যে সমতা ও স্বাধীনতার জন্য ফ্রান্সের আপামর সাধারণ সকলেই সমুৎসুক হইয়া উঠিয়াছে, সে সম্বন্ধে রাজা ত কিছুই বলিলেন না। আমি উচ্চবংশসম্ভূত, তুমি নীচবংশজাত, আমি আদেশ দিব, তুমি অম্লানবদনে প্রতিপালন করিবে; তুমি পরিশ্রম করিয়া ভূমিকর্ষণ করিবে, আমি বিনা পরিশ্রমে তাহার সারাংশ ভোগ করিব, এই পার্থক্যে, এই ভাগ্যবিপর্য্যয়ে ফ্রান্স অনন্তকাল প্রপীড়িত। সেই পার্থক্যের সেই ভাগ্য-বিপর্য্যয়েরই যদি মোচন না হইল তবে আমরা কি প্রতিনিধিত্ব করিতে আসিলাম!

শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তী।

বনলীলা।

(বসন্তে)

বনদেবী।　নবকিসলয়দল শোভিল　মৃদু দোলিল (১)

তরুণ ব্রততি, তরু-সঙ্গে,

নন্দন বনফুল গঞ্জন　বনরঞ্জন

ফুটিল কুসুম শত অঙ্গে।

জয় জয় মন্মথ হে!

---

(১) "শ্রিত কমলা কুচমণ্ডল" ইত্যাদির সুরে (গুর্জ্জরী রাগ, নিঃ সার তান)।

শ্যামল পত্র সুশোভিত অতি লোহিত
পলাশ চিত্ত বিদারে ;
বিতরি মনোহর সৌরভ বনগৌরব
ফুটিল বকুল মদ ভারে।
জয় জয় মন্মথ হে !

বেষ্টি বিকচ নব মঞ্জরী অলি গুঞ্জরি
নিমগন নবমধু পানে ;
সুরভিত অনিল সুপূজিত বন কূজিত
মধুকল কোকিল গানে।
জয় জয় মন্মথ হে !

বনবধূ। রে সখি রে সখি উদিল বসন্ত ;
আইল ফুলসহ প্রফুল্ল কান্ত !
পর সখি অংশুক, রঞ্জিত কিংশুক
সুরম্য কুসুম্ভবর্ণে ;

সখী ! অগ্রনখে ত্রুটি' শিরীশ ফুলদুটি,
কর অবতংসিত কর্ণে।
ললাট লম্বিত কপোল চুম্বিত
শোভিল কুন্তল চূর্ণ।
মধুফুল আসব গন্ধে সখি তব
অনিন্দ্য আনন পূর্ণ।
পর ধনি, অঞ্জন, খঞ্জন-গঞ্জন-
আয়ত নয়ন বিলোলে।
যতন ভরে তুলি' কোমল ফুলকলি
পর ফুলরেণু কপোলে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

অতীত-বিরহ।

জীবনে যতই জাগে কামনা নূতন
কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ তত পিছে চায়।
ভ্রান্ত প্রবাসীর মত কাতর নয়ন,
অজ্ঞাত নূতন পথে নব নিরাশায়,
শ্রান্ত পথিকের মত, নবীন কৈশোর
মুগ্ধ সম ফিরে চায় খেলায় বিভোর
অতীত শৈশব পানে, জাগ্রত যৌবন
তপ্ত প্রাণ ভরি শুধু বিছাইতে চায়
স্বপ্নাতুর কৈশোরের বিরাম শয়ন।
নবীন আকাঙ্ক্ষা কতবার ফিরে যায়
বিদায় কাতর ভীরু প্রেমের মতন,
পরিচিত শান্তিস্নিগ্ধ অন্তঃপুর পানে
আশৈশব জীবনের নিশ্চিন্ত ভবন!
অনিশ্চিত ভবিষ্যত দুরাশার টানে
হৃদয় ব্যাকুল করে, অজানা আঁধার
অসহায় প্রাণ ভরি ঢালে ভীতিভার,
তাই প্রাণ ফিরে ফিরে কাঁদে নিশিদিন
চাহি চিরপরিচিত পুরাতন পানে,
পাখীরা যেমন কাঁদে শাবক-বিহীন
নীরব কুলায় ঘিরে সকাতর গানে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

দৈনিক ঘটনা সংগ্রহ।

মাঘ, ১৩০৭।

১লা মাঘ। লর্ড মেথুয়েন জেনারেল ডিলারীকে টোঙ্গার নিকট পরাজিত করেন। ঘিলঘিট প্রদেশে তুষার বর্ষণ।

২রা মাঘ। জয়পুর ষ্টেটের দেওয়ান কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই মহাশয়ের মৃত্যু। পশ্চিম হিমালয়ে কাঙ্গড়া প্রদেশে তুষার পাত।

৩রা মাঘ। বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারক মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ের মৃত্যু। ইটালিয়ান কনসলের কলিকাতায় আগমন।

৪ঠা মাঘ। প্রুসিয়া রাজ্যের বাইসেন্‌টেনারি* মহোৎসব। মার্সেলিস নগর হইতে কুচবিহার মহারাজের ভারতযাত্রা।

৫ই মাঘ। মহারাণী ভারতেশ্বরীর কঠিন পীড়ার সংবাদ প্রচারিত হয়। ক্ষেত্রী নগরের রাজার মৃত্যু। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন। প্রুসিয়া রাজ্যের বাইসেন্‌টেনারি মহোৎসব।

৬ই মাঘ। পঞ্চাশ জন কনষ্টেবল দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রেরিত হয়। কলিকাতায় সিটি কলেজে মহাদেব রাণাড়ের স্মরণার্থ সভা হয়।

৭ই মাঘ। নাগপুর ও লাহোরে মহাদেব রাণাড়ের স্মরণার্থ সভা আহূত হয়।

৮ই মাঘ। দুর্ভিক্ষ কমিশনের বোম্বাই নগরে অধিবেশন। জর্ম্মন রাজ্যের নূতন কনসলের কলিকাতায় আগমন।

৯ই মাঘ। মহারাণী ভারতেশ্বরীর মৃত্যু।

১০ই মাঘ। মহারাণী ভারতেশ্বরীর মৃত্যুসংবাদ কলিকাতা ও ভারতের অন্যান্য স্থানে প্রচারিত হয়। আলবার্ট এডোয়ার্ডের "সপ্তম এডোয়ার্ড" নামে রাজ্য গ্রহণে শপথ।

১১ই মাঘ। সপ্তম এডোয়ার্ড ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর বলিয়া ঘোষিত হন। ব্রহ্মোৎসব।

১২ই মাঘ। দার্জ্জিলিঙ্গে ভূমিকম্প। সরস্বতী পূজা।

---

* বাইসেনটেনারি অর্থে এই বুঝায় যে ঐ উৎসব দুই শত বৎসরানন্তর হইয়া থাকে।

১৩ই মাঘ। মহিষাদলের রাজা ঈশ্বরীপ্রসাদ গর্গ মহাশয়ের মৃত্যু।

১৪ই মাঘ। সপ্তম এডোয়ার্ডের ঘোষণাপত্র ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পঠিত হয়।

১৫ই মাঘ। জর্ম্মন যুবরাজ "অর্ডার অব দি গার্টার" উপাধিতে ভূষিত হন। পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য সার জন ম্যাক্লিয়রের মৃত্যু।

১৬ই মাঘ। মুণ্ডা বিদ্রোহের বিচার সমাপ্ত। জেনারেল নক্স ও ডিওয়েটের ঘোরতর সংগ্রাম।

১৭ই মাঘ। ট্যাবাক্সবর্গে বুয়ার কর্ত্তৃক কলোনিয়ানদের পরাজয়।

১৮ই মাঘ। ভারত সেনাপতি সার পাউয়ার পামার মহোদয়ের কলিকাতায় প্রত্যাগমন।

১৯শে মাঘ। কলিকাতায় মিউনিসিপাল ম্যাজিষ্ট্রেসীর সৃষ্টি। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন।

২০শে মাঘ। মহারাণী ভারতেশ্বরীর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া। কলিকাতা ময়দানে বিরাট শোক-সম্মিলন।

২১শে মাঘ। মহারাণীর মৃত্যুপলক্ষে সঙ্গীতসমাজ কর্ত্তৃক কাঙ্গালী ভোজন। লোয়ার পঞ্জাবে ঝড়, বৃষ্টি ও তুষার পাত।

২২শে মাঘ। মহারাণী ভারতেশ্বরীর সমাধি। বোম্বাই নগরে মহারাণীর স্মরণার্থ বিরাট সভা।

২৪শে মাঘ। বেঙ্গল এসিয়াটিক্ সোসাইটির সাম্বৎসরিক সভা। পূর্ব্ব সাইবেরীয়ার গ্রাণ্ডলামার কলিকাতায় আগমন। মহারাণীর স্মরণার্থ আগড়তলায় (হিল ত্রিপুরা) দরবার। মহারাণীর স্মরণার্থ কলিকাতা টাউন হলে বিরাট সভা।

২৫শে মাঘ। রাণী উইলহেল্মিনার বিবাহ। বাকু নগরে অগ্নিকাণ্ড; অনেক লোক বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

২৬শে মাঘ। দুর্ভিক্ষ কমিশনের আজমীরে অধিবেশন। দ্বারবঙ্গের মহারাজের বিবাহ। ছোটলাটের আমতা পরিদর্শন।

২৮শে মাঘ। ফেরোজপুরে বিষম জলপ্লাবন।

২৯শে মাঘ। মহীশূরের মহারাজের মহীশূরে প্রত্যাগমন। করাচী নগরে সপ্তম এডোয়ার্ড সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হন।

৩০শে মাঘ। সার্ভিয়ার রাজা মিলানের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হয়। দুর্ভিক্ষ কমিশনের দিল্লী নগরে অধিবেশন।

সারসংগ্রহ।

নিদ্রা।

সজেষ্টার ও থিংকার।

Suggester and Thinker আমেরিকার সাপ্তাহিক পত্র। তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে, মনুষ্যের মনের দুইটী ভাগ আছে, একটী অন্তর্মুখ আর একটী বহির্মুখ। বহির্মুখ মন, বাহ্যজগতে যাহা ঘটিতেছে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা মনুষ্য যাহা গ্রহণ করিতেছে, তাহারই সংবাদ লয়, এবং তদ্‌বিষয় বিচার করে। জাগ্রত অবস্থায় বহির্মুখ মনের কার্য্য হয়। অন্তর্মুখ মন বাহিরের ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করে না, অন্তঃকরণের ভিতর যাহা চলিতেছে তাহাই আলোচনা করে,—যুক্তি করে না, সহজ জ্ঞান দ্বারা মীমাংসা করে। নিদ্রিত অবস্থায় অন্তর্মুখ মন কার্য্য করিয়া থাকে। এক্ষণে কতকগুলি নিদ্রা-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি বলেন, নিদ্রার সময় এই অন্তর্মুখ মনকে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। নিদ্রিত ব্যক্তির কাণে কাণে যাহা বলা যায়, সেই দিকেই তাহার চিন্তা যায়; ভাল কথা বলিলে ভাল চিন্তা হয়। নিদ্রিত অবস্থায় এইরূপ শিক্ষা দিলে সহজেই নাকি অনেকটা সুশিক্ষা হইতে পারে। মেটাফিজিকাল ম্যাগাজিন (Metaphysical Magazine) নামক মাসিক পত্র বলেন, নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে কল্য মনের যেরূপ অবস্থা রাখিতে হইবে তাহা ভাল করিয়া চিন্তা করিবে। এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিবে যে, "কল্য যদি মনে কোন অশান্তি-কর বা অনুচিত চিন্তা আইসে, তাহা আমি দূর করিয়া দিব।" তাহার পরে নিদ্রা যাইবে; ক্রমাগত এইরূপ অভ্যাস করিলে দেখিবে মনে নূতন বল পাইবে। কেননা যাহা শরীরের পক্ষে রাত্রি, তাহা আত্মার পক্ষে দিবস।

জগতের নৈতিক অবনতি।

নর্থ আমেরিকান রিভিউ (North American Review) নামক সাময়িক পত্রে প্রত্যক্ষবাদী শিরোমণি মিঃ ফ্রেড্‌রিক হেরিসন সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন যে, গত পঁচিশ বৎসরে ইংলণ্ডের রীতি নীতি ও সাহিত্যের অবনতি হইয়াছে। আমরা বলি, কেবল ইংলণ্ডে কেন, সমুদয় জগতে গত পঁচিশ বৎসরে নীতি ও ধর্ম্ম অবনত হইয়াছে।

চীনে উপদ্রব।

কন্‌টেম্‌পোরারি রিভিউ (Contemporary Review) নামক বিলাতের মাসিক পত্রিকাতে শ্রীযুক্ত ডিলন সাহেব, চীনদেশে অবলাগণের প্রতি ইউ-রোপীয় জাতি যে পৈশাচিক অত্যাচার করিয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। সুখের বিষয় ইংরেজ ও মার্কিণ সেনা সম্বন্ধে এই তুরপনেয় কলঙ্কের কথা শুনা যায় না। আমাদিগের হিন্দুপেট্রিয়েট এই ঘটনা উপলক্ষে বলিয়াছেন যে, যখন সিপাহী-বিদ্রোহে সিপাহি কর্ত্তৃক মেমসাহেবদিগের উপর অত্যাচার হইয়াছিল, তখন ভারতবাসিগণ পশু বর্ব্বর ইত্যাদি কত কথা প্রচার হইয়াছিল। এক্ষণে খৃষ্টীয়ান ইউরোপীয় জাতিগণ কি বলিবেন? থিয়সফিষ্ট সমালোচন (Theosophist Review) বলেন, জাপানের বৌদ্ধগণ ইউরোপীয় খৃষ্টীয়ানগণ অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে মৈত্র ও ক্ষমার ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। যাহা হউক কার্য্যক্ষেত্রে কাম, ক্রোধ, লোভ রিপু দমনে বৌদ্ধ ও হিন্দুগণ যে অনেক খৃষ্টীয়ানগণকে শিক্ষা দিতে পারেন তাহা দেখা যাইতেছে।

খাজানার আইন।

বসুমতী সংবাদ পত্রে এই বিষয়ের আলোচনা দেখিয়া সুখী হইলাম। কলিকাতার ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন বাঙ্গালার জমিদারগণের সভা। কিছুকাল হইল এই সভা হইতে খাজানার আইন অর্থাৎ ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের কয়েকটী ধারা সংশোধনের জন্য ছোট লাট বাহাদুরের নিকট একখানি আবেদনপত্র প্রেরিত হইয়াছে। উক্ত সভা বলেন হাইকোর্টের নজির অনুসারে খাজানার সুদ খাজানার অন্তর্গত বুঝায় না। এ বিষয়ে

আইন সংশোধন করা উচিত। খাজানা আইনের ১২ হইতে ১৫ ধারা পরিবর্ত্তন করা উচিত। প্রজা খাজানা না দিয়া ক্ষেত্র হইতে শস্য কাটিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না, এইরূপ বিধান হওয়া সঙ্গত। খাজানার মোকদ্দমার শমন ডাকঘরের দ্বারা জারির ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য, এবং বিচারে যদি প্রজা জমিদারকে খাজানা দেয় নাই এবং মিছা জবাব দিয়াছে, তাহা প্রমাণ হয়, তাহা হইলে দাবির দ্বিগুণ টাকা প্রজা জমিদারকে দিতে বাধ্য হইবে এইরূপ বিধান হওয়া সঙ্গত। সংক্ষেপতঃ উক্ত সভার প্রার্থনা এইবার জানাইলাম। প্রজাদিগের পক্ষে একজন হাইকোর্টের উকীল একটী প্রবন্ধ লিখিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

ইংরাজি টীকা।

(Vaccination) ভ্যাক্‌সিনেশন সম্বন্ধে হিতবাদীতে একটী হিতকর প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ লেখক বলেন যে, গোজাতির একপ্রকার বসন্ত হয়, এই বসন্ত-বীজ কোন মনুষ্য-শরীরে প্রবেশ করিলে তাহার প্রায় বসন্ত হয় না। যদিও হয়, তাহাতে জীবন নষ্ট হয় না, মহাত্মা স্যার উইলিয়ম জেনার এই তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। সেই সময় হইতে গো-বসন্তের বীজ দ্বারা মনুষ্য-শরীরে টীকা দেওয়া প্রচলিত হইয়াছে, ইহারই নাম ইংরাজি টীকা অথবা ভ্যাক্‌সিনেশন। ইংরাজি টীকা দেওয়ার পর সহস্রের মধ্যে ২।১ জন ব্যক্তিকে পুনরায় বসন্ত রোগাক্রান্ত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতা ক্যাম্বেল হাসপাতালে বহু বসন্ত-রোগী চিকিৎসার্থ নীত হইয়া থাকে, ইহাদের মধ্যে যাহাদিগের কোন প্রকার টীকার দাগ নাই, তাহাদিগের ভিতরেই মৃত্যু সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। পক্ষান্তরে ডাক্তার পীব্‌ল্‌স্ (Peebles) সাহেব আমেরিকাতে ভ্যাক্‌সিনেশন্ প্রচলনের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন, এবং অনেক আমেরিকান তাঁহার মতাবলম্বী। ইংলণ্ডেও ভ্যাক্‌সিনেশন বিরোধীর দল আছে। কিন্তু আমরা নিজে যতদূর দেখিয়াছি তাহাতে ইংরাজি টীকার উপকারিতাই অনুভব করিয়াছি।

শতাব্দীর বাণিজ্য।

বঙ্গবাসী ইহার একটী উৎকৃষ্ট বিবরণ লিখিয়াছেন। উনবিংশতি শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে। যে ভাবেই হউক, যে রকমেই হউক ভারতে এখনও ব্যবসায়-বাণিজ্যত আছে। ব্যবসায়-বাণিজ্য-সূত্রে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত ভারতের ক্ষুদ্র বৃহৎ ব্যবসায়ী কিঞ্চিৎ সম্বন্ধও রাখিয়া থাকে। পৃথিবীর বাণিজ্যতত্ত্বে ভারতের বণিক-ব্যবসায়ীর উন্মেষণা, উত্তেজনা, উদ্ভাবনাও কিঞ্চিৎ বাড়িতে না পারে, এমন কথা নহে।

পৃথিবীতে যত লোক ছিল, উনবিংশতি শতাব্দীর মধ্যে তাহার দেড় শত গুণও লোক বাড়ে নাই ; কিন্তু বাণিজ্য যত ছিল, তাহার হাজার গুণ বাণিজ্য বাড়িয়াছে। কল, তড়িৎ, আবিষ্কার, অর্থস্বচ্ছলতা এবং শান্তি, এই পাঁচটী ঐন্দ্রজালিক কথায় এই অতুলনীয় বাণিজ্য-বৃদ্ধির তত্ত্ব মীমাংসা হইয়া যায়। পূর্ব্বে যে বাণিজ্য-সংবাদ পাঠাইতে ও তাহার জবাব লইতে এক বৎসর লাগিত, এখন তাহা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সম্পন্ন হইতেছে। অর্থের বিনিয়োগ ও বিনিময় বাণিজ্যের পথ সুগম করিয়া দিয়াছে। এখনও যুদ্ধ-বিসংবাদ আছে বটে ; কিন্তু উনবিংশতি শতাব্দীতে যেরূপ শান্তি বিরাজমান ছিল, ইহার পূর্ব্বে আর কোন শতাব্দীতে সেরূপ ছিল না।

বিংশ শতাব্দী।

নাইন্‌টীন্‌থ সেন্‌চরিতে (The Nineteenth Century) মিঃ ফিলিপ্স ৩১ ডিসেম্বর ১৯০০ সাল "দ্বিপ্রহর রাত্রি" নামক একটী কবিতা লিখিয়াছেন, তাহাতে টেনিসন কবির লক্‌সলিহল কবিতার ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় অনেক ভবিষ্যৎ ঘটনার সূচনা আছে ;—যথা স্তব্ধ হইবে রণভেরি, স্বদেশী বিদেশী সবে ভাই ভাই হবে—এক ভাষা সব দেশ বুঝিবে বলিবে—জাহাজ আকাশে চলিবে ইত্যাদি।

অনেকে মনে করেন যে কেবল আমাদিগের দেশেই উৎকৃষ্ট সাময়িক পত্র বাহির করিয়া লোকে ক্ষতিগ্রস্ত হন, তাহা ভুল। বিলাতের ফর্টনাইটলি রিভিউ (Fortnightly Review) প্রসিদ্ধ পত্রিকা। তাহার দেখাদেখি কন্‌টেম্‌পরারি, নাইনটীৎ, ন্যাসনেল কাগজ বাহির করা হয়। ফর্টনাইটলি

সাহিত্য ও রাজনীতি ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। লিউইস্ সাহেব তাহার সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু তাহাতেও অনেক টাকা ক্ষতি হয়। পরে জন মর্লে সম্পাদক হন। তখন কাগজের আয়ের অবস্থা ভাল হয়।

চারাগাছ ও সঙ্গীত।

নিউইয়র্কের সঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞ অধ্যাপক হ্যান্স টিট্‌জেন (Prof. Hans Teitgen) "চারাবৃক্ষ সঙ্গীতপ্রিয়" বলিয়া একটি অভিনব প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "আমি স্পষ্ট দেখিয়াছি যে, চারাবৃক্ষ সূর্য্যকিরণ যেরূপ ভালবাসে, সঙ্গীতও সেইরূপ ভালবাসে। যে ঘরে সঙ্গীত হয়, তথায় ছোট গাছ খুব বাড়ে, এবং কোমল মুকুলগুলি ত্বরায় প্রস্ফুটিত হইয়া সুন্দর পুষ্পে পরিণত হয়। নিস্তব্ধতায় বা কর্কশধ্বনিতে সেরূপ বাড়ে না, ও সেরূপ শীঘ্র ফুল ফুটে না।" উক্ত অধ্যাপক তাঁহার মতের পোষকতায় এই কথা বলেন যে, প্রথমতঃ আমার বিশ্বাস ডার্ব্বিনই ঠিক বলিয়াছেন। সমস্ত মাংসই তৃণ। উদ্ভিদ্‌রাজ্যের মধ্য দিয়াই জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। কোনরূপ দুর্লভ ও সুন্দর ফুলগাছ মনুষ্যজাতির পূর্ব্বপুরুষ। আমাদের সকলেরই স্নায়ু আছে। * * * কে বলিতে পারে যে কোন কোন উচ্চ শ্রেণীর চারা বৃক্ষের স্নায়ু নাই? * * * আমি জানি একজন বোষ্টন নগরের চিকিৎসক বলেন যে, যখন তিনি ঐক্যতান বাদন করেন, তখন তাঁহার সুকুমার ক্ষুদ্র বৃক্ষগুলি প্রসারিত হয়, এবং সূর্য্যকিরণের ন্যায় সঙ্গীত পান করিয়া উৎফুল্ল হইয়া থাকে। কিন্তু যখনই তিনি সুরভঙ্গ করেন, তখনই তাহারা কম্পিত হইয়া সঙ্কুচিত হয়। সঙ্গীতময় কম্পিত বায়ুলহরী চারাবৃক্ষের তন্তুকে কম্পিত করে এবং যেরূপে জীবগণের রক্ত সঞ্চালিত ও উত্তেজিত করিয়া চিত্তের আবেগ উৎপাদিত করে, সেইরূপে বৃক্ষেরও মন্দগামী রসকে দ্রুতগামী করিয়া দেয়।" Light of Truth.

ডার্ব্বিনের মতে কপিকুলই মনুষ্যের পূর্ব্বপুরুষ এই কথা প্রচার ছিল। এক্ষণে শুনা যাইতেছে পুষ্পবৃক্ষই সম্ভবতঃ মনুষ্যের আদিপুরুষ।

সাহিত্য সংবাদ।

সংস্কৃত বর্ত্তি-বাতি-শব্দ আসামীয় ভাষায় বন্তিরূপে দেখা দেয়। সম্প্রতি আসাম বন্তি নামে একখানি উচ্চ শ্রেণীর সাপ্তাহিক পত্র তেজপুর হইতে প্রকাশিত হইতেছে। আসামীয় ভাষা কিরূপ, বাঙ্গালা ভাষার কন্যা কি ভগিনী দেখাইবার জন্য এইখানে মহারাণীর মৃত্যু সংবাদ হইতে একটু উদ্ধৃত করিলাম। "আজি মাতৃহীনা মাউরীর বিননিরে আমি গ্রাহক সকলর আগত বুকুভঙ্গা শোক সংবাদ বিনাব লগাত পরিলোঁ। হেথা মিচলা অসমীয়াই দুখত "দোহাই" দি উপস্থিত বিপদত শান্তিলাভ করা "মহারাণী" রাজভক্ত ভারত-বাসীরে শোকে দুঃখে আনন্দ উৎসবে মঙ্গল ধ্বনির উচ্চরার কঢ়া "ভারতেশ্বরী," সূর্য্য অস্তনোয়ারা পৃথিবীর অধিশ্বরী ইংলণ্ডর পাটেশ্বরী মহামাতৃ ৺ ভিক্টোরীয়াই অর্দ্ধেক পৃথিবীর সুদীর্ঘ আরত সুখ্যাতির রাজত্বর সামরণি মারি প্রায় ৭৭ কোটী প্রজাপুত্রক মাউরা করি, যোবা ২২ জানুয়ারী মঙ্গলবারর রাতি সর্গধামলৈ প্রয়াণ করিলে।"

জাপানে নিকো নগরে একটী প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির আছে। এই মন্দিরে যাইবার পথের উভয় পার্শ্বে দশ ক্রোশ পথ বৃহৎ বৃক্ষের সারিগাছা দেখা যায়। একটী দরিদ্র বৌদ্ধ দারিদ্র্যহেতু মন্দিরে পিতলের প্রদীপ দিয়া দেবস্থানে যাইবার পথ আলোকিত করিয়া লইতে পারে নাই। তাই পথের ধারে বসিয়া সারিগাছা রোপণ করিয়াছিল। অভ্রভেদী বিটপীরাশির সুশীতল ছায়ায় আজি সহস্র পথিক শান্তিসুখ লাভ করিতেছে।

জলন্দরের উকিল পণ্ডিত শিবনারায়ণ উর্দ্দূ ভাষায় বুদ্ধের জীবন ও উপদেশ নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন।

শার্ঙ্গনাথ হইতে সারনাথ কি সারনাথ হইতে শার্ঙ্গনাথ? অথবা শব্দ দুইটীর মধ্যে কোনও জ্ঞাতিত্ব নাই? অনেকে মনে করেন অহিংসাবাদী জীবকুলরক্ষয়িতা গৌতম বুদ্ধ সারনাথে প্রথম ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন। ইহার নামান্তর ঋষিপত্তন। মৈত্রেয় বুদ্ধ এখানেই আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মচক্র পুনঃ প্রবর্ত্তন করিবেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

"হুরে দরে হাঁটু জল।"

এক নির্ব্বোধ নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তি কোন নদীতীরে নিয়ত উপস্থিত থাকিয়া তত্রত্য জল মাপিত। বোধ হয় সংসারে তাহার উপযুক্ত অন্য কোন কাজ ছিল না। একদা জনৈক বৃদ্ধ সপরিবারে তথায় আগমন করতঃ অপর পারে যাইবার উদ্দেশে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "নদীতে কত জল, আমরা স্ত্রীপুরুষে ছেলে পিলে লইয়া পদব্রজে অনায়াসে পার হইতে পারি কি না?" উত্তরে সেই অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিলেন,—"হুরে দরে হাঁটু জল হইবে।" এত অল্প জল শুনিয়া তাহারা সকলে হাঁটিয়া নদী পারে প্রবৃত্ত হওয়ায় মধ্য-জলের গভীরতা বশতঃ হাবুডুবু খাইয়া বিষম বিপন্ন হইল। দর্শকবৃন্দ তাহাদের দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইয়া উক্ত বর্ব্বরকে নানাবিধ তিরস্কার করাতে সে স্পষ্ট জবাব দিল, "আমি ত ঠিক কসিয়া মাজিয়া বলিয়াছি যে গড়ে এক হাঁটু জলের বেশী কিছুতেই হইবে না। তোমরা না হয় নিজেরা আঁক জোঁক কসিয়া দেখ।" অর্থাৎ সে ব্যক্তি এ পার হইতে ওপার পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানের জল মাপিয়া গড়ে হিসাব করিয়া দেখিয়াছে, এক হাঁটু হইবে—মাঝখানে হয় ত পাঁচ হাত জল, কিন্তু এধারে ওধারে কোথাও এক হাত কোথাও আধ হাত কোথাও বা চারি আঙ্গুল, এই প্রকারে সকল স্থানের গভীরতার সে একটা গড় হিসাব ঠিক করিয়া এক হাঁটু বলিয়াছে।

বিগত শতাব্দী পৃথিবীকে কি কি বিষয়ে কিরূপ শিক্ষা দিয়া চলিয়া গেল, এত নিকটে দাঁড়াইয়া তাহার ঠিক বিচার করিতে পারা একপ্রকার অসম্ভব। তবে এ পর্য্যন্ত অনায়াসে বলা যাইতে পারে যে, উহা আমাদিগকে বিস্তর দেখাইল, বিস্তর শুনাইল বিস্তর শিক্ষা দিল। এমন কি ঐতিহাসিক যুগের মধ্যে পূর্ব্বে আর কোন শত বর্ষকাল এবম্বিধ নূতন নূতন কাণ্ডকারখানার দ্বারা সংসারের এপ্রকার চমক লাগাইতে সমর্থ হয় নাই। বিজ্ঞান, সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি যে কোন রাজ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেইখানেই অভিনব ব্যাপার নয়নগোচর হয়। সমস্ত দেখিয়া বোধ হয় যেন এক নূতন যুগের পত্তন করা ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশেষ কাজ ছিল। যাহা হউক এ সকল বিচার করিবার ক্ষমতা আমাদের মত ক্ষুদ্রের সম্ভবেনা।

আমাদের মর্ম্মস্থান যেথানে আহত আমরা তাহার সম্বন্ধে দুই একটি কথা মাত্র বলিব। বিগত শতাব্দীতে আমরা যাহা কিছু নূতন শিখিয়াছি, তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের "হরে দরে হাঁটু জলের" হিসাব শিক্ষা একটী বিশেষ জিনিস কি না, তাহা পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

মধুরিমা।

উপন্যাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মাঘী পূর্ণিমার সন্ধ্যার সময় দুইটী যুবক মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত বিলাস-পুরের একটী দোকানে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটী বালিকার সকরুণ ক্রন্দনধ্বনি তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। একজন উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ও ক্রন্দনের শব্দ অনুসরণ করিয়া কিছু দূরে যাইয়া দেখিলেন, হিমানীসিক্ত মল্লিকার ন্যায় একটী সুন্দরী বালিকা আকুল হইয়া কাঁদিতেছে। যুবক ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কাঁদ কেন?

বালিকা। আমার ধাই কোথায় গেল? ধাই, ধাই কোথায়?

যুবক। কাঁদিও না, ভয় কি? তোমার ধাই কোন্ দিকে গিয়াছে?

বালিকা। তা ত আমি দেখি নাই, বৈকাল বেলা আমাকে একজন লোকের নিকট এইখানে রাখিয়া, সে কি জিনিস কিনিতে গেল, আর আমি তাহাকে দেখি নাই।

যুবক। তোমাদের বাড়ী কোথায়?

বালিকা। আমাদের বাড়ী "পাহাড়তল্লি"।

যু। সে যে এখান হতে অনেক দূর। এখানে কোথায় এসেছিলে?

বা। আমি মেলায় এসেছিলাম।

যু। এখন তো রাত্রি হইয়া গিয়াছে, তোমার এখানে কেউ চেনা লোক আছে কি?

বা। না? আমার "মুনিয়া" কোথা গেল?

যুবক অনেক খুঁজিলেন "মুনিয়ার" (ধাইয়ের) কোন খোঁজ পাইলেন না; বালিকাকে, বলিলেন "কই মুনিয়া নামে লোক এখানে নাই, তবে আর দেরী করিয়া কি হইবে, চল আমার বাড়ীতে তোমায় লইয়া যাই। কল্য পুনরায় মুনিয়াকে খুঁজিব।"

বালিকা অগত্যা যুবার সঙ্গে যাইতে স্বীকৃতা হইল। বাড়ী পঁহুছিতে রাত্রি ১ প্রহর বাজিয়া গেল। যুবা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া, বলিলেন, "পিসিমা, এই মেয়েটী যত্ন করে রাখ," পিসিমা বলিলেন, "এ কে শচীন ? এমন সুন্দর মেয়ে তুই কোথায় পাইয়াছিস্ ?" পিসিমা বালিকাকে ক্রোড়ে লইলেন এবং সজলনয়নে বলিলেন, "আহা কোন্ অভাগিনীর সন্তান তুই ? তোর দুঃখিনী মা আজ কোন প্রাণে তোকে ছেড়ে আছে ?" এমন সময় বালিকা কাঁদিয়া বলিল, "বাবা, কই তুমি।" যুবা শচীন নিকটে আসিয়া বালিকাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, বলিলেন,—"তুমি কেঁদোনা, লক্ষ্মী মেয়ে, এখন কিছু খাও। কাল তোমার বাবার কাছে তোমাকে থুয়ে আস্‌বো।" বালিকা দুঃখের স্বরে বলিল, "আমি বাবার সঙ্গে যে রোজ খাই বাবা—কোথায়, কৈ ? আমার মুনিয়া কোথায় গেল ?" পিসিমা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া একখানা থালায় অন্ন ব্যঞ্জনাদি বাড়িয়া আনিলেন, যুবা, বালিকাকে লইয়া আহার করিতে বসিলেন। পিসিমা বালিকাকে "ভাল করিয়া খাও, মা লক্ষ্মী" বলিয়া আদর করিতে লাগিলেন, স্নেহের সম্ভাষণে বালিকার দুঃখ আরও উথলিয়া উঠিতে লাগিল, সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। অনেক বুঝাইবার পর বালিকা কিছু আহার করিল, যুবা শচীন জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার নাম কি ?

বা। আমার নাম ? মধুরিমা।

যু। তোমরা বামন না কায়েত ?

বা। কায়েত।

যু। তোমার বাবা তোমায় এতদূর কেন আসিতে দিলেন ? ধাত্রীর সঙ্গে কি তোমায় সকল জায়গায় যাইতে দেন ? তোমার মা বারণ করেন না ?

বা। আমার মা নাই, বাবা সন্ন্যাসী। তিনি রাত্রিতে বাড়ী আসেন। আবার সকাল বেলায় পাহাড়ে চলিয়া যান। আমি রাত্রিতে তাঁর কাছে থাকি। আর সব সময় মুনিয়ার কাছে থাকি। সেই আমায় মানুষ করিয়াছে,

সব জায়গায় আমায় লইয়া যায়, বাবা খোঁজ লন না। পরিচয় পাইয়া যুবকের নয়ন জলে ভরিয়া গেল। হায়! মা নাই, বাপ সন্ন্যাসী। কঠিন বিধাতা!!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সরস্বতীপুর একখানি ছোটখাট গ্রাম। সেই গ্রামের জমীদার পীতাম্বর রায়। তাহার একমাত্র কন্যা নীলিমা। নীলিমার বয়স হবে পাঁচ বছর। সে বালিকা বড় সুন্দরী। যেন দেবকন্যা! নীলিমা পিতার নিকট বসিয়া বিড়ালের ছানা লইয়া খেলা করিতেছে। একটী অপরিচিতা বালিকা সেই বিড়াল ছানাকে কোলে লইতে যাইবে, এমন সময়ে নীলিমা বিরক্ত হইয়া বলিল,—আঃ ছেড়ে দাও না, ও যে আমার পুষি।—সেই অপরিচিতা বালিকাটী দুঃখিত মনে ছলছল নয়নে সেই পুষিটাকে ছাড়িয়া দিল। কিন্তু সেই সরল মুখের মলিনভাব দেখিয়া, নীলিমার কোমল হৃদয়ে আঘাত লাগিল, মেয়েটী চলিয়া গেল। তখন নীলিমা ভাবিতে লাগিল মেয়েটী কে? কেন বিড়াল নিল না? নিধি-চাকরাণী ডাকিল "নীলমণি"। আইমার ডাক শুনিয়া নীলিমা থাকিতে না পারিয়া কচি মুখখানি তাহার দিকে ফিরাইল। নিধিকে সে আইমা বলিত, কেননা, নীলিমার মাতা নিধিকে মাসি বলিতেন।

নিধি। কোলে আয় না মা।

নীলিমা। আইমা, ঐ যে ছোট মেয়েটী শচীন দাদার সঙ্গে এসেছিল, সে কাদের মেয়ে?

নিধি। সে মেয়েটী বিলাসপুরের মেলায় হারিয়ে গিয়েছিল, কাদের মেয়ে তা জানি না।

নীলি। আইমা, ওর কি মা, বাবা, নাই?

নিধি। ওর মা নাই, বাবা আছে। এইবার নীলিমার পদ্মপলাশলোচন অশ্রুপূর্ণ হইয়া শিশিরসিক্ত নবনলিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। করুণাময়ী বালিকা স্নেহমাখা নয়নে আইমার মুখের দিকে চাহিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "আহা, ওর মা নাই, আইমা"? নিধি বুঝিল বালিকার কোমল প্রাণে "মা নাই" শুনিয়া বেদনা লাগিল। "বাছারে ষাট আমার, তার মা

নাই, তাতে তোর কি ? তোর মা বাপের কোল জোড়া হয়ে তুই বেঁচে থাক।" এই কথা বলিয়া নিধি তাহাকে ভুলাইবার জন্য অন্য কথা পাড়িল। কিন্তু নীলিমা, ভুলিবার মেয়ে নয়, সে আবার বলিল,—আইমা, ওর মা নাই, তবে কার কাছে থাকে ?

নিধি। আগে বাবার কাছে ছিল এখন শচীনবাবুর পিসির কাছে থাকে।

নীলি। তা হবে না। কাল থেকে আমার মা, বাবা, পুষি মেনি, আইমা—সব তাকে দিয়ে দেব।

নিধি। বরও দিবি নাকি ? নীলিমা একটু হাসিয়া বলিল,—হাঁ দেব বই কি।

নিধি। তবে যে তোর সতীন হবে লো,—নীলিমা ছোট মাথাটী অল্প নাড়িয়া বলিল—না তোর দিদিমণি হবে। ক্রমশঃ

শ্রীমোহিনী দেবী।

আহার।

(স্বামী বিবেকানন্দ উদ্বোধনে লিখিয়াছেন)

* * * সকল পক্ষ দেখে শুনে আমার ত বিশ্বাস দাঁড়াচ্ছে যে, হিঁদুরাই ঠিক, অর্থাৎ হিঁদুদের ঐ যে ব্যবস্থা যে জন্ম কর্ম্মভেদে আহারাদি সমস্তই পৃথক্, এইটিই সিদ্ধান্ত। মাংস খাওয়া অবশ্য অসভ্যতা, নিরামিষ ভোজন অবশ্যই পবিত্রতর। যাঁর উদ্দেশ্য কেবল মাত্র ধর্ম্ম জীবন, তাঁর পক্ষে নিরামিষ, আর যাকে খেটেখুটে এই সংসারের দিবা রাত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে জীবনতরি চালাতে হবে, তাকে মাঝে মাঝে কিছু মাংস খেতে হবে বৈকি। যত দিন মনুষ্য সমাজে এই ভাব থাকবে, "বলবানের জয়," ততদিন মাংস খেতে হবে বা অন্য কোনও রকম মাংসের ন্যায় উপযোগী আহার আবিষ্কার কর্ত্তে হবে। নইলে বলবানের পদতলে দুর্ব্বল পেষা যাবেন। রাম কি শ্যাম নিরামিষ খেয়ে ভাল আছেন বল্লে চলে না—জাতি জাতির তুলনা করে দেখ।

আয়তনে অনেকটা পুষ্টি অথচ শীঘ্র পাক হয়, এমন খাওয়া চাই। যে খাওয়ায় পুষ্টি কম, তা কাজেই এক বস্তা খেতে হয়, কাজেই সারাদিন লাগে তাকে হজম করতে ; ঘি, তেল্ গরম দেশে যত অল্প খাওয়া যায়, ততই কল্যাণ। ঘিয়ের চেয়ে মাখন শীঘ্র হজম হয়। ময়দায় কিছুই নাই, দেখতেই

সাদা। গমের সমস্ত ভাগ যাহাতে আছে, এমন আটাই সুখাদ্য। আমাদের বাঙ্গালা দেশের জন্য এখনও দূর পল্লীগ্রামে যে সকল আহারের বন্দোবস্ত আছে, তাহাই প্রশস্ত। লুচি কচুরি এসেছে পশ্চিম থেকে। সেখানেও কালেভদ্রে লোকে খায়।

গরিবরা খাবার যোটে না বলে অনাহারে মরে, ধনীরা অখাদ্য খেয়ে অনাহারে মরে। যা তা পেটে পোরার চেয়ে উপবাস ভাল। ময়রার দোকানে খাদ্য দ্রব্য কিছুই নাই, একদম উল্টা আছেন বিষ—বিষ—বিষ। পূর্ব্বে লোকে কালেভদ্রে ঐ পাপগুলো খেত; এখন সহরের লোক, বিশেষ বিদেশী যারা সহরে বাস করে, তাহাদের নিত ভোজন হইতেছে ঐ। এতে অজীর্ণ রোগে অপমৃত্যু হবে তায় কি বিচিত্র! খিদে পেলেও কচুরী ও জিলিপি খানায় ফেলে দিয়ে এক পয়সার মুড়ি কিনে খাও—সস্তাও হবে, কিছু খাওয়াও হইবে, ভাত, ডাল, আটার রুটি, মাছ, শাক, দুধ্ যথেষ্ট খাদ্য। তবে ডাল দক্ষিণিদের মত খাওয়া উচিত, অর্থাৎ ডালের ঝোল মাত্র, বাকিটা গরুকে দিও। মাংস খাবার পয়সা থাকে, খাও, তবেও পশ্চিমি নানা প্রকার গরম মশলাগুলো বাদ দিয়ে। মশলাগুলা খাওয়া নয়—ও গুলো অভ্যাসের দোষ। ডাল অতি পুষ্টিকর খাদ্য, তবে বড়ই দুষ্পাচ্য। কচি কলাইসুঁটির ডাল অতি সুপাচ্য এবং সুস্বাদ; পারিসরাজধানীর ঐ সুপ বিখ্যাত খাওয়া। কচি কলাই-সুঁটি খুব সিদ্ধ করে, তার পর তাকে পিসে জলের সঙ্গে মিশিয়ে ফেল। তার পর একটা দুদ্ ছাকনির মত ছাক্‌নিতে ছাঁকিলেই খোসাগুলো বেরিয়ে আসবে। এখন হলুদ, ধনে, লঙ্কা, জিরেমরিচ যা দেবার দিয়ে সাঁতলে নাও—উত্তম সুস্বাদ সুপাচ্য ডাল হ'ল। যদি একটা পাঁটার মুড়ি বা মাছের মুড়ি তার সঙ্গে থাকে, ত উপাদেয় হয়।

ঐ যে এত প্রস্রাবের রোগের ধূম দেশে ও অধিকাংশই অজীর্ণ, দুই চার জনের মাথা ঘামিয়ে, বাসী সব বদ্ হজম। পেট পুরলেই কি খাওয়া হলো? যেটুকু হজম হইবে সেইটুকুই খাওয়া। ভুঁড়ি নাবা বদ হজমের প্রথম চিহ্ন। শুকিয়ে যাওয়া বা মোটা হওয়া, দুটোই বদ হজম। পায়ের মাংস লোহার মত শক্ত হওয়া চাই। প্রস্রাবে চিনি বা আলবুমেন (Albumen) দেখা দিয়েছে বলে হাঁ করে বসো না। ও সব আমাদের দেশের কিছুই নয়। ও

গ্রাহ্যের মধ্যেই এনো না। খাওয়ার দিকে খুব নজর দাও, অজীর্ণ না হতে পায়। ফাঁকা হাওয়ায় যতক্ষণ সম্ভব থাকবে। খুব হাঁট আর পরিশ্রম কর। যেমন করে পার ছুটি নাও, আর বদরিকাশ্রম তীর্থযাত্রা কর। হরিদ্বার থেকে পায়ে হেঁটে ১০০ ক্রোশ ঠেলোপাহাড় চড়াই করে বদরিকাশ্রমে যাওয়া আসা একবার হলেই ও প্রস্রাবের ব্যায়রাম ফ্যায়রাম ভূত ভাগবে। ডাক্তার ফাক্তার কাছে আসতে দিও না, ওরা অধিকাংশ "ভাল কর্ত্তে পারবো না, মন্দ করব, কি দিবি তাই বল্।" পারত পক্ষে ওষুধ খেয়ো না। রোগে যদি এক আনা মরে, ঔষুধে মরে ১৫ আনা। পার যদি প্রতি বৎসর পূজার বন্দের সময় হেঁটে দেশে যাও। ধন হওয়া আর কুঁড়ের বাদশা হওয়া দেশে এককথা হয়ে দাড়িয়েছে। যাকে ধরে হাঁটাতে হয়, খাওয়াতে হয়, সেটাও জীবন্ত রোগী, সেটা ত হতভাগা। যেটা লুচির ফুল্কো ছিঁড়ে খাচ্চে, সেটা ত মরে আছে। যে একদমে দশ ক্রোশ হাঁটিতে পারে না, সেটা মানুষ, না কেঁচো। সেধে রোগ, অকাল মৃত্যু, ডেকে আন্লে কে কি করবে?

আবার ঐ যে পাঁউরুটি, উনিও হচ্ছেন বিষ, ওঁকে ছুঁয়ো না, এক দম। খামীর মিশলেই, ময়দা এক থেকে আর হয়ে দাঁড়ান। কোনও খাম্বীরদার জিনিস খাবে না। এবিষয়ে আমাদের শাস্ত্রে যে সর্ব্ব প্রকার খাম্বিরদার জিনিসের নিষেধ আছে, এ বড় সত্ত। শাস্ত্রে যে কোন জিনিস মিষ্টি থেকে টকেছে, তার নাম শুক্ত; তা খেতে নিষেধ কেবল দই ছাড়া। দই অতি উপাদেয়—উত্তম জিনিষ। যদি একান্ত পাঁউরুটি খেতে হয়, তাকে পুনর্ব্বার খুব আগুনে সেঁকে খেও।

অশুদ্ধ জল, আর অশুদ্ধ ভোজন, রোগের কারণ। আমেরিকায় এখন জল শুদ্ধির বড়ই ধুম। এখন ঐ যে ফিল্টার, ওর দিন গেছে চুকে। অর্থাৎ ফিল্টার জলকে ছেকে দেয় মাত্র, কিন্তু রোগের বীজ যে সকল কীটাণু তাতে থাকে, ওলাউঠো, প্লেগের বীজ, তা যেমন তেমনিই থাকে; অধিকন্তু ফিল্টারটি স্বয়ং ঐ সকল বীজের জন্মভূমি হয়ে দাঁড়ান। কলিকাতায় যখন প্রথম ফিল্টার করা জল হল, তখন পাঁচ বৎসর নাকি ওলাউঠা হয় নাই; তার পর যে সেই; অর্থাৎ সে ফিল্টার মশাই এখন স্বয়ং ওলাউঠো বৃদ্ধির আবাস হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। ফিলটারের মধ্যে দিশি

তেকাঠার উপর ঐ যে তিন কল্‌সির ফিল্‌টার, উনিই উত্তম; তবে দু তিন দিন অন্তর বালি বা কয়লা বদলে দিতে হবে বা পুড়িয়ে নিতে হইবে। আর ঐ যে একটু ফটকিরি দেওয়া গঙ্গাতীরস্থ গ্রামের অভ্যাস, এটি সকলের চেয়ে ভাল। ফট্‌কিরির গুঁড়ো যথা সম্ভব মাটি ময়লা ও রোগের বীজ সঙ্গে নিয়ে আস্তে আস্তে তলিয়ে যান। গঙ্গার জল জালায় পুরে একটু ফট্‌কিরির গুঁড়ো দিয়ে থিতিয়ে যে আমরা, ব্যবহার করি ও তোমার বিলিতি ফিল্‌টার মিল্‌টারের ঘাড়ে চড়ে, কলের জলের মাথায় ঝাঁটা মারে। তবে জল ফুটিয়ে নিতে ও পারিলে নির্ভয় বটে। ফটকিরি থিতোন জল ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে ব্যবহার কর, ফিল্‌টার মিল্‌টার খানায় ফেলে দাও। এখন আমেরিকায় বড় বড় যন্ত্রযোগে জলকে এক দম বাষ্প করে দেয়, আবার সেই বাষ্পকে জল করে, তার পর আর একটা যন্ত্র দ্বারা বিশুদ্ধ বায়ু তার মধ্যে পুরে দেয়, যে বায়ুটা বাষ্প হবার সময় বেরিয়ে যায়। সে জল অতি বিশুদ্ধ; ঘরে ঘরে এখন দেখ্‌ছি তাই। যার আমাদের দেশে দু পয়সা আছে, সে ছেলে পিলেগুলিকে নিত্যি কচুরি মণ্ডা মেঠাই খাওয়াবে!! ভাত রুটি খাওয়া অপমান!! এতে ছেলে পিলেগুলো নড়ে ভোলা পেট মোটা আসল জানোয়ার হবে না ত কি? এত বড় ষণ্ডা জাত ইংরেজ, এরা ভাজা ভুজি মেঠাই মোণ্ডার নামে ভয় খায়, যাদের বরফান্‌ দেশে বাস, দিন রাত কসরত!! আর আমাদের অগ্নিকুণ্ডে বসে, এক ঘর থেকে আর এক ঘরে নড়ে বস্তে চাইনে, আর আহার লুচি কচুরি মেঠাই—ঘিয়ে ভাজা তেলে ভাজা!! সেকেলে পাড়াগেঁয়ে জমিদার এক কথায় দশক্রোশ হেঁটে দিত; দুকুড়ি কই মাছ কাঁটাশুদ্ধ চিবিয়ে ছাড়ত, ১০০ বৎসর বাঁচত। তাদের ছেলে পিলেগুলো কলকেতায় আসে, চস্‌মা চোখে দেয়, লুচি কচুরি খায়, দিন রাত গাড়ি চড়ে, আর প্রস্রাবের ব্যামো হয়ে মরে; কলকেতাই হওয়ার এই ফল!!! আর সর্ব্বনাশ করেছে-ঐ পোড়া ডাক্তার বদ্দি গুলো। ওরা সবজান্তা, ঔষুধের জোরে সব কর্ত্তে পারে। একটু পেট গরম হয়েছে, ত অমনি একটু ঔষুধ দাও; পোড়া বদ্দিও বলে না যে, দূর কর ঔষুধ, যা; দুক্রোশ হেঁটে আসগে যা। নানান্‌ দেশ দেখ্‌ছি, নানান রকমের খাওয়াও দেখ্‌ছি। তবে আমোদের ভাত, ডাল, ঝোল, চচ্চড়ি, শুক্তো, মোচার ঘণ্টোর জন্য পুনর্জ্জন্ম

নেওয়াও বড় বেশী কথা মনে হয় না। দাঁত থাকে তোমরা যে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝছো না এই আপশোষ। এখনো আমাদের দেশে উপযোগী যথার্থ উপাদেয়, পুষ্টিকর ও সস্তা খাওয়া পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ওদের নকল কর হতে পারে।

সীতা।

প্রথম দৃশ্য।

রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন

রাম। কিশোর বয়সে বনবাসী, বনে রহিতাম ভাই;
শিখি নাই রাজকার্য্য; ধর্ম্ম, রাজনীতি, শিখি নাই;
মৃগয়ায় কাটায়েছি দিন; রাত্রি বিশুদ্ধ বিশ্রামে,
আশ্রম কুটীরে। প্রতিদিন সেই ঘন বনগ্রামে,
একই মুগ্ধকর দৃশ্য চিত্তহারী, নিত্য দেখিতাম;—
সেই গোদাবরীতীর, গিরিপথ, সেই অভিরাম
ক্ষেত্রগুলি, পরিচিত বৃক্ষ গুল্ম খর্ব্ব শৈলশিরে।
শুনিতাম নিত্য একই ধ্বনি—সেই সুমন্দ সমীরে
আন্দোলিত বিকম্পিত পল্লবের অস্ফুট মর্ম্মর,
সুদূরে মধুর স্নিগ্ধ নির্ঝরের প্রপাতের স্বর।
—এইরূপে অস্ত্রচর্চ্চা, বিদ্যালাপ, সর্ব্বকর্ম্ম ভুলি,
অনন্ত আলস্যে স্বপ্নবৎ চলে গেছে দিনগুলি,
নদীর স্রোতের মত। শিখি নাই কিছু। তিন ভাই
তোমরাই আমার সুহৃৎ সখা মন্ত্রী তোমরাই।
দিও উপদেশ প্রিয় ভরত সতত, যাহে রাম
কল্যাণ সাধিতে পারে প্রজাদের; পূর্ণ মনস্কাম
তা হলেই হব। কাছে রহিও লক্ষ্মণ প্রিয়তর
চিরদিন, যেইমত পঞ্চবটী বনে নিরন্তর
ছিলে ঘেরি গাঢ় স্নেহদিয়া। প্রিয় শত্রুঘ্ন, আমার

বিশাল সাম্রাজ্যে যেন অবিরাম, শান্তি চারিধার
বিরাজে জ্যোৎস্নার মত।

ভরত। জাগে মাত্র ভরতের ধ্যানে
ভ্রাতার মঙ্গল চিন্তা।

লক্ষ্মণ। সুখে দুঃখে বিপদে, কল্যাণে,
চিরকাল লক্ষ্মণ রামের সঙ্গী।

শত্রুঘ্ন। অনুদিন নিত্য
শত্রুঘ্ন আবদ্ধ চির আজ্ঞাবহ সম্রাটের ভৃত্য।

রাম। তাহাই হউক তবে ভ্রাতৃগণ—

ভরত। প্রিয়বর, শুনি,
আসিয়াছিলেন রাজ্যে সম্প্রতি কি অষ্টাবক্র মুনি?

রাম। আসিয়াছিলেন সত্য।—দিলেন বিবিধ উপদেশ
বিবিধ মন্ত্রণা, প্রিয়বর! তাঁর এই শেষ
আজ্ঞা, মূল রাজধর্ম্ম একমাত্র প্রজানুরঞ্জন,
তাহাই রাজ্যের ভিত্তি, তাহা ভিন্ন রাজার শাসন
প্রজার পীড়ন মাত্র। রাজা শুদ্ধ প্রজাদের ভৃত্য
রাজকার্য্য প্রজা সেবা। প্রজার সুখের জন্য নিত্য
বিসর্জ্জিতে হবে সর্ব্বসুখ আপনারও—যদি হয়
প্রয়োজন—ত্যাজ্য বন্ধু ভ্রাতা মাতা পত্নীও নিশ্চয়"
—ভরত! আমারো ভাই জীবনের সাধনা ও ধ্যান,—
নিত্য কায়মনোবাক্যে প্রজাদের সাধিব কল্যাণ।
বল বৎস, জানিব কিরূপে রাজ শাসনের দোষ?
বল ভাই কি উপায়ে প্রজাদের সাধিব সন্তোষ?

ভরত। কঠিন সমস্যা প্রিয়বর! মুক্ত মিথ্যা নিন্দাবাণী
দারিদ্র্যের করে কর্ণভেদ। আর নিত্য যুক্তপাণি।
মিথ্যা স্তুতি ঐশ্বর্য্যের চারিদিকে উঠে নিরবধি।
অক্ষমের ভ্রূভঙ্গও ক্ষমাতীত; পদাঘাত যদি
করে ক্ষমতা, সে তবু ক্ষমা যোগ্য। ক্ষমতার ত্রুটি

দেখায়ে কে মূঢ়জন, ভ্রাতঃ, তার সহিবে ভ্রূকুটি ?

রাম। সত্য ; তবে প্রজাদের কি অভাব কিবা অভিযোগ
কিরূপে জানিব ভাই ?—নির্দ্ধারণ না হইলে রোগ,
চিকিৎসা সম্ভব নহে।

ভরত। আছে তবে একটি উপায়,—
ছদ্মবেশী গুপ্তচরে বিনিযুক্ত কর অযোধ্যায় ;
প্রজাদের অভিযোগ নিবেদিবে চরণে তোমার ;
না বিকীর্ণ হ'তে ব্যাধি তবে হবে তার প্রতিকার।

রাম। উত্তম প্রস্তাব ইহা। বিনিযুক্ত কর গুপ্তচর
কল্য হতে ভরত ; যাহাতে প্রজাদের নিরন্তর
না হইতে ব্যক্ত অভিলাষ, দিব তাহা পূর্ণ করি।
—লক্ষ্মণ, কহিও ঊর্ম্মিলারে ভাই যেন রাজ্যেশ্বরী
রাজলক্ষ্মী সীতার কামনা নিত্য পূর্ণ হয় সব ;
মণিমুক্তা হয় যেন জানকীর ইচ্ছায়, সুলভ
পথের ধূলার মত।

লক্ষ্মণ। অসম্ভব হইবে সম্ভব
দেবীর ইচ্ছায় সদা।

রাম। শত্রুঘ্ন শুনিনু তদা দূরে
করিছে লবণ দৈত্য অত্যাচার রাজ্য মধুপুরে
তাহার বিপক্ষে তুমি সসৈন্যে প্রস্তুত হও ভাই।

শত্রুঘ্ন। শিরোধার্য্য রাজার আদেশ।

রাম। চল অন্তঃপুরে যাই।
আগত মধ্যাহ্ন। এবে যাই যথা জননী আমার।
দেখি তাঁর পূজা সাঙ্গ কিনা। আর রাজপরিবার
সবার কুশলবার্ত্তা শুধাইতে চল যাই ঘুরে
এই দিক দিয়া। সভাভঙ্গ আজি চল অন্তঃপুরে। নিষ্ক্রান্ত।

শ্রীদ্বিজেন্দ্র লাল রায়।

নবপ্রভা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

১ম খণ্ড। { কলিকাতা, চৈত্র ১৩০৭ সাল } ২য় সংখ্যা।

আমাদিগের সাহিত্য।

সাহিত্য, সুচিন্তা।

সাহিত্য উৎকৃষ্ট চিন্তা ও সুন্দর ভাবের স্থায়ী অভিব্যক্তি। ভাষা তাহার দেহ; চিন্তা তাহার প্রাণ। সাহিত্য মর নর জীবনের যাহা কিছু ভাল, তাহা অমর করিয়া রাখিবার উপায়। মনুষ্যের চিত্ত এবং মনুষ্যের সুখ দুঃখ সাধারণতঃ সাহিত্যের আলোচ্য বিষয় বলিয়া গণ্য।

সাহিত্য, দান।

নূতন আলো দিয়া, অজ্ঞান অন্ধকারকে দূর করাই সাহিত্যের কার্য্য। মনুষ্যের এমনই একটী প্রবৃত্তি আছে যে, সে নিজে যাহা পায়, তাহা অন্যকে না দিয়া ভোগ করিতে পারে না। জ্ঞানী লোকে যে জ্ঞান পান তাহা না বিলাইয়া নিজে পূর্ণ ভাবে উপভোগ করিতে পারেন না। নিজের ভাল চিন্তা অন্যকে দেওয়াই সাহিত্য। নিজে যে আনন্দ ভোগ করিয়াছি সেই আনন্দ অন্যকে দিবার চেষ্টা সাহিত্যের কারণ। সংসারে সকল বিষয়ে দুই শ্রেণীর

লোক আছে। এক শ্রেণী তোলে, আর এক শ্রেণী ঢলে। এক শ্রেণী অন্যকে উত্তোলন করে, আর এক শ্রেণী উত্তোলিত হইবার জন্য অন্যের গায় ঢলিয়া পড়ে। যাঁহারা সাহিত্যসেবী তাঁহারা নিজের সঙ্গে সঙ্গে অন্যকে তুলিবার চেষ্টা করেন।

সাহিত্য, অভেদ জ্ঞান।

আমার চিন্তা যে পরিমাণে আপনার হইল, সেই পরিমাণে আপনাতে ও আমাতে ভেদ জ্ঞান চলিয়া গেল। যে পরিমাণে আমার চিৎ, আমার আনন্দ, আপনার হইল, সেই পরিমাণে আপনি আর আমি অভিন্নহৃদয় হইলাম। সেই পরিমাণে আমরা একই সচ্চিদানন্দের অংশ হইলাম। সুতরাং সাহিত্যকে আমি অভেদজ্ঞাপক ধর্ম্মশাখা বিবেচনা করি। সাহিত্য সত্য মূলক। সাহিত্য ঈশ্বরপূজা। যে পরিমাণে জ্ঞান ও সত্য লাভ হয়, সেই পরিমাণে আমরা জ্ঞানস্বরূপ অনন্ত সত্তাকে উপলব্ধি করি। কাব্যে বল, ইতিহাসে বল, বিজ্ঞানে বল, এক অদৃশ্য শক্তির প্রকাশ। সুতরাং সাহিত্য আলোচনা, জ্ঞানের অনুশীলন, উচ্চ ভাবে দেখিলে, এক অদৃশ্য সর্ব্বব্যাপী শক্তির চিন্তা ও অনুশীলন। সাহিত্য সেবী ঘোর নাস্তিক হইলেও এক দিক দিয়া অজ্ঞাতে সেই বিশ্বময়ী শক্তিকে উপাসনা করিতেছেন, তাঁহারই পাদপদ্মে ভক্তি কুসুমাঞ্জলি দিতেছেন। তিনি যখনই কোনও জ্ঞান লাভ করিতেছেন, তখনই পূর্ণ জ্ঞান স্বরূপের অংশকে না চিনিয়াও অর্চ্চনা করিতেছেন। সুতরাং সাহিত্য বা জ্ঞানচর্চ্চা ভগবানের অর্চ্চনা। আইস, ভাই, আমরা ভক্তিভাবে সাহিত্যকে ঈশ্বরের প্রতিমা মনে করিয়া পূজা করি। সাহিত্য সেবা সরস্বতীর সেবা; সরস্বতী ভগবানেরই একটী রূপ মাত্র; অর্থাৎ তাঁহাকে যখন জ্ঞান বিদ্যা ও বাক্‌রূপে ভাবি ও আরাধনা করি তখন তিনি সরস্বতী। সুতরাং সাহিত্য সেবা ভগবানের সেবা। সাহিত্যে যিনি অপবিত্র ভাব আনেন, তিনি পূজার মন্দিরে পাপাচরণ করেন।

সাহিত্য, জননী।

এক্ষণে, যে সাহিত্য অজ্ঞানকে জ্ঞানী করে, ভিন্ন মনকে অভিন্ন করে, যে সাহিত্য উচ্চস্তরে উঠিয়া ঈশ্বরের অর্চ্চনারূপে পরিগণিত হয়, সেই সাহিত্য জাতীয় জীবনের কি না উপকার করিতে পারে!

বস্তুতঃ সাহিত্য জাতীয় জীবনের জননী। তাহার অর্থ কি? তাহার অর্থ এই যে, দেশে যদি কতকগুলি অতি উচ্চ প্রবৃত্তির লোক জন্মগ্রহণ করেন, এবং তাঁহাদিগের উচ্চ চিন্তা ও মহদ্ভাব সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচার হয়, তাহা হইলে সাধারণ লোকে ক্রমে ক্রমে সেই ভাবে উদ্দীপিত ও অনুপ্রাণিত হইয়া, মহত্তর জীবন লাভ করে। তখন চিন্তাশক্তি কার্য্যশক্তিতে পরিণত হয়। তখন পুস্তকের লিখিত নীরব ভাষা, দেশের পৃষ্ঠায়, গুরুতর ঘটনার বড় বড় অক্ষরে, অঙ্কিত ও শব্দিত হয়। তখন প্রতিভাপ্রসূত চিন্তাবিদ্যুৎ জাতীয় জীবনাকাশে খেলিতে থাকে, এবং বজ্রের কড় কড় শব্দে মেদিনী কম্পিত করে। ইহার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত ফরাসি বিপ্লব।

সাহিত্য, বিদ্যালয়।

বস্তুতঃ জাতীয় শিক্ষার সহায়তা করা সাহিত্যের একটী প্রধান কার্য্য। স্কুল কালেজে এই শিক্ষার ভিত্তি পত্তন হয় মাত্র। বাল্যকালে বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা হয় তাহা বর্ণ পরিচয় মাত্র। যৌবনে, সংসারে প্রবেশ করিয়া, গ্রন্থ ও মাসিক পত্র অধ্যয়নে প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হয়। পাঠকের নিজের নিজের জীবনের ঘটনা ও সাংসারিক প্রত্যক্ষ দর্শন তখন তাঁহার টীকা ও ভাষ্য। জাতীয় চরিত্র গঠন করা সাহিত্যের কার্য্য। মহৎ ও হিতকর বিষয়ের দিকে লোকের চিন্তার স্রোত প্রবাহিত করিয়া দেওয়া সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য কোন এক জাতিকে ভাল করিবার, উন্নত করিবার, একটী প্রধান উপায়ই সাহিত্য।

সাহিত্য, কন্যা।

জাতীয় সাহিত্য যেমন একদিকে জাতীয় জীবনের জননী, জাতীয় চিন্তা ও কার্য্যের পরিচালক, তেমনি ইহা অন্যদিকে জাতীয় চিন্তার কন্যা, অর্থাৎ জাতীয় অবস্থাও চিন্তাদ্বারা সৃষ্ট ও পরিচালিত। যে জাতির মনের ভাব ও কার্য্য যে রকম, সেই জাতির সাহিত্যও সেই রকম হইবে। যখন জাতীয় জীবনে ধর্ম্মের উচ্ছ্বাস, কার্য্যের উদ্যম হইবে, যখন জাতীয় চরিত্রে মহত্ত্বের বিকাশ হইবে, তখন জাতীয় সাহিত্যে নিশ্চিতই তাহা প্রতিফলিত হইবে। সুতরাং কার্য্যশীল ব্যক্তিগণ পরোক্ষে সাহিত্যের উৎপাদক। আমাদিগের জীবন ভাল হইলে সাহিত্যও ভাল হইবে। আবার সাহিত্য ভাল হইলে জীবনও ভাল হইবে।

বাঙ্গালা সাহিত্যের অভাব।

এক্ষণে আমাদিগের কি জাতীয় সাহিত্য আছে? বাঙ্গালা ভাষাতে কয়-খানি পুস্তক আছে যাহা পাঠ করিয়া আমরা জ্ঞান লাভ করিতে পারি? পাঠক বলেন যে ভাল পাঠ্যপুস্তক নাই, তাই বাঙ্গালা পুস্তক পড়ি না। ওদিকে লেখক বলেন, বাঙ্গালাতে লিখিলে কেহ পড়েন না; তাই বাঙ্গালা লিখিতে চাহি না। কিন্তু আমার বোধ হয়, ভাল পুস্তক বা ভাল প্রবন্ধ বাঙ্গালাতে লিখিলে, পাঠকের অভাব থাকিবে না। যেমন যেখানে মধু সেখানেই মধুকরগণ আপনিই ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া পড়ে, তেমনি ভাল রচনা যেখানে, সেখানে পাঠকগণ আপনিই দলে দলে আসিবেন, এইত আশা হয়। কেহ কেহ বলেন, বাঙ্গালাতেই যেন ভাল গ্রন্থ নাই। ইংরাজিতে ত অনেক ভাল গ্রন্থ আছে। ইংরাজী গ্রন্থ ও ভাল মাসিক পত্র আমাদের দেশে কয়জন লোক কলেজ ছাড়িয়া পড়িয়া থাকেন? এমন কি অনেকে বলেন যে, বিনা মূল্যেও যদি ভাল পুস্তক বাঙ্গালীগণকে যোগান যায়, তাহা হইলেও অধিকাংশ ব্যক্তিই তাহা পড়িবেন না। এই কথাটা সত্য কি না জানি না। আমি একটী Circulating Club এর সম্পাদক ছিলাম। তাহার অনেকগুলি বি, এ, বি, এল্ সভ্য ছিলেন। তাঁহাদিগের হাত দিয়া যখন Nineteenth Century, Fortnightly Review, Contemporary Review প্রভৃতি অতি সারবান্, মাসিক পত্রিকা আমার নিকট ফিরিয়া আসিত, আমি দেখিতাম অধিকাংশ পাতা আদৌ কাটা হয় নাই। সুতরাং পঠিত হয় নাই। এক্ষণে আমাদিগের দেশে প্রায়ই যিনি যে ব্যবসায় করেন, তাহার জন্য যে অধ্যয়নটুকু অপরিহার্য্য, অর্থাৎ না করিলে ব্যবসায় ভাল চলে না, সেইটুকু তিনি পড়িয়া থাকেন। সেই জন্যই বঙ্কিম বাবু বঙ্গদর্শনের সূচনাপত্রে লিখিয়াছিলেন, যাঁহারা বাঙ্গালা পুস্তক বা সাময়িক পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হন তাঁহাদিগের দুরদৃষ্ট। তথাপি বঙ্কিম বাবু বাঙ্গালা পুস্তকও লিখিয়াছিলেন, বাঙ্গালা সাময়িক পত্রও বাহির করিয়াছিলেন। কেন? দেশীয় ভাষাতে দেশকালোচিত ভাল গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখিলে লোকে ক্রমে ক্রমে তাহা পড়িবে, ক্রমে পাঠকের সংখ্যা অধিক হইবে, এই আশায় তিনি বাঙ্গালা লিখিতেন। তাঁহার আশা অবস্থানুসারে অনেক পরিমাণে ফলবতী হইয়াছিল। বস্তুতঃ কৃতবিদ্য বাঙ্গালীর বাঙ্গালা লেখা, এবং শিক্ষিত বাঙ্গালীর

বাঙ্গালা পড়া যে লজ্জার বিষয় নহে তাহা বঙ্কিম বাবু অনেকটা প্রমাণ করিয়াছিলেন।

তবে এখনও অনেক দুর্ব্বলচিত্ত শিক্ষিত বাঙ্গালী—রেলের গাড়ীর দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিয়া, কোন বাঙ্গালা পুস্তক বা মাসিক পত্র পড়িতে সাহস করেন না। তাঁহাদিগের ভয়, ট্রেণে বাঙ্গালা পড়িতে দেখিলে পাছে লোকে তাঁহাদিগকে অশিক্ষিত মনে করে। যদি ভাল ভাল লোক বাঙ্গালা লিখিতে থাকেন যদি বাঙ্গালাতে ভাল ভাল বহি বাহির হয় তাহা হইলে, ক্রমে অনেক লোক বাঙ্গালা পড়িবে, প্রকাশ্যে পড়িবে।

সাহিত্যে, বাণিজ্য।

আমাদিগের দেশে বিলাতের পণ্যদ্রব্যের প্রচলন হওযায় দেশীয় শিল্পের লোপ হইতেছে—ইহা অনেকে বলিয়া থাকেন। কিন্তু বিদেশী সাহিত্য দেশকে আচ্ছন্ন করিতেছে, তাহাতে যে ক্ষতি হইতেছে—তাহা কি আমরা বুঝি না? স্বদেশের বস্ত্র ইত্যাদি যাহাতে প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হয় তাহার জন্য স্বদেশী সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে ও তদ্বিষয়ে প্রশংসনীয় চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু যাহাতে স্বদেশীয় সাহিত্যের বিকাশ ও আদর হয় তজ্জন্য চেষ্টা করা কি বিশেষ উচিত নয়? স্বদেশীয় সাহিত্যের উপর কোন শুল্ক নাই। কোন মাঞ্চেষ্টার সম্প্রদায়ের উত্তেজনায় গমর্ণমেণ্ট ইহার দমনের জন্য কোনও প্রতিকূল ব্যবস্থা করেন নাই। বরঞ্চ দেশীয় সাহিত্যের উন্নতি কল্পে অনেকগুলি অনুকূল অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। ইংরাজি সাহিত্যের বিপুল ধন ভাণ্ডারের দ্বার খোলা পাইয়াছি। ব্যবহার করিতে জানিলে, তাহা দেশীয় সাহিত্যের বিশেষ উপযোগী ও হিতকর হইবে। ইংরাজি সাহিত্য বৈচিত্র্য ও বৈভবশালী। প্রাচীন এবং আধুনিক সার চিন্তা ইহাতে ঘনীভূত হইয়াছে। ইহা জীবন্ত, নিত্য নূতন, মানবমনজলধি নিয়ত মন্থন করিয়া রত্নরাশি লাভ করিতেছে, এবং প্রতিভার তাড়িত প্রবাহ জগতে দিগ্‌দিগন্ত ছুটাইয়া দিতেছে। কিন্তু এই সাহিত্য বিচিত্রও ঐশ্বর্য্যশালী হইলেও ইহা বিদেশীয়। প্রত্যেক দেশের সাহিত্য সেই দেশের রীতি, নীতি, ধর্ম্ম এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উপযোগী। এক দেশের পক্ষে যে চিন্তা স্বভাবানুযায়ী ও মঙ্গলকর, অন্য দেশের পক্ষে তাহা অস্বাভাবিক ভ্রান্তিজনক ও অনিষ্টকর হইতে

পারে। সুতরাং যাহাতে বিদেশীয় সাহিত্যে দেশের অনিষ্ট না হয় স্বদেশীয় সাহিত্যের তাহাই করা কর্ত্তব্য। বিদেশীয় কোন্ চিন্তাটী আমাদিগের সমাজের পক্ষে খাটে, কোন্‌টী বা অবস্থাভেদে আদৌ খাটে না, তাহা নিরূপণ করিয়া দেওয়া দেশীয় সাহিত্যের একটী প্রধান কার্য্য। আমাদিগের রাজনৈতিক অধীনতা রহিয়াছে, তাহার উপর যদি দেশীয় সাহিত্য না থাকে, তাহা হইলে মানসিক দাসত্বে আমাদিগের সমগ্র চিত্ত একবারে অভিভূত ও অবসন্ন হইয়া পড়িবে, এবং মনুষ্যত্ব একবারে লোপ হইবে। আর বিদেশীয় সাহিত্য আমাদিগের জাতীয় আশাভরসা ধর্ম্মকাহিনী, আমাদিগের সুখ দুঃখ, আমাদিগের জাতীয় অধঃপতন ও পুনরুত্থানাশা, আমাদিগের মর্ম্মব্যথা, স্পষ্ট করিয়া পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে পারে না। মাতৃভাষা নিজের জননী। নিজের জননীর স্থান আর কেহ কি কখন পূরণ করিতে পারে? যেমন ভাগ্যহীন সেই শিশু, যাহার জননী নাই, তেমনি হতভাগ্য সেই জাতি যাহার জাতীয় সাহিত্য নাই!

সংস্কৃত সাহিত্য।

যেমন একদিকে ইংরাজি সাহিত্যের চিন্তা ও ভাবে আমাদিগের দেশের সাহিত্য উদ্দীপিত ও পরিপুষ্ট হইতে পারে, তেমনি অন্যদিকে আমাদিগের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য, ঋষিগণের জ্ঞান ও উপদেশ দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের স্বদেশীয়তা রক্ষা করিয়া, তাহাকে মার্জ্জিত, উন্নত, পবিত্র, করিতে সমর্থ। আমরা এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছি আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষের সাহিত্য জগতে অতুলনীয়। তাহাতে এমন সকল তত্ত্ব আছে যাহা ইউরোপ ও আমেরিকা আজিও লাভ করিতে পারে নাই, এমন তত্ত্ব আছে যাহা আয়ত্ত করিতে পারিলে জগৎ প্রকৃত সভ্যতার পথে অনেকটা অগ্রসর হইবে।

ইংরাজি ও সংস্কৃত সাহিত্য, গঙ্গা ও যমুনা। এই উভয় সাহিত্যের সঙ্গম প্রয়াগের পবিত্র তীর্থে আমরা উপস্থিত হইয়াছি। এই তীর্থে অবগাহন করিলে আমরা সাহিত্যে নবজীবন, নবপ্রভা লাভ করিব।

অবিশ্বাস।

এক্ষণে ধর্ম্ম ও সামাজিক বিষয়ে অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙ্গালির প্রাচীন বিশ্বাস-বন্ধন ছিঁড়িয়া গিয়াছে। সত্য ও মিথ্যা, ভাল ও মন্দ, সকলেই স্বাধীনভাবে

যুক্তি ও বিচার দ্বারা, নির্ণয় করিতে চাহেন। এইরূপ অবস্থায় একদিকে যেমন কিছুকাল সামাজিক বিশৃঙ্খলা ঘটে, তেমনি অন্যদিকে স্বাধীনচিন্তা ও বিচার শক্তি বলবতী হয়, এবং নূতন তথ্যের পথ আবিষ্কার হয়। যাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে, এক্ষণে তাহাকে নূতন করিয়া গড়িতে হইবে। ইহার জন্য চিন্তা শক্তির পরিচালনার আবশ্যক হইবে। তাহাতে সাহিত্য বিকশিত হইবে।

রাজনীতি।

আমাদিগের রাজনৈতিক অধীনতায় বাঙ্গালা সাহিত্য চর্চ্চার নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। আমরা ইংরাজি শিক্ষিত কয়েকজন লোক, সমগ্র দেশের হিতার্থে যখনি রাজদ্বারে কোন আবেদন করি, তখনি গবর্ণমেণ্ট বলিয়া থাকেন যে, দেশের সমুদয় লোকসংখ্যার তুলনায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যা নগণ্য, দেশের শিক্ষিত লোক যে সকল কথা বলিতেছে তাহা দেশের অধিকাংশ লোক বুঝে না, ও বলে না, তাহাদিগের নামে কতকগুলি শিক্ষিত লোক আপনাদিগের স্বার্থের জন্য হৈ চৈ করিয়া বেড়ান। গবর্ণমেণ্টের এই আপত্তি খণ্ডন করিতে হইলে, এবং আমাদিগের সভাগণকে বলীয়ান্ করিতে হইলে, দেশের অধিকাংশ লোকের যাহাতে শিক্ষা হয় তাহাই করা বিধেয়। দেশের অধিকাংশ লোক কখনও ইংরাজি বুঝিবে না। কিন্তু সহজেই বাঙ্গালা বুঝিবে। সুতরাং রাজনৈতিক দিক্ দিয়া দেখিলেও, দেশের অধিকাংশ লোককে বুঝাইবার জন্য, স্বদেশীয় সাহিত্যের আবশ্যক। দেশের অধিকাংশ লোকের সহিত সুশিক্ষিত লোকের সহানুভূতি না হইলে, দেশের উন্নতির আশা কোথায়? এই সহানুভূতি হওয়ার একটী প্রধান উপায় স্বদেশীয় সাহিত্যের বিকাশ ও প্রচার।

নব যুগের শুভ বার্ত্তা।

আর বর্ত্তমান যুগের প্রধান শিক্ষা,—মনুষ্য মাত্রেই সুখ স্বচ্ছন্দের অধিকারী, উন্নতির অধিকারী। কতিপয় লোকের সুখ বা আরামের জন্য বহুসংখ্যক লোক অজ্ঞান থাকিয়া ক্রীত দাসের ন্যায় খাটিবে না। মনুষ্য মাত্রেরই ভিতর ভগবান্ অধিষ্ঠিত। মনুষ্য দেহ মাত্রই পবিত্র মন্দির। এই শিক্ষা জগতে শনৈঃ শনৈঃ প্রচার হইতেছে, কৃষকের কুটীরে, মজুরের বাসগর্ত্তে, দেবচরিত্র মহাপুরুষদিগের দ্বারা নূতনভাবে এই মত ব্যাখ্যাত ও প্রচারিত হইতেছে। যেন

এক আশাময়, দয়াময়, জ্ঞানময়, প্রীতিময় নব যুগের অবতারণার সূচনা দেখিতেছি। এই শুভবার্ত্তা, নবযুগের এই বেদবাক্য, আমরা কি আমাদিগের দেশের হতভাগ্য গরিব ও মূর্খ কৃষকদিগের নিকট, মজুর মুটে দিগের নিকট, প্রচার করিব না? এই প্রচারের উপায় দেশীয় সাহিত্য। যে দিক দিয়াই দেখুন, স্বদেশীয় সাহিত্যের চর্চ্চা ও উন্নতি, মাতৃভাষার সেবা, নিতান্ত কর্ত্তব্য।

উপসংহার।

আমি অনেক দিন পূর্ব্বে অন্যত্র যাহা লিখিয়াছিলাম এক্ষণেও তাহা আবার বলিতেছি:—মাতার ক্রোড়ে বসিয়া স্তন্যপান করিতে করিতে, মাতার অমিয় ক্ষরিত মধুরবচনে যে ভাষা শুনিয়াছ, জনকের ক্ষেমঙ্কর গম্ভীর উপদেশে যে ভাষা শুনিয়াছ, সহোদরার কোমল কমনীয় স্মিত সম্ভাষণে যে ভাষা বিভাসিত, প্রেয়সীর প্রাণারাম প্রণয়পুষ্পাঞ্জলি যে ভাষায় স্বামীচরণে নিবেদিত, যন্ত্রণায় প্রাণ ছটফট করিলে যে ভাষায় পিতা ও মাতাকে ডাকি, অন্তিম কালে গঙ্গাতীরে বালুকাশয্যাশায়ী হইলে যে ভাষায় পতিত পাবনের নাম কর্ণকুহরে প্রবেশ করে—বাল্যে বার্দ্ধক্যে, স্বাস্থ্যে রোগে, শোকে প্রণয়ে, উৎসবে বিপদে, জীবনে মরণে, যে ভাষা প্রাণের সহিত জড়িত;—সেই মাতৃভাষা, সেই চিরপ্রিয়া চিরপূতা, চিরপূজনীয়া মাতৃভাষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠভাষা আর কি আছে? জাতীয় হৃদয় আয়ত্ত করিবার, প্রশস্ত করিবার, আলোকিত করিবার, উদ্দীপিত করিবার, এমন ক্ষমতাশালিনী শক্তি আর কিসের আছে? স্বদেশ ব্যাপিনী সহানুভূতি, মহীয়সী প্রতিভার সহিত মিশ্রিত হইলে, স্বতঃই অকপট প্রেমে স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের গলা জড়াইয়া মাতৃভাষায় প্রাণ ভরিয়া আলাপ করে। ভাই, স্বজাতির নিকট যদি, কাহারও কোন শুভ সংবাদ প্রচার করিবার থাকে, মাতৃভাষা তাহার অবশ্য অবলম্বনীয়।

রহস্য।

(একাল ও সেকালের কথোপকথন।)

শব্দের ছবি।

তামাসা না সত্য ?

একাল। শব্দের ফটো লওয়া যায় কি ?

সেকাল। আরে পাগল, শব্দ কি দেখা যায়, তাই তার ছবি তুলিবে।

একাল। শব্দ প্রথমে দেখা যায় না। ছবি তুলিলে দেখা যায়।

সেকাল। আশ্চর্য্য কথা! শব্দ যদি দেখা যায়, তাহা হইলে ছবিও শুনা যায়।

একাল। ছবি শুনিবার কথা এখন আমি বলিতেছি না। শব্দে ছবি তুলিবার কথা বলিতেছি।

সেকাল। কেমন করিয়া শব্দের ছবি তোলা যায় তুমি বল দেখি শুনি। যত আজ গবি কথা।

একাল। পূর্ব্বে যাহা আজগবি ছিল, এক্ষণে তাহা বাস্তবিক হইতেছে। শুন বড় মজার কথা। একটা নলের এক মুখ খোলা রাখে, আর এক মুখে একটা পাতলা চামড়া থাকে।

সেকাল। সেই পরদাটাতে ছবি থাকিবে বুঝি।

একাল। আরে মশাই, একটু থামুন না।

সেকাল। আচ্ছা, বল বল।

একাল। সেই পরদাটা এমনি করিয়া তৈয়ার করা হয়, যে নলের এক দিকে খোলা মুখে কথা কহিলে, অন্য দিকে (অর্থাৎ) পরদাটার উপর দাগ হয়।

সেকাল। দাগ হয়। ছাগ হয় না ? হা হা।

একাল। মশাই রসুন না, দেখিবেন ছাগ হয়, কি আর কিছু হয়।

সেকাল। একদিকে কথা কহিলে অন্যদিকে দাগ হয় কেন ?

একাল। সেটা অতি সোজা কথা। শব্দ হইলে বাতাস কাঁপে, তা দেখেছেন ?

সেকাল। আরে বাপু, বাতাস কি দেখা যায়? ভাল মুস্কিলেই পড়লাম।

একাল। বাতাস দেখা যায় না, ঠিক। কিন্তু বাজ পড়িলে দরজা শারশি সব কাঁপিয়া উঠে, তাহাও দেখেছেন। কেন কাঁপে?

সেকাল। বাতাস কাঁপে বলিয়া।

একাল। শব্দ হইলে বাতাস কাঁপে তা জানেন। এক্ষণে নলের এক মুখে কথা কহিলে নলের ভিতর বাতাস কাঁপে, সেই কাঁপুনিতে অপর মুখে যে পাতলা চামড়ার পরদা আছে তাহাও কাঁপে, এবং সেই কাঁপুনিতে তাহাতে রকম রকম দাগ হয়।

সেকাল। রকম রকম দাগ হয়, ও কথাটা ভাল বুঝিলাম না।

একাল। বলিতেছি। যদি কেহ, রাগিয়া বা দ্বেষ করিয়া বা আপ্ত গরজি হইয়া, ঐ চোঙ্গের ভিতর কথা কহে তাহা হইলে ছারপোকা, সাপ, ব্যাঙ্ প্রভৃতি ঘৃণিত জীবের ছবি আঁকা হইয়া যায়।

সেকাল। সত্যি নাকি? তুমি তামাসা করিতেছ।

একাল। না, তামাসা নহে। সত্য কথা। আবার যদি কেহ করুণ স্বরে, অথবা কোন ধর্ম্ম ভাবে উত্তেজিত হইয়া, ঐ চোঙ্গের ভিতর কথা কহে, তাহা হইলে সেই শব্দের কাঁপুনিতে তোফা ফুল আঁকা হইয়া যায়। আমি একবার দেখি, এই রকমে খাসা একটী গোলাপ ফুল আঁকা হইয়া গেল।

সেকাল। বাহবা বাহবা, কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ।

একাল। কেয়াবাৎ কেয়াবাতই বটে। আরও মজার কথা আছে। যে স্বামী স্ত্রী পরস্পর খুব ভালবাসে, তাহারা যদি এই চোঙ্গের ভিতর কথা কহে, ত্যহা হইলে কেবল ফুল ছবি বেরোয় তাহা নহে, গাইয়ে পাখির ও ছবি বেরোয় দেখা গিয়াছে।

সেকাল। বহুত আচ্ছা।

একাল। কেবল আচ্ছা নহে। সাচ্চা কি না তাহাও বুঝা যায়।

সেকাল। সেটা কি রকম?

একাল। সাচ্চা বা ঝুটা বুঝা যায়।

সেকাল। কি সাচ্চা বা ঝুটা?

একাল। পুরুষ বা নারী।

সেকাল। হেঁয়ালির মত কি বলিতেছ, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

একাল। কোন্ পুরুষ সাচ্চা বা ঝুটা, অকপট বা কপট, তাহা বুঝা যায়। কোন্ নারী সাচ্চা, কোন্ নারী ঝুটা তাহা বুঝা যায়।

সেকাল। আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা যে বলিয়া গিয়াছেন নারী চরিত্র অতি দুর্জ্ঞেয়।

একাল। দুর্জ্ঞেয় হইলেও এই চোঙ্গের দ্বারা সুজ্ঞেয় হইয়া যায়। যে দুশ্চরিত্রা নারী, পাপ কর্ম্ম করিয়া, স্বামী আসিতেছেন জানিয়া ভীত, সে অন্যের নিকট পাপ চিন্তা গোপন করিতে পারে। কিন্তু এই চোঙ্গের ভিতর কথা কহিলেই, ঐ চোঙ্গের পরদার উপর ঘৃণিত ছবি ফুটিবে, সাপ, ছারপোকা, মাকড়সা ইত্যাদি। আর সতী সাধ্বী—

সেকাল। বহুতাচ্ছা। যত মন্দ স্ত্রীলোক ঐ কলের দ্বারা বাছাই কর, আর তাহাদের গালে বা কপালে ঐ রকম এক একটা ছবি লোহা পোড়াইয়া দাগিয়া দাও!

একাল। সেটা মহাশয় আমি পারিব না, পীনাল কোডের ভয় আছে।

সেকাল। আরে বাপু তোমাকে কি যথার্থই দাগিয়া দিতে বলিতেছি। আমার মানে ঐরূপ দাগিয়া দেওয়া উচিত।

একাল। মন্দ পুরুষও ঐরূপ চোঙ্গ দ্বারা ধরা যায়।

সেকাল। ভাল ভাল। কিন্তু বলি, তুমি নবীন ছোকরা আমি বুড়া মানুষ। আমার সঙ্গে ত তামাসা করিতেছ না?

একাল। আপনি ঠাকুর দাদা আপনার সঙ্গে তামাসা চলিতে পারে বটে, কিন্তু এ তামাসা নয়।

সেকাল। প্রথমে তুমি একথা কোথায় শুনিলে?

একাল। বিবি আনিবেশান্তের বক্তৃতায়।

সেকাল। বিবি বেশায়ন্তা নহেত?

একাল। না তিনি বেসায়েন্তা নহেন, তিনি প্রসায়েন্তা, অর্থাৎ বিজ্ঞানে ও থিওসফি ধর্ম্মটাতে বিশেষ অভিজ্ঞ।

সেকাল। সেই বিবি বিশান্তা (বা প্রশান্তা) সে মেয়ে লোকটী

ভাল। আমাদের হিন্দু ধর্ম্মকে সে ভাল বলে। বুড়ি অনেক দিন বাঁচিয়া থাকুক।

একাল। সেই বিশান্তার বক্তৃতাতে শব্দের ছবি লীলার কথা প্রথম শুনি। পরে এক খানি আমেরিকান সাময়িক পত্রে পড়ি।

সেকাল। ভাল তবে তামাসা নহে, সত্য?

একাল। সত্য।

রাজনৈতিক ভূমিকম্প।

ফরাসি-বিপ্লব।

(১)

The French Revolution was the accession of three moral sovereignties:—

The sovereignty of right over force;

The sovereignty of intelligence over prejudices;

The sovereignty of people over governments.—*Lamartine*

ধনসচিব নেকার।

অধিকাংশ সভ্যের অন্তঃকরণে যখন এই ভাবের উদয় হইতেছে, তখন রাজার প্রধান ধনসচিব নেকার সর্ব্ব সমক্ষে রাজকোষের অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজগণের সময় হইতেই রাজকোষ ধনশূন্য হইয়াছে। রাজার ঋণের ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। গৃহীত ঋণ রাশির সুদ বহন করাও বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। রাজকোষের এইরূপশোচনীয় অবস্থায় ধনীদিগের নিকট বারংবার আবেদন করিয়াও আর ঋণ পাইবার সম্ভাবনা নাই!

নেকার সাতিশয় বুদ্ধিমান ধার্ম্মিক এবং কার্য্যদক্ষ ধনসচিব বটেন, কিন্তু তাঁহার বক্তৃতায় বিষময় ফল উৎপন্ন হইতে চলিল। সভ্যেরা বিশেষতঃ সাধারণতন্ত্রের প্রতিনিধিরা এইবার নিঃসংশয়িত ভাবে বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারা যে স্বাধীনতা এবং সমতার প্রার্থী হইয়া দূরদেশ হইতে সমাগত হইয়াছেন রাজা বা রাজপুরুষগণের তৎপ্রতি কোন সহানুভূতি নাই। তাঁহাদের উদ্যম

ও অধ্যবসায় ধনের নিমিত্ত। রাজকোষ ধনশূন্য হইয়াছে, কি প্রকারে তাহার পরিপূরণ করা যাইতে পারে, তন্নিমিত্তই তাঁহারা তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। বলা বাহুল্য নেকারের প্রতি সর্ব্ব সাধারণের শ্রদ্ধা ও অনুরাগের বিলক্ষণ হ্রাস হইল।

সরল প্রকৃতি লুই ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি ধনের প্রার্থী ছিলেন সত্য, কিন্তু সে ধন লইয়া তিনি কি স্বকীয় বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিতেন? প্রতিদিন রাজদ্বারে লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত্ত লোক সমাগত হইয়া হা অন্ন হা অন্ন বলিয়া যে বিষম চীৎকার আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাই তাঁহার ধন যাচ্ঞার কারণ; আপতিত দুর্ভিক্ষ নিবারণই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, কাজেই তিনি ধনসচিবের দ্বারা সর্ব্বসমক্ষে রাজকোষের অবস্থা জ্ঞাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সিংহাসনে অধিরোহণাবধি তিনি এক মুহূর্ত্ত কাল আলস্যে ক্ষেপণ করেন নাই। তিনি নিজের সুখ শান্তি সমস্তই প্রজার মঙ্গলের নিমিত্ত উৎসর্গ করিয়া ছিলেন, এবং পরিশেষে ষ্টেটস্ জেনারল নামক সভার আহ্বান করিয়া অন্তঃকরণে কথঞ্চিৎ শান্তি অনুভব করিয়া ছিলেন। প্রজার প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক ভালবাসা ছিল, এবং তদীয় প্রতিনিধিগণকে তিনি অপত্যস্নেহে গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন. তিনি স্বভাবতঃই আপনাকে সর্ব্বজনপ্রিয় বলিয়া বোধ করিতেন, এবং যে সমস্ত গুণ থাকিলে রাজাকে সর্ব্বজনপ্রিয় বলা যাইতে পারে, লুই সে সমস্ত গুণে কখনই বঞ্চিত ছিলেন না।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে ষ্টেটস্ জেনারেল তিনভাগে বিভক্ত ছিলেন। প্রথম বিভাগ পুরোহিতবৃন্দ, দ্বিতীয় বিভাগ অভিজাততন্ত্র বা উচ্চবংশীয় ভদ্র, এবং তৃতীয় বিভাগ সাধারণ প্রজাপুঞ্জের প্রতিনিধি সমূহ। এই শেষোক্তবিভাগ Tiers etat টার্জেটা নামে বিখ্যাত। সচিব প্রবর নেকার সমস্ত বিভাগের প্রিয় পাত্র হইলেও টার্জেটা (Tiers etat) মহলে তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তির সীমা ছিল না, কারণ তিনি দয়ার্দ্রচিত্ত, দানপরায়ণ, স্বাধীনতা প্রিয়, এবং সামাজিক সমতার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে অধিকাংশ লোক এক বাক্যে যে মত দান করে, তাহা কখনই ধর্ম্ম ও জ্ঞানানুমোদিত ভিন্ন হইতে পারে না। এই ভ্রমাত্মক বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি পূর্ব্বেই প্রজাবন্ধুগণের নির্দ্ধারিত সংখ্যার দ্বিগুণ ব্যবস্থা করিলেন। প্রজাবন্ধুগণ অন্য

দুই বিভাগ অপেক্ষা পদমর্য্যাদায় অনেকাংশে হীন হইলেও, এখন আর তাঁহাদিগের ক্ষোভের কোন কারণ রহিল না। তাঁহারা আপনাদিগের দল পুষ্টি দেখিয়া অভাবনীয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন; অন্তঃকরণে নিত্য নূতন আশা ও দুরাশার সঞ্চার হইতে লাগিল, কোন কথা ন্যায় ও ধর্ম্মের অনুমোদিত হউক আর নাই হউক, বাক্ বিতণ্ডায় সংখ্যায় জয় লাভ করিতে পারিলেই হইল, প্রজাবন্ধুগণ কাল্পনিক জয়াশায় একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন।

রাজমন্ত্রী নেকারকে সকলেই নিন্দা করিয়াছে; অপরের কথা কি বলিব, মহাবীর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট যিনি ফরাসী উপপ্লবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভবান্ হইয়াছিলেন, তিনিই বলিয়াছেন, নেকারের কার্য্য দেখিয়া বোধ হয় যে রাজ্যশাসনের নিয়মাবলী সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণই অজ্ঞ ছিলেন। তিনিই রাজার পদচ্যুতির কারণ, তাঁহার দোষেই লুইকে বধ্যভূমিতে আসিতে হইয়াছিল। মরট, ড্যাণ্টন, রোবস্পায়ার, ইহার কেহই নেকারের তুল্য অনিষ্ট সাধন করিতে পারে নাই। যে উপপ্লব নেকারের হস্তে সৃষ্ট হয়, উহারা তাহারই পোষণ করিয়াছিল মাত্র।

নেকারের উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও, নেকারের কার্য্যে যে বিষফল প্রসব করিল তাহাতে আর সন্দেহ কি? নেকার ভাবিয়াছিলেন যে প্রজাবন্ধুগণ এই অভাবনীয় অনুগ্রহে পরিতৃপ্ত হইয়া যাইবে, কিন্তু ফলে তাহাদিগের তৃষ্ণা আরও বলবতী হইয়া উঠিল। নেকার ভাবিয়াছিলেন, ইহাতে রাজা ও প্রজার নিরতিশয় ঘনিষ্টতা সংসাধিত হইবে, ফলে রাজ পদই সর্ব্বসাধারণের লক্ষ্য হইয়া উঠিল। নেকার ভাবিয়াছিলেন, ইহাতে ফরাসী জাতি ভূতপূর্ব্ব অত্যাচারের কথা ভুলিয়া যাইবে; ফলে তাহারা ভবিষ্যতের মোহিনী মূর্ত্তিতে উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিল। কোন শান্তিপূর্ণ সময়ে নেকারের উদারতা স্বর্ণফল প্রসব করিতে পারিত, কিন্তু যে সময়ে লোকের অন্তঃকরণে ধর্ম্ম বলিয়া কোন আস্থা নাই, প্রাচীনতার ধ্বংস, এবং সর্ব্ববিষয়ে নবীকরণই যে সময়ের পদ্ধতি, বহুবর্ষব্যাপী অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রতিহিংসা গ্রহণ, এবং সহস্র বৎসরের দাসত্ব উন্মোচনই যে সময়ের প্রতিজ্ঞা, সেই নিদারুণ সময়ে সাধারণ তন্ত্রের ক্ষমতা দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত করা যে কিরূপ ভীষণ ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

প্রারম্ভে প্রমাদ।

২৯১ জন যাজক, ২৭০ জন সম্ভ্রান্ত লোক, এবং ৫৬৫ জন প্রজাবন্ধু, সমুদায়ে ১১২৮ জন সভ্য লইয়া সভার কার্য্য আরম্ভ হইল, অথবা প্রারম্ভেই এক ভয়ানক বিঘ্ন উপস্থিত হইল। প্রথম দুই বিভাগ স্ব স্ব স্থানে উপবিষ্ট হইয়া কার্য্যারম্ভ করিলেন, কিন্তু তৃতীয় বিভাগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র গৃহ নির্দ্দিষ্ট হইল, দেখিয়া প্রজাবন্ধু গণ নিরতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন। সকলে একত্র হইয়া কার্য্য না করিলে তাঁহারা কার্য্য করিতে প্রস্তুত নহেন। নিত্যই বিভাগত্রয়ের সমাগম হইতে লাগিল, কিন্তু কার্য্যারম্ভ হইবার কোনই সুবিধা হইল না। অভাব ও অভিযোগ সমস্তই তৃতীয় বিভাগের হস্তে, কারণ তাঁহারাই জাতীয় প্রতিনিধি, ধরিতে গেলে তাঁহারাই জাতি। উপস্থিত বিবাদে তাঁহারাই সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন। এদিকে দেশ মধ্যে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ক্ষুৎপীড়িত লোকের আর্ত্তনাদে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সকলেই সাহায্যের নিমিত্ত সতৃষ্ণভাবে মহাসভার দিকে চাহিয়া; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁহারা অদ্যাপি কার্য্যারম্ভ করিতে পারেন নাই।

এক গৃহে যাজক ও সম্ভ্রান্ত লোক এবং গৃহান্তরে প্রজাপ্রতিনিধিবর্গ সংগঠিত করিয়া, নেকার ভাবিয়াছিলেন যে ইংলণ্ডীয় মহাসভার অনুকরণ করিবেন। যাজক ও সম্ভ্রান্ত লোক হাউস্ অব লর্ডস্ এবং প্রজাবন্ধু গণ হাউস্ অব কমন্সের কার্য্য করিবেন। নেকারের এই অভিলাষ পূর্ণ হইলে ফ্রান্স অবশ্যই নররক্তে ভাসমান হইত না। কিন্তু এই অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে যেরূপ শক্তি ও সামর্থ্যের প্রয়োজন ফ্রেঞ্চ গবর্ণমেণ্টের তাহা আদৌ ছিলনা। রাজা স্বয়ং নিরীহ ভদ্রলোক ছিলেন। বিদ্রোহ উত্তেজিত করিবার দোষ ও তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিলনা, বিদ্রোহ নিবারণ করিবার সামর্থ্যেও তিনি বঞ্চিত ছিলেন। উপস্থিত দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য প্রজা প্রতিনিধি গণের যোগদান একান্ত আবশ্যকীয় বিবেচনায় জনৈক ধর্ম্মযাজক তৃতীয় বিভাগে গমন করিয়া বিনীত ভাবে অনুরোধ করিলেন,—"অন্নাভাবে প্রজাবর্গ বড়ই কষ্ট পাইতেছে; আপনাদের কতিপয় প্রতিনিধি প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগের কতিপয় সভ্যের সহিত পরামর্শ করিয়া সকলে আপতিত দুঃখ নিবারণে অগ্রসর হউন।"

রোবস্পায়ার রাহু।

প্রজাবন্ধুগণ প্রজার দুঃখ নিবারণে সমুৎসুক বটেন, কিন্তু কোন অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে প্রস্তুত নহেন। তথাপি তাদৃশ বিনীত বাক্য কি প্রকারে প্রত্যাখ্যান করা যায় ইহাই তাঁহাদের ভাবনার বিষয় হইল। ইতিমধ্যে তাঁহাদের মধ্য হইতে জনৈক অজ্ঞাত অপরিচিত যুবক দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "আপনি যান্, আপনার বন্ধুদিগকে বলুন, যে যদি তাঁহারা সাধারণের দুঃখ নিবারণ করিতে এতই অধীর হইয়া থাকেন, এইখানে আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্যারম্ভ করুন। আমরা কোন ক্রমেই আমাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব না। আপনার বিলাসী বন্ধুগণ কি স্ব স্ব বিলাস দ্রব্য বিক্রয় করিয়া আপতিত দুর্ভিক্ষ কষ্টের কথঞ্চিৎ নিবারণ করিতে পারেন না।" এই বাক্যে বক্তার প্রতি সকলেরই দৃষ্টি পড়িল। বাক্যগুলি সময়োচিত এবং সর্ব্বানুমোদিত হইয়াছে দেখিয়া সকলেই সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, ঐ যুবকটী কে? পরবর্ত্তী সময়ে ঐ যুবকের নামে সমগ্র ফ্রান্স ভয়ে কম্পান্বিত হইয়াছিল। নামটী—ম্যাক্সি-মিলিএন রোবস্পায়ার।

নেকার এই সময়ে যাজক ও সম্ভ্রান্ততন্ত্র একত্র গঠিত করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই দুই বিভাগ সম্মিলিত হইলে, তৃতীয় বিভাগের অত্যুন্নতি রোধ করা যাইত, কিন্তু ইহাদিগের মিলিত হইবার বিশেষ বাধা উপস্থিত হইল। যাজক মণ্ডলীর মধ্যে প্রায় এক শত জন হীন বংশজাত ছিলেন, সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁহাদের সহিত মিলিত হইতে অপমান বোধ করিলেন। আবার উচ্চবংশীয় পুরোহিতেরাও কতিপয় আধুনিক সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত মিলিতে নানাবিধ আপত্তি উত্থাপন করিতে লাগিলেন।

"জাতীয় সমিতি" স্থাপন।

প্রথম বিভাগদ্বয়ে এইরূপ পদপার্থক্যের জল্পনা চলিতেছে, এমন সময়ে প্রজাবন্ধুগণ একটী স্বতন্ত্র সভা স্থাপনের কল্পনা করিলেন; সভা স্থাপনে কাহারও আপত্তি নাই, কিন্তু সভার কি নাম হইবে তদ্বিষয়েই বাক্ বিতণ্ডা চলিতে

লাগিল। বেলি সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 'ফ্রান্সে সম্ভ্রান্ত লোকের সংখ্যা দেড়লক্ষ, কিন্তু আমাদের সংখ্যা আড়াই কোটী, আমরা অভিজাত তন্ত্র উপেক্ষা করিয়া স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারিবনা কেন?' সকলেই এই মর্ম্মে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে ভয়ানক ঝড় বহিতেছিল, বায়ুর প্রবলবেগে সভাগৃহ পতনোন্মুখ হইতেছিল, দুরন্ত মর্ম্মর শব্দে কর্ণ বধির প্রায়। অবিচলিত বেলি পাঁচশত প্রতিনিধির সহিত রাজাহূত মহাসভার অবমাননা করিয়া আপনাদিগকর্ত্তৃক "জাতীয় সমিতি" নামক সভার স্থাপন করিলেন। সভার মন্তব্য অন্যান্য বিভাগের দর্শনার্থে প্রেরিত হইল। ফ্রান্স উপপ্লবের দ্বিতীয় সোপানে আরোহণ করিল।

এই সংবাদ দেশমধ্যে পরিব্যাপ্ত হইলে, সর্ব্ব সাধারণের আনন্দের সীমা রহিল না। আট শত বৎসরের দাসত্ব একদিনেই অন্তর্হিত হইয়াছে বলিয়া জন সাধারণ আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। কিন্তু অপেক্ষাকৃত চিন্তাশীল লোকেরা ইহাতে নিরতিশয় ভীত হইলেন। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন যে প্রজাপ্রতিনিধিদিগের এই প্রকার অপ্রতিহত ধৃষ্টতায় যে কেবলমাত্র যাজক ও অভিজাততন্ত্র নির্বীর্য্য হইলেন, এমত নহে, ইহাতে রাজসিংহাসন পর্য্যন্ত বিচলিত হইল।

পরক্ষণেই প্রজাবন্ধুগণ পূর্ব্ব প্রচলিত যাবতীয় ট্যাক্স রদ হইবার মন্তব্য প্রকাশ করিলেন দেখিয়া রাজা শশব্যস্তে ২৩ শে জুন পর্য্যন্ত সমস্ত বিভাগেরই অধিবেশন বন্ধ থাকিবার আদেশ করিলেন। তিনি সেই দিবসে বিভাগত্রয়কে একত্রিত করিয়া স্বকীয় সদভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেন, এবং যাহাতে সকলে একমত হইয়া কার্য্য করিতে পারেন, তাহারও সুব্যবস্থা করিয়া দিতেন। ২০ শে জুন তারিখে প্রজাপ্রতিনিধিগণের অধিবেশন হইবার কথা ছিল, তাঁহারা তদনুসারে সমাগত হইলেন বটে, কিন্তু প্রবেশ করিতে পারিলেন না, কেননা সভাগৃহের দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে। অনুসন্ধান করিয়া, রাজার আদেশে দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে, তাঁহারা এই মাত্রই জানিতে পারিলেন; কিন্তু রাজার সদভিপ্রায় সম্বন্ধে কেহই তাঁহাদিগকে কিছু বলিতে পারিল না বা বলিল না। প্রতিনিধিগণ দুঃখিত অন্তঃকরণে নিকটবর্ত্তি টেনিস্ ক্রীড়াঙ্গনে প্রবেশ করিয়া নিদারুণ প্রতিজ্ঞা পাশে আবদ্ধ হইলেন,

"আমরা জীবনে কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইব না। রাজ্যে শান্তি সংস্থাপন, রাজশক্তির খর্ব্বীকরণ প্রভৃতি যে সকল গুরুতর কার্য্যের নিমিত্ত আমরা প্রেরিত হইয়াছি, তৎসমুদয় সুসম্পন্ন না করিয়া কিছুতেই আমরা প্রতিনিবৃত্ত হইব না। আমরা বিচ্ছিন্ন হইলেও পুনরায় একত্রিত হইব, এবং যে স্থানে আমরা মিলিত হইব, সেই স্থানেই—জাতীয় সমিতির আবির্ভাব হইবে।"

পরদিবস টেনিস্ ক্রীড়াঙ্গনেরও দ্বার রুদ্ধ হইল। নিরুপায় প্রতিনিধিবর্গ ২২ শে জুন তারিখে সমীপবর্ত্তী সেণ্টলুই নামক ধর্ম্ম মন্দিরে মিলিত হইলেন। এই স্থানে ১৪৮ জন ধর্ম্ম যাজক তাঁহাদিগের সঙ্গে যোগদান করিলেন। প্রতিনিধিগণ এই অভাবনীয় দল পুষ্টিতে দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। কিছু সময়ের জন্য উভয় দলে পরস্পর আলিঙ্গন ও আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন হইতে লাগিল। তখন কেহই বুঝিতে পারিলেন না যে আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই দুরন্ত প্রজাপক্ষের হস্তে ধর্ম্ম-যাজকদিগের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবেনা। তাহাদের বিষয় সম্পত্তি ধন মান সমস্তই প্রজার করাল কবলে নিক্ষিপ্ত হইবে। তাহারা ধর্ম্মবন্ধুদিগের শীতল রক্তে স্ব স্ব শোণিত পিপাসা নিবৃত্ত করিতে থাকিবে।

সভাপতি বেলি

উপপ্লব অতি ভীষণ ব্যাপার! এই সময়ে সকলেই অধিক লোকের প্রশংসা ভাজন হইতে চেষ্টা করে; কিন্তু আবার এই সময়ের হাততালিই মূর্ত্তিমতী প্রতারণা বলিয়া বোধ হয়। প্রজা প্রতিনিধিগণকে প্রশংসা না করিয়া থাকা অসম্ভব। তাঁহারা জাতীয় শান্তি ও স্বাধীনতার জন্য যে রূপ মহাকণ্টকাকীর্ণ ও সর্ব্বথা বিপদসঙ্কুল পথে অগ্রসর হইতেছেন, তাহাতে তাঁহারা বাস্তবিকই ধন্যবাদের পাত্র। সভাপতি বেলির যশঃ সৌরভে দিকদিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ফ্রান্সের আবাল বৃদ্ধ বনিতা তাঁহাকে জানিয়াছে। গৃহে গৃহে তাঁহার নাম কীর্ত্তিত হইতেছে। সমগ্র ইউরোপ তাঁহাকে প্রশংসা করিতেছে। সংবাদ পত্রের স্তম্ভসমূহ বেলির বুদ্ধিমত্তা ও স্বদেশানুরাগে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। মহামতি বেলি যে কার্য্যে

হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তদাপেক্ষা মহত্তর কার্য্য আর কি আছে? কৃতজ্ঞ ফরাসী জাতি তাঁহাকে ফ্রান্সের উদ্ধার কর্ত্তা ও সুখশান্তি বিধাতা বলিয়া পূজা করিতেছে। কিন্তু যদি কাহারও ভবিষ্যতের উদরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইত যে ঐ বেলিই আবার প্লাস্ ডি মার এর বধ্য ভূমিতে থর থর কম্পান্বিত ভাবে দণ্ডায়মান, তাঁহার হস্ত দ্বয় পৃষ্ঠোপরি আবদ্ধ; গ্রীবা'পরি ভীষণ খড়্গ সূর্য্য কিরণে বিদ্যুচ্ছটা প্রকাশ করিতেছে।

মহাত্মা লাফেট।

প্রজা বন্ধুগণের দলপুষ্টি, এবং তাঁহাদিগের প্রতি সর্ব্ব সাধারণের সহানুভূতি দেখিয়া ৪৭ জন সম্ভ্রান্ত লোক স্বদল পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৃতীয় বিভাগে যোগদান করিলেন। ইহাঁদের মধ্যে ডিউক অব আর্‌লিন্‌দ্‌, মার্কুইস্ লাফেট প্রভৃতি প্রধান প্রধান লোকও ছিলেন। কে কি নিমিত্ত তৃতীয় বিভাগের দল পুষ্টি করিলেন, তাহা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। কিন্তু অধিকাংশই যে ঘোরতর স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া ঐরূপ করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সংশয় নাই। পরিণাম সকলেরই শোচনীয়—প্রায় সকলকেই গিলোটিনমঞ্চে আরোহণ করিতে হইয়াছিল।

বিবিধ।

মদুরা, ত্রিনবল্লী, ত্রিচিন পল্লা, তাঞ্জোর ও কোইম্বাটুর জেলায় মারবার জাতি বাস করে। তামিল ভাষায় "মারবন" শব্দের অর্থ "আমি কখন ভুলিব না"। রাবণের সঙ্গে রামচন্দ্র যখন যুদ্ধ করেন তখন এই অসভ্য জাতি এমন অসীম সাহসে রামচন্দ্রের সহায়তা করিয়াছিল যে রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন "আমি কখন ভুলিব না, আমি কখন ভুলিব না"। সেই কথা হইতে এই জাতির নাম মারবন বা মারবর। এই মারবর জাতি হইতে মলবর নামের উৎপত্তি। এই জাতির লোক-সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ হইবে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রামনাদের রাজা দু এক দিনে ত্রিশ চল্লিশ সহস্র মারবার সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিতেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে এই জাতির সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হই-

তেছে। মারবারেরা কৃষি জীবী। ইহারা ভদ্র কালী, মথুরবীর প্রভৃতি দেবতার পূজা করে। মদ মাংস ও ফল মূল দিয়া নৈবেদ্য প্রস্তুত করা হয়। ইহারা শূকর বা গোমাংস স্পর্শ করে না। জন্মাশৌচ দশ দিন। অশৌচান্তে স্নান করিয়া জ্ঞাতি কুটুম্বকে ভোজন করাইতে হয়। যাহারা জ্ঞাতি ভোজনের ব্যয় সঙ্কুলান করিতে পারে না, তাহারা স্নানান্তে গোময় ভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হয়। খুড়তুত জেটতত ভাই বোনের বিবাহ নিষিদ্ধ নহে, বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে, স্বামী স্ত্রী কাহারও অভিমত হইলে বিবাহ ভঙ্গ হইতে পারে। বিবাহ হেতু বর কন্যার অভিপ্রায়ের আবশ্যক হয় না। কর্ত্তৃপক্ষীয়দের মত হইলেই বর পক্ষের কয়েকজন কন্যার বাটীতে যাইয়া কন্যার গলায় সূতা বাঁধিয়া দেয়, তখন সদর বাটীতে জোরে শাঁক বাজিয়া উঠে। তাহার পর কন্যাকে বরের বাড়ীতে লইয়া গিয়া জ্ঞাতি কুটুম্বকে নিমন্ত্রণ করা হয়। যে দিন বরযাত্রেরা বরকে লইয়া সমারোহে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া বিবাহমণ্ডপে ফিরিয়া আসে, সেখানে প্রথমে একটী নারিকেল ভাঙ্গা হয়। তাহার পর নানাবিধ মন্ত্র পাঠ ও আচার। তাহাতে অনেক ব্যয় হয়। খরচ পত্রের অনাটন হইলে সে কার্য্যটা পরেও করা যাইতে পারে। কিন্তু স্বর্গে যাইবার পূর্ব্বে সারিতে হইবে। স্বামীর মৃত দেহকে স্ত্রীর পার্শ্বে বসাইয়া মন্ত্রপাঠ ও অন্যান্য আচরণ সম্পন্ন করিতেও দেখাগিয়াছে। বিবাহের পূর্ব্বে যে সূত্র তালি বা মালা বরপক্ষীয়েরা কন্যার গলায় পরাইয়া দিয়াছিল বিধবা হইয়াও, মারবারবাসিনী সে মালা পরিত্যাগ করে না। যদি করে বুঝিতে হইবে যে পুনরায় বিবাহ করিবে। এই জাতির কোন কোন সম্প্রদায়ে বিবাহক্ষেত্রে বর উপস্থিত না থাকিলেও বিবাহ হইতে পারে। বরের কোন বন্ধু কন্যার গলায় তালি বাঁধিয়া দিয়া বিবাহ মণ্ডপে তাহাকে উপস্থিত করে। সেখানে একটী খোঁটা পোতা হয়; সেই খোঁটাটা বরের প্রতিনিধিত্ব করে। কাহারও মৃত্যু হইলে শ্মশানে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা তাহার গালে একরাশি ভাত পুরিয়া দেয়। চিতায় দাহ করিবার পূর্ব্বে শ্মশানে পুরুষেরাও এইরূপ করে। চিতায় তুলিয়া দিবার পরে জ্যেষ্ঠ পুত্র এক কলসী জল মাথায় করিয়া তিন বার চিতা প্রদক্ষিণ করে। প্রদক্ষিণ শেষ হইলে কলসীটী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া চিতায় আগুন দেয়। সৎকার শেষ হইলে কিছু ভস্ম সংগ্রহ করিয়া সকলে স্নান করিয়া ঘরে ফিরে। পর দিন সেই ভস্ম

কোন নদীতে বা পুকুরে ফেলিয়া দেওয়া হয়। মারবার রমণী বড় অলঙ্কার প্রিয়। কাণে এত ভারী মাকড়ী পরে, যে কাণ ঝুলিয়া কাঁধে ঠেকে।

সম্প্রতি আমার বাড়ীতে পশুদের মধ্যে কি একটী রোগ হইয়াছিল একে একে আটটী ছাগল মরিয়া যায়। মরিবার পূর্ব্বে সকলেই আপনার থাকিবার ঘরে গিয়াছিল, সেখানেই মরে। বুঝিয়াছিলাম যে বাসস্থানের মায়া শেষ পর্য্যন্ত রহিয়া যায়। শেষে গরুটীরও সেই রোগ হয়। গরুর ঘরটী সামনে, ছাগলের ঘরের মত নিভৃত নহে। গরুটী মরিবার জন্য নিজের ঘরে না গিয়া আর একটী স্থানে চলিয়া গিয়াছিল। তখন পূর্ব্বের কল্পনা বাসস্থানপ্রিয়তা আর খাটিল না। আর একটী কথা মনে পড়িল! বনে বনে পর্ব্বত কন্দরে ঘুরিয়া পরিব্রাজকেরা মরা পশুর হাড় দেখিতে পান না। আবার নিভৃত গিরি গুহায় এক স্থানে রাশি রাশি হাড় দেখিতে পান। ইহা হইতে একটী মত প্রচারিত হইয়াছে যে মরিবার সময় পশু পক্ষী কোন নিভৃত স্থানে আশ্রয় লয়। আমার ছাগলের ঘরটী নিভৃত, মরিবার পূর্ব্বে কুকুর ও বিড়াল কোন নির্জ্জন স্থানে আশ্রয় লয়। সেজন্য তাহারা বাড়ী হইতে অনেক দূরেও গিয়া থাকে। শশকেরা মৃত্যু কালে স্থানান্তরে চলিয়া যায়। সন্তানের স্বাস্থ্যের জন্য এরূপ করে কি না বলা যায় না ইন্দুরেরাও সেই আপন গহ্বরে মরে না। হরিণ আহত হইলে বাসস্থান ও সঙ্গীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে নিভৃত স্থানে একাকী চলিয়া যায়। মরিবার সময় হস্তীও এইরূপ করে। কি কারণে পশু পক্ষীর মধ্যে মৃত্যুকালে নিভৃত প্রস্থান প্রকৃতির উদয় হইয়াছে তাহা এখনও নিরূপিত হয় নাই।

সীতা।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—রাজ অন্তঃপুর। কাল—সায়াহ্ন।

সীতা, উর্ম্মিলা, মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্ত্তি ও শান্তা।

সীতা। কি কহিব সে সব পুরাণো কথা আর ?
কতবার কহিয়াছি।

শান্তা। আর একবার
বল। একবারো তুই বলিসনি মোরে ;
আর একবার বল বোন সাধি তোরে।
উর্ম্মিলা। ততই শুনিতে চাই তাহা শুনি যত,
সবই যেন মায়াময় উপন্যাস মত।
মাণ্ডবী। হাঁ হাঁ—সেই জায়গাটি সব চেয়ে ভালো।—
সেই যে—কি নাম তার?—সূর্পনখা—[উর্ম্মিলাকে] না লো?
হয়েছিল মূর্চ্ছিত যে লক্ষ্মণের রূপে—
শান্তা। সূর্পনখা রাক্ষসী?
মাণ্ডবী। হাঁ। এসে চুপে চুপে,
লক্ষ্মণে জানায় কত ভালো ভালো কথা
নিভৃতে, কত না গুপ্ত হৃদয়ের ব্যথা,
কত না বিনয় স্তুতি, অনুনয় আর।—
হবে না বা কেন? সূর্পনখা কোন ছার
দেবরের রূপে রতি মূর্চ্ছা যান নিজে
কোথা লাগে সূর্পনখা।
উর্ম্মিলা। রাখো ভাই। কি যে
তামাসা শিখেছ দিদি!—সদাই তামাসা!
শান্তা। তার পরে?
মাণ্ডবী। তার পরে যেই তার আসা
অমনি দেবর তার কাটিলেন নাসা
জানালেন উক্তরূপে স্বীয় ভালবাসা।
শান্তা। [সীতাকে] সত্য নাকি?
সীতা। সত্য বোন
মাণ্ডবী। সব সত্য কথা
প্রেম জ্ঞাপনের এই অভিনব প্রথা
বোধ হয় জানোনাক বোন্
শান্তা। তার পরে?

মাণ্ডবী। বিপর্য্যয় কাণ্ড!—কেঁদে যায় নিজ ঘরে
নাসাহীন স্পর্ণনখা; ধেয়ে আসে পরে
সৈন্যসহ তার দুই সোদর সমরে;
শ্রীলক্ষ্মণ এক দৌড়ে চোঁচা দেন পাড়ি
"রক্ষা কর দাদা" বলি' ঘন ডাক ছাড়ি।
শান্তা। না না মিথ্যা কথা।
মাণ্ডবী। সত্য!
শান্তা। বটে!—তার পরে?
মাণ্ডবী। তার পরে শ্রীলক্ষ্মণ ফিরে এসে ঘরে
তবুও নিশ্চিন্ত ন'ন—কেঁপেই অস্থির।
রঘুবর জিজ্ঞাসেন "হয়েছে কি?"—বীর
দূরে অনির্দ্দিষ্ট স্থানে অঙ্গুলি বাড়ায়ে
বলে "দাদা তারা"—শেষে কোনমতে ভায়ে
শান্ত করে'—বাহিরিয়া গিয়া রঘুপতি
একা যুদ্ধে বধিলেন রাক্ষস সংহতি।
কুটীরে ফিরিয়া এসে দেখেন, লক্ষ্মণ
মূর্চ্ছিত, জানকী তারে করেন বীজন।
ডাকিলেন উচ্চৈঃস্বরে।—শুনিয়া নিহত
সংগ্রামে রাঘব হস্তে রক্ষঃসেনা যত
তখন বসেন উঠি দেবর নিঃশ্বাসি',
অধরেতে বাক্য ফুটে, মুখে ফুটে হাসি,
বলিলেন "তা কি জানো? আমিই একাকী
নিধন করিতে রক্ষঃ পারিতাম না কি?
তবে কিনা তুমি হলে কিনা জ্যেষ্ঠ ভাই
তাই বিনা অনুমতি যুদ্ধ করি নাই।
সীতা। স্তব্ধ হ' মাণ্ডবি!—কেন মিথ্যা নিন্দা তার
শুনালে শান্তারে বোন।—যার শতধার
দয়া সর্ব্বভূতে, অবারিত বরিষার

ধারা সম ;—নির্ঝরের সম স্নেহ যার
শরৎ প্রথমে, তার কূলে কূলে ভরা ;
বিনম্র চম্পক সম ভক্তি ; বসুন্ধরা
সম সহিষ্ণুতা ; বীর্য্য যার সূর্য্যোপম
অনিবার্য্য ; কোমলতা পদ্মপুষ্প সম।
কৈশোরে যে প্রাসাদের সম্ভোগ বিলাস
তুচ্ছ করি, স্ব-ইচ্ছায় দীর্ঘ বনবাস
ভুঞ্জিল রাঘব সঙ্গে। নিত্য পুত্র সম
অনিদ্রায় অনশনে করি' সেবা মম,
যে অচ্ছেদ্য ঋণপাশে বাঁধিলা আমারে,
তাহা হ'তে সাধ্য নাহি মুক্ত হইবারে
আজীবন। চাহিনাও করিবারে দূর
সেই ঋণভার—এত পবিত্র মধুর !—
যত ভাবি হই মুগ্ধ,—রোমাঞ্চিত হর্ষে,
দেখি' সেই মহত্ত্বের চরম আদর্শে।
পরিহাস কর বোন কোন মুখে তার
প্রশংসা করিলে নিত্য শত মুখে যার
ফুরায় না শত বর্ষে।

উর্ম্মিলা। [স্বগত] ভালবাসা সতি !
বাড়িল এ বাক্যে শত গুণ তোমা প্রতি,
প্রিয়তমা ভগ্নি। সত্য ধন্য মোর স্বামী
যাঁর পদ-অঙ্গুষ্ঠেরও যোগ্য নহি আমি।

শ্রুতকীর্ত্তি। উনি সে ত পরিহাস করিবেনই জানি ;—
ছিলেন উত্তম দিব্য অযোধ্যার রাণী—
রাজস্বামি সহবাসে সুখে সর্ব্বক্ষণ।
ভুঞ্জিতে হয় নি ওঁরে সীতার মতন
চৌদ্দবর্ষ বনবাস, উর্ম্মিলার মত
চৌদ্দবর্ষ বিচ্ছেদের নিদারুণ ক্ষত।

মাণ্ডবী । [গম্ভীর ভাবে] সে আমার দোষ ? সত্য, বল সত্যবাণী,
চাহিয়াছিলাম আমি হতে' যুবরাণী ?
যুবরাজ রাম সীতা সৌমিত্রির সনে
রাজ্য ত্যজি যেইদিন চলিলেন বনে,
যদিও বালিকা আমি নিতান্ত তখন,
তথাপি কি নিরুপায় শিশুর মতন
কাঁদিনি সে অন্ধকার অযোধ্যার সনে
গভীর আক্ষেপে ?—পরে যখন যৌবনে
করিলাম পদার্পণ, বুঝিলাম হায়
নীতির বিপ্লব সেই, গভীর অন্যায় ;—
চাহিনি ত্যজিতে এই রাজ্য শতবার ?
এই রাজ্যে এ প্রাসাদে দিইনি ধিক্কার
পুনঃ পুনঃ ? যবে কেহ মহারাণী কহি,
সম্ভাষিত, বলি নাই ?—"আমি রাণী নহি ;
যিনি রাজা, যিনি রাণী তাঁরা বনবাসী
ভৃত্যমাত্র তাঁদের ভরত, আমি দাসী ।"

সীতা । স্থির হ' মাণ্ডবি । সত্য ভাবিস্ কি বোন্
দুঃখিনী ছিলাম আমি এতদিন ?—কোন্
সুভাগিনী শতবর্ষে ভুঞ্জিয়াছে আহা
সেই সুখ, আমি ভোগ করিয়াছি যাহা
নাথ সঙ্গে একদিনে ?
আজো পড়ে মনে
সে দিব্য প্রভাতগুলি, কনক কিরণে
চড়িয়া, আসিত সেই নীলশূন্য দিয়া
নিঃশব্দে নামিয়া ধীরে,—পড়িত আসিয়া
নাথের চরণতলে প্রণমি' ;—অমনি
উঠিত মঙ্গলবাদ্য বিহঙ্গের ধ্বনি
শত শাখী হতে' ; শত কুঞ্জে দিব্য হাসি'

ফুটিয়া উঠিত সঙ্গে পুষ্প রাশি রাশি।
নিত্য এই পূজা হত নাথের প্রভাতে
নিত্য তার সঙ্গে আমি পূজা করি' নাথে
গরবিনী হইতাম।—মধ্যাহ্নে প্রাঙ্গনে
নিবিড় অশ্বত্থচ্ছায়ে বসি নাথ সনে
দেখিতাম স্থির সৌম্য শ্যামবনচ্ছবি,—
রৌদ্রতপ্ত সমুজ্জল নিস্তব্ধ অটবী।
সন্ধ্যাকালে শিলাতলে গোদাবরী তটে
গিয়া বসিতাম কভু নাথের নিকটে
কভু একাকিনী ;—দূরে উর্দ্ধে দেখিতাম
অনন্ত বর্ণের স্রোত—নীল পীত শ্যাম
লোহিত ; বর্ণের সেই রাগিনী সুন্দর ;
অথবা প্রেমের স্বপ্ন শান্ত, মনোহর।
ক্রমে ঘনাইলে তীরে নৈশ অন্ধকার
ফিরিতাম বিশ্রাম কুটীরে। —আহা আর
দেখিব কি সেই দৃশ্য আবার জীবনে
সত্য লো মাণ্ডবি! বড় সাধ হয় মনে।

মাণ্ডবী। একি চিন্তা দিদি? ছিলে বন দেবী তথা,
আজ গৃহলক্ষ্মী তুমি। ওই সব কথা
ভুলে যাও ; ও দুঃস্বপ্ন কর সবে দূর
থাকো আলোকিত করি রাজ অন্তঃপুর!

সীতা। দুঃস্বপ্ন? দুঃস্বপ্ন তারে বলিস মাণ্ডবি?
দেখিসনি গহনের সে মধুর ছবি—
তাই বোন।—আহা সেই হেমন্তের স্থির
নির্ম্মুক্ত আকাশ ; সেই বসন্ত সমীর
আসিত যা জোয়ারের মত যেন কোন
অজানিত সিন্ধুবক্ষ হতে! আহা বোন্
সেই নিদাঘের স্নিগ্ধ ঘন বনচ্ছায়;

শরতের চন্দ্রালোক, যাহার বন্যায়
ঢেকে যেত ক্ষেত্র গিরি উপত্যকা আর
গোদাবরী বক্ষ এক সঙ্গে; বরিষার
কৃষ্ণমেঘগর্জ্জন, সে সৌদামিনী খেলা;
শীতের মধুর রৌদ্রে সে প্রভাত বেলা
নিত্য গা ঢালিয়া স্নান।—দেখিস্ নি ভাই
সেই সব; দুঃস্বপ্ন বলিস্ তারে তাই।

শ্রুতকীর্ত্তি। আমি যতদূর বুঝি আমাদেরি জিত
এ প্রাসাদই ভালো

শান্তা। কেন?

শ্রুতকীর্ত্তি। বনে ভারি শীত।

শান্তা। [সহাস্যে] সে যা হোক, এ প্রাসাদ; এ উচ্চ প্রাচীর;
উত্তুঙ্গ মন্দির চূড়া; উচ্চ সৌধ শির;
দাস দাসী; সশস্ত্র প্রহরী সদা জাগে,
বলিস কি সীতা!—তোর ভালো নাহি লাগে।

সীতা। কি জানি।—এ প্রাসাদের পাষাণ কঠিন
যেন চেপে ধরে বক্ষ। আসে যায় দিন
অপরিচিতের মত গৃহের বাহির
দিয়া। বসন্তের বায়ু আসে অতি ধীর
কম্পিত চরণক্ষেপে গবাক্ষে; আমার
সহিত নিষিদ্ধ যেন বাক্যালাপ তার।
নীলাকাশ উঁকি মারে সভয়ে উপরে।
চন্দ্রালোক আসে দূরে সসঙ্কোচে; পরে
চলে যায় রাণী কাছে হতাদর হয়ে'।—
পূর্ব্ববন্ধু এরা সব আসে ভয়ে ভয়ে,
কি এক সঙ্কোচ যেন, আতঙ্ক সবার;
প্রাণভয়ে কথা কেহ কহে নাক আর।
দাস দাসী পরিজন সবাই আমাকে

সম্রাজ্ঞী বলিয়া দূরে সসম্ভ্রমে থাকে ;
কহে সদা যুক্তকরে "রাণি, মহারাণি"।
নাথেরও সলজ্জভাব, কেমন কি জানি,
সশঙ্ক সংযত ভাষা, গুরুজনে দেখি ;
বুঝিনা এ সব বোন—এ কি—বোন একি !—
বুঝিনা, অন্তরে কিন্তু বড় ব্যথা পাই
দেখে এই সব দৃশ্য। এ প্রাণ সদাই
তাই হুহু করে। সদা ছুটে যেতে চাই
আবার উন্মুক্ত ক্ষেত্রে মোর নাথ সনে—
সেই গোদাবরীতীরে ; সেই কুঞ্জ বনে
প্রস্ফুটিত পুষ্প ; সেই বিহঙ্গ হরিণ ;—
গিয়াছে চলিয়া অহো কি সুখের দিন !

শ্রুতকীর্ত্তি। তোর ভালো লাগিলনা, দিদি এ প্রাসাদ,
আত্মীয় স্বজন, এত আমোদ আহ্লাদ,
আমাদের ভালবাসা, এ সেবা শুশ্রূষা,
সন্দেশ পায়স এত, এত বেশভূষা ?
পঞ্চবটী বন হল ভালো এর কাছে ?—
দিদি তোর কপালে অনেক কষ্ট আছে।

মাণ্ডবী। চুপ কর শ্রুতকীর্ত্তি

সীতা। সত্য বলিয়াছে
আমার কপালে বুঝি বহু কষ্ট আছে।

নেপথ্যে কৌশল্যা। সীতা সীতা।

শান্তা। ডাকিছেন কৌশল্যা জননী
শুনিতেছ বোন !

সীতা। [চমকিতভাবে] কই ? যাই মা। [প্রস্থান]

শান্তা। এমনি
সদা চিন্তাকুলা, সীতা, সদা অন্যমনা,
চাহে চারিদিকে মুগ্ধকুরঙ্গ নয়না,

সপ্রশ্ন বিস্ময়ে ; সদা আতঙ্ক বিহ্বল ;
মুহূর্ত্তে পাণ্ডুরা ; চক্ষু দুটি ছল ছল
ভরে আসে জলে ; হাসি মিলাইয়া যায়
গভীর বিষাদে। যেন পূর্ণিমা নিশায়
মরণের চিন্তা ; যেন পুষ্পিত কাননে
আর্ত্তরব ; নৈশ স্তব্ধতায় বংশীধ্বনি ;
যেন মূর্চ্ছা সৌন্দর্য্যের ; চিন্তার কালিমা
শিশুর ললাটে ; যেন পাষাণ প্রতিমা
হাস্যের ; পদ্মের পত্রে নিশার নীহার।
অথবা তমিস্রাগর্ভে সুন্দরী সন্ধার
আত্মহত্যা। লো মাণ্ডবি! কি চিন্তা সীতার
বুঝিতে কি পার বোন ?

মাণ্ডবী। বুঝিব কি আর
বন বিহঙ্গিনী কভু সোনার পিঞ্জরে
সুখে থাকে দিদি ?

শ্রুতকীর্ত্তি। না। সে গাছের উপরে
শীতে রৌদ্রে বর্ষায় সে ভারি সুখে থাকে।
আমি বরাবর বলে এসেছি সীতাকে
তোমার বনের চেয়ে এ প্রাসাদ ভালো।
এখানে বহেনা বায়ু ? পূর্ণিমার আলো
ফোটেনা হেথায় দিদি ? তাহার উপরে
এই নিত্য রাজভোগ ; নিত্য সেবা করে
নিদ্রাহীন শুশ্রূষায় শত দাসদাসী।—
আমি ত সেটার চেয়ে এটা ভালবাসি।

মাণ্ডবী। সবার ত নয় বোন একরূপ রুচি

শ্রুতকীর্ত্তি। সেটা সত্য বটে। কেও ভালবাসে লুচি
কেউ বাসে পরমান্ন।

শান্তা। এই ঠিক এই !

ঠিক বলেছিস্। তুই সব সময়েই
বলিসলো সত্য কথা। আর ও মাণ্ডবী
উর্ম্মিলা কি সীতা ওরা, ওরা সব কবি।
[উর্ম্মিলা ভিন্ন সকলের প্রস্থান]

উর্ম্মিলা। সূর্য্য অস্তে যায়। দূরে অনিমেষে চাহে
রঞ্জিত প্রান্তর। স্তব্ধ সরযূ প্রবাহে
রবির কনক রশ্মি ঘুমাইছে আসি।
হস্তে দীপ, আরক্তিম মুখে মৃদুহাসি
আসিছে আনতনেত্রে ধূসর বসনে
অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী সন্ধ্যা সঙ্গোপনে,
নীরব চরণক্ষেপে ;—শয়ন মন্দিরে
প্রবেশ উন্মুখা নব বধূসম। অয়ি
স্মিতা সুমধুরা লজ্জানম্রা প্রেমময়ি
সন্ধ্যা, এস ধরাতলে, নিয়ে এস আর
প্রাণেশ লক্ষ্মণে সখি বক্ষে উর্ম্মিলার।

[প্রস্থান]

খোকার উদ্দেশে।

যামিনী আঁধারে থাক কালিমা মূরতি,
আমার প্রাণের সাথে মিশিতেছে ভালো।
প্রাণের প্রদীপ দিয়ে করেছি আরতি,
যে দিন ষষ্ঠীর চাঁদ করেছিল আলো।

শুক্ল পক্ষে প্রাণ শশী, দিয়াছি বিদায়,
তাই মিশিবারে সাধ, কৃষ্ণপক্ষ সাথে,
তোমার বিমল চাঁদ, পুন আসে যায়,
আমার চাঁদতো কভু আসেনা এ পথে।

দেখেছ কি বিভাবরী, কোন পথ দিয়ে,
পলাইল ছবি মম বদ্ধ গৃহ হতে ?
কেমন সে চুপে চুপে নয়ন মুদিয়ে,
কোন জননীর স্নেহে আরাম পাইতে

রাজসিংহ।—

(উপন্যাস)

সমালোচন।

কাতারে কাতারে সেনা চলে রাজ পথে,
সাগর তরঙ্গ যথা পবন তাড়নে
দ্রুতগামী।——(মেঘনাদবধ কাব্য)

ম্যারাথন ও মরগার্টেন, থর্ম্মপলি ও হলদিঘাটের অদ্ভুত যুদ্ধ, প্রতাপ ও রাজসিংহ, ওয়ালেস ও ওয়াসিংটন, গারিবল্ডি ও ডিওয়েটের বীর কাহিনী যে শুনিবে, সে আর জীবনে ভুলিব না। তাহা ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। কিন্তু ইতিহাস পড়ে কয় জনে ? টড রাজস্থানের ইতিহাস লিখিলেন। তাহাতে রাজপুতগণের যে বিস্ময়জনক বীর্য্য বর্ণিত হইয়াছে তাহা কয় জন জানেন! আমাদের দেশের লোকে ইতিহাস পড়ে না। তাই, বঙ্কিম বাবু উপন্যাসে ইতিহাসের কথা প্রচার করিবার জন্য, হিন্দুদিগের হিন্দুকুলগৌরব স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য, রাজসিংহ উপন্যাস লিখিলেন।

বীরত্বকাহিনী নিত্যমনোমোহিনী। কেন ? বীরত্ব বিপদকে পদদলিত করে, স্বাধীনতা ও সম্ভ্রমের তুলনায় জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, দেহের উপরে আত্মার শক্তি ও প্রভুত্ব স্থাপিত করে। বীরত্বদেবতা ভয়দৈতাকে মানুষের পবিত্র হৃদয় হইতে তাড়াইয়া দেয়। ভয় জীবনের মহাব্যাধি, সাহস স্বাস্থ্য। ভয় নরক, সাহস স্বর্গ। ভয় সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণ্য। সাহস সর্ব্বাপেক্ষা পূজনীয়। যে জন্মিল তাহার মরিতে হইবেই। "জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যুঃ"। যতই ভয় করি, মরণ নিবারণ করিতে পারিব না। তবে কিসের ভয় ? কর্ত্তব্য যাহা তাহা

করিব, তাহাতে ধন যায় প্রাণ যায়, যাউক। ইহাই বীরবাক্য। ভীরু যে, সে বাঁচিয়াও মরিয়া আছে, সে জীবন্মৃত। বীর যিনি, তিনি মরণে জীবন লাভ করেন, তিনি অমর।

রাজপুতগণের বীরধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত ছিল। প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম চলিয়া গিয়াছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে বীরধর্ম্মও চলিয়া গিয়াছে। আবার সেই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম ভারতে যখন আসিবে, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে বীরত্ব ও সাহস আসিবে।

বঙ্কিম বাবু জীবনের শেষভাগে, স্বদেশের মঙ্গলের জন্য, প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে দুই স্তর দেখিতে পাই। প্রথমে যৌবনে—সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ও উপভোগ। পরে পরিণত বয়সে—সাধনা ও প্রচার। প্রথম স্তরে, বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থ, সুন্দরী যুবতী দেহের ন্যায়, অঙ্গে অঙ্গে, পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে, কবিতাকুসুমসন্নদ্ধ, লাবণ্যলীলায় তরঙ্গায়িত। দ্বিতীয় স্তরে, ফুল ফলিয়াছে, কবিত্ব তখন জ্ঞানে পরিণত হইয়াছে। তখন উপন্যাস কেবল কোমল মধুর সৌন্দর্য্য রচনা ও উপভোগের উপায় নহে, তখন উপন্যাস জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রচারের বেদী। তখন দেবী চৌধুরাণী গীতা পড়িতেছে, নিষ্কাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সপত্নীর সঙ্গে সুখসন্তোষে স্বামী সেবা করিতেছে। তখন বঙ্গে আনন্দমঠে, "বন্দে মাতরং"। তখন রাজপুতানার রাজসিংহে, "জয় জয় জন্মভূমি"।

তখন রাজপুত ভৈরব নিনাদে বলিতেছে,

জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়; শত ধিক্ তারে!

কাব্যে দুইটী উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। একটী চিত্তবিনোদন, আর একটী শিক্ষাদান। এই দুইটি একই গ্রন্থে সংমিশ্রিত করা অতি দুরূহ কার্য্য। আমদিগের দেশে দীনবন্ধু বাবুর নীলদর্পণ, আমেরিকাতে শ্রীমতী বীচার ষ্টোর "অঙ্কল টম্‌স্ ক্যাবিন" Uncle Tom's Cabin (টম কাকার কুটীর) এইরূপ দুই চারি খানি পুস্তক লিখিবা মাত্র তাহাদিগের উদ্দেশ্য সংসাধিত হইয়াছিল। ডিকেন্সের রসপূর্ণ উপন্যাসও বিলাতের কারাগারের ও বিদ্যালয়ের কোন কোন বিষয়ে, জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, নিতান্ত প্রার্থনীয় সংস্কার সাধন করিয়াছিল। জীবিত উপন্যাস লেখকদিগের মধ্যে মার্কিন দেশে বেলামি

Bellamy সাম্য (Equality) প্রভৃতি উপন্যাসে ধনতত্ত্বের অলোচনা, এবং ফরাসি উপন্যাস লেখক জোলা (Zola) তাঁহার Fecondite প্রভৃতি উপন্যাসে অনেক সামাজিক প্রশ্ন বিচার করিয়া, পাঠকগণের চিন্তা আলোড়িত করিতেছেন। যাহাই হউক, কোন একটী নৈতিক বা সামাজিক বা ঐতিহাসিকতত্ত্ব প্রচার করিবার জন্য উপন্যাস লিখিয়া, চিত্তবিনোদন করা এবং চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্ফুটিত করিতে পারা অতি কঠিন। বঙ্কিম বাবু রাজসিংহের চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে নিজেই লিখিয়াছেন, "এপর্য্যন্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রণয়নে কোন লেখকই সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আমি যে পারি নাই, তাহা বলা বাহুল্য।" বঙ্কিম বাবু যতটুকু পারিয়াছেন তাহাই আমাদিগের পক্ষে যথেষ্ট।

অদ্য যেমন ব্রিটিশ সেনাশ্রেণী সাগরতরঙ্গের ন্যায় দক্ষিণ আফ্রিকা প্লাবিত করিতেছে; তেমনি একদিন অগণ্য মোগল বাহিনী পঙ্গপালের ন্যায় পবিত্র রাজপুতানা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। অদ্য যেমন অল্পসংখ্যক বুয়র অপূর্ব্ব রণকৌশল ও অদমিত বীরত্ব দেখাইতেছে, সভ্য জগৎ বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে তাহাদিগের প্রতি তাকাইয়া ধন্য ধন্য করিতেছে, তেমনি একদিন বীররাজপুতগণ অল্প সৈন্য লইয়া অনির্ব্বচনীয় শৌর্য্য, অপূর্ব্ব রণকৌশলে, স্বদেশ ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া, গৌরবে ভারত আলোকিত করিয়াছিলেন। টড্ ও অর্ম্মের ইতিহাসে যাহা আছে তাহা অবলম্বন করিয়া, বঙ্কিম বাবু এই বীরকাহিনী বিবৃত করিয়াছেন।

ইহাতে যবন নন্দিনী রমণীরত্ন আয়েষার আত্মোৎসর্গ নাই। বিমলার মনীষা ও বাক্‌পটুতা নাই; গিরিজায়ার "সাধের তরণী" নাই। ইহাতে শুদ্ধাত্মা চন্দ্রশেখরচরিত্রের গৌরব কিরীট নাই, ইহাতে কুসুমপেলব কুন্দের মৃদুতা নাই। ইহাতে কাপালিকপালিতা কপালকুণ্ডলার ঔদাস্যপূর্ণ বিচিত্র লাবণ্য নাই। ইহাতে আছে, রাজপুতবালার অদম্য তেজঃ, গভীর স্বজাতি প্রেম, স্বজাতিপীড়ক মোগলের প্রতি মজ্জাগত ঘৃণা। ইহাতে আছে বীরাঙ্গনার বীরকামনা। ইহাতে আছে রাজপুতরাজ অরিন্দম রাজসিংহের স্বদেশের জন্য আত্মোৎসর্গ ও স্বদেশ রক্ষা। ইহাতে আছে তেজস্বিতার অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি। আর আছে ইহাতে মোগলসম্রাট ঔরঙ্গজেবের স্বেচ্ছাচারিতা কুটিলতা ও হিন্দুবিদ্বেষ। ইহাতে

আছে বাদসাহ দুহিতা মহাপাপিষ্ঠা জেব উন্নিসার ইন্দ্রিয়াসক্তি, বেগমের মদ্য-পান ও বাদসাহের অন্তঃপুর-নরকের বীভৎস চিত্র। আর আছে, যবন পাপের এই অমাবস্যা রজনীর তমিস্রার ভিতর, হিন্দুর স্বদেশানুরাগ ও পবিত্র বীরত্বের বিদ্যুৎচমক।

মাসকাবার।

বুয়রযুদ্ধ। দক্ষিণ আফ্রিকাতে বুয়রদিগের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ অদ্যাপি চলিতেছে। লর্ড কিচিনার বুয়র সেনাপতি বোথার নিকট যে সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহাতে বোথা সম্মত হন নাই। বুয়র রণবীর ডিওয়েট অদ্য এখানে যুদ্ধ করিতেছেন, কল্য ওখানে ইংরাজ সৈন্য হত করিতেছেন, পরদিন ইংরাজ ব্যূহ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া কোথায় অদৃশ্য। বুয়র সৈন্যের অদম্য সাহস, অদ্ভুত রণকৌশল।

চীনে সঙ্কট। হতভাগ্য চীন সাম্রাজ্যের শান্তি সংস্থাপিত হয় নাই। নূতন গোলযোগ। চীন রুসিয়াকে ম্যাঞ্চুরিয়া দিয়াছেন। তাহাতে ইংরাজ রুষ্ট, রুষের সহিত বিবাদ সম্ভাবনা; জাপান চীনের এক ফালা চাহিতেছেন। ইংলণ্ডে ও জর্ম্মনিতে মিল, ফরাসি ও রুষিয়াতে মৈত্র দেখা যাইতেছে। ইংরেজের রাজনীতি আকাশে ঘন কৃষ্ণ মেঘ—ঝড় উঠিবে কি মেঘ কাটিয়া যাইবে বলা যায় না।

আয়ার্লণ্ড। ইংলণ্ডের উপর আয়র্লণ্ড পূর্ব্ববৎ অসন্তুষ্ট। কয় দিবস হইল নয় জন আইরিস সভ্য এরূপ বাক্‌যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন যে, মল্লযুদ্ধ দ্বারা তাঁহাদিগকে মহা সভা হইতে নিষ্কাশিত করা হয়। কিন্তু যাহাই হউক "হোমরূল" অর্থাৎ আয়র্লণ্ড দেশে স্বকীয় পৃথক্ পার্লিমেণ্ট স্থাপনাশা সুদূরপরাহত।

পার্লিমেণ্টে ভারত। উদর বোঝা বুদোর ঘাড়ে। বাৎসরিক প্রায় ৩৮৷৷০ লক্ষ টাকা ব্যয়, যাহা ইংলণ্ডের বহন করা উচিত ছিল, তাহা অনেক বৎসর ভারতের সহিষ্ণু স্কন্ধে চাপান হইয়াছিল। ভবিষ্যতে ইংলণ্ড আর ঐ টাকা ভারতের নিকট লইবেন না। কেন্ প্রমুখ ভারত বন্ধুগণ বলেন, ভারতকে

বকেয়া টাকা ফেরত দেওয়া কর্ত্তব্য। পার্লিমেণ্ট অতদূর বদান্যতা দেখাইতে অসম্মত। সুতরাং প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে।

নূতন রাজা। রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড শনৈঃ শনৈঃ লোকের অধিকতর বিশ্বাস ভাজন হইতেছেন। সল্‌সবরি বংশের প্রভুত্বে লোকের বিরাগ হইতেছে। প্রধান মন্ত্রী ও চেম্বার্লেনের উপর তাঁহাদিগের সহযোগিগণের মধ্যেও অনেকে অসন্তুষ্ট হইতেছেন। বিপক্ষ উদারনীতিক দলের মধ্যেও ঐক্যের অভাব। এস্থলে রাজশক্তি প্রসারের বিশেষ সুবিধা।

ভারতে দুর্ভিক্ষ। ভারতের প্রতি ভাগ্যদেবী অপ্রসন্ন। গত বৎসরের ভীষণ দুর্ভিক্ষ না চুকিতে, চুকিতেই ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে আবার দুর্ভিক্ষের কৃষ্ণছায়া নিপতিত হইয়াছে। ভারত কৃষক এক্ষণে নিত্য অনশন পীড়িত, আজি কালি তাহার নিত্যই কণ্ঠশ্বাস।

আসাম কুলি। অন্যান্য শ্রম জীবিদিগের অবস্থাও শোচনীয়। আসামের কুলিদিগের এক টাকা বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব হইয়াছিল। আইন পাশের সময় তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। স্বয়ং আসামের চিফ কমিশনর মহামতি কটন সাহেব বেতন বৃদ্ধি জন্য অতি তেজস্বী ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। দাসখতশৃঙ্খলিত কুলি পূর্ব্বে যেমন আধপেটা খাইয়া খাটিতে খাটিতে মরিত, এক্ষণও তেমনি মরিবে; অথবা যদি বাঁচিয়া থাকে, নিত্য কাঁদিবে। কুলীদিগের দুঃখমোচনাশা ক্ষীণা।

নীল। এদিকে নীলের আবাদে বিষম বিপদ। ইউরোপের কৃত্রিম নীল অকৃত্রিম নীল অপেক্ষা ভাল। তাহাতে ভারতে নীলের চাস উঠিয়া যাইতেছে।

খনির আইন। খনির বিল পাশ হইল। কুলি রমণী ও অল্পবয়স্ক কুলিসন্তান খনিতে নিযুক্ত করা আপাততঃ আইনে নিষিদ্ধ হইল না। তথাপি এবিষয় যে সকল নিয়ম করিবার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টকে আইনে প্রদত্ত হইল, তাহাতে ক্রমে যে কুলি রমণী ও কুলি সন্তান খনি হইতে নিঃসারিত হইবে, তাহার বিলক্ষণ আশঙ্কা আছে।

স্বাস্থ্য। ভারত দিন দিন অধিকতর অস্বাস্থ্যকর হইতেছে। ম্যালেরিয়াতে ভারতবাসী জর্জ্জরিত। ওলাউঠা ও বসন্ত বাড়িতেছে। তাহার পর

প্লেগ ভারতভূমিকে আতঙ্কময় করিতেছে। এক্ষণে ভয়ার্ত্তজনের ভরসা হইল হরিনাম ও হরিসঙ্কীর্ত্তন।

শিক্ষা। বঙ্গদেশের নিম্ন বাঙ্গালা শিক্ষার সংস্কার জন্য গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিতেছেন। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য কলিকাতা গেজেটে নিয়মাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থপ্রণেতা গবর্ণমেণ্টের নিকট পুরস্কার পাইবেন। বদান্য টাটা মহাশয় আবিষ্কার বিশ্ব বিদ্যালয় সংস্থাপন জন্য প্রভূত অর্থ দান করিয়াছেন। রামজে সাহেব অনেক অনুসন্ধান ও বিবেচনার পর লিখিয়াছেন যে, যে ধন প্রদত্ত হইয়াছে তদপেক্ষা আরও অনেক ধন চাহি, এবং এই বিদ্যালয়ে যাঁহারা শিক্ষা সমাপ্ত করিবেন, ভারতবর্ষে তাঁহাদিগের কার্যক্ষেত্র পাওয়া কঠিন। দুর্ভাগ্য ভারত।

ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ। প্রয়াগের পাইওনিয়ার সংবাদপত্র বলেন যে "এই স্মৃতিসৌধ সাম্রাজ্যের প্রাচীন উদ্ভট সামগ্রীর একটী দোকানের ন্যায় হইবে।" ভারতবাসীর সাধারণ লোকে এই সৌধ ভক্ত তাহা বোধ হয় না। অধুনা ভারতবাসীর উদরে অন্ন নাই, গ্রামে পানীয় নাই। এমন সময় সৌধ নির্ম্মাণ না করিয়া, মহারাণীর স্মরণার্থ দুঃখীদিগের দুঃখমোচন কল্পে কোন কার্য্য করিলে এক। মহৎ পুণ্য কার্য্য হইতে পারিত। ক্ষুৎপিপাশায় যে অন্নজল পাইতেছে না, তাহার নিকট বীরত্বব্যঞ্জক চিহ্নরাশির উদ্দীপনা তীব্র ব্যঙ্গ।

অকুতোভয় পেনেল সাহেব। ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের হাতে বিচারের ক্ষমতা থাকাতে যে কত সময় দুর্ব্বল ভারতবাসী নিপীড়িত হয়, ও ন্যায়বিচার পক্ষে দুরতিক্রম্য বাধা হয়, তাহা পেনেল সাহেবের রায়ে বজ্রনির্ঘোষে ঘোষিত হইয়াছে। তিনি মহামান্য হাইকোর্টের অবাধ্য বলিয়া ছোটলাট তাঁহাকে কার্য্যে স্থগিত করিয়াছেন। পেনেল সাহেব বড়লাটের নিকট অবিলম্বে নিজের চাকুরি পাইবার জন্য যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহা অগ্রাহ্য হওয়ায়, তিনি ২১এ মার্চ্চে বিলাতে ভারত সচিবের নিকট এক দরখাস্ত করিয়াছেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, যদি তিনি দশ দিনের মধ্যে তারযোগে সন্তোষজনক উত্তর না পান, তাহা হইলে তিনি বিলাতে যাইয়া পার্লিমেণ্ট মহাসভায় আবেদন করিবেন। পেনেল সাহেব চূড়ান্ত না দেখিয়া ক্ষান্ত হইতেছেন না। তিনি নিজে যাহা সত্য ও ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করেন, তাহা বলিতে ও করিতে জগতে

কাহাকেও ভয় করেন না। অন্যের জন্য বা স্বকীয় ধর্ম্মবোধের অনুসরণে যিনি আপনাকে বলিদান দেন তিনি বীর ও চিরস্মরণীয়। তবে পেনেল সাহেবের যে গৌরব, তাহাও ইংরাজের, বাঙ্গালীর নহে, বাঙ্গালীর তাহা স্মরণ রাখা ভাল।

বালিকা হরণ। কলিকাতায় গত ২৩এ জ'নুয়ারি, সাত বৎসরের একটী বালিকা চুরি যায়। সম্প্রতি তাহাকে পাওয়া গিয়াছে। পুলিশে মোকদ্দমা চলিতেছে। বালিকার জবানবন্দীতে ও অন্যান্য সূত্রে যে রহস্যভেদ হইয়াছে, তাহাতে কলিকাতার নারকীয় গুপ্ত পাপ প্রকাশিত। ১৫ বৎসর পূর্ব্বে বিলাতের পেলমেল গেজেটে লণ্ডনবাসী ধনীদিগের গুপ্ত পাপানলে দীনা অবলা কুমারীদিগের সতীত্ব কিরূপে আহুতি দেওয়া হইত তাহা সাহসী ষ্টেড্‌ সাহেব প্রকাশ করিয়া ইংলণ্ডকে চকিত করিয়াছিলেন। ইদানীং জর্ম্মনীতে এক ধনী ব্যক্তি তাহার বিপুল অর্থ নবযৌবনা কামিনীদিগের কলুষিত করিবার জন্য ব্যয় করিত। নরাধমের আড়াই বৎসর কারাবাস দণ্ড হইয়াছে। কলিকাতায় ধনী কামুক হাঙ্গরদিগের জন্য গরিব ইংরাজ ও ফ্রিঙ্গি বালিকাগণের রাজপথে বিশেষ বিপদ আছে এই কথা লইয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটা আন্দোলন হইয়াছিল। কিন্তু কলিকাতার হিন্দু সমাজেও যে এরূপ বালিকা বিপত্তি আছে তাহা আমরা জ্ঞাত ছিলাম না। আরও আশ্চর্য্য যে বালিকার বয়স সাত বৎসর। তথাপি অপহৃত হইয়াছিল।

চুম্বনে রোগ। নিউ ইয়র্কবাসিনী ডাক্তার হাতফীল্ড চুম্বন প্রথা যাহাতে ক্রমে উঠিয়া যায় তজ্জন্য একটা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি বলেন চুম্বন ঘটিত সংস্পর্শহেতু অনেক সংক্রামক রোগের বিস্তার হয়। সূক্ষ্মদর্শী হিন্দুগণ প্রাচীন কাল হইতে চুম্বন বিষয়ে চিরকালই সংযত। যাঁহারা চুম্বন তত্ত্বের সমীচীন ব্যাখ্যা চাহেন, আমরা তাঁহাদিগকে ভল্‌তেয়ারের দার্শনিক অভিধান দেখিতে বলি।

———

আমার ডিপুটী জীবন।

(গল্প।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বি. এ. পাসের পর অনন্যোপায় হইয়া আমি ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী পরীক্ষা দিই। এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, দুই বৎসর দ্বাদশটী জেলা বেড়াইয়া, অবশেষে, উত্তর বঙ্গের কোন জেলার সদরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ নিযুক্ত হইয়া সপরিবারে সেখানে আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিলাম।

নানা কারণে শৈশব হইতে আমি সংসারের উপর বড় চটা ছিলাম। আর এই কারণেই জীবনের এই দীর্ঘকাল, এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিমল শান্তি উপভোগ করিতে পারি নাই। অধুনা নূতন স্থানে আসিয়া, স্থানীয় কতিপয় সহৃদয় উকিল ও অধ্যাপক মণ্ডলীর নূতন বন্ধুত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া জীবনে কতকটা শান্তি উপভোগ করিতেছিলাম।

এই প্রকারে চারি মাস কাটিয়া গেল। পাঁচ মাসের প্রথমে,—একদিন নব বর্ষার প্রদোষে নিজের ক্ষুদ্র শয়ন-গৃহে একখানি কেদারার উপর বসিয়া আপনার মনে বঙ্গ-কবিকুল-তিলক মহাকবি জয়দেবের অমৃতময় কাব্য “গীত-গোবিন্দ”,—পাঠ করিতেছিলাম। এমন সময়ে, আমার দ্বাবিংশ বর্ষ বয়স্কা বিধবা ভাতৃজায়া মনোরমা ঠাকুরাণী ধীরে ধীরে আমার গৃহে প্রবেশ করিয়া, ধীরে ধীরে কহিলেন,—“ঠাকুর-পো, একজন হতভাগিনী বিধবা, কি জানি কেন, আপনার সহিত একবার সাক্ষাতের অভিলাষে আসিয়াছেন। বিধবাটী দুঃখিনী হইলেও, তাঁহার ভস্মাচ্ছাদিত সেই অতুল্য রূপরাশি দেখিয় মনে হয়, তিনি কোনও বড় ঘরের দুহিতা এবং বড় ঘরের বধূ। সম্প্রতি কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে পড়িয়া অমন অনিন্দনীয় রূপরাশিও মেঘে ঢাকিয়াছে। এদিকে ক্রোড়ে একটী দুই বৎসরের শিশু পুত্র,—শিশু পুত্রের বর্ণও মার মত উজ্জ্বল, কিন্তু উপযুক্ত আহারের অভাবে শীর্ণ। বাহিরে ঠাকুর-ঝির সঙ্গে তিনি আলাপ করিতেছেন। এখন আপনার মত কি ?”

বউদিদীর কথায় আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কহিলাম,—"কেন, আমার সহিত সাক্ষাতের তাঁহার কি প্রয়োজন? যদি কিছু অর্থের প্রত্যাশায় আসিয়া থাকেন, তবে কয়েকটী টাকা দিয়া বিদায় করিয়া দিন।

মনোরমা কহিলেন,—"তিনি অর্থের প্রত্যাশিনী নন। সুধু একবার আপনার সহিত সাক্ষাতের প্রত্যাশায় আসিয়াছেন।

আমি কহিলাম,—"তবে কি উদ্দেশ্যে আমার সহিত সাক্ষাতের জন্য আসিয়াছেন,—আপনি কিছু বুঝিয়াছেন কি?"

মনোরমা,—"না, আমি কিছু বুঝিতে পারি নাই।"

আমি কহিলাম,—"আগে জিজ্ঞাসা করিয়া আসুন। পশ্চাৎ সাক্ষাৎ করিব কিনা বলিব।"

আমার কথায় এবার বউদিদীর সেই সদা হাসি মাখা মুখ খানি মলিন হইয়া গেল। প্রথম হইতেই দেখিয়া আসিতেছিলাম যে, পরদুঃখ কাতরের দুঃখ মোচন করিতে পারিলেই বিশ্ব-প্রেমময়ী মনোরমার চিত্ত প্রফুল্ল হইত। তাই আজ এই আশ্রয়হীনা অনাথা বিধবার দুঃখ দেখিয়া আপনার হৃদয়ের অন্তঃ-পুরে প্রেমের পূত মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত হইয়াছিল; তাই তাঁহার আর বিলম্ব সহিতে ছিল না। হায়! সর্ব্বসুখ বঞ্চিতা বিধবার কি মহৎ হৃদয়। বউদিদী ক্ষণকাল কি ভাবিলেন। তারপর হঠাৎ সেই মলিন আননে বিদ্রূপের তীব্র হাসি হাসিয়া, ধীরে ধীরে কহিলেন,—"বিধাতা যে আপনাকে কি দিয়া গড়িয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।"

আমি,—"কেন?"

বউদিদী,—"কেন, কি? একজন আনাথা বিধবা বড় কষ্টে পড়িয়া, আপনার সহিত সুধু একবার সাক্ষাতের প্রত্যাশায় আসিয়াছেন; আর আপনি কিনা,' নানা ছলে—নানা প্রকার কূট-প্রশ্নে তাঁহার সময় নষ্ট করিতেছেন।"

এবার আমি একটু হাসিয়া কহিলাম,—"হাকিমের সহিত সাক্ষাৎ বড় সহজে হয় না।"

বউদিদী পুনরায় প্রীতি বিস্ফারিত আননে হাসিয়া কহিলেন,—"তবুও ভাল; ডেপুটী—ঘটিরাম।"

আমি কহিলাম—"ঘটিরামেই রক্ষা নাই। ইহার উপর ঘড়ারাম—হইলে আর রক্ষা থাকিত না।"

বউদিদী আমার কথায় মধুরিমাময় হাসি হাসিয়া কহিলেন—"কথায় তো আপনার সঙ্গে পারিয়া উঠা দায়;—কথায় আপনি জগৎ-জয়ী। যা'ক্, আমি জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছি।"

এই বলিয়া বউদিদী উঠিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অল্পক্ষণ পরেই বউদিদী ফিরিয়া আসিয়া সংক্ষেপে কহিলেন,—"স্ত্রীলোকটীর নাম—বিনোদিনী। বাড়ী—রাজগ্রাম। বড় বিপদে পড়িয়া আপনার নিকট আসিয়াছেন। আসিবার কারণ অন্যের নিকট অবক্তব্য।"

ইতস্ততঃ করিয়া আমি কহিলাম,—"লইয়া আসুন।"

আবার কিয়ৎক্ষণ পরে বউদিদী বিনোদিনীকে সঙ্গে করিয়া, আমার শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিলেন।

সুন্দরী বিধবা যুবতী বিনোদিনী আমার শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিয়াই কাঁদিতে কাঁদিতে, আপনার দুইখানি কমল-কোমল হস্তে, আমার চরণ দুই খানি ধরিয়া কহিলেন,—"বড় বিপদে পড়িয়া আপনার পায়ে পড়িয়াছি—আমাকে এই বিপদ হইতে, আপনাকে উদ্ধার করিতেই হইবে।"

আমি প্রদীপের উজ্জ্বল রজতালোকে, হঠাৎ বিনোদিনীর সেই অশ্রুসিক্ত বদন খানি দেখিয়া, ক্ষণকাল জন্য মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া রহিলাম। বিনোদিনীর বয়ঃক্রম পূর্ণ বিংশ বর্ষ হইবে—বড় সুন্দরী। আমি জীবনের এই কয় বৎসর, কত দেশে কত সুন্দরী যুবতী দেখিয়া আসিতেছি; কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, এমন অতুলনীয় রূপরাশি কখন চক্ষে দেখি নাই। টেবিলের উপরের উজ্জ্বল ও পরিষ্কার মোমের বাতীর আলোকে, সেই বিংশ বর্ষীয়া বিধবা যুবতীর, সেই লোক-মনোমোহিনী রূপরাশি দেখিয়া, আমি একেবারে বিমোহিত হইয়া গেলাম। একে শরতের জ্যোৎস্নার ন্যায় কলঙ্ক শূন্য রূপরাশি, তাহার উপর প্রদীপের সেই উজ্জ্বল আলোক রাশি—ভঙ্গিতে ভঙ্গিতে যুবতীর দেহের উপর পতিত হইয়া যুবতীর

দেহে যেন রূপের তরঙ্গ বহিতেছিল। আমি, জীবনের এই দীর্ঘকাল কত সুন্দরীর রূপরাশি দেখিয়া আসিতেছিলাম; কিন্তু পাষাণের ন্যায় আমার এ হৃদয়,—এ হৃদয়, এ পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্তের জন্যও রমণীর রূপে দ্রব হয় নাই। রমণীর রূপে আমার এই বন্ধুর হৃদয়ে এক মুহূর্ত্তের জন্যও চাঞ্চল্যের উদয় হয় নাই। আর বলিতে কি, রমণীর রূপে আমার চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই বলিয়াই, এত বড় ডেপুটীমাজিষ্ট্রেটী করিলেও, এত দিন আমি বিবাহ করি নাই। কিন্তু, আজ দীর্ঘকাল পরে, হঠাৎ এই অপরিচিতা দুঃখিনীর বিধবার রূপে, সহসা, আমার এই দীর্ঘ দশ বৎসরের বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। আমি তখন অনন্য-মনে অপরিচিতার সেই মৃণাল বিনিন্দিত বাহু যুগল ধরিয়া,—পরস্ত্রীর গাত্র স্পর্শ যে বড় দোষের বিষয়, মুহূর্ত্ত জন্য তাহা ভুলিয়া গিয়া, বিনোদিনীর সেই বাহু-যুগল ধরিয়া উঠাইয়া, নিকটে একখানি কেদারার উপর বসাইয়া, ধীরে ধীরে কহিলাম,—"কি জন্য আমার নিকট আসিয়াছেন?"

বিনোদিনী কহিলেন,—"আপনি অগ্রে প্রতিজ্ঞা করুন যে, আপনি আমার ন্যায় চির হতভাগিনীকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন। আপনি যদি প্রতিজ্ঞা করেন, তবেই বলিব,—নতুবা বলিয়া কি হইবে?"

আমি,—"কারণ না শুনিয়া আগে কেমন করিয়া প্রতিজ্ঞা করিব। আগে বিপদের কারণ শুনিতে পাইলে, শেষ যদি আমার ক্ষমতার মধ্যে হয়, আমি সহজেই আপনাকে বিপন্মুক্ত করিব।"

বিনোদিনী,—"যাহা আপনার সাধ্যায়ত্ত নহে, তাহার জন্য আপনার নিকট আসি নাই।" এই বলিয়া আপনার সেই ছিন্ন মলিন বসনাগ্রভাগে আপনার চারু নয়ন যুগলের অশ্রুজল মার্জ্জন করিলেন।

আমি অন্যমনে কত কি ভাবিতে ছিলাম। এমন সময়ে হঠাৎ বউদিদী বলিয়া উঠিলেন,—"ইহাও বুঝি বি'য়ের কথা যে, ভাবিতেই দশ দিন যাইবে।" আজীবন আমাকে বিবাহে বীতস্পৃহ দেখিয়া, বউদিদী ও আমার কনিষ্ঠা বিধবা ভগ্নী অমলা বিবাহের জন্য সময়ে সময়ে আমাকে পীড়াপীড়ি করিলেই আমি কহিতাম,—"বিবেচনা করিয়া পরে বলিব,"—অথচ আমার বিবেচনা হইত না। এই সব কারণে বউদিদী কহিলেন,—"ইহাও বুঝি বিয়ে'র কথা যে ভাবিতেই দশ দিন যাইবে। হায়! পুরুষের হৃদয় কি কঠিন!"

হায়, রমণি! তুমি কি বুঝিবে? পুরুষের হৃদয় কঠিন নয়,—কোমল। কুসুম অপেক্ষারও পুরুষের হৃদয় কোমল; তবে কর্ত্তব্যের অনুরোধে, সময়ে সময়ে পুরুষকে পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন হইতে হয়। শেষ আমি কহিলাম,—"আর কেন জ্বালাতন করেন।"

বউদিদী—"জ্বালাতন করি কি সাধে,—বড় রাগ হয়, সেই জন্য।"

আমি—"আর সেই আপনার রাগের জন্যই তো এত দিন বিবাহ করিতে বিমুখ আছি।" এই বলিয়া একটু হাসিলাম।

আশৈশব—আজ প্রায় তের বৎসর হইতে বউদিদী আমাকে দেখিয়া আসিতেছেন; সুতরাং আমাকে ভাল করিয়া চিনিতেন। তাই'ই তিনি মধুরিমাময় বৎসল হাসি হাসিয়া কহিলেন,—"যদি সে ভয় বিন্দু থাকে, তবে তাহা আপনার স্ত্রীর—আপনার তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি?"

আমি,—"আমারও তাহাতে বিলক্ষণ ক্ষতিবৃদ্ধি আছে। কেন না আমাকেও যে, তাহা হইলে স্ত্রীর হইয়া আপনার সঙ্গে সতত ঝগড়া করিতে হইবে?"

হঠাৎ এবার বউদিদী কহিয়া উঠিলেন,—"বৃথা কথায় সময় যায়,—এখন কি উত্তর দিবেন, বলুন।" বউদিদী—এই কথাগুলিন বলিবার পুর্ব্বে, হঠাৎ একবার বিনোদিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। সেই সময় বিনোদিনী একদৃষ্টে আমায় দেখিতেছিলেন,—আগ্রহ সহকারে আমার প্রত্যেক কথাগুলিন শুনিতেছিলেন। আমার প্রতি বিনোদিনীর এই দৃষ্টি, বুঝি বউদিদীর চ'খে ভাল লাগে নাই; তাই তিনি এখন যত সত্বর বিনোদিনীকে বাহিরে লইয়া যাইতে পারেন, সেই চেষ্টায় ছিলেন।

আমি বউদিদীর মনের ভাব বুঝিতে পারিলাম। তার পর বউদিদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলাম,—"ভয় নেই।" এই বলিয়া বিনোদিনীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলাম,—"আচ্ছা, স্বীকার করিলাম,—আমার সাধ্যানুসারে আমি আপনার উপকার করিব।"

এবার বউদিদী হাসিয়া কহিলেন,—"হাঁ, ইহাই তো পুরুষের মত কথা।"

আমি কহিলাম,—"কি করিব। আপনার অনুরোধ রক্ষা না করিয়া তো উপায় নাই।"

বউদিদী কুটিল কটাক্ষপাত করিয়া কহিলেন,—"বটে—আমার অনুরোধ।"

আমি কহিলাম,—"হাঁ, আপনারই অনুরোধ।"

বউদিদী—"মিথ্যা কথা। আমার অনুরোধ নয়,—আপনার নিজের।"

"আপনি কিসে জানিলেন যে, আমার নিজের।"—

বউদিদী এবার হাসিতে হাসিতে অম্লান বদনে কহিলেন,—"সুন্দর মুখখানির মাধুরীতে মুগ্ধ হইয়া"—কথাগুলিন শুনিয়া, বিনোদিনী লজ্জায় মুখ নত করিলেন।

বউদিদী—বড় দুষ্ট।

আমিও একটু লজ্জিত হইয়া কহিলাম,—"বাজে কথা এখন থা'ক।" তার পর বিনোদিনীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলাম,—"এখন, আপনার কি উপকার করিতে হইবে,—বলুন।"

"তবে শুনুন,—বলিয়া বিনোদিনী আপনার আত্ম-কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিনোদিনী কহিতে লাগিলেন,—"শ্যামপুর আমার পিত্রালয়, দ্বাদশ বর্ষ আমাকে রাজগ্রামে বিবাহ দেন।

রাজগ্রামে বিবাহের কথা শুনিয়া, আমি বাধা দিয়া কহিলাম,—কাহার সহিত রাজগ্রামে আপনার বিবাহ হইয়াছিল,—শুনিতে পাইব কি?

বিনোদিনী কহিলেন,—"রাজ গ্রামে রায়দের গৃহে।"

আমি কহিলাম, "ইহাতেও আমার কৌতূহলের নিবৃত্তি হইল না। আপনার শ্বশুর ও স্বামীর নাম জানিবার বিশেষ আয়োজন হইয়াছে। আমি রাজ গ্রামের দুই চারি জনকে জানিতাম।"

আগ্রহভরে বিনাদিনী কহিলেন,—"কাহাকে জানিতেন."

আমি,—"রাজগ্রামের দুর্গাদাস রায় ও তাঁহার পুত্র সুধাংশুমোহনকে জানিতাম। দুই একবার তাঁহাদের গৃহেও গিয়াছিলাম,—বিশেষতঃ সুধাংশু মোহনের বিবাহের সময়।"

বিনোদিনী এবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"আমিই উক্ত রায় মহাশয়ের হতভাগিনী পুত্রবধূ।"

এবার হঠাৎ আমার নয়নে জল আসিল। সুধাংশুমোহন যে আমার শৈশব সহচর। আমি আশৈশব কলিকাতায় মাতুলালয়ে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতাম। আমার মাতুল বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় ও সুধাংশুমোহনের পিতা দুর্গাদাস রায়,—উভয়ের পাশাপাশী বাড়ী। উভয় বাড়ীর মধ্যে বেশ একটু আত্মীয়তা ছিল। দুর্গাদাস কলিকাতার কোনও কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপকের কাজ করিতেন। সুধাংশুমোহন ও আমি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একত্র একই কলেজে অধ্যয়ন করিয়া, উভয়ে একই বৎসরে বি, এ পাশের পর আমি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম,—সুধাংশুমোহন বি, এ পাশের পর, কোন একটা জেলা-স্কুলের হেড মাষ্টার নিযুক্ত হইয়া চলিয়া যায়। সেই হইতে উভয়ের সহিত আর কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই। আজ, সহসা সেই প্রিয়তম সুহৃদের অকাল মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া, আমার নয়নে জল আসিল। আমি চোখের জল মুছিয়া কহিলাম,—"কতদিন হইল, এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।"

বিনোদিনী,—"আজিও এক বৎসর পূর্ণ হয় নাই।"

আমি,—"এখন কি ভাবে দিন চলিতেছে।"

বিনোদিনী কহিতে লাগিলেন,—"বাবু কলেজ ছাড়িয়া যখন ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের হেড মাষ্টার নিযুক্ত হইয়া গেলেন, তখন আমার শ্বশুরও বার্দ্ধক্য জন্য কলেজের কাজ ছাড়িয়া দিয়া বাড়ী আসিয়া বসিলেন। কিন্তু চাকরী ছাড়িয়া ছয় মাসও কাটিল না। হঠাৎ তিনি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া, ইহ সংসার পরিত্যাগ করিলেন। এদিকে আমার শ্বশুরের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই, আমার স্বামী কঠিন হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রায় এক বৎসর ভুগিয়া, তিনিও আমাদিগকে পথে দাঁড় করাইয়া, ইহ সংসারের মায়া কাটিয়া চলিয়া গেলেন। স্বামী-বিয়োগের পর আমরা অত্যন্ত দারিদ্র্যাবস্থায় পড়িলাম। দিন যাপনের অন্য কোন উপায় না পাইয়া, অবশেষে আমার পঞ্চদশ কি ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক দেবর হিমাংশু মোহনকে অগত্যা বিদ্যালয় ছাড়াইয়া মাসিক দশ টাকা বেতনে গ্রাম্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করাইলাম। সুখে দুঃখে স্বামী বিয়োগের

পর প্রায় সাত আট মাস কাটিল। তাহার পর আমরা আর এক নূতন বিপদে পড়িলাম। আমাদের গ্রাম,—রাজা ভবানী প্রসাদের জমিদারী। ভবানী প্রসাদের ন্যায় নরপিশাচ জমিদারের কীর্ত্তিকাহিনী বোধ হয় আপনি জ্ঞাত আছেন।"

আমি,—"হাঁ, কতকটা জানিয়াছি।"

বিনোদিনী,—"যেমন নরপিশাচ রাজা ভবানীপ্রসাদ, তেমনি নরপিশাচ তাঁহার রাজগ্রামের নায়েব উদ্ধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। পল্লীগ্রামে আমাদের বাস; সুতরাং অবরোধ প্রথা ততটা নাই;—বিশেষতঃ আমাদের মত দরিদ্রের পক্ষে।" এই বলিয়া বিনোদিনী ক্ষণকাল কি ভাবিলেন;—"ক্ষমা করিবেন,—আজ আপনার নিকট আমাকে লজ্জার মাথা খাইয়া সব বলিতে হইতেছে।"

আমি কহিলাম,—"আপনি আমার পরম সুহৃদ সুধাংশুমোহনের স্ত্রী,—আমাকে লজ্জা করিবার কোনও কারণ নাই। আপনি সবিস্তারে সব বলিয়া যান।"

বিনোদিনী পূর্ব্বের ন্যায় কহিতে লাগিলেন,—"যখন আমি বিধবা হই, তখন আমার পোড়া রূপের খ্যাতি চারিদিকে ছিল! আর বলিতে কি সেই পোড়া রূপই আমাদের সব শান্তির ব্যাঘাত হইয়া উঠিল। সকলের আগে গ্রামের সেই নায়েব মনুষ্যকুলাধম উদ্ধব চন্দ্রের পাপদৃষ্টি আমার উপর পড়িল। গ্রীষ্মকাল,—খোকাকে দুধ খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইতেছিলাম,—হিমাংশু মোহন স্কুল গিয়াছিলেন। এমন সময়ে গ্রামের একজন অসচ্চরিত্র স্ত্রীলোক আসিয়া আমার সহিত, এও তা, এই সব পাঁচ সাত রকমের গল্প ফাঁদিয়া, শেষ, উদ্ধব চন্দ্রের সেই পাপ অভিসন্ধি আমার নিকট ব্যক্ত করিল, এবং প্রচুর অর্থের প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। মাগীর কথায়, ক্রোধে ও অভিমানে আমর সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। আমি ক্রোধকে সংবরণ করিতে না পারিয়া মাগিকে লাথি মারিলাম।"

এমন সময়ে হঠাৎ বউদিদী বলিয়া উঠিলেন,—"লাথি,—সুধু লাথি; আমি হইলে মাগিকে খুন করিতাম।"

এবার আমি হাসিয়া কহিলাম,—"তাই সময়ে সময়ে, তাউই মহাশয়

আপনাকে রণ বাঘিনী বলিয়া থাকেন,—না ?" বউ দিদীর পিতা শ্যামসুন্দর ঘোষাল, মধ্যে মধ্যে আদর করিয়া বউদিদীকে রণবাঘিনী বলিয়া ডাকিতেন। কারণ, সকল সময়ে ও সহজে বউদিদী রাগ করিতেন না; আবার যদি কখন কাহারো উপর রাগ করিতেন, তবে বড় সহজে সে রাগ পড়িত না।

বউদিদী পূর্ব্বের ন্যায় গম্ভীর ভাবে কহিলেন,—"পুরুষ জাতের মুখে ঝাঁটা।

আমি এবার রাগিয়া কহিলাম,—"আমরাও তো পুরুষ জাতি—আমাদের মুখেও কি ঝাঁটার ব্যবস্থা করিলেন ?"

আমার কথায় বউদিদী বড় লজ্জিতা হইলেন। কহিলেন—"অপরাধ হইয়াছে। আমাদের মুখেই ঝাঁটা; কেন না আমরাই পোড়া রূপ লইয়া ইহ সংসারে জন্মিয়া থাকি।"

এই প্রকারে আমাতে ও বউদিদীতে অনেকক্ষণ কথাকাটাকাটির পর, বিনোদিনী পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন,—"মাগিকে লাথি মারাই শেষে ঘোর অমঙ্গল হইয়া উঠিল। এদিকে বৈকালে হিমাংশুমোহন বিদ্যালয় হইতে আসিলে, একে একে তাহাকে সব বলিলাম। হিমাংশুমোহন সব শুনিয়া ক্ষণকাল নীরবে রোদন করিলেন। তার পর কহিলেন,—"এখন উপায়।"

আমি কহিলাম,—"উপায় আর কি ? গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন।"

হিমাংশু মোহন,—"পলাইব বা কোথায় ?"

আমি কহিলাম,—"তাহাও সত্য। ইহ সংসারে আমার আপনার বলিতে কি পিতৃকুলে, কি শ্বশুরকুলে,—কোন কুলেই কেহ ছিলেন না।"

অনেক চিন্তার পর হিমাংশুমোহন কহিলেন,—"দেখি, দুই চারি জনের সহিত পরামর্শ করিয়া দেখি। যাহা ভাল হয়, করিব। অদৃষ্ট ছাড়া মানুষের হাত নাই। বিধাতা অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন,—বিধি লিপি খণ্ডন কার সাধ্য করে।"

এইরূপে আরও এক সপ্তাহ কাটিল। সপ্তাহ পরে, হঠাৎ শুনিলাম যে, দেহাতে বহির্গত হইয়া রাজা ভবানীপ্রসাদ দুই চারি দিনের মধ্যে রাজগ্রামে আসিতেছেন কথাটা শুনিয়া উভয়ে আবার চিন্তা সাগরে ভাসিলাম।

এই প্রকার কঠোর দুশ্চিন্তায় আরও কয় দিন কাটিল। শেষে রাজা ভবানীপ্রসাদ রাজ গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা আইসার পর দিন,

বৈকালে কাছারী হইতে হিমাংশুমোহনের ডাক আসিল। রাজার সহিত সাক্ষাতের মানসে হিমাংশুমোহন কাছারী গেলেন।”

* * *

“দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা অতীত হইয়া, রাত্রি ক্রমে ক্রমে—দেড় প্রহর হইয়া গেল;—কিন্তু, হিমাংশুমোহন কাছারী হইতে ফিরিলেন না। আমি ঘোর দুশ্চিন্তায়, একবার ঘর একবার বাহিরে পা’চারি করিতেছিলাম। এমন সময়ে সহসা কতিপয় লোকের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া শ্যেন ভয়ে ভীতা কপোতীর ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে, খোকাকে বুকে করিয়া, শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলাম, এবং ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিলাম। কিন্তু, অল্পক্ষণ পরেই দ্বারে মনুষ্যের পদাঘাত হইতে লাগিল। দুই চারি বার পদাঘাত হইতে না হইতেই দ্বারের হুড়কা খুলিয়া গেল। ঘরের দ্বার খুলিয়া গেলে দেখিলাম যে, কতকগুলিন লোক আমাদের গৃহ দ্বারে আগুন দিতেচে. আর কতকগুলি আমাকে ধরিবার জন্য গৃহে প্রবেশ করিতেছে। আমি তখন নিরুপায় হইয়া খোকাকে বুকে করিয়া খিড়কির দ্বার দিয়া গৃহের পশ্চাৎদিকের আম্র কানন মধ্যে প্রবেশ করিয়া পলায়নের চেষ্টা দেখিলাম। তখন আমাদের গৃহের সবগুলিন ঘরেই আগুন জ্বলিতেছিল।

সারা রাত্রি একাকিনী খোকাকে বুকে করিয়া, সেই ঘন অন্ধকারময়ী বন পথে বড় কষ্টে পথ চলিয়া রজনী প্রভাতে থানায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। থানায় আসিয়া আমাদের এই বিপদের কথা, দারগার নিকট একে একে বলিলাম। কিন্তু, প্রতিকার তো দুরে থাকুক, কেবল মাত্র পিশাচদের কুৎসিত গালাগালী লাভ হইল। শেষ, পিশাচেরা আমাকে ধরিবার জন্য, ষড়যন্ত্র করায়, আমি হতাশভাবে সে স্থান ত্যাগ করিবার আশায়, আবার বন পথ অতিবাহিত করিয়া চলিলাম। কিন্তু, আমাদের বিপদ পদে পদে। বিধাতা স্ত্রীজাতিকে কেন যে, পোড়া রূপ দিয়াছেন,—বলিতে পারি না। পথি মধ্যে ক্লান্ত হইয়া যেখানেই আশ্রয় লাভের প্রত্যাশায় উপস্থিত হই, লোকে অমনই রূপ দেখিয়া কুৎসিত রঙ্গ রহস্য জুড়িয়া দেয়। হায়, পোড়া রূপ, ধিক্ তোমাকে।

এই প্রকারে সেদিন রাত্রি আশ্রয় শূন্য হইয়া পথে পথে অতিবাহিত করিয়া, অবশেষে পরদিন অপরাহ্নে—কালিকাপুর আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কালিকা-

পুরের এক ব্রাহ্মণ, জানি না কেন আমার প্রতি সদয় হইয়া, সে দিবস আমাকে তাঁহার গৃহে আশ্রয় দিলেন। পরদিন প্রাতে আমাকে সঙ্গে করিয়া জেলায় আসিবার উদ্যোগ করিতে ছিলেন। এমন সময়ে, সহসা শুনিলেন যে, আমি রাজা ভবানী প্রসাদের পলায়িতা প্রজা। নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী রাজার পলায়িতা প্রজা শুনিয়া, অত্যাচারের ভয়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আর আমাকে সঙ্গে লইয়া জেলায় আসিতে স্বীকৃত হইলেন না। তবে নিভৃতে আমায় ডাকিয়া জেলায় আসিবার পথ বলিয়া দিলেন।

এইরূপে বড় কষ্টে আপনার জাতি ধর্ম্ম বাঁচাইয়া, তিন দিন পরে জেলায় আসিলাম। জেলায় আইসার পরদিন দেখিলাম যে, চৌর্য্যাপরাধে হিমাংশু মোহনকে জেলায় চালান দিয়াছে। এবং আজি কয়দিন হইল সে জেলে বাস করিতেছে।

এদিকে আমি রাজার বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা করিবার মানসে, এই সহরের অনেক উকিল মোক্তারের আশ্রয় প্রার্থনা করিলাম। কিন্তু, হায়! ইহারা প্রায় সকলেই, সেই নর পিশাচ রাজার প্রসাদ ভিখারী; সুতরাং কেহই আমার মোকর্দ্দমা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তবে অনেক চেষ্টা ও কাঁদাকাটির পর, কতিপয় নব্য উকিল, আমার প্রতি দয়া করিয়া আমার এই মোকর্দ্দমা লইতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু, শেষে তাঁহাদের এই অনুগ্রহের কারণ জানিতে পারিয়া, আপনার মরমে আপনি মরিয়া গেলাম। হায়! এ সংসারে ইহারাই যদি শিক্ষিত,—তবে এ সংসারে অশিক্ষিত কে? ইহারাই যদি মনুষ্য, তবে পশু কে?"

এবার আমি কহিলাম,—"এখানকার উকিল কৃষ্ণচন্দ্র বাবুর নিকট গিয়াছিলেন কি?"

বিনোদিনী—"অনেকের নিকটই গিয়াছিলাম; কিন্তু কাহাকেও তো চিনিতাম না।"

আমি—"বোধ হয় তাঁহার নিকট যান নাই। তাঁহার নিকট যাইয়া আপনার আত্ম-কাহিনী বলিলে, তিনি পরম যত্নের সহিত আপনাকে আশ্রয় দিতেন। বলিতে কি, এই সহরে তিনিই একমাত্র মানুষ, আর সব পশু। যা'ক্ তার পর।"

বিনোদিনী—"তারপর আর কি? আশ্রয় অভাবে কয়দিন পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইলাম। আজ কতিপয় দরিদ্রা ভিখারিণীর মুখে, আপনার দয়ার পরিচয়

পাইয়া, সাহসে বুক বাঁধিয়া আপনার পায়ে পড়িয়াছি। এখন আপনার যাহা কর্ত্তব্য হয়,—করুন। তবে আপনার চরণে আমার প্রার্থনা, যাহাতে আমার কুল-মান-জাতি-ধর্ম্ম রক্ষা হয় এবং হিমাংশু মোহন কারামুক্ত হয়, আপনি দয়া করিয়া তাহারই উপায় করিয়া দিন।"

আমি—"পূর্ব্বেই আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, আপনাকে আমি বিপন্মুক্ত করিব। তৎপর, এখন তো আপনার পরিচয় পাইলাম, এখন আপনি আমার বড় স্নেহের,—বড় প্রীতির পাত্রী; কেন না, আপনি আমার প্রেমাস্পদ শৈশব সুহৃৎ সুধাংশু মোহনের স্ত্রী। সুতরাং, আর আমাকে আপনার কোনও অনুরোধ করিতে হইবে না।" এই বলিয়া সহসা উঠিয়া, হিমাংশু মোহনের বিচার ভার কোন্ ডিপুটীর উপর পড়িয়াছে, দেখিবার জন্য আফিসের Diary খুলিয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে, দেখিতে পাইলাম যে, হিমাংশুর বিচার ভার আমার উপরই পড়িয়াছে। তখন আমি একটু আগ্রহভরে কহিলাম,—"আর চিন্তা নাই,—ঈশ্বর আমাদের সহায়। হিমাংশু মোহনের বিচারভার আমার উপরেই পড়িয়াছে। তবে যে পর্য্যন্ত আপনাদের এই মোকর্দ্দমা মিটিয়া না যায়, সে পর্য্যন্ত আপনাকে স্থানান্তরে থাকিতে হইবে। এবং আমিই তাহার সুব্যবস্থা করিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া তখনই একখানি কার্ড লিখিয়া, আমার আরদালীকে কৃষ্ণচন্দ্র বাবুর সমীপে পাঠাইয়া দিলাম। এমন সময়ে, আমার সংসার-সুখ-বঞ্চিতা বাল-বিধবা কনিষ্ঠা ভগ্নী অমলা আসিয়া ডাকিলেন,—"দাদা।"

আমি—"কি, বল।"

অমলা—"তোমার আহারের যায়গা হ'য়েছে।"

আমি—"চল, যাই।"

এবার বউদিদী আর সহ্য করিতে পারিলেন না। কৃত্রিম ক্রোধ সহকারে কহিলেন,—"কি আক্কেল গা? যেমন ভাইটী, তেমনি বো'নটী। সুধু নিজের পেট নিয়েই সতত ব্যস্ত। আর এই যে, একজন এসেছেন, ইঁহাকে একবারও খাবার কথা জিজ্ঞেসা কর্ব্বার নাম নেই।"

অমলা কহিলেন,—"কেন, আমার কি গরজ। তুমি কেন জিজ্ঞাসা ক'র না।"

বউদিদী—"তোমার গরজ না তো কি আমার গরজ। তোমার ভাইয়ের সংসার,—এ সংসারে তুমি তো কর্ত্রী।"

এবার অমলা কুটিল কটাক্ষপাত করিয়া কহিলেন,—"ছিঃ।"

অমলা বেশী কথা বলিতে জানিতেন না; বিশেষতঃ আমার সম্মুখে। সুতরাং বউদিদীর কথায় আর কোনও উত্তর না দিয়া, বিনোদিনীকে ডাকিয়া, হস্ত ধরিয়া লইয়া গেলেন। অল্পক্ষণ পরে, আমরাও উঠিয়া গেলাম।

ক্রমশঃ।

গরীব-সেবা।

হরে_দরে হাঁটু জল।

(২)

If you take the actual political and social history of a country like England during the past fifty years, you will find that a very considerable portion of the questions which most agitated the country and the people, questions which stirred up the keenest interest, questions which caused the rise or fall of power, were precisely the questions which vitally affected the well-being and progress of the lowest classes of society.

* * You are earnestly and anxiously desirous of the future welfare of your own country. In recent years in all centres of education throughout India in the North and in the South, there are small bodies of men, small in comparison with the population, who are genuinely and sincerely anxious to do something for the social, moral, intellectual, and spiritual improvement of their own country and their own people, and I will ask those here who have bound themselves together for their purpose to keep steadily before them the fact that no progress in society is possible so long as no real attempt is made to realize and make effective this great

truth and doctrine of the brotherhood of man, and the fact that society is one single organism and a single whole. And it is impossible for those who want to promote their own social and moral advancement and progress to do so, unless they have real community of sympathy and interest for those who are at the bottom of society and for those by whose labour alone it can live.—[মান্দ্রাজের বিশপের বক্তৃতা]

ইয়ুরোপীয় হিসাবে যুদ্ধ কালে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত সৈনিকগণের সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত। হতাহত সকলকে হাঁসপাতালে একত্রিত করা হয়, পরে ডাক্তার সাহেব আসিয়া প্রত্যেককে পরীক্ষা করত মৃত ও মুমূর্ষু ব্যক্তি-গণের গায়ে—একটা করিয়া D চিহ্ন দিয়া যান—D অর্থাৎ Dead বা মৃত। এরূপ D চিহ্নাঙ্কিত ব্যক্তি, সমূহের দেহ রাশি একটা বিরাট গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হইয়া সমাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এ ব্যাপারের জনশ্রুতি এই যে শববাহকগণ যখন উহাদিগকে স্থানান্তরিত করিতে আইসে তখন D চিহ্নিতের মধ্যে তাড়াতাড়ি ভুলক্রমে যে দুই একজন জীবিত থাকে তাহাদিগকেও লইয়া যাইতে ছাড়ে না, তাহারাও মৃত মুমূর্ষু মধ্যে পরিগণিত হয়, প্রতিবাদ করিলে উত্তর দেয়,—"যে হেড্ ডাক্তার সাহেব পরীক্ষা দ্বারা স্থির করত তোমাদেরর গাত্রে D চিহ্ন দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তোমরা মৃত, আমরা তোমাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া তোমাদিগকে জীবিত বলিয়া ছাড়ি কি প্রকারে? অত বড় ডাক্তার সাহেবের কথার উপর কি তোমাদের কথা খাটিতে পারে? তিনি যখন তোমাদিগকে মৃত বলিয়াছেন তখন অপর দিকে সহস্র প্রমাণ সত্ত্বেও তোমরা কিছুতেই জীবিত হইতে পার না।" এইরূপ সুমধুর যুক্তির দ্বারা কর্ণকুহ পরিতৃপ্ত করতঃ মুর্দ্দারফরাসগণ মৃতের সহিত জীবিতদিগকেও টানিয়া ফেলিয়া দেয়। এই প্রকারে প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিরুদ্ধ বড় বড় লোকের কাগজী মতামত ও হিসাবপত্র আমরা মান্য করিতে শিক্ষা পাইয়াছি বিগত শতাব্দীর দৌলতে। অন্ততঃ আমাদের দেশে পূর্ব্বে এরূপ ব্যাপার সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। "টেকনিকালি-টির" প্রাদুর্ভাব এ দেশে বোধ হয় আদৌ ছিল না ইহার দেশীয় প্রতিশব্দের জ্ঞানাভাবে উহাকে "কায়দা" বলিব। টেকনিকালিটির জোরে ফাঁশি মাপ হইয়া যাইতেছে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। এই "টেকনিকালিটির"

মহাবীরের শাসন সম্বন্ধে জ্ঞান বিগত শতাব্দী আমাদিগকে উত্তমরূপে দিয়াছে। মুসলমানী কায়দা এই পশ্চাত্য টেকনিকালিটীর নিকট কিছুই নয়। আমাদের চক্ষু বুদ্ধিতে একা এই "টেকনিকালিটি" বিশাল ভারত সাম্রাজ্যে একাধিপত্য করিতেছে। "হরে দরে হাঁটু জল" ও যুদ্ধক্ষেত্রের হাঁসপাতালের D মার্কার মত অনেক বিষয় আমাদিগকে গ্রাহ্য করিয়া লইতে হইতেছে। অথচ যখন একটু বিচার করিয়া দেখি তখন বুঝি যে প্রকৃত পক্ষে উহা ঠিক নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে ঐরূপ হিসাবপত্র বিলক্ষণ প্রচলিত, এবং উহারই উপর নির্ভর করিয়া সকল বিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংসা কলের মত নিষ্পন্ন হইতেছে। উক্ত হিসাবগুলি অনেকস্থলে আপাত মধুর, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পায়া যায়, আসলে কি। একজন রাজ্যতত্ত্ববিশারদকে জিজ্ঞাসা কর,—"ভারত বাসীর আয় পূর্ব্বে কত ছিল, এখন কত?"—অমনি জবাব মজুদ—"আগে ছিল গড়ে প্রত্যেকের দশ টাকা, এখন পঞ্চাশ টাকা।" অতি উত্তম কথা, একেবারে পাঁচ গুণ আয় বৃদ্ধি, আবার সেই সঙ্গে এক পয়সায় তিনটা দেশলাই-বাক্স বিক্রয় হইতেছে, আর কি চাই? সুখের সীমা নাই, সুবিধার অন্ত নাই। কিন্তু পাঠক একটু ভাল করিয়া হিসাবটা বুঝুন, দেখিবেন উহা "হরে দরে হাঁটু জলের" অনুরূপ কিনা। পাঠক নিজে বুঝিতে না পারেন আমরা পরে বুঝাইয়া দিব। ফলে এ হিসাবের নদীতে নামিলেও ছাঁকা ডুবিবার কথা।

হিসাবটা প্রায় যে ধরণে হইয়া থাকে তাহার একটা নমুনা নিম্নে দেওয়া গেল। D মার্কা ভুল ভ্রান্তির কথা এখন থাকুক।

আগে ছিল—

৫ জন	মহারাজা—	প্রত্যেকের আয়	২	লক্ষ	—— ——	১০ লক্ষ
১০ „	রাজা—	„ „	১	„	—— ——	১০ „
২০ „	জমিদার—	„ „	৫০	হাজার	—	১০ „
৫০ „	মহাজন—	„ „	১০	„	—	৫ „
৫০ „	„	„ „	৫	„	—	২॥ „
১০০ „	বণিক—	„ „	৬	„	—	৬ „
২০০ „	চাকুরে—	„ „	৩	„	—	৬ „
১ লক্ষ „	সাধারণ প্রজা	„ „	১২	টাকা	—	১২
১ লক্ষ ৪৩৫						৬১ লক্ষ ৫০ হাজার

মোট আয় ৬১৫০০০০ টাকা ১০০৪৩৫ জনের মধ্যে ভাগ করিয়া, দেখা গেল ফি জনের পড়্‌তা ৬১৲ টাকা ৯ আনা ১০ [illegible] পাই——কড়ায় ক্রান্তিতে হিসাব ঠিক হইয়া প্রচারিত হইল—পূর্ব্বে ভারতবাসী প্রজার গড়ে অত আয় ছিল। এ হিসাবে কাহারও ভুল ধরিবার একার নাই, উহা বেদের বচন রূপে গ্রাহ্য করিতে সবাই বাধ্য, কারণ সরকার বাহাদুর বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া অনেক আপিস দপ্তর রাখিয়া বহু পরিমাণে ভদারক তাগাদার পর বিস্তর কর্ম্মচারী পণ্ডিত মাথা ঘামাইয়া উহা প্রস্তুত করিয়াছেন।

এখনকার আয়ের হিসাব গড়্‌-পড়্‌তা এইরূপ—

১০ জন	মহারাজা—	প্রত্যেকের আয়	১০ লক্ষ	—	১ কোটী
৫০ ”	”	”	” ৫ ”	—	২॥০ ”
৩০ ”	রাজা	”	” ৩ ”	—	৯০ লক্ষ
৫০ ”	”	”	” ২ ”	—	১ কোটী
১০০ ”	”	”	” ১ ”	—	১ ”
১০০ ”	জমিদার	”	” ১ ”	—	১ ”
২০০ ”	”	”	” ৫০ হাজার	—	১ ”
১০০ ”	মহাজন	”	” ১ ”	—	১ ”
২০০ ”	”	”	” ৫০ হাজার	—	১ ”
১০০ ”	সওদাগর	”	” ১ লক্ষ	—	১ ”
২০০ ”	”	”	” ৫০ হাজার	—	১ ”
১০০০ ”	চাকুরে	”	” ১০ ”	—	১ ”
১০০০০ ”	রাইয়ত	”	” ১০০ ”	—	১০ লক্ষ
৫০০০০ ”	”	”	” ৫০ ”	—	২৫ ”
১০০০০০ ”	”	”	” ২৫ ”	—	২৫ ”
১০০০০০ ”	”	”	” ১০ ”	—	১০ ”
২০০০০০ ”	”	”	” ৫ ”	—	১০ ”
১০০০০০০ ”	”	”	” ২ ”	—	২ ”
৫৬২৩৬০					১৪ কোটি ২২ লক্ষ

এই মোট ১৪২২০০০০০ টাকা ৫৬২৩৪০ জনের মধ্যে ভাগ করিলে ২৫২৸/১১[illegible] পাই পড়ে প্রত্যেক ব্যক্তির আয় বলিয়া দেখা যায়।

এখন পাঠক দেখুন, কোথায় ছিল কিঞ্চিদধিক ৭১৷/৹ বর্ত্তমান দাঁড়াইয়াছে ২৫২৲ টাকা উপর। আর কি চাই? তার উপর, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ভোগবিলাসের সামগ্রী সমূহ চূড়ান্ত সস্তা দরে পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং সুখ বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা বিলক্ষণ প্রমাণিত হইল। যুক্তি আরও আছে নানা প্রকার নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দ্বারা সাংসারিক জীবগণের বিস্তর সুবিধা গত বৎসরে হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিজ্ঞানের সাহায্যে সংসারের ব্যবহারিক কার্য্য সমূহ সম্পাদিত হওয়াতে আপামর সাধারণের সুখ বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার কারণ কি? কল কারখানার দৌলতে যখন ভোগবিলাসের সামগ্রীগুলি স্বল্প মূল্যে পাওয়া যাইতেছে, এবং সবাই উহা ক্রয় করিতে সমর্থ হইতেছে, তখন অসঙ্কুচিত চিত্তে কেন না বলিব যে গরিবের দুঃখ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম হইয়াছে? সুদ্ধু বেশী আয়ের দিকে দেখিবার দরকার কি? পরন্তু জিজ্ঞাসা করি দুইটী হিসাব দেখিয়া কি বুঝিতে বাকী আছে যে ভারতের দুঃখ নদীর এপার ওপারের জল কিছু কমিয়া থাকিবে, কিন্তু মাঝখানকার গভীরতা কম হওয়া দূরে থাকুক বরং বেশী হয় নাই কি? বাৎসরিক দুর্ভিক্ষ কি সাক্ষ্য দেয়? রাজা রাজড়া ঘরে ঢের ধন, সোণা, হীরা, মাণিক, মার্ব্বেল জমিয়াছে, কিন্তু দরিদ্রের অভাবের মাত্রা ত বিলক্ষণ বেশী হইয়াছে। দেশলাই ধরাইয়া সিগারেট টানিলে কি হইবে? এদিকে যে পেটে অন্ন নাই।

দৈনিক ঘটনা সংগ্রহ।

ফাল্গুন, ১৩০৭।

১লা ফাল্গুন। মাদ্রিদ নগরে প্রজা বিদ্রোহ। নব ভারতেশ্বরের অর্ডার অব দি গার্টার উপাধি ধারণ। দুর্ভিক্ষ কমিশনারের অধিবেশন অদ্য শেষ হয়। মহারাণীর স্মরণার্থ কলিকাতায় মহিলাদিগের সভা।

২রা ফাল্গুন। নূতন সম্রাট কর্ত্তৃক ইংলণ্ডের পালিয়ামেণ্ট আহূত হয়। কোলাপুরের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান খাঁ বাহাদুর মেহের জি আরপুর ওয়ালার মৃত্যু।

৩রা ফাল্গুন। সিগনর জানারেলি কর্ত্তৃক ইটালী রাজ্যের নূতন মন্ত্রী সভার গঠন। কলিকাতা ময়দানে পুষ্প প্রদর্শনী।

৪ঠা ফাল্গুন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন সার্ভিয়ার বিশ্বতন মিলানের সমাধি। ডিউক অব ওয়েষ্টমিনিষ্টারের বিবাহ।

৬ই ফাল্গুন। মান্দ্রাজ নগরে তন্তুবায়দিগের ধর্ম্মঘট। মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ের স্মরণার্থ মান্দ্রাজ নগরে সভা। মৃত ভারতেশ্বরীর স্মরণার্থ বোম্বাই নগরে স্ত্রীলোকদিগের সভা।

৭ই ফাল্গুন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়েয় কনভোকেশন।

৮ই ফাল্গুন। মিসেস্ আনিবেশান্তার কলিকাতায় আগমন।

৯ই ফাল্গুন। সিমলা প্রদেশে তুষার পাত। কাশিম বাজারের বড় রাজ পুত্রের বিবাহ।

১০ই ফাল্গুন। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন।

১১ই ফাল্গুন। ইংলণ্ডের সম্রাট জর্ম্মন দেশে যাইবার জন্য যাত্রা করেন।

১২ই ফাল্গুন। কাপ্তেন মালসোয়ার্থ কত্তৃক একটী নূতন তারার আবিষ্কার।

১৩ই ফাল্গুন। কলিকাতা নগরে মহাদেব গোবিন্দ রানাড়ের স্মরনার্থ সভা হয়।

১৪ই ফাল্গুন। বেঙ্গল চেম্বার্সের বাৎসরিক সভার অধিবেশন। চায়নার সিয়াচিং এবং সুসেনের প্রাণদণ্ড। ভারতেশ্বরীর স্মৃতি স্থাপক সভার অধিবেশন।

১৫ই ফাল্গুন। ডিউক অব কনট "গ্রাণ্ড মাষ্টার অব দি বাত" উপাধিতে ভূষিত হয়েন। অষ্ট্রীয়াতে রিফস্রাথে জর্ম্মন ও জেকসের বিবাদ হয়।

১৭ই ফাল্গুন। আদমসুমারীর কার্য্য। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় আনন্দ চারলু কর্ত্তৃক দেবোত্তর আইনের পাণ্ডুলিপির প্রত্যাহার।

১৮ ই ফাল্গুন। মার্সেলিস নগরে জাহাজের কুলিদিগের (Dockers) ধর্ম্মঘট

১৯শে ফাল্গুন। নবসম্রাটের জর্ম্মন দেশ হইতে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন।

২০শে ফাল্গুন। পেনেল সাহেবের সসপেনসন।

২১শে ফাল্গুন। লেডি উডবরণের কন্যা সহিত ইংলণ্ডে গমন। নেপালের

মন্ত্রী বীর সমসের সিং রাণা বাহাদুরের এবং খোরাসানের শাসন কর্ত্তা বুকুদ্দোলার মৃত্যু আলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন। পার্লিয়ামেণ্টের নয় জন সভ্যের সমর বিভাগের শাসন ব্যয়ে ভোট না দেওয়ায় সসপেনসন।

২২শে ফাল্গুন। বুন্দির মহারাজার কলিকাতায় আগমন।

২৩শে ফাল্গুন বোম্বাই চেম্বার্স অব কমার্সের সাম্বাৎসারিক অধিবেশন। আলাহাবাদে বিষম ঝড় বৃষ্টি।

২০শে ফাল্গুন। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হয়; কুলি আইন ও ফরেষ্ট আইন লিপিবদ্ধ হয়। ছিপনির ধর্ম্মযাজক এ, এফ, উইনিংটনিংগ্রাম লণ্ডন নগরের ধর্ম্মযাজক (Bishop) হন।

২৮শে ফাল্গুন। "ইণ্ডিয়া সণ্ডে স্কুল ইউনিয়নের" সাম্বাৎসরিক সভা।

২৯শে। লর্ড ওয়েনলক প্রিভি কাউনসিলের মেম্বর হন। টিয়ানসিং নগরে ইংরাজ ও রুসিয়ার মানচুরিয়া লইয়া বিবাদের সূত্রপাত। আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট বেনজামিন হারিসন এল এল, ডি মহাশয়ের মৃত্যু।

সূচি।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
আমাদিগের সাহিত্য	৪৯
রহস্য	৫৭
ফরাসিবিপ্লব	৬০
বিবিধ	৬৭
সীতা (নাটক)	৬৯
খোকার উদ্দেশে	৭৮
রাজসিংহ (সমালোচন)	৭৯
মাসকাবার	৮১
আমার ডেপুটী জীবন (গল্প)	৮৬
হরে দরে হাঁটুজল	৯৮
দৈনিক ঘটনা সংগ্রহ	১০২

এই সংখ্যাতে এক ফর্ম্মা অর্থাৎ ৮ পৃষ্ঠা অতিরিক্ত দেওয়া হইল।

---

২৬ নং স্কটস্ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে, সান্যাল এণ্ড কোম্পানির দ্বারা মুদ্রিত ও
১৩ নং চন্দ্রনাথ চাটার্জ্জির ষ্ট্রিট, ভবানীপুর হইতে শ্রীরণেন্দ্রলাল রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

নবপ্রভা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

১ম খণ্ড। { কলিকাতা, বৈশাখ, ১৩০৮ সাল। } ৩য় সংখ্যা।

"দেশে" ;—পিতৃভবনে ;—প্রবাসে।

"*Home*—I can not but think it an evil sign of a people when their houses are built to last for one generation only. There is a Sanctity in a good man's house which cannot be renewed in every tenement that rises on its ruins ; and I believe that good men would generally feel this, and having spent their lives happily and honourably, they would be grieved at the close of them to think that the place of their earthly abode which had seen, and seemed almost to sympathize in, all their honour, their gladness or their suffering, —that this,—with all the record it bare of them, and all of material things that they had loved and ruled over, and set the stamp of themselves upon—was to be swept away, as soon as there was room made for them in the grave ; that no respect was to be shewn to it, no affection felt for it, no good to be drawn from it by their children ; that though there was a monument in the church that there was no monument in the hearth and house to them ; that all that they ever treasured was despised, and the places that had sheltered and comforted them, were dragged down to the dust."

—***Ruskin's Seven Lamps of Architecture.***

ভাই পাঠক ;—ভগ্নী পাঠিকা ;—তুমি তোমার "দেশে" বাস করিতেছ, কি "দেশ" ছাড়িয়া অন্যস্থানে "বসোবাস" করিতেছ, জানি না। তবে এটা ধ্রুব সত্য যে অনেকে অস্বাস্থ্যনিবন্ধন, কিম্বা কর্ম্মোপলক্ষে, বা ব্যবসার টানে, বা অন্নসংস্থানের তাড়নে বা উদ্দেশ্যে, "দেশ",—জন্মস্থান,—পিতৃভবন পরিত্যাগ করিয়াছেন। তবে, কেহ হয়তো স্বাস্থ্যলাভ মানসে বা কর্ম্মোপলক্ষে বিদেশে বাস করিয়াও,—"দেশের" সহিত, জন্মস্থান পিতৃভবনের সহিত সংস্রবশূন্য নহেন ; আর কেহ বা বিদেশে থাকিয়া, "দেশের" কথা, "পৈত্রিকভিটে"র কথা, জন্মস্থান—পিতৃভবনের কথা, "দেশে"র সহস্র-সুখ-স্মৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।—আজকাল, একটা কথা "হামেসা" শোনা যায় যে "দেশে আর যাওয়ার যো নাই ; যে দুর্দ্দান্ত ম্যালেরিয়া ; গেলেই পেটে পিলে, কম্পজ্বর, বমি, গাত্রদাহ ;—একমাস "দেশে" কাটালে, তার ফল ছ মাস ভুগিতে হয় ; ইত্যাদি ইত্যাদি" যাঁহারা কলিকাতায় থাকেন, তাঁহারা হয়তো বলিয়া উঠিবেন—"দেশে" পানীয় জলের অভাব,—চাকর চাকরাণী মেলে না ; "দেশের লোকগুলা নিতান্ত "পাড়াগেঁয়ে" ও "দেহাতী" ; "দেশে" মনটেঁকা একেবারে অসম্ভব ; আনন্দ নাই, সভা নাই, বক্তৃতা নাই, রাজনৈতিক আন্দোলন নাই,—থিয়েটার নাই, সর্কস্ নাই, রেস্ (race) নাই ; হ্যারিসনরোডের দক্ষিণে হাওয়া ও ইলেক্ট্রিক্ লাইট্ নাই ;—সুতরাং "দেশে" দু-চার-দিনও কাটান একটা বিষম সমস্যা বলিয়া বোধ হয়"। আর যাঁহারা "পশ্চিমে" "বিহারে" বা "উত্তর পশ্চিমে" বিহার করিয়া, "ছাতুখোর"দের সহবাসে, "আধ্-বাঙ্গালী পোন্-খোট্টা" হইয়া দাঁড়াইয়াছেন,—যাঁহারা বাঙ্গালী হইয়াও "শিশির বা নীহার পড়েছে" এই কথাটী বুঝাইতে হইলে "ওষ্ (নীহার) গিরেছে (পড়িয়াছে)" বলিয়া থাকেন, যাঁহারা "মুজ্‌রা-মকিলে"র "তবলার টিনি টিনি ও সারঙ্গের কোঁয়া কোঁয়া"র সহিত বাইজীর বিভ্রম-বিলাস-আবেশ- র্ণ সঙ্গীতে এবং সঙ্কেতপূর্ণ হাবভাবে ও কুৎসিৎ হাস্য পরিহাসে, ইহজগতে সুখের চরমসীমা অনুভব করিয়া থাকেন,—যাঁহারা মামলার ব্যয় সংকুলানের জন্য "মক্কেলকে,' টাকা ধার দিয়া, মকদ্দমার আগুনে 'বেকুফ্' মক্কেলের ঘর জ্বালাইয়া, সুদের সুদ খাটাইয়া, অন্যের সর্ব্বনাশের পথ নিতান্ত সুপ্রশস্ত করিয়া, এবং নিজেদের অর্থাগমের পথ নিতান্ত সুগম ও সহজ করিয়া আপনাদিগকে বুদ্ধির বৃহস্পতি এবং বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করিয়া

থাকেন, তাঁহারা তো অনেক দিন হতে "দেশের" সর্ব্বপ্রকার সংস্রব ও সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

জানি না, প্রবাসী ভাই, প্রোষিতা ভগ্নী, তুমি "দেশ" ছাড়িয়া সুখী হইয়াছ কি না। তবে, এটী প্রকৃত কথা যে কোন কোন ব্যক্তি,—হইতে পারে, দশের ভিতর একজন,—ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও,—গ্রহের ফেরে, —চক্ষুর জলে অভিষিক্ত হইয়া,—নিতান্ত অবসন্ন হৃদয়ে, বিষণ্ণ মনে, "দেশ" ছাড়িয়াছেন। তাঁহারা বিদেশে আসিয়া, "দেশের" ভাইবন্ধুর বিষয়, পিতৃ-ভবনের সহস্র সুখের কথা, জন্মস্থানের স্নেহপূর্ণ গৌরবের কথা ভাবিয়া,—কত সময়ই না, নীরব-নিস্তব্ধ-পবিত্র-প্রভাতে, ম্লান-রক্তিম-সন্ধ্যাগমে, শান্ত দ্বিপ্রহর-নিশীথে,—অলক্ষ্যে, মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া থাকেন।—বাঙ্গালীর পক্ষে, পূর্ব্বে, "দেশছাড়াটা" নিতান্ত সোজা, সহজ ছিল না; আজকাল অনেকটা হইয়াছে।—ভাই, "নীলদর্পণ" নিশ্চয়ই পড়িয়াছ এবং তাহার অনেক কথা সম্ভবতঃ মনে আছে।—আর, যদি "নীলদর্পণের" অভিনয় দেখিয়া থাক, আজ কালকার অভিনয় নহে—সেই সেকালকার অভিনয়, যখন রঙ্গমন্দিরের অতুলনীয় অধিনায়ক অর্দ্ধেন্দু মুস্তফী, কেবলমাত্র তাঁহার পুরুষ-অভিনেতৃবর্গের সাহায্যে "নালদর্পণ" অভিনয় ব্যাপারে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া, দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দের মনে একটী মহান্ বিশাল শোক ও ক্রন্দনের উচ্ছ্বাস প্রবোধিত করিতে সক্ষম হইতেন;—তাই, বলিতেছিলাম যদি অর্দ্ধেন্দু-মুস্তফী পরিচালিত "নীলদর্পণ" অভিনয় দেখিয়া থাক, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, "দেশ ছাড়া কি মুখের কথা"—গোলক বসুর ৫০ বিঘা "ধানি জমী" নীলদাগে চিহ্নিত হইল, পুকু-রের পাড়ে বলপূর্ব্বক নীলবপনের চেষ্টায় সক্রোধ প্রতিবাদে গোলক বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র গ্রন্থনায়ক নবীনমাধব নীলকর কর্ত্তৃক আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, মিথ্যা মকদ্দমায় জেলে প্রেরিত হইয়া গোলক বসুর উদ্বন্ধনে মৃত্যু সংঘটিত হইল—গোলক বসু, নবীনমাধব, বিন্দুমাধব নীলকর কর্ত্তৃক শত প্রকার অত্যাচার অপমানে লাঞ্ছিত হইয়াও "দেশ" ত্যাগ করিতে পারিলেন না। সমৃদ্ধ কায়স্থ পরিবার নীলোপদ্রবে ধনে প্রাণে মারা গেলেন—তথাপি দেশের মায়া পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। সেই "শ্যামচাঁদ" "রামকান্ত" প্রপীড়িত "দেশে" থাকিয়া গোলক বসুর ধনে প্রাণে ধ্বংসটা ভাল হইল, কিম্বা "দেশ"

ছাড়িয়া পলায়নটা সুবুদ্ধি সুবিবেচকের কাজ হইত, এই তর্কের মীমাংসা ও নির্দ্ধারণ করাটা, কোন কোন পাঠকের নিকট কিছু গোলমেলে ও কঠিন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, তবে এটা নিতান্ত সত্য যে গোলক বসুর ও তৎপুত্রগণের দেশানুরাগ ও দেশহিতৈষিতার চরণে আত্ম-বলিদানে "নীল-দর্পণের" জন্ম ও পরিণতি। মহানুভব অতীব কোমলহৃদয় পরদুঃখকাতর, দীনবন্ধু মিত্রের গভীর সমাজজ্ঞতা ও তীব্র সহানুভূতি, "নীলদর্পণের" প্রকৃত ঘটনাবলিকে উদ্ভাসিত করিয়া অন্যের সহানুভূতি উদ্দীপিত ও আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাঁহার অদম্য দেশানুরাগে ও পরদুঃখকাতরতার ফলে, নীলোপদ্রব প্রশমিত ও তিরোহিত হইল।—আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই, নিজের ক্ষুদ্র দুঃখটুকু, ও নিজের অতীব ক্ষুদ্র সুখটুকু লইয়াই নিতান্ত 'বেহাতী' ও বিপন্ন। "দেশে" থাকিয়া "পাড়াগেঁয়ে" পরিণত হওয়া, পানীয় জলের অসুবিধা ভোগ করা, রাস্তাঘাটের বেবন্দবস্তের ভিতর থাকা, ম্যালেরিয়া জ্বরে উপর্য্যুপরি আক্রান্ত হওয়া অপেক্ষা, "দেশে", অযত্নরক্ষিত পিতৃভবন, ক্লিষ্ট-পীড়িত রুগ্ন ভাই-ভগ্নী স্বজন-বান্ধব পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া কন্‌গ্রেস্‌ ও কন্‌ফারেন্স সুদনসমরের ব্যয়, লেজিস্‌লেটিভ কাউন্‌সেলের প্রসার ও বিস্তৃতি বিষয় আন্দোলন ও লম্বা বক্তৃতা এবং "সবজান্তা" সম্পাদক হইয়া একজনের সর্ব্বনাশ ও অপরের পৌষমাস বিধান করা, ইহার কুৎসা উহার নিন্দা-বাদ,—অভাবপক্ষে, অন্ততঃ কলিকাতার বাসে "পাড়াগেঁয়ে" নামটা ঘুচান, নিতান্ত অনায়াসসাধ্য ও সুবিধাজনক সন্দেহ নাই।—যে স্থানে জন্ম হইয়াছে, যেখানে শৈশব যৌবন অতিবাহিত করিয়াছি, যেখানে পিতামাতার স্নেহ, ভাই ভগিনীর ভালবাসায় বাড়িয়াছি—যে দেবমন্দির পিতৃভবনের প্রতি কক্ষে, প্রতি প্রকোষ্ঠে, আবাসগৃহের প্রত্যেক বৃক্ষে—তরঙ্গায়িত মাধবীলতার আন্দোলনে যৌবনভার বিনম্রা, ঝাউ গাছবেষ্টিতা মধুমালতীর সুমিষ্ট প্রকম্পনে প্রস্ফুটিত কুসুমমণ্ডিত সুমোহন বকুলের সুঘ্রাণ পূর্ণ স্পন্দনে, সেগুণ গাছের সুগম্ভীর সস্নেহ-সৌহার্দ্দ-সুদৃঢ় বীথিকায়, দেবোপম পিতামাতার স্নেহ, সুচিন্তা পবিত্র হৃদয়, ধর্ম্মভাব, ভাই ভগিনীর প্রাণারাম ভালবাসা, বন্ধুবর্গের প্রীতি, বিজ-ড়িত ও স্ফুরিত;—যে এবম্প্রকার দেশ ও পিতৃভবন ভুলিতে পারে, তাহা দ্বারা জগতের কোন ভাল, মহৎ কাজ হওয়া একেবারে অসম্ভব।—তাই আজ

দেখি কি ?—দেখি—দেশ জন্মস্থান পিতৃভবনের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, অনুরাগের অভাবে, জীবনহীন রাজনৈতিক আন্দোলনে, সহানুভূতি শূন্য সম্পাদকতায়, নীরস শুষ্ক রচনায়, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, নিতান্ত সীমাবদ্ধ, স্বার্থ-কলুষিত আশা ও উদ্বেগ ও আকাঙ্ক্ষা নিঃশেষিত হইতেছে ; তাই দেখি, যে "প্রবাসী" আজ "উদাসী" হইয়া পশুর উপযোগী জীবিকা আহরণের যোগাড় ও বন্দোবস্তে ব্যস্ত ও আকুল হইয়া ফিরিতেছে।—তাই, এত দিনে দেশের শত দুঃখ সহস্র অভাব সত্ত্বেও, সহানুভূতির অভাবে, স্নেহশূন্যতা প্রযুক্ত, "নীলদর্পণের" বা "দেবীচৌধুরাণীর" বা "আনন্দমঠের" মতন আর একখানি পুস্তক কিম্বা "Song of the Shirt," "Bridge of sighs" "Father return home" বা "বন্দে মাতরং"এর মতন আর একটী গান বা কবিতা বাহির হইল না। তাই, আজ কত পুস্তক রচিত হইল ; কিন্তু কয়খানিতে, গ্রন্থকার অন্যের অবস্থায় নিজেকে পরিস্থাপিত করিয়া অন্যের সুখ আপনার সুখ, অন্যের দুঃখ আপনার দুঃখ মনে করিয়া, পরকে প্রীতিদানে ও নিজে স্নেহ ভালবাসা প্রতিগ্রহণে অশ্রু-পরিপ্লুত হইয়া, সৌন্দর্য্য সৃষ্টি বা সহানুভূতি উদ্দীপনা, করিতে পারিয়াছেন। যে নিজের "দেশ," জন্মস্থান, পিতৃভবন ভাইভগিনী ভুলিতে পারিয়াছে, তাহার দ্বারা দেশেরই বা কি উপকার হইবে, সাহিত্যই বা কি প্রকারে পরিপুষ্ট হইবে, তাহা দ্বারা সৌন্দর্য্য সৃষ্টিই বা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে। দেশের কোন খোঁজ খবর রাখি না, সেখানকার আপামর সাধারণ লোক কি খায়, খেতে পায় কি না খোজ রাখি না, কেমন থাকে কি ভাবে বা চিন্তা করে জানি না ; ধর্ম্মের বিভিন্নতায় বা অমিলে, কুসংস্কারের সংস্পর্শের ভয়ে, বা ম্যালেরিয়ার ভীষণ প্রকোপে, দেশ, ভাই ভগিনী—পরিত্যাগ করিয়াছি। যাহা কিছু 'পৈত্রিক' সব ছাড়িয়া, নিজের 'পৈত্রিক' প্রাণটার উপরই যত কিছু মায়া মমতা দাঁড়াইয়াছে, তখন আমাদের আর আশা কোথায়।

"দেশের" গাছটা রাস্তাটা আকাশ, পাখীগুলি, "দেশের" মেঘ, "দেশের" বাতাস, "দেশের" কৃষককে যদি নিজের আপনার স্বকীয় সামগ্রী ভাবিতে না পারিলাম, ঐ সকল ছাড়িয়া আসিয়া উহাদিগের স্মৃতি যদি প্রবাসে থাকিয়াও হৃদয়কে প্রকম্পিত করিতে না পারিল, সুদূরস্থিত পিতা মাতা ভাই ভগিনী বন্ধু

বান্ধবের কথা লইয়া যদি সুখ উপভোগ না করিলাম, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে জীবনটা নিতান্ত নীরস সুখহীন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে। যাহার অতীতের ভিত্তি নাই, তাহার ভবিষ্যতের অবলম্বন কোথায়। স্বদেশহিতৈষী পরদুঃখকাতর মহামতি পরম শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় মনমোহন ঘোষ বন্ধুবর্গের নিকট বলিতেন যে "কোন একটা বাঙ্গলা দেশের সংবাদপত্র পাইলেই আগে দেখি—উহাতে কৃষ্ণনগরের কথা আছে কি না,—সংবাদ দাতার স্তম্ভে—"কৃষ্ণনগর" এই কয়টী অক্ষর চক্ষে পড়িলেই আমার মন ঔৎসুক্যে বিচলিত হইয়া যায়"। কলিকাতার চাকচিক্যে "দেশের" কথা, পিতৃভবনের কথা ভুলেন নাই। যেখানে শৈশবে, যৌবনে, বাপ মার আদর স্নেহে ভাই ভগিনীর ভালবাসায় লালিত পালিত হইয়াছিলেন, সেই পিতৃভবনের উপর মনমোহন বাবুর ঐকান্তিক অনুরাগ ও আসক্তি ছিল। অবসর পাইলেই, প্রায় প্রতি শনিবারে কৃষ্ণনগরে আসিতেন। "দেশের" লোককে ভালবাসিয়াছিলেন বলিয়া "দেশে"—পিতৃ-ভবনে, মাতৃ সমীপে, শৈশবের বন্ধুবান্ধবগণ পরিবৃত হইয়া জীবনের শেষলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন। তিনি বিলাতফেরৎ কায়স্থ হইলেও, তাঁহার মৃতপূতদেহ বিশিষ্ট নিষ্ঠাবান সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণসন্তান স্পর্শ বা উত্তোলন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। তাই এখনও দেখিতে পাই, বাগ্মীপ্রবর লালমোহন বাবু কৃষ্ণনগর বা ঢাকার কোন লোকের বিপদ হইলে, সমস্ত কাজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, সেই বিপন্নলোকের সাহায্যে বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়ান।

তাই বলি এস, আমরা বেহার বা উড়িষ্যায় পঞ্জাব বা গঞ্জামে—যেখানেই থাকি না কেন "দেশের" পিতৃভবনের কথা যেন না ভুলি।—নানান কারণে, বিদেশে থাকিতেই হইবে। বিদেশে দূরে থাকিয়াও, যাহাতে নিজের "দেশের" জন্মস্থানের হিত হয় তাহারও চেষ্টা করিতে হইবে। কলিকাতায় প্লেগ, বসন্ত, বিসূচিকা ; পশ্চিমেও তাহাই। সুতরাং সময় সময় ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক "দেশে" যাইতেই হইবে ; বিবাহোৎসবে ছেলেপিলেদের দেশে পাঠাইতেও হইবে। তাই বলি, নিজের যদি পুকুর থাকে তাহার সংস্কার কর, পিতৃভবনের মেরামত ও উন্নতি কর, পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত কর, পুষ্করিণীর পাড়ে নর্টন টিউব ওয়েল (Norton Tube Well) খনন কর, নিজের গ্রামে নগরে শিক্ষার সুবিস্তারের উপায় চিন্তা কর।—যদি বিদেশে থাকিয়া, দেশের উন্নতি

কল্পে চিন্তা করিতে অভ্যস্ত হও, তাহা হইলে প্রবাসে থাকিয়া বিদেশের হিতসাধনে মন আকর্ষিত হইবে।

প্রবাসে, বহুকাল, কর্ম্মোপলক্ষে, ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক বাস করিতে হইয়াছে। কিন্তু জীবনের এই প্রধান আশা, কল্পনায়—এই প্রধান সুখ যে ভগবানের অনুগ্রহ ও অনুকম্পায়, "দেশে" গিয়া অন্ততঃ জীবনের শেষ ভাগ-টায় ছেলে পিলেদের লইয়া "দেশের" লোকদিগকে সুখী করিতে পারিব। অন্তিম সময় যখন উপস্থিত হইবে, ভগবানের নিকট এই কাতর প্রার্থনা যেন সেই "পিতৃভবনে" অবশিষ্ট জীবনের শেষ যবনিকার পতন হয়। যেন, সেই নবদ্বীপের রাস্তা দিয়া,—যে রাস্তায় প্রত্যুষে প্রদোষে জ্যোৎস্নায় কত সুখপূর্ণ স্বপ্নময় কল্পনা লইয়া বেড়াইতাম, সেই রাস্তা দিয়া পুণ্যশ্লোক জাহ্নবীজীবন গঙ্গাবক্ষে নীত হই। ছেলে সঙ্গে যাবে, ভাই বন্ধু ভাইপোরা সঙ্গে যাবে।—বড় আশা, শেষ দিনের বড় সুখ, যে একবার, বিদেশস্থ বন্ধুগণের অনুগ্রহ স্নেহ, অনুরাগ, সজল নয়নে, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে, স্মরণ করিয়া "দেশের" পরিবারবর্গের নিকট শেষ বিদায় লইয়া দূরস্থ নিকটস্থ সকলের নিকট কাতরভাবে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া ভগবানের মঙ্গলময় শান্তিময় সান্নিধ্যে উপনীত হইব। আমাদিগের অবর্ত্তমানে, ছেলে মেয়েরা, তাহাদের পিতামহের—"দাদামহাশয়ের" দেবমন্দির আলোকিত করিবে। আবার মাধবীলতা ঘাড় নাড়িয়া দুলিবে, মধুমালতী আবার ঝাউগাছ বেষ্টন করিয়া শুভ্রকুসুমে গন্ধ বিতরণ করিবে, আর সেই সেগুণগাছের পার্শ্বে ছেলে মেয়েরা আগেকার মত বেড়াইবে, এবং ঝাউগাছ, পূর্ব্বেকার মত শোঁ শোঁ করিয়া সকরুণ মধুর স্বরে গান গাইবে।

শ্রীহরেন্দ্রলাল রায়।

সনাতন ধর্ম্ম ও কালী।

জগতের লোক বহুদিন বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছে, হিন্দুর দেবতা ৩৩ কোটী, হিন্দু পৌত্তলিক, হিন্দু বহ্বীশ্বর, হিন্দু ধর্ম্মের আদি মধ্যান্ত নির্ণয় করা সুকঠিন। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে, ৩৩ কোটী দেবতার আবির্ভাবই হিন্দু

ধর্ম্মের অপৌত্তলিকতা, একেশ্বর বাদিতা ও পরমার্থ-পরায়ণতার এক ও অক্ষুণ্ণ প্রমাণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

ঈশ্বর কি পদার্থ তাহা কেহ জানেনা, তাঁহার কি রূপ তাহা কেহ দেখে নাই; অনুমান ও কল্পনা দ্বারা তাঁহার স্বরূপ অবগত হইতে হইবে। এখন পাঁচজন স্বতন্ত্র ভাবে ঈশ্বর চিন্তা করিতে বসিলে, সেই দুর্জ্ঞেয় ঐশ পদার্থ যে পাঁচজনের নিকট পাঁচ প্রকারে প্রতিভাত হইবেন ইহার বিচিত্র কি? অতএব যে দেশে ৩৩ কোটী লোকের বাস, সে দেশের লোকেরা যে ৩৩ কোটী ভাবে ঈশ্বরকে দেখিবে, ঈশ্বরের ৩৩ কোটী রূপ যে তাঁহাদের হৃদয় মন্দিরে জাগরিত হইবে, ইহাও কোন ক্রমে অসম্ভাবিত নহে। ঈশ্বর সম্বন্ধে জাতীয় চিন্তার স্রোতঃ চির দিন অপ্রতিহত থাকায় হিন্দু ধর্ম্মে অসংখ্য অসংখ্য দেব দেবীর উদ্ভব হইয়াছে।

অন্যান্য ধর্ম্মে যেমন বলে, ঈশ্বর এই, এবং ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহেন; খ্রীষ্ট যেমন বলেন, ঈশ্বর এই, স্বর্গ এই, মুক্তি এই, পন্থা এই, ইহা ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা, সনাতন ধর্ম্ম তেমন কিছু বলিতে পারেন না। একে ঈশ্বর অনন্ত ও অসীম পদার্থ, তাহাতে আবার জীব ও জীবের প্রকৃতিও অনন্ত নামে অভিহিত হইতে পারে। এখন এক অনন্ত আর এক অনন্তের দিকে অগ্রসর হইতে কি কেবল একটী মাত্র পথ বিদ্যমান? সনাতন ধর্ম্ম এই প্রকার সঙ্কীর্ণ বাদের পক্ষপাতী নহেন। মুক্তির অনন্ত পন্থা বিদ্যমান, প্রত্যেক পথেই আবার সমাধি অনুসারে ক্রমোচ্চ পদের ব্যবস্থা রহিয়াছে। সুতরাং নিশ্চিত বাদের যে সকল সৌন্দর্য্য প্রাকৃত জনের চিত্ত অপহরণ করে, সনাতন ধর্ম্ম তাহাতে অণুমাত্রও বিচলিত না হইয়া, বরং নিশ্চিত বাদে,—অনাদির আদি, অনন্তের অন্ত ও অসীমের সীমা কথনে—দারুণ প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা অনুভব করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত ছান্দোগ্য উপনিষদের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে—

প্রাচীন শাল ঔপমন্যবঃ সত্যযজ্ঞঃ পৌলুষিরিন্দ্রদ্যুম্নো ভাল্লবয়ো জনঃ শার্করাক্ষ্যো বুড়িল আশ্বতরাশ্বিস্তেহৈতে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়াঃ সমেত্য মীমাংসাঞ্চক্রুঃ কোন আত্মা কিং ব্রহ্মেতি। ১।

"প্রাচীন শাল, ঔপমন্যব, সত্যযজ্ঞ, পৌলুষি, ইন্দ্রদ্যুম্ন, ভাল্লবয়, জন, বুড়িল, আশ্বতরাশ্বি; ইঁহারা সম্পত্তিশালী এবং পরম বেদবিৎ; সকলে এই মীমাংসার্থে সমবেত হইলেন, আমাদিগের আত্মাই বা কি, এবং ব্রহ্মই বা কি?

তে হ সম্পাদয়াঞ্চক্রুরুদ্দালকো বৈ ভগবন্তোঽয়মারুণিঃ সম্প্রতীমমাত্মানং বৈশ্বানরমধ্যেতি তং হন্তাভ্যাগচ্ছামেতি তং হাভ্যাজগ্মুঃ। ২।

তাঁহারা স্থির করিলেন, হে পূজার্হ ব্যক্তিগণ! অরুণ নন্দন উদ্দালক সম্প্রতি বৈশ্বানর আত্মাকে অবগত হইয়াছেন। আমরা তাঁহারই নিকট গমন করি, এই বলিয়া সকলে তৎ সমীপে গমন করিলেন।

স হ সম্পাদয়াঞ্চকার প্রক্ষ্যন্তি মামিমে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়া স্তেভ্যো ন সর্ব্বমিব প্রতিপৎস্যে হন্তাহমন্যমভ্যনুশাসানীতি। ৩।

তিনি বুঝিতে পারিলেন, এই সকল পরম বেদবিৎ সম্পন্ন লোক আমার নিকট জিজ্ঞাসু হইবেন, হায়! আমি সমস্ত কথা প্রতিপন্ন করিতে পারিব না, অতএব ইঁহাদিগকে অন্য গুরুর কথা বলিয়া দিই।

তান্ হোবাচাশ্বপতির্বৈ ভগবন্তোঽয়ং কৈকেয়ঃ সম্প্রতীমমাত্মানাং বৈশ্বানরমধ্যেতি তং হন্তাভ্যাগচ্ছামেতি তং হাভ্যাজগ্মুঃ। ৪।

তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন হে পূজার্হ ব্যক্তিগণ! কেকয়ের পুত্র অশ্বপতি সম্প্রতি বৈশ্বানর আত্মাকে জানিয়াছেন। অনন্তর 'তাঁহারই নিকটে যাই' বলিয়া সকলে তৎসমীপে গমন করিলেন।

তেভ্যো হ প্রাপ্তেভ্যঃ পৃথগর্হাণি কারয়াঞ্চকার স হ প্রাতঃ সঞ্জিহান উবাচ ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্য্যো ন মদ্যপো নানাহিতাগ্নির্নাবিদ্বান্ন স্বৈরী স্বৈরিণী কুতো যক্ষ্যমাণোবৈ ভগবন্তোঽহমস্মি যাবদেকৈকস্মা ঋত্বিজে ধনং দাস্যামি তাবদ্ভগবদ্ভ্যো দাস্যামি বসন্তু ভগবন্ত ইতি। ৫।

অশ্বপতি তাঁহাদিগকে পাইয়া প্রত্যেকের অভ্যর্থনা করিলেন, তিনি প্রাতঃকালে বিনীত ভাবে কহিলেন, আমার জনপদে চোর নাই, অদাতা নাই, মদ্যপায়ী নাই, অনাহিতাগ্নি নাই, অবিদ্বান্ নাই, পরস্ত্রী-গন্তা কেহই নাই, সুতরাং দুষ্টচারিণী কোথায়? আমার অর্থ সঞ্চয় হইয়াছে। আমি এক এক করিয়া ঋত্বিক্‌দিগকে যে ধন দান করিতাম, তাহা আপনাদিগকেই দান করিব, আপনারা অবস্থান করুন।

তে হোচুর্যেন হৈবার্থেন পুরুষশ্চরেত্তং হৈব বদেদাত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধ্যেষি তমেব নোব্রূহীতি। ৬।

তাঁহারা বলিলেন, যে ব্যক্তি যে নিমিত্ত আইসে, তাহাকে তাহাই বলিতে

হয়। সম্প্রতি আপনিই বৈশ্বানর আত্মাকে জানিয়াছেন, আমাদিগকে তাহাই বলুন।

তান্ হোবাচ প্রাতর্বঃ প্রতিবক্তাস্মীতি তে হ সমিৎপাণয়ঃ পূর্ব্বাহ্নে প্রতিচক্রমিরে তান্ হানুপনীয়ৈবৈতদুবাচ। ৭।

রাজা বলিলেন, "প্রাতঃকালে আপনাদিগকে প্রত্যুত্তর দান করিব।" পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহারা সমিৎ হস্তে উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহাদিগকে প্রণাম না করিয়াই বলিতে লাগিলেন।

ঔপমন্যব কং ত্বমাত্মানমুপাস্সে ইতি দিবমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈসুতেজা বৈশ্বানরোঽয়ং ত্বমাত্মানমুপাস্সে তস্মাত্তব সুতং প্রসুতং কুলে দৃশ্যতে। ১

হে ঔপমন্যব! তুমি কোন আত্মার উপাসনা কর। 'হে ভগবন্! হে রাজন্! আমি দ্যুলোকরূপ আত্মার উপাসনা করি।' রাজা বলিলেন, ইনিই সুতেজ নামক বৈশ্বানর আত্মা। তুমি ইঁহার উপাসক বলিয়া সোম যজ্ঞাদি দ্বারা তোমার কুল অতীব পবিত্র হইয়াছে।

অৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়ং অত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চ্চসং কুলে য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে মূর্দ্ধাত্বেষ আত্মন ইতি হোবাচ মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যদ্যন্মাং নাগমিষ্য ইতি। ২।

(রাজা আরও বলিলেন) তুমি নিজেও অন্ন পাইতেছ, পুত্রাদি দেখিতেছ। যে এই প্রকার বৈশ্বানর আত্মাকে উপাসনা করে, সে ও অন্ন পায়, পুত্রাদি দেখে এবং তাহার কুলে ব্রহ্মতেজের উদ্ভব হয়। কিন্তু হে ঔপমন্যব! তুমি কি দ্যুলোককেই সমস্ত মনে করিয়াছ? দ্যুলোক আত্মার মূর্দ্ধা মাত্র। ভাগ্যে তুমি আমার নিকটে আসিয়াছিলে, নচেৎ তোমার মূর্দ্ধাই নিপতিত হইত।"

অসীম পদার্থের সসীমবাদ বেদনিষিদ্ধ। এখন খ্রীষ্ট যদি ছান্দোগ্য উপনিষৎ জানিতেন, তাহা হইলে তিনি কখনই তাদৃশ সসীম বাদে অগ্রসর হইতেন না, অথবা তাঁহার আসন্ন মূর্দ্ধ-নিপাতের কথা অগ্রেই জানিতে পারিতেন। তথাপি সনাতন ধর্ম্ম তদীয় অবতারণার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন না। একটী বংশপত্রও ঈশ্বরের বিনা অভিপ্রায়ে স্খলিত হয় না বলিয়া যে ধর্ম্মের বিশ্বাস, সেই সনাতন ধর্ম্ম খ্রীষ্টের আবির্ভাব ও তিরোভাবের অবশ্যই কোন নিগূঢ় কারণ অনুমান করিতে পারেন। সনাতন ধর্ম্মের সসীমবাদ নাই।

ইঁহার অহঙ্কার নাই, ছলনা নাই, অনন্ত অপার মহাসমুদ্রের কূপীকরণ প্রথাও নাই। শাস্ত্রই ইঁহার প্রধান অবলম্বন। প্রাচীনতার প্রতি ইঁহার ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা। কেননা ঈশ্বর মনুষ্যকে যাহা কিছু দিবার তাহা প্রারম্ভেই দিয়াছেন, যাহা কিছু বলিবার তাহা প্রারম্ভেই বলিয়াছেন। এবং সে সকল কথা বেদাদি শাস্ত্রে আছে। এই নিমিত্ত সনাতন ধর্ম্ম, শাস্ত্রের একটী বর্ণেরও, ব্যত্যয় করিতে পারেন না। অবতারের প্রয়োজনীয়তা শাস্ত্র ব্যাখ্যার জন্য, কোন নূতন কথা বলিবার জন্য নহে; জীর্ণ সংস্কারের জন্য, কিছু ভাঙ্গিয়া গড়িবার জন্য নহে। বুদ্ধ যখন বেদোক্ত ক্রিয়া কলাপের বিরোধী হইয়াছিলেন, তখনও ইহার বৈষম্য লক্ষিত হয় নাই। কারণ বেদে ওঁ বায়ব্যাম্ শ্বেতচ্ছাগল মালভেত" (বায়ু দেবতার পূজা কালে শ্বেতবর্ণ ছাগল আহরণ করিবে), ইত্যাকার মন্ত্রের সহিত ওঁ মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি' এই মন্ত্রও বিদ্যমান ছিল। বুদ্ধ বেদের তামসিক ভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাত্বিক ভাগ গ্রহণ করিলেন। ঐ শেষোক্ত মন্ত্র হইতেই তিনি 'অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ, এই মহাবাক্যের আকর্ষণ করিলেন। 'ওঁ অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্মাস্য যাজিনঃ সুকৃতং ভবতি' ইত্যাকার মন্ত্র হইতে কঠোর জীবনের ব্যবস্থা করিলেন। ফলতঃ যে সকল লোক সাত্বিক সাধনার যোগ্য হইয়াও কুলক্রমাগত রীত্য-নুসারে তামসিক সাধনাতেই লিপ্ত ছিল তিনি তাহাদিগকে উদ্বোধিত করিলেন মাত্র, কোন নূতন কথা বলিলেন না।

আবার যে সময়ে বৌদ্ধদিগের আত্যন্তিক প্রশ্রয় নিবারণের জন্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অবতীর্ণ হইলেন, তখন না জানি ভারতে কি লোমহর্ষণ ব্যাপারই উপস্থিত হইল। কিন্তু বাস্তবিক কিছুই নহে, তিনি বৌদ্ধদিগকে সস্নেহ সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, দেখ তোমরা সন্দেহ করিও না। আমিও বৌদ্ধ; বুদ্ধ যাহা বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, আমি ও

কতি নাম সুতা ন লালিতাঃ।
কতি বা নেহ বধূরভুঞ্জিহি॥
ক নু তে ক চ তা ক বা বয়ং।
ভবসঙ্গঃ খলু পান্থসঙ্গমঃ॥

সেই বাক্য বলিতে বলিতেই জননীর নিকট বিদায় লইয়াছি। আমি প্রাচীন মত খণ্ডন করিতে আসি নাই। তোমরা প্রাচীনদিগের মুখে যে কর্ম্ম ফলের

কথা শুনিয়াছ, আমিও তদপেক্ষা কোন মহত্তর তত্ত্ব অবগত নহি। তবে আমি সমগ্র বেদশাস্ত্র আলোড়ন করিয়া দেখিলাম যে, কর্ম্মফল অনন্ত ভোগের সামগ্রী নহে, তাহাকে জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিতে পারা যায়। অতএব যে যেমন কর্ম্ম করিয়াছ, সে তেমন ফল ভোগ করিতেছ, বলিয়া কখনও নিরস্ত থাকিও না, ব্রহ্মবিদ্যার্থী হও, কেননা ব্রহ্মবিদ্যা মাত্রেই তোমাদের ভোগের অবসান হইবে, তোমরা বিমল আনন্দ উপভোগ করিবে; তোমরা জীবন্মুক্ত হইতে পারিবে। এক কথায় জাতির মন ফিরিল। শঙ্করের শিষ্যদিগকে এক হস্তে অসি ও এক হস্তে কোরাণ লইয়া বাহির হইতে হইল না, সত্য নিজ বলেই মনুষ্যের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। নিরীশ্বর বৌদ্ধেরা পুনরায় ব্রহ্মপথের পথিক হইয়া দাঁড়াইল।

সনাতন ধর্ম্ম বলেন, ঈশ্বর আছেন এ কথা শপথ করিয়া বলিতে পারি। কিন্তু তাঁহার এই রূপ, তিনি এই, এই ভিন্ন আর কিছুই নহেন, এরূপ নিশ্চিত বাদ করিতে পারি না। যাহা দেখি নাই, তাহা তোমাদিগকে দেখাইতে পারি না। যাহা বুঝি নাই, কেননা

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

যাঁহার নিকট হইতে আমার বাক্য ও মন ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহা তোমাদিগকে বুঝাইতেও পারি না। তোমরা যে যে প্রকারে পার ভাবিয়া লও। আমি তোমাদিগকে কতগুলি মূর্ত্তি, কতিপয় সদৃশ উপাদান, দিতেছি; তোমরা তাহা হইতে আপন আপন অভীষ্ট সাধন করিয়া লও।

সনাতন ধর্ম্ম বলিতেছেন, আর এই যে তোমাদের সাধনার্থে মূর্ত্তি সমূহ প্রদত্ত হইতেছে, তোমরা মনে করিওনা যে ইহাই সমস্ত, ঈশ্বর ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহেন। যেমন কোন শিশুকে এক হইতে শূন্য পর্য্যন্ত শিক্ষা দিয়া বলিয়া দেওয়া হয়, এই দশটী সংখ্যা হইতেই সমস্ত গণিত শাস্ত্র উৎপন্ন, কিন্তু মনে করিওনা যে এই দশটী অঙ্ক শিখিলেই গণিত শাস্ত্র সমাপ্ত হইল; সেইরূপ হে ব্রহ্ম বিদ্যার্থিন্! তুমিও এই সকল মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া সেই দুর্জ্ঞেয় ব্রহ্ম পদার্থের দিকে অগ্রসর হইতে থাক। তুমি ইহা হইতে অনেক ফল প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু সাবধান সে অমৃত নিজেই ভক্ষণ করিও, সে আনন্দ নিজেই উপভোগ করিও। তাহা কাহাকেও বলিতে যাইও না, তোমার ফলে আর কেহ ফলবান্ হইতে পারিবেনা, সকলকেই স্বতন্ত্রভাবে সাধনা করিয়া লইতে হইবে।

আর দেখ হে বিশ্বজন, তোমরা সকলে সমান নহ। বুদ্ধিশক্তি মনোবৃত্তি ও সাধনা প্রবৃত্তিতে তোমাদের মধ্যে এত প্রভেদ লক্ষিত হয় যে, বোধহয় আলো ও অন্ধকারে শৈত্য ও উত্তাপেও তাদৃশ প্রভেদ বিদ্যমান নাই। তাই তোমাদের জন্য অসংখ্য অসংখ্য দেব দেবী মূর্ত্তি অনুধ্যাত হইয়াছে। তোমরা স্ব স্ব বর্ণাশ্রম অনুসারে যে যেরূপে শান্তি লাভ কর, সে সেইরূপ ধর, সেই রূপের উপাসনা কর, অগ্রসর হইতে পারিবে, অক্ষয় ধামে পৌছিবে।

আর দেখ তোমাদিগের সমক্ষে কালী দুর্গা প্রভৃতি রূপ উপস্থাপিত করা হইতেছে বলিয়া তোমাদের স্বাধীন চিন্তায় বাধা দেওয়া হইতেছে, কদাচ এমন মনে করিওনা। তোমরা স্ব স্ব রুচি অনুসারে মৎ প্রদর্শিত রূপের পরিবর্ত্তন্ করিও। আমি দুর্গাকে অতসীপুষ্পবর্ণাভা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি, যদি প্রাতঃ সূর্য্য তোমার দৃষ্টিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আকর্ষণ করিয়া থাকে, তবে তুমি দুর্গাকে বালার্কসদৃশাননা করিয়া লইও। আমি কালীকে ঘোরা বলিয়া ধ্যান করিয়াছি, যদি নিশীথান্ধকারের সুগভীর গাম্ভীর্য্য তোমার সমধিক মনঃপূত হয়, তুমি কালীকে তাদৃশ বর্ণে চিত্রিত করিও। কিংবা যদি নিদাঘের সমুদ্যত মেঘমালা দেখিয়া তুমি কখনও স্তম্ভিত হইয়া থাক, তবে তুমি কালীকে নবীন নীরদ পরিশোভিত নভস্তল সদৃশী করিয়া দেখিও। এই পরিদৃশ্যমান জগতে যে তোমার চিত্ত আকর্ষণ করে, যাহাতে তোমার চৈতন্য হয়, হৃদয়ের প্রবুদ্ধি জন্মে, সেই তোমার পন্থা।

আর যে বলিতেছিলাম ভগবান্ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর সাধকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন :—তিনি শিশু পালিনী ষষ্ঠীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন প্রসূতির জন্য; শ্মশানবাসী, গৃহত্যাগীর জন্য; কৈলাস নাথ, গৃহস্থ সন্ন্যাসীর জন্য; দাক্ষায়ণী, পতিব্রতার জন্য; কার্ত্তিকেয় পুত্রার্থীর জন্য; লক্ষ্মী ধনার্থীর জন্য; সরস্বতী বিদ্যার্থীর জন্য; মন্মথ জনয়িতার জন্য; দুর্গা, অরিন্দমের জন্য; ভৈরব তামসিকের জন্য; ভৈরবী রাজসিকের জন্য; বিষ্ণু সাত্ত্বিকের জন্য; আর সেই দুর্জ্ঞেয় ঐশ পদার্থ কালিকা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন বিশ্বজনের জন্য।

কেননা হে মানবগণ! এই মায়ামোহাচ্ছন্ন জরামরণভয়সঙ্কুল বিশ্বসংসারে তোমরা ভগবানের আর কি মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া থাক? এই যে তোমরা ঘোর অন্ধকারে, অজ্ঞান তিমিরে, মায়া আবরণে আবৃত রহিয়াছ, ঐ দেখ ঘোরা

কালিকার ঘোরতর কলেবরে তাহাই প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু হতাশ হইও না, উহার মূলে পরম মঙ্গলময় শিব বিরাজ করিতেছেন।

এই যে তোমরা মুহুর্মুহুঃ আধিদৈবিকতাপে প্রপীড়িত হইতেছ, ঘোর ঘনঘটা বিদ্যুৎ-বজ্রাঘাত সহকারে প্রবল বাত্যা উত্থিত হইয়া নিমেষের মধ্যে অসংখ্য স্থাবর জঙ্গম সমন্বিত নগরী উৎসাদিত করিতেছে, ঐ দেখ মায়ের আলুলায়িত কেশ পাশও সেই উৎসন্ন ভাব ধারণ করিয়াছে, কিন্তু আশ্বস্ত হও, উহার মূলে পরম মঙ্গলময় শিব বিরাজ করিতেছেন।

এই যে নিদারুণ মৃত্যু আসিয়া কালে অকালে তোমাদের ভবলীলা সাঙ্গ করিতেছে, ঐ দেখ করালবদনার গলদেশে বিলম্বিত নৃমুণ্ড মালায় তাহাই প্রকাশমান কিন্তু চিন্তা নাই, উহারা সকলেই পরমমঙ্গলময় শিবসদনে উপস্থিত হইয়াছে।

এই যে নিত্য ব্রহ্মাণ্ডময় জননক্রিয়া চলিতেছে, অহর্নিশি সংসারে শত কোটী জীব প্রসূত হইতেছে, ঐ দেখ বিবসনা জননীর অনাচ্ছাদিত প্রসবাঙ্গ তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে ; কিন্তু চিন্তা নাই পরম মঙ্গলময় শিব সকলেরই উপায় বিধান করিতেছেন।

এই যে জীবগণ মাতৃস্তন আশ্রয় করিয়া সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেছে, অশীতি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিতেছে, ঐ দেখ বিশ্বময়ীর কাল কলেবরে পীনোন্নত পয়োধর পরিবেষ্টিত রুধির চক্রে তাহারই পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে, কিন্তু হতাশ হইও না, ঐ দেখ কতিপয় রুধির ধারা চক্রাবর্ত্ত পরিত্যাগ করিয়া পরম মঙ্গলময় শিবের অভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে।

এই যে তামসিকবর্গ নিদারুণ দম্ভ ও হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া মুহুর্মুহুঃ সৃষ্টি বিলোপে উদ্যত হইতেছে, দর্পে পৃথিবী টলমল, জীবরক্তে মেদিনী ভাসমানা ; ঐ দেখ তামসিকরূপিণী কৃপাণ পাণি কালিকায় সেই ভাব প্রকটিত হইয়াছে ; কিন্তু ভয় নাই উহারা প্রতিনিবৃত্ত হইবে, কেননা ঐ দেখ রুধির রঙ্গিণী কালী ধ্বংস প্রকরণে স্বামীর বক্ষে পদার্পণ করিয়া জিহ্বা দষ্ট ও সুগম্ভীর মুখমণ্ডল লজ্জাবনত করিয়াছেন, তাই চিন্তা নাই, তামসিকবর্গ অচিরে উদ্বোধিত হইবে যে উহারা কেবল পরম মঙ্গলময় শিবকেই পদদলিত করিতেছে।

এই যে সংসারে একস্থানে জরা, অপর স্থানে যৌবন ; একস্থানে মৃত্যু, অপর

স্থানে জন্ম; একদিকে লয়, অপরদিকে সৃষ্টি; একদিকে আর্ত্তনাদ, অপর দিকে জয়োল্লাস; একের সর্ব্বনাশ, অপরের সুখোচ্ছ্বাস; ঐ দেখ মায়ের শ্মশানাঙ্গার প্রতিম মলিনবদনে অট্টহাসিতে তাহারই প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে।

এই যে সংসারে ঐশ্বর্য্যের পার্শ্বে দারিদ্র্য, এই যে দিব্যবসনভূষিতা পুরনারীর পার্শ্বে ছিন্ন ও মলিনবসনে ঐ কাঙ্গালিনীর লজ্জা নিবারণ হইতেছে না, তাই বুঝি মায়ের স্বুবর্ণকিঙ্কিনী পরিশোভিত কটিতটে একখণ্ড বস্ত্রের আত্যন্তিক অভাব দৃষ্ট হইতেছে।

এই যে সংসার অন্নচিন্তায় বিব্রত, এই যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ, ভীষণ জঠর জ্বালা, শতকোটী জীবের হাহাকার, কণ্ঠাগত প্রাণ, ঐ দেখ লোলজিহ্বা কালিকার লালায়িত রসনায় তাহারই অপূর্ব্ব ছবি প্রকাশ পাইতেছে। সাধক একবার গাত্রোত্থান কর। তুমি স্বকীয় বর্ণাশ্রম অনুসারে, যাহাতে আত্মাব তৃপ্তিবোধ কর, সেই সেই উপাদানে বিশ্বময়ীর উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হও। হে তামসিকবৃন্দ! তোমরা রুধিরদানে উন্মাদিনী রণরঙ্গিণীর সান্ত্বনা কর। হে রাজসিকবৃন্দ! তোমরা মহার্ঘবস্ত্রালঙ্কারে বাদ্যোদ্যম সহকারে ত্রৈলোক্যতারিণীর আরাধনা কর। আর হে নিষ্কাম সাত্ত্বিকবৃন্দ! তোমরা অনন্তকর্ম্মা হইয়া জগতের দুঃখ বিমোচনে অগ্রসর হও।

শ্রীকেদার নাথ বিদ্যাবিনোদ।

প্লেগ বা মহামারী।১*

কুত্র মহামারী মহাকালী আবির্ভূতা,
কুত্র ঘোরা ভীমা মহামারী তিরোহিতা।

Of all the co operating causes of the plague, *uncleanliness* is the most powerful * * The satutation of the soil with

---

* সর্জ্জন মেজর কলভিল (Colvill) ডাক্তার কেবিয়াডিসি (Cabiadis), ফ্রান্সিস (Francis) ও পেন (Payne) যে সকল তত্ত্ব ও ঘটনা অবধারণ করিয়াছেন তাহা অবলম্বন করিয়া প্লেগের ১ম প্রবন্ধ লিখিত হইল। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার নিজে অনেকগুলি প্লেগ রোগীর চিকিৎসা করিয়া, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় প্লেগের ২য় প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন।

filth is perhaps the most important point. Overcrowded buildings * * greatly favour the spread of the disease. * * Of social conditions *poverty* has by far the most powerful influence on the spread and development of plague—J. F. Payne M. D.

ভারত ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছিল, হাহাকার করিতেছিল। এক্ষণে ম্যালেরিয়া জ্বরও চলিতেছে। তাহার উপর আবার প্লেগের প্রকোপ হইল। পাঠক, বোধ হয় বাল্যকালে এই প্লেগের বর্ণনা ইংলণ্ডের ইতিহাসে পড়িয়াছেন। নেপোলিয়ন যখন সিরিয়া আক্রমণ করেন তখন তাঁহার সৈন্যগণ প্লেগে আক্রান্ত হয়। বকাচিও (Boccacio) লিখিত Decameronএও প্লেগ প্রসঙ্গ পাঠ করিয়াছিলাম। প্লেগ যে ভারতে কখন স্বচক্ষে দেখিব তাহা কখন মনে করি নাই। এইবার (ভবানীপুরে) নিজের বাসার চতুর্দ্দিকে প্লেগে লোক মরিল, শোকার্ত্ত ব্যক্তির আর্ত্তনাদ, রজনীর নিস্তব্ধতা ও দিবসের ব্যস্ত কলরব ভেদ করিয়া শ্রোতার হৃদয়কে বিদীর্ণ করিল। প্লেগ এক্ষণে আমাদিগের নিত্য সহচর। সুতরাং ইহার স্বরূপ ও পূর্ব্বচরিত জানা আবশ্যক।

প্রাচীনকালে ইউরোপে লোকে মহামারী মাত্রকেই প্লেগ বলিত। গেলেন (Galen) ও অন্যান্য রোগতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই সাধারণ অর্থে প্লেগ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু অধুনা মহামারী বিশেষকে প্লেগ বলা হয়। এই রোগ জ্বরাত্মক, সংক্রামক, প্রায়ই গ্রন্থিস্ফীতিলক্ষিত।

প্লেগ দুই প্রকার। (১) সহজ বা ছোট প্লেগ (mild plague, *pestis minor*)। (২) উৎকট বা বড় প্লেগ (severe plague, *pestis* major).

সহজ প্লেগে গ্রন্থিস্ফীতি হয়—প্রায়ই কুচকিতে বা বগলে বা গলায় বিচি হয়। অল্প জ্বর হয়, দশ বিশ দিন থাকে। ইহাতে প্রায়ই মৃত্যু হয় না। ১৮৭৭ সালে আসট্রাকান Astrakhan নগরে যে এপিডেমিক হয় তাহাতে কেবল একটী মাত্র লোক মরিয়াছিল। তাহাতেও অন্য রোগের সংযোগ ছিল। এই সহজ প্লেগের সহিত উৎকট প্লেগের কত দূর সম্বন্ধ তাহা অদ্যাপি স্থির হয় নাই।

(২) উৎকট প্লেগ বহু শতাব্দী হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার লক্ষণ :—কম্পজ্বর, গাত্রে বেদনা, অস্থিরতা, আতঙ্ক, গুরুতর শিরঃপীড়া, দারুণ তৃষ্ণা, রক্তবর্ণ চক্ষু ; জিহ্বা স্ফীত শুষ্ক ফাটা ফাটা কাল বা সাদা। রোগীকে

কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সহজে বুঝিতে পারে না, যদি বা বুঝে বিলম্বে উত্তর দেয়। কোন কোন রোগী প্রথমেই বমন করিতে আরম্ভ করে। দেহের তাপ ১০০° Fahr হইতে ১০৭° পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কিন্তু অত্যুগ্র রোগে জ্বর প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই মৃত্যু হয়। অনেক সময় কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে। কদাচিৎ উদরাময় হয়। অধিকাংশ রোগীর গ্রন্থিস্ফীতি হয়। ইহা কখন জ্বরের পূর্ব্বে, কখন বা সঙ্গে সঙ্গে, কখন বা জ্বর প্রকাশের পরে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই বিচি গুলি পাকিতে পারে; পাকিয়া প্রচুর পরিমাণে পূঁজ নির্গত হইলে আরোগ্য লাভের অধিকতর সম্ভাবনা। কখন কখন চর্ম্মের উপর রক্তবিন্দুবৎ চিহ্ন দেখা যায়। ইহা কুলক্ষণ। কখন মুখ, বা নাসিকা, বা অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব হয়। এইরূপ রক্তস্রাব বসন্ত রোগেও দেখিতে পাওয়া যায়, এবং এরূপ হইলে প্রায়ই মৃত্যু হয়। যে সকল রোগী পাঁচ দিন বাঁচিয়া থাকে, তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই আরোগ্য লাভ করে।

কোন কবিরাজ প্লেগকে বিদ্রধি (এক প্রকার শোথ), কোন কবিরাজ ইহাকে অগ্নিরোহিনী (সাংঘাতিক স্ফোট বিশেষ), কোন কবিরাজ ইহাকে সান্নিপাতিক বিকার মনে করেন। দুই একজন কবিরাজ বলেন ইহা এক প্রকার বসন্ত রোগ, যখন বসন্ত ফুটিয়া বাহির না হয় তখন এই রোগ প্লেগ গণ্য হয়। কেহ কেহ বলেন প্লেগ এক প্রকার ম্যালেরিয়া জ্বর। কিন্তু ডাক্তার ফ্রান্সিস বলেন যে ম্যালেরিয়া জ্বরে যেরূপ বিরাম ও হ্রাস পর্য্যায় দেখা যায়, তিনি ভারতবর্ষের প্লেগে তাহা দেখিতে পান নাই। তিনি ও ডাক্তার পেন ইহাকে সম্পূর্ণ একটী স্বতন্ত্র রোগ বিবেচনা করেন।

ইউরোপের পণ্ডিতগণ বলেন, যদি বৃষ্টি না হয়, আর উত্তাপও অধিক হয় (৮৫° উপর), তাহা হইলে প্লেগ এপিডেমিক কমিতে আরম্ভ হয়। কিন্তু আমার বোধ হয় কলিকাতার প্লেগ সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। কলিকাতায় বৃষ্টি হইলে প্লেগ, বসন্তের মত, কমিতে দেখা গিয়াছে।

প্লেগের ইতিবৃত্ত অন্বেষণ করিলে দেখা যায় যে, খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীতে ইহা আফ্রিকার উত্তর ভাগে দৃষ্ট হইয়াছিল। প্রায় ৯০০ শত বৎসর পরে ইউরোপে ইহার আক্রমণ বা সংক্রমণ হয়। তখন প্রসিদ্ধ সম্রাট্ জষ্টিনিয়ান রোমের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। গিবন তাঁহার ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

কিন্তু চিকিৎসা শাস্ত্রের শব্দ গুলি ঠিক না বুঝিতে পারিয়া তিনি নাকি ভ্রম প্রমাদে পতিত হইয়াছেন। ১৪শ শতাব্দীতে প্লেগে ইউরোপের অনেক জনপদ উৎসন্ন যায়। অনেকে বলেন এই প্লেগ এসিয়া (চীন দেশ) হইতে ইউরোপে প্রবেশ করিয়াছিল। ১৩৬১ ও ১৩৬৮ সালে ইংলণ্ডে তৃতীয় এডওয়ার্ডের রাজত্বকালে দুই বার প্লেগ দেখা দেয়। এই প্লেগকে ব্ল্যাক ডেথ (Black Death) বলিত। ইহাতে ইউরোপের সিকি লোক মরিয়াছিল। ইংলণ্ডে এত লোক মরিয়াছিল যে দীর্ঘ কাল অনেক কৃষিক্ষেত্র কৃষক বিহীনে "পতিত" ছিল। মজুরির দর বাড়িয়া গিয়াছিল। তাহাতে মজুরদিগের অবস্থা ভাল হইয়াছিল।

১৫শ শতাব্দীতেও এই ঘোর মহামারী ইউরোপে করাল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নরনারী সংহার করিয়াছিল। ১৪৯৯-১৫০০ সালে লণ্ডনে এমন ভয়ানক প্লেগ হইয়াছিল যে রাজা ৭ম হেন্‌রি লণ্ডন ছাড়িয়া ক্যালে (Calais) নগরে পলায়ন করিয়াছিলেন।

১৪শ শতাব্দীতে ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় এসিয়ায় চীন দেশ ভীষণ প্লেগে জনশূন্য প্রায় হইয়াছিল। ইউরোপে জর্ম্মানি, হলণ্ড, ইতালি, স্পেন, ইংলণ্ড প্লেগাক্রান্ত হইয়াছিল। ১৫৬৩-৬৪ সালে প্যারি (Paris) নগরে প্লেগ নিত্য ঘটনার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। কথিত আছে মস্তক বেদনার অপেক্ষা ইহাকে কেহ কেহ তুচ্ছ জ্ঞান করিত। কলিকাতায় দেখিতে পাই, প্রথমে প্লেগের নামে লোকের আতঙ্ক হইত। এক্ষণে ঘরে ঘরে লোক প্লেগে মরিতেছে। সে আতঙ্ক আর নাই। প্লেগ যেন একটা নিত্যঘটনার মধ্যে হইয়াছে। শমন ভবনে প্রবেশ করিবার শত সহস্র দ্বার রহিয়াছে। আর একটী দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। তাহাতে আর ভয় কি? কলিকাতায় যখন অতিশয় প্লেগ হইতেছিল তখন অনেক সঙ্গতি সম্পন্ন লোক অনায়াসে পলাইতে পারিতেন। তথাপি পলায়ন করেন নাই, পার্শ্বের বাটীতে প্লেগের গুলি গোলাতে লোক মরিতেছে দেখিয়াও ভীত হন নাই। কেমন করিয়া বলি বাঙ্গালীর সাহস নাই। কিন্তু যদি প্লেগের গুলির পরিবর্ত্তে কলিকাতায় কোন শত্রু পক্ষের বন্দুক ও কামানের গুলি গোলা গুড়ুম গুড়ুম করিয়া পড়িতে আরম্ভ হইত, তাহা হইলে বাঙ্গালী সাহস করিয়া নগরে থাকিয়া বীরের মত লড়িত কি না, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। খুব সম্ভব পলায়ন করিত। প্রথমে যেমন প্লেগে পলাইয়াছিল,

তেমনি পলায়ন করিত। কিন্তু যদি বন্দুক কামানের গুলি গোলা নিত্য ঘটনা হইত তাহা হইলে বর্ত্তমান প্লেগের মত তাহাতেও আর বিশেষ আতঙ্ক থাকিত না। সাহসটা অভ্যাসের ফল। যে বিপদে লোকে অভ্যস্ত হয়, সে বিপদকে লোকে আর ভয় করে না। নাবিক ঝড় তুফানকে ভয় করে না, কুলি মজুর চারিতালা উপরে বাঁশের ভারার উপরে উঠিতে ও হাঁটিতে ভয় করে না, বাঘের দেশে বাঘকে লোকে ভয় করে না, কুম্ভকার কূপের ভিতরে খনন করিতে ভয় করে না, বাঙ্গালী লাঠিয়াল সড়কিওয়ালা লাঠি ও সড়কির ভয় করে না, যোদ্ধা গুলি গোলাকে ভয় করে না। তাই বলি, সাহস অভ্যাসের ফল, সে কথা যাউক।

১৭শ শতাব্দীতে ইউরোপে প্লেগ কতক কমিয়াছিল ; কিন্তু লণ্ডনে ১৬৬৪-৬৫ সালে যে প্লেগ হয় তাহা ভীষণ হইতে ভীষণতর। তাহাতে ছয় মাসে প্রায় ৭০,০০০ মরিয়াছিল। দুই বৎসরে ৪৷৷০ লক্ষ লোকের মধ্যে ১ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। লণ্ডন মহানগরী এই সময় অতিশয় অপরিষ্কার আবর্জ্জনাময় ছিল। অপরিচ্ছন্ন মলযুক্ত পূতিময় স্থানে দরিদ্র ব্যক্তিদিগের মধ্যেই, এই রোগের প্রতাপ অধিক। এমন কি ইহাকে the "poor's" plague গরিবের প্লেগ বলিয়া থাকে। ১৬৬৫ সালে ইংলণ্ডের অধিকাংশ স্থানে প্লেগ হইয়াছিল। কিন্তু অক্সফোর্ডে (Oxford) হয় নাই। অক্সফোর্ড অতি পরিস্কার স্থান, তাহাতে জল নিকাশের উপায় ভাল ছিল। এই জন্যই তথায় প্লেগ হয় নাই, অনেকে এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন।

১৮শ শতাব্দীতে ইউরোপে প্লেগে অনেক লোকের মৃত্যু হয়। কিন্তু তাহা বর্ণনা না করিয়া আমরা দ্রুতবেগে উনবিংশ শতাব্দীর প্লেগ সমাচারের মধ্যে উপনীত হইলাম।

১৮০২-৩ সালে ইউরোপীয় তুরস্কের রাজধানী কনস্তান্তিনোপল মহানগরীতে প্লেগ হয়। ১৮১৪ সালে ইতালী দেশে প্লেগ হয়। তৎপরে ঐ দেশে প্লেগের কথা আর বড় শুনা যায় না। ১৮৩৩ ও ১৮৪৫ সালে মিসর দেশে প্লেগ হয়। এই প্লেগের সময় ইউরোপীয় কয়েকজন ডাক্তার মিসর দেশে যাইয়া প্লেগের স্বরূপ নিদান ইত্যাদি অনুসন্ধান করেন। পূর্ব্বে প্লেগকে যতটা সংক্রামক রোগ বোধ হইত, এক্ষণে বোধ হইল, ইহা ততটা সংক্রামক নহে। কোনও ফরাসি

ডাক্তার বলিলেন ইহা আদৌ সংক্রামক নহে। ১৮৪৪-৪৫ সালে এই মহামারী আফ্রিকা পরিত্যাগ করিয়া, এসিয়া মহাখণ্ডে আবির্ভূত হইয়া লোকক্ষয় করিতে লাগিল। কখন বা আরব দেশের লোকবিরল মরু প্রান্তরে, কখন বা মেসপটেমা প্রদেশবাহিনী ইউফ্রেটিস তটিনী তটে, কখন বা জনাকীর্ণ পারস্য দেশে, ঘোরা মহামারী মহাকালী, আলুলায়িত কেশে, নরমুণ্ডমালায় স্বদেহ সজ্জিত করিয়া, নর শোণিত পান করিতে করিতে, শ্মশানীকৃত জনপদে, উন্মত্ত ভাবে বিকট নৃত্য করিতে লাগিলেন। এসিয়াতে অসংখ্য লোক সংহার করিয়া ১৮৭৮ সালে ইউরোপে রুষিয়া দেশে ভল্গা (Volga) নদী তীরে প্লেগ অবতরণ করিলেন। ইউরোপবাসিগণ আতঙ্কময় হইল। নরপতিগণ রুষিয়াতে এই প্লেগ তত্ত্ব বুঝিবার জন্য কয়েকটী ডাক্তার প্রেরণ করিলেন। ইংলণ্ড সর্জ্জন মেজর কলভিল এবং ডাক্তার পেন সাহেবকে পাঠাইলেন। কিন্তু এই সকল ডাক্তার সেই স্থানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে প্লেগ পলায়ন করিয়াছিল।

এক্ষণে আমরা বিদেশ ছাড়িয়া স্বদেশে প্লেগের ইতিহাস অন্বেষণ করি। প্রাচীন কালে ভারতে প্লেগ ছিল কি না তাহা স্থির করা কঠিন। তবে ঊনবিংশতি শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতে যে প্লেগ ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতের প্লেগের সঙ্গে দুর্ভিক্ষের যেন সম্বন্ধ দেখা যায়। তিন বৎসর ভীষণ দুর্ভিক্ষের পর গুজরাট, কাতিয়ার, এবং কচ্ছ দেশে প্লেগ হইয়াছিল। ১৮৩৬ ও ১৮৩৭ সালে রাজপুতনাতে প্লেগ দেখা গিয়াছিল। ১৮৩৩ সালে হিমালয়ের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে কমায়ুনের অন্তর্গত কেদারনাথে প্লেগ হইয়াছিল। ১৯৪৯ সাল হইতে ১৮৫২ সাল পর্য্যন্ত প্লেগ ভারতে দক্ষিণাভিমুখে প্রসারিত হইতে থাকে। ১৮৫৩ সালে ডাক্তার ফ্রান্সিস ও পিয়ারসন এই মহামারী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট দ্বারা নিযুক্ত হন। এই মহামারীর প্রারম্ভে ইন্দুর এবং সর্প মরিতে দেখা গিয়াছিল। মরিবার সময় ইন্দুরে রক্ত বমন করে।

১৮৭১ সাল হইতে চীন দেশে প্লেগের প্রকোপ প্রায় পনর বৎসর থাকে। ১৮৯৪ সালে হংকং নগরে যে মহামারি হয় তাহাতে কি টাসটো নামক একজন জাপানবাসী প্লেগ উৎপাদক জীবাণু আবিষ্কার করেন। যখনই প্লেগ হয় তখন এই জীবাণু রোগীর দেহে অনুবীক্ষণলক্ষ্য হয়। ১৮৯৭ সালে বোম্বাই নগরে

কয়েকটী অষ্ট্রীয়ার (Austria) ডাক্তার প্লেগ তত্ত্ব আলোচনা করিবার জন্য আসিয়াছিলেন।

এই বৎসর কলিকাতায় যে ভয়ানক প্লেগ হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করা অনাবশ্যক। তাহা সকলেই অবগত আছেন। এ প্লেগেও দেখা যায়, যে সকল স্থান অতিশয় ময়লা, যেখানে বায়ু আর আলোকের ভাল সঞ্চার হয় না, যে স্থানে অনেক লোকের বাস, সেই সকল স্থানই প্লেগের লীলা ক্ষেত্র। তাহার প্রমাণ চিৎপুর রোডের পশ্চিম দিকে, বড় বাজারে, যোড়াবাগানে প্লেগ অধিক। চৌরঙ্গীতে সাহেবদিগের মধ্যে মোটেই প্লেগ হয় নাই।

প্লেগের যে ইতিহাস সংক্ষেপে দেওয়া গেল তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে প্লেগ একটা নূতন রোগ নহে। অনেক দেশ এক্ষণে প্লেগকে দূরীকৃত করিয়াছে।

প্লেগ নিবারণের উপায় :—পরিচ্ছন্ন থাকা, দেহ ও বসন পরিষ্কার রাখা; গৃহে গলিতে রাস্তায় নগরের ভিতরে কোন স্থানে আবর্জ্জনা জমিতে না দেওয়া; জল নিকাশের উপযুক্ত উপায় করা; এক স্থানে অধিক লোক বাস না করা; বায়ু ও আলোক সঞ্চারের উপায় করা; এবং পুষ্টিজনক আহার করা। প্লেগ কেন, সকল রোগের সম্বন্ধেই এই কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু ভারতবাসী এই সকল বিষয়ে ক্রমেই অতিশয় উদাসীন হইতেছে। হিন্দু শাস্ত্রে দেহ শরীর ও ভবন পল্লী ও জনপদ পরিষ্কার রাখার যে সকল ব্যবস্থা আছে তাহাও এক্ষণে প্রতিপালিত হয় না। ইংরাজগণ যে প্রণালীতে পরিচ্ছন্ন থাকেন তাহা দেখিয়াও আমরা শিক্ষা করি না। এক্ষণে আমরা না হিন্দু মতে, না ইংরাজি মতে চলি। কেবল একটী আবর্জ্জনাময় কুমতে চালিত হইয়া মল রাশির ভিতরে মূঢ়চিত্তে কালাতিপাত করিয়া, ভারতবাসিগণ মরে। প্লেগে মরিবে, প্রিয়তম আত্মীয়জনের মৃত্যুর শোকে হাহাকার করিবে, আর্ত্তনাদে গগন বিদীর্ণ করিবে, তথাপি বাসস্থান পরিষ্কার করিবে না, তথাপি গৃহে বায়ু ও আলোক সঞ্চালনের ব্যবস্থা করিবে না, জলনিকাশের দিকে দৃক্‌পাত করিবে না। বাহিরে বাবুগিরি করিবার জন্য গাড়ি ঘোড়া রাখিবে, পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের আহার সম্বন্ধে যত মিতব্যয়িতা অভ্যাস করিবে। প্রভূত অর্থ হইলেও সে বিলাস ব্যসনে মিছা জাঁক জমকে তাহা ব্যয় করিয়া সমাজে সে মহদ্ব্যক্তি, গণ্য হইবার চেষ্টা করে—দরিদ্র ব্যক্তিকে এক মুঠা অন্ন দিতে হইলে যত গোল বাধিয়া যায়।

পল্লীস্থ গরিব লোককে অন্নদান করিলে, জলাশয় খনন করিলে, নিজের গ্রামের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধায়ক কোন কার্য্য করিলে, এক্ষণে আর মহত্ত্ব নাই। এক্ষণে যত মহত্ত্ব ল্যান্‌ডো গাড়িতে, ওয়েলার ঘোড়াতে, আর প্রেয়সীর কণ্ঠে কনক মুক্তা মালা ঝুলাইয়া দেওয়াতে, আর ইষ্টকের উপর ইষ্টক স্তূপীকৃত করাতে। গরীবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না, সে না খাইয়া মরে, মরুক। তুমি ত বিলাস সুখে আছ। কিন্তু ঐ দেখ, তোমার সন্নিহিত দরিদ্র কুটীরে প্লেগ আসিল। দরিদ্র যুবাকে সংহার করিল। ঐ শুন নিস্তব্ধ রজনীতে তাহার শোকাকুলা জননীর মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে আকাশ ফাটিতেছে। তুমি তাহাতে কর্ণপাত করিওনা। সুখ শয্যায় প্রেয়সীর সহিত নিদ্রা যাও। কিন্তু একি! পরদিন প্লেগ ঐ গরিবের ঘর হইতে তোমার প্রাসাদে সংক্রামিত হইল। তোমার প্রিয়তম পুত্র জ্বরে কম্পিত, কখন বা অভিভূত, কখন বা প্রলাপ বকিতেছে। তোমার মুক্তামণ্ডিত-প্রমদার কপোলে অশ্রু মুক্তাফল ঝরিতেছে। তুমি উদ্বেগে ভয়ে এঘর ওঘর ছুটাছুটী করিতেছ। গাড়ির পর গাড়ি, চিকিৎসকের পর চিকিৎসক আসিতেছে। কিন্তু সকলই নিস্ফল। জীবন তরণী মৃত্যুর অগাধ জলে ডুবিতেছে, ঐ প্রাণ বায়ু পলাইল। দীপ নিবিল—অন্ধকার। গৃহ হাহাকারে প্রতিধ্বনিত। হে স্বার্থপর ধনী, তুমি জানিও, ইহা ঈশ্বর প্রেরিত নিদারুণ দণ্ড। মস্তক পাতিয়া লও। শিক্ষা লাভ কর। বিনীত হৃদয়ে একটু পরার্থপরতা শিক্ষা কর। সমাজ একটী দেহ। তাহার কোন একটী অঙ্গে আঘাত লাগিলে, ব্যাধি প্রবেশ করিলে, সমুদয় দেহে আঘাত লাগিবে, সমুদয় দেহ ব্যাধিদুষ্ট হইবে, সমুদয় দেহের মৃত্যু হইবে। আর, কেবল মিছা হরি নাম করিলে হইবে না। হরির অভিপ্রেত কার্য্য কর। কেন না কার্য্যই সরল ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত হরি সংকীর্ত্তন। মহামারীর ভিতরে, মা মহাকালীকে দেখ; আর মহাকালীরূপ হইতে মহাশিবরূপ চিনিতে শিক্ষা কর। মহামারীর কশাঘাতে তাড়িত হইয়া নিঃস্বার্থ পরোপকার নিষ্কাম ধর্ম্ম স্বরূপ মহাজীবনের দিকে ধাবিত হও, অমঙ্গলের তত্ত্বের দ্বার দিয়া, স্বার্থপরতা স্বরূপ মহা অমঙ্গল পরিহার করিয়া, কার্য্যময়ী পরার্থপরতা স্বরূপ মঙ্গল মন্দিরে উপনীত হও। "তত্র ঘোরা মহামারী চিরতিরোহিতা, তত্র দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ শিবরূপেণ সংস্থিতা।

প্লেগ বা মহামারী।২*

এই শীতকালে কলিকাতা সহরে অন্য যত প্রকার রোগ থাকুক বা না থাকুক প্লেগ বা মহামারীর প্রাদুর্ভাব কিছুমাত্র নাই। লোকে নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছে। প্লেগের অত্যাচার অপেক্ষা প্লেগ নিবারণকারী লোকদিগের অত্যাচারে লোক এত ভীত হইয়াছে যে প্লেগের নাম শুনিলেই তাহাদের কম্প উপস্থিত হইত। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে আমাদের বর্ত্তমান ছোটলাট বাহাদুর দয়া পরবশ হইয়া প্লেগের নিয়মাদি শিথিল করিয়া দিয়াছেন, এবং গবর্ণমেণ্টের প্লেগকর্ম্মচারীদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে কোন প্রকার অত্যাচার না হয়।

গত বৎসর গ্রীষ্মের আগমনে যেরূপ প্লেগের দর্শন পাওয়া গিয়াছিল, এবারে যে তাহা পাওয়া না যাইবে এমত সম্ভাবনা নাই, এবার যদি আবার প্লেগ আরম্ভ হয় তাহা হইলে লোকের সমূহ বিপদ উপস্থিত হইবে, যদিও অল্প সংখ্যক প্লেগ রোগী আমরা দেখিয়াছি তথাপি যাহা দেখিয়াছি তাহাতে বলিতে পারি যে প্রথম অবস্থায় এবং বিবেচনা পূর্ব্বক রীতিমত ঔষধ প্রয়োগ করিলে আমরা এ প্রকার রোগী আরাম করিতে সক্ষম হইব।

প্লেগ যেরূপ শীঘ্র জীবন ধ্বংস করে, অন্য কোন রোগে এরূপ হয় না বলিয়া লোকের মনে ধারণা হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। ওলাউঠা, জ্বর বিকার প্রভৃতি রোগও কিন্তু কম বিপদ জনক নহে এবং ইহাতেও যে অল্প সময়ের মধ্যে জীবন নাশ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে প্লেগটী বঙ্গ দেশে নূতন আসিয়াছে। আমরা এখনও ইহার প্রকৃতি অবগত নহি এবং কি উপায়ে ইহার প্রাদুর্ভাব নিবারণ করিতে হইবে তাহাও জানি না, সুতরাং ইহাতে ভয়ের সম্ভাবনা অধিক হইয়াছে।

প্লেগ এক প্রকার মহামারী জ্বর বিশেষ, প্রথমে রক্ত দুষিত হইয়া জ্বর প্রকাশ

---

* এই প্রবন্ধ শীতকালে লেখা হইয়াছিল। তখন প্লেগের নাম মাত্রও ছিল না। দুর্ভাগ্যের বিষয় প্লেগ আবার প্রবল বেগে এই গ্রীষ্মকালের প্রারম্ভে প্রকাশ পাইয়াছে। প্রত্যহ বহু সংখ্যক রোগী ইহার করাল কবলে পতিত হইয়াছে। আমরা এবারে যথার্থই অনেক রোগীর রোগমুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছি।

পায় পরে কুচ্‌কি, বগল, গলা ও অন্যান্য স্থানের গ্রন্থি স্ফীত হইয়া উঠে, শেষে প্রগাঢ় বিকার উপস্থিত হইয়া মৃত্যু হইয়া থাকে।

জ্বর অতিশয় অধিক হয়, শরীরের তাপ ১০৩।১০৪ বা কখন কখন ১০৬ পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। রোগীর মস্তিষ্কের অবস্থা প্রথমেই খারাপ হইয়া যায়। নানা প্রকারের বিকার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী হয়ত নিদ্রালুতা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া গভীর অজ্ঞানাবস্থা প্রাপ্ত হয়, নতুবা অত্যন্ত অস্থির হইয়া জীবনীশক্তি ক্ষয় করিয়া ফেলে।

জ্বর প্রকাশের দুই একদিন পরে অথবা সঙ্গে সঙ্গেই নানা স্থানের গ্রন্থি স্ফীত হয়, কখন একটী এবং কখন বা বহু গ্রন্থি একেবারে আক্রান্ত হইয়া উঠে। এই সমুদায় গ্রন্থি প্রদাহিত হইয়া ফুলিয়া উঠে ও শক্ত ও বেদনা যুক্ত হয়, কখন উহা পাকিয়া পূঁযে পরিণত হয় আবার কখন বা মিলাইয়া যায়।

রোগীর মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হয় অথবা তাহাতে নানা প্রকার ক্লেশের নিদর্শন বর্ত্তমান থাকে। আবার কখন বোধ হয় যে রোগীর যেন কোন অসুখই হয় নাই। চক্ষু রক্তবর্ণ বা রক্তহীন, চক্ষু বিস্তৃত করিয়া চাহিয়া থাকা অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, তাচ্ছল্য ভাবে দৃষ্টিপাত করাও বিরল নহে।

জ্বর যদি বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাহা হইলে মস্তিষ্ক লক্ষণ প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, রোগী বিড় বিড় করিয়া বকিতে থাকে, জ্ঞানের অভাব হয়, চীৎকার করিয়া ডাকিলেও উত্তর দেয় না, বা কোন চিহ্ন দ্বারা জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করিতে পারে না। কখন কখন জ্ঞান থাকে বটে কিন্তু বিশেষ চেষ্টা না করিলে তাহা উপলব্ধি হয় না। জিহ্বা দেখাইতে বলিলে প্রথমে দেখায় না, পরে চীৎকার করিয়া বলিলে বা চিকিৎসক নিজের জিহ্বা বাহির করিয়া সঙ্কেত করিলে রোগী জিহ্বা বাহির করে, বাহির করিয়া আবার ভিতরে লয় না। অনেক বার বলিয়া জ্ঞানের সঞ্চার করিয়া দিলে তখন আবার জিহ্বা ভিতরে লইয়া যায়, জিহ্বা প্রায়ই পরিষ্কার থাকে তবে পেটের দোষ থাকিলে অপরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়, রোগের বর্দ্ধিতাবস্থায় জিহ্বা শুষ্ক ও লাল দৃষ্ট হয়।

বাক্‌শক্তি প্রায়ই থাকে না, অথবা কথা অর্দ্ধ প্রকাশিত ভাবে বাহির হয়।

শ্বাসকষ্ট প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে, কোন কোন রোগীর প্রথম হইতেই নিশ্বাস

টানিয়া ফেলিতে দেখা যায় এবং নিশ্বাস দ্রুতবেগে পড়িতে থাকে। কাহার বা শেষাবস্থায় এইরূপ হইতে দেখা যায়।

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দুর্ব্বল ও চঞ্চল হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে হৃৎপিণ্ডের গতি বেগে চলিতে থাকে।

কখন কখন কাশি হইয়া থাকে এবং ফুস্‌ফুস আক্রান্ত হইয়া প্রদাহ বা নিউমোনিয়া হইয়া পড়ে। ইহাকে নিউমোনিক প্লেগ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। যে সমুদায় রোগীর গ্রন্থি বা গ্লাণ্ড ফুলিয়া রোগ হয় তাহাদিগকে বিউবণিক প্লেগ বলা-হয়।

আবার যাহাদের অন্ত্র দুষিত হইয়া ভেদ বমন প্রকাশ পায় তাহাদের ইন্‌টেষ্টাইণ্ডাল প্লেগ নাম দেওয়া হইয়া থাকে।

শুনিতে পাওয়া যায় এই মহামারী রোগ বহু পূর্ব্বে আমাদের দেশে প্রকাশ পাইয়াছিল, কিম্বদন্তী আছে যে তৎকালীন বাঙ্গালা দেশের প্রধান নগর গৌড় এই প্লেগ রোগে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছিল। পালি প্লেগ এই রোগের অন্য নাম করণ মাত্র।

শুনিতে পাওয়া যায় যে এই প্লেগ আমাদের দেশ হইতে ক্রমে ইউরোপ মহাদেশের নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইংলণ্ডে ইহার প্রকোপ অনেক পূর্ব্বে দেখা গিয়াছিল।

পূর্ব্বকালে প্লেগ উপস্থিত হইলে রাজাকে দেশত্যাগ করিতে হইত, ইহার যথেষ্ট অর্থ আছে: রাজা যেখানে থাকেন সেইখানেই অধিক লোক সমাগম হয় সুতরাং সহজেই সে স্থান অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। রাজা স্থান পরিত্যাগ করিলে লোক সমুদায় চলিয়া যায় সুতরাং রোগ দুরীভূত হইয়া যায়।

এই কলিকাতা সহরে প্রথম বৎসর এক দিনে প্রায় অর্দ্ধেক লোক ভয় পাইয়া পলাইয়া যায়, তাহাতে প্লেগ সহজেই থামিয়া গিয়াছিল। এ বৎসর বড় বাজার অঞ্চলে প্লেগ বেশী হয়। মাড়য়ারিরা চারিদিকে পলাইয়া যাওয়াতে রোগের প্রকোপ হ্রাস হইয়া পড়ে।

অস্বাস্থ্যকর স্থানেই যে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয় তাহার আর সন্দেহ নাই। আমরা এই সহরের অনেক স্থান দেখিয়াছি, তথায় বায়ু প্রবাহ বর্ত্তমান নাই, রৌদ্রের আলো বা তাপ প্রবেশ করিতে পারে না এবং জল ও ময়লা গমনা-

গমনের সুন্দর উপায় নাই, এই সকল স্থানেই প্লেগের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আবার এইরূপ স্থানে যদি অধিক লোকের সমাগম হয় তাহা হইলে তো আর কোন কথাই নাই, ভীষণ আকারে মহামারী এই স্থানে প্রবেশ লাভ করে।

চিকিৎসা—প্লেগের চিকিৎসা সম্বন্ধে আমরা বড় অধিক অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি নাই। প্লেগ আরম্ভ হইয়া অবধি পূর্ব্ব দুই বৎসর আমরা কোন রোগী দেখিতে পাই নাই কারণ সহরে যত রোগী হইয়াছে সমস্তই হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হইত, কেহই বাড়ীতে রোগী রাখিতে বা চিকিৎসা করাইতে পারিত না। পরে এই কয়েক বৎসর যাহা দেখিতেছি তদনুসারে এইস্থলে প্রধান প্রধান ঔষধ কয়েকটীর বিষয় সন্নিবেশিত করিতেছি।

শীতের শেষে গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই কলিকাতা সহরে প্লেগ আরম্ভ হয়। এই সময়ে আমরা পূর্ব্বেও দেখিয়াছি ঠাণ্ডা ও গরমে গলা, কুচ্‌কী প্রভৃতি ফুলিয়া জ্বর হইত। তাহা একোনাইট্, বেলেডনা, রস্টক্স জেল্‌সিমিয়ম প্রভৃতিতে আরাম হইয়া যাইত।

প্লেগ রোগীর প্রথম অবস্থায়, জ্বর হইলে, কুচ্‌কী ফুলিলে ছটফট ও পিপাসা থাকিলে এবং গাত্র বেদনা, অনিদ্রা, শুষ্ক কাশি প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে রস্টক্স উত্তম ঔষধ। ইহাতে সহজেই পীড়া আরাম হইয়া যায়।

ইহাতে উপকার না হইলে এবং চক্ষু লাল, মাথা ধরা, বিকারের ভাব, বিছানা হইতে উঠিয়া বসা ও পালাইবার চেষ্টা থাকিলে বেলেডনা দেওয়া যায়।

আমরা দেখিয়াছি রোগীর জ্ঞানশক্তি লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে, লোক চিনিতে পারে না অথচ জোর করিয়া উঠিয়া বসে এরূপ অবস্থাতেও বেলেডনা উত্তম।

নিদ্রালুতা, বিড় বিড় করিয়া বকা, গাত্রে কাপড় রাখিতে চায় না, অর্দ্ধ দৃষ্টি, চক্ষু তত লাল নহে কিন্তু জ্ঞানের অভাব থাকে এই অবস্থায় হাইওসায়েমস দেওয়াতে উপকার দর্শে। ইহাতে উপকার না হইলে ও নিদ্রালুতা বৃদ্ধি হইয়া অজ্ঞান হইলে ওপিয়ম ভাল। উচ্চ ডাইলিউসন দিয়া উপকার না পাইলে নিম্ন ডাইলিউসন দেওয়া উচিত। আমরা সম্প্রতি ২।৪টি রোগীতে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, প্রথমে ৩০ বা ২০০ দিয়া কোন ফল পাই নাই পরে ৩য় দিয়া উপকার

পাইয়াছি। আবার কোন কোন স্থলে ইহার বিপরীতও দেখা গিয়াছে। অর্থাৎ ৩য়, ৬ষ্ঠতে উপকার না পাইয়া ৩০ বা ২০০ তে উপকার হইয়াছে।

নিদ্রালুতা যদি ক্রমে বাড়িয়া যায় তবে বড়ই ভয়ের কথা। ক্রমে নাড়ী ক্ষীণ হইয়া পড়ে এবং শ্বাস কষ্ট উপস্থিত হইয়া অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যু উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা হয়। এরূপ অবস্থা প্রকাশ পাইবা মাত্র কোব্রা দেওয়া উচিত। নাজা বা কোব্রা আমাদের দেশের গোক্ষুরা সর্পের বিষ, ইহার ৬ষ্ঠ ডাইলিউসন চূর্ণ দিয়া আমরা অতি ভয়ানক রোগীকে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি। যদি শ্বাস কার্য্য না থাকে তবে কোব্রাতে কোন উপকার হয় না।

এই অবস্থায় লাকেসিস্ আমাদের অন্যতর সহায়। বামদিকে গ্রন্থি আক্রান্ত হইলেই আমরা ল্যাকেসিস দিয়া থাকি। বাস্তবিক সর্পবিষ যে প্লেগের এক অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ তাহার আর সন্দেহ নাই। রোগটী যেমন শীঘ্র প্রাণ নাশক, সর্প বিষ তেমনি তীক্ষ্ণ ঔষধ। তাই বলিয়া প্লেগ হওয়া মাত্রই যে ইহা দিতে হইবে এমত নহে। ইহাতে অপকার হইতে দেখিয়াছি।

আমরা একটি সামান্য আকারের প্লেগ দেখিয়াছিলাম তাহার বাঁচিবার অনেক সম্ভাবনা ছিল। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা অনেক উত্তেজক ঔষধ সেবন করাইয়া প্রকৃত অনিষ্ট করিয়াছিলেন, পরে যাহা অবশিষ্ট ছিল কবিরাজের সূচিকাভরণ বিষ বড়ি দেওয়ার পর এমন বেগে বমন ও ঘর্ম্ম আরম্ভ হইল যে রোগীর নাড়ী শীঘ্রই ক্ষয় পাইয়া গেল।

হৃৎপিণ্ডের ক্ষমতা হ্রাস, বিকার, শ্বাসকষ্ট, শরীর নীলবর্ণ হইয়া যাওয়া এমন কি ক্ষত উপস্থিত হইলেও কোব্রা বা ল্যাকেসিসে উপকার হইয়া থাকে। ইহাতে উপকার না হইলে অনেকে ক্যাম্ফর দিতে উপদেশ দেন।

নিদ্রালুতা এই রোগের এক প্রধান উপসর্গ এবং সেইরূপ রোগী প্রায়ই খারাপ হইয়া যায়। ইহার প্রথমাবস্থায় বেলেডনা, জেলসিমিয়ম প্রভৃতিতে যদি উপকার না হইয়া বর্দ্ধিতাবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে নক্সমস্কেটা অথবা ওপিয়ম প্রয়োগে উপকার হইয়া থাকে।

যদি নিদ্রালুতার সঙ্গে উদরাময়, উদরস্ফীত ও নাড়ী খারাপ বোধ হয় তাহা হইলে নক্সমস্কেটা দেওয়া উচিত। তাহাতে উপকার না হইয়া যদি গাঢ় নিদ্রার

আবেশ হয়, রোগীকে আর চেতনাবস্থায় আনা না যায় তাহা হইলে ওপিয়ম দেওয়া যায়। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলেই ওপিয়মের ক্রিয়া অধিক হয়, মুখমণ্ডল রক্ত-বর্ণ চট্‌চটে অথচ গরম ঘর্ম্ম, শ্বাস প্রশ্বাসের ঘড়্‌ঘড়ানি থাকিলেও ওপিয়ম উত্তম। অত্যন্ত বিকারের ঝোক, রোগী লাফাইয়া উঠে, জোর করে, কামড়াইতে যায়, থুথু দেয়, চীৎকার করে প্রভৃতি অবস্থায় ষ্ট্রামোনিয়ম দেওয়া যায়।

নাড়ীর অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইলেআর্সেনিক, কার্ব্বভেজ, হাইড্রোসায়েনিক এসিড, কোব্রা কার্ব্বলিক এসিড, প্রভৃতি ঔষধ উপকারপ্রদ।

যদি রোগী ছট্‌ফট্‌ করে, গাত্রদাহ থাকে, পিপাসা, অস্থিরতা, ঘর্ম্ম প্রভৃতি দুর্ব্বলকারী অবস্থাযুক্ত হয় তাহা হইলে আর্সেনিক দেওয়া উচিত। প্রথমে নিম্ন ডাইলিউসন অর্থাৎ ৩০ দিয়া যদি উপকার না পাওয়া যায় তাহা হইলে ২০০ বা ততোধিক দেওয়া যাইতে পারে, কখন কখন ৩য় বা ৬ষ্ঠ দিয়াও আমরা উপকার পাইয়াছি।

যদি রোগী মৃতবৎ পড়িয়া থাকে, শীতল চট্‌চটে ঘর্ম্ম হয়, সর্ব্ব শরীর হিমাঙ্গ হইয়া উঠে, চর্ম্ম কৃষ্ণবর্ণ দেখায় ও কুচকী ইত্যাদি পাকিয়া পূঁয পড়িতে থাকে তাহা হইলে কার্ব্বভেজ উত্তম।

কার্ব্বভেজে উপকার না হইলে ও নিশ্বাসের কষ্ট থাকিলে এসিড্‌ হাইড্রো-সায়েনিক দেওয়া যায়।

এইরূপ শেষাবস্থায় বিকারের লক্ষণ থাকিলে এবং মূত্রকৃচ্ছ্র হইলে কার্ব্বলিক এসিড ভাল, ইহাতে শ্বাসকষ্টের উপকার দর্শে বিশেষতঃ যদি কন্‌ভল্‌সন বা আক্ষেপ উপস্থিত হয় বা হইবার উপক্রম হয় তাহা হইলে কার্ব্বলিক এসিড প্রযোজ্য।

রোগের প্রথমাবস্থায় জ্বর ইত্যাদির সঙ্গে গ্রন্থি স্ফীত হইয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, ফুলা ও লাল বেশী হয়, বিকারের ভাব প্রকাশ পায় ও অত্যন্ত অস্থিরতা, 'পিপাসা নিদ্রালুতা, চীৎকার করা ও মূত্র কষ্ট থাকে তাহা হইলে এপিসে অতিশয় উপকার হইয়া থাকে। প্লেগের রোগীর ব গী ইত্যাদি হইতে পূঁয লইয়া এক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহাতে লয়মিন বা বিউবনিন বলে। অনেকের বিশ্বাস যে ইহাতে পীড়া আরাম হইয়া থাকে। এ বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা নাই সুতরাং কিছু বলিতে পারিলাম না। আরও অনেক অনেক ঔষধ অনেকে

প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন কিন্তু আমরা যাহাতে উপকার পাইয়াছি তাহাই কেবল এই স্থলে প্রকটন করিলাম।

অপরিষ্কার স্থানে থাকা ও দুর্গন্ধযুক্ত বস্ত্রাদি ব্যবহার করা কোন মতেই উচিত নহে। রোগীর বস্ত্রাদি ভিন্ন স্থানে রাখা উচিত। রোগীর গৃহে বেশী লোক আসিতে দেওয়া উচিত নহে, রোগীর স্পর্শে বা তাহার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ব্যবহার করিলে অন্য লোককে এই পীড়া আক্রমণ করিতে পারে অতএব সে বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে।

পথ্য প্রথম অবস্থায় জলসাগু বা বার্লি ব্যবহার বিধেয়। রোগ নিবারণের সময় দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইলে দুগ্ধ, মাংসের যুস প্রভৃতি দেওয়া যাইতে পারে।

কুচকী প্রভৃতিতে কোন ঔষধ না দেওয়াই ভাল। কুচকী যত বড় হয় বিপদের ভাব তত অল্প হইয়া আইসে, গ্রন্থি বসাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিলে বা দিলে বাড়িয়া যায় ও শীঘ্রই মৃত্যু উপস্থিত হয়।

শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র মজুমদার।

হাসির গান।

হোল কি এ হোল কি এত ভারি আশ্চর্য্যি!
বিলেতফের্ত্তা টানছে হুক্কা সিগারেট খাচ্ছে ভশ্চার্য্যি।
হোটেল ফের্ত্তা মুন্সেফ ডাক্‌ছেন "মধুসূদন কংসারি";
চট্টোপাধ্যায় দোকান খুলে দস্তুর মত সংসারী।
ছেলের দল সব চসমা পোরে বোসে আছে কাটখোট্টা;
যুবারা সব গেরুয়া পর্চ্চে বুড়োরা নেকটাই হ্যাট্‌কোটা;
পক্ষীর মাংস লক্ষ্মীর মত ছেলে বেলায় খাননি কে?
ভবনদীর পারে গিয়ে বিড়াল বস্‌ছেন আহ্নিকে!
পদ্য গদ্য লিখছে সবাই কিনছেনাক কিন্তু কে'ই;
কাটছে বটে—পোকায় কিন্তু আলমারি কি সিন্ধুকেই।
বিজ্ঞাপনে বিকোচ্ছে ছাই নয়ক তাও সস্তাটি;
সংবাদ পত্র বাঁধতে দরকার উপহারের বস্তাটি।

রাধাকৃষ্ণ রঙ্গমঞ্চে নাচছেন গিয়ে আনন্দে,
ব্যাখ্যা কচ্ছেন হিন্দুধর্ম্ম হরি ঘোষ আর প্রাণধন দে।
শাস্ত্রীবর্গ কোন শাস্ত্রের ধারেন না একবর্ণ ধার;
স্ত্রীরা হচ্ছেন ভবার্ণবে বেশী মাত্রায় কর্ণধার।
পুরুষ তা সব শুনছে বোসে মেয়েরা আসর জমকাচ্ছে,
গাচ্ছে এমনি তালকাণা যে শুনে তা পিলে চমকাচ্ছে।
রাজা হচ্ছে শিষ্ট শান্ত প্রজা হচ্ছে জবর্দ্দার,
মুনিব কচ্ছে "আজ্ঞে হুজুর" চাকর কচ্ছে "খবর্দ্দার"।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

(টমাস) কার্লাইল সংবাদ।

Work is Worship.

We are here to do God's will. The only key to a right life is self-renunciation.

Carlyle's message has proved prophetic of the great movement which is now sweeping over the world, proclaiming the coming of sweetness and joy and comfort to human life, through the surrender of luxury, greed and vulgarity.'

ঊনবিংশতি শতাব্দীতে ইংলণ্ডে কার্লাইল (Carlyle) যে মূলমন্ত্র প্রচার করেন সেই মূলমন্ত্রে, অদ্য ইউরোপ ও আমেরিকাতে, অনেক মহাত্মা দীক্ষিত হইয়া, নিজের সুখ, ধন, প্রাণ মান সমুদয় বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়া, সমাজের মঙ্গল সাধনে, দরিদ্র ব্যক্তিদিগের দুঃখ মোচন চেষ্টায়, সংসার-সংগ্রামক্ষেত্রে বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিতেছেন। তাঁহাদিগের মত, শিক্ষা, সাধু দৃষ্টান্তের ফল, অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ন্যায় ইউরোপে ও আমেরিকায় সমস্ততঃ বিকীর্ণ হইতেছে। সুদীর্ঘ রজনীর অবসানে, যেমন আকাশের পূর্ব্বাঙ্গণে ধীরে ধীরে উষার উন্মেষ হয়, রক্তিম প্রভা আস্তে আস্তে বিচ্ছুরিত হয়, সদ্যঃ নিদ্রাভঙ্গ বিহঙ্গমগণ কলস্বরে প্রভাত বায়ু কম্পিত ও উল্লাসিত করে,—তেমনি যেন অদ্য, স্বার্থপরতা বিলাস ও মোহের গাঢ় তমসাচ্ছন্ন যুগের অবসানে, প্রীতি ও পরার্থপরতার প্রভা

কালের আকাশে আস্তে আস্তে স্ফুরিত হইতেছে, এই যুগের বক্তা ও কবিগণ পতিতপাবনীর আগমনী গাহিতেছেন। এই নব যুগের শুভসংবাদদাতা, উনবিংশ-শতাব্দীর মহাপুরুষ কার্লাইলের জীবনী ও তাহার শিক্ষা দান আমরা অদ্য সংক্ষেপে আলোচনা করিব। পুরাকালে পবিত্র ভারতবর্ষে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং। ইদানীং ইংলণ্ডে কার্লাইল ও তাহাই প্রচার করিলেন। কার্য্য তাঁহার ধর্ম্ম শাস্ত্র, কার্য্য তাঁহার পূজা। শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষা দিলেন, যদি মোক্ষ পাইতে চাহ, যদি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ ভাবে লাভ করিতে চাহ, তাহা হইলে কার্য্য কর, নিষ্কাম ভাবে কার্য্য কর। কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে—মা ফলেষু কদাচন— কর্ম্মেই তোমার অধিকার, কর্ম্মফলে কদাচ না হউক। কর্ত্তব্য কার্য্য নিয়ত করিতে থাক। মহাপুরুষ কার্লাইলও তাহাই শিক্ষা দিলেন—work is worship. Laborare orare est কার্য্য দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা হয়। তোমার যাহা কর্ত্তব্য কার্য্য, তাহা কর। অন্য কিছু ভাবিবার আবশ্যক নাই। ভগবান্ তোমাকে যে স্থানে প্রেরণ করিয়াছেন, নির্ভীকচিত্তে সেই স্থানে, সেই পদে তোমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা সম্পন্ন কর। তাহাতেই তোমার মঙ্গল হইবে। ক্ষণভঙ্গুর জীবন, দিন দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেছে, রজনী সমাগত হইলে, আয়ু শেষ হইলে, কিরূপে কার্য্য করিবে। যতক্ষণ আলোক, ততক্ষণ কার্য্য করিয়া লও। অন্ধকার হইলে আর কার্য্য করিতে পারিবে না। For the night cometh wherein no man can work* দিন থাকিতে বাজার করিয়া লও;

ভবের বেলা গেল,
সন্ধ্যা হল, কি করবে আর ভবের হাটে;
বাজারে বাজার কর মন, মিছে কেন বেড়াও ছুটে—।

কার্লাইল কপটতা বড় ঘৃণা করিতেন। সংসার কপটতাতে প্রবঞ্চনায় পরিপূর্ণ হইয়াছে, সমাজের ধনিগণ তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য ভুলিয়া আলস্য ও বিলাসে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। দরিদ্রগণের অশ্রুতে ধরাতল আর্দ্র হইয়া যাইতেছে। ধনতত্ত্ব ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়া মিল প্রমুখ সম্প্রদায় দ্বারা বিকৃত ভাবে ব্যাখ্যাত হইতেছে। স্বাধীন প্রতিযোগিতা (competition) কার্য্যতঃ পরস্পর শত্রুতায় (mutual hostility) পরিণত হইতেছে। ধনী ও শ্রমীর মধ্যে

* Past and Present bk. iii. ch. xii.

অনবরত দ্বন্দ্ব চলিতেছে। সবল ব্যক্তি দুর্ব্বল ব্যক্তির মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে। ধনতত্ত্বের নামে দয়াদাক্ষিণ্য বিসর্জ্জন দেওয়া হইতেছে। লোকে উন্মত্ত হইয়া প্রীতিকে জলাঞ্জলি দিয়া অর্থের অনুসরণ করিতেছে। সমাজের এই অবস্থা কখনই স্বাভাবিক ঈশ্বর সম্মত হইতে পারে না। সমাজের মতি গতি না ফিরিলে সমাজ শীঘ্র নিপাতের অতল জলধিতলে নিমগ্ন হইবে। কার্লাইলের গভীরতম হৃদয় হইতে, জ্বালামুখীর দ্রব "লাভা"বৎ, এই বচন উত্থিত হইয়াছিল। ধনতত্ত্বে রস্কিন কার্লাইলের শিক্ষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কার্লাইল ও রস্কিন প্রথমে দুইজনেই সাহিত্য সমাজে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন। কার্লাইল গভীরতত্ত্বপূর্ণ Sartor Resartus. লিখিলেন। যে পুস্তকপ্রকাশকের নিকট তাহা লইয়া যান, তিনিই তাহা ছাপাইতে অস্বীকার হন। নিজে দরিদ্র, কেমন করিয়া ছাপাইবেন। অবশেষে Fraser's Magazine সাময়িক পত্রিকার স্বত্বাধিকারী তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে স্বীকার হইলেন। কিন্তু লঘুচেতা ও মূর্খ পাঠকগণ তাহাতে চিন্তা বা গবেষণা কিছুই দেখিতে পাইল না। Fraser's Magazineএর গ্রাহকগণ লিখিতে লাগিল "না হয় Sastor Resartus নামক অসার প্রবন্ধ ছাপান বন্ধ করুন, না হয় আমার কাগজ বন্ধ করুন"। একজন দিগ্‌গজ-পণ্ডিত-গ্রাহক লিখিল যে "when is that stupid series of articles by the crazy tailor going to end"—কি আশ্চর্য্য! এমন যে গভীর জ্ঞানপূর্ণ গ্রন্থ তাহা কেহ আদর করিল না, বুঝিল না। কেবল মাত্র দুইজন লোক বুঝিলেন; একজন আইরিশ; আর একজন মার্কিণ; সুদূর আমেরিকায় এমার্সন তাহা পাঠ করিয়া বুঝিলেন, ইউরোপীয় সাহিত্য আকাশে একটী জলন্ত জ্যোতিষ্ক উদিত হইয়াছে। ভবভূতির দৃপ্ত বাক্য "বিপুলাচ পৃথ্বী" সার্থক হইল। লেখা দ্বারা কার্লাইলের অন্ন সংস্থান হওয়া কঠিন হইল। ১৮৩৯ সালে ইংরেজি সাহিত্য সমাজ এই গ্রন্থের কোনই গুণ দেখিতে পাইলেন না। পঞ্চাশৎ বৎসর পরে ১৮৮২ সালে এই পুস্তকের এমন আদর হইল যে, একটী দোকানে এক বৎসরে ইহার ৭৮ হাজার খণ্ড বিক্রয় হইয়া গেল। ভবভূতি কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলাচপৃথ্বী বলিয়া, তাঁহার গুণোচিত অভিমানে, তাঁহার গ্রন্থ জগতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু কার্লাইল অনশনক্লিষ্ট—কালের অনন্ততায়, পৃথিবীর বিশালতায়, তাহার গ্রন্থ

এক দিন উচ্চ স্থান পাইবে, এই চিন্তায় কার্লাইল শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই। দারুণ দারিদ্র্য ও জঠরানল তাঁহাকে দগ্ধ করিতেছিল। কিন্তু কার্লাইল মহাপুরুষ; দমিত হইবার লোক নহে। দারিদ্র্য, সংসারের প্রতিকূল অবস্থা, তাঁহার অজেয় ইচ্ছা-শক্তিবলে পরাজিত হইল।

গল্প আছে, একটী মায়াবিনী রাক্ষসী ছিল। সে পথের ধারে বসিয়া থাকিত। পথিক তাহার সমীপবর্ত্তী হইলে তাহাকে সে একটী কূট সমস্যা মীমাংসা করিতে বলিত। পথিক যদি তাহা মীমাংসা করিতে না পারিতেন, সে তখনই ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া তাহার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিত। কিন্তু যদি পথিক সেই কূট প্রশ্নের উচিত উত্তর দিতে পারিতেন, তাহা হইলে সেই মায়াবিনী কমনীয় কামিনীর কোমল কান্তি ধারণ করিয়া কান্তাভাবে তাহাকে ভজনা ও সেবা করিত। সংসার সেই মায়াবিনী রাক্ষসীবৎ। তুমি সাহস করিয়া, বুদ্ধি খাটাইয়া, উপস্থিত সমস্যার, বর্ত্তমান বিপদের, প্রতিকার করিতে পার, সংসার তোমাকে ভজনা করিবে। কিন্তু তুমি যদি ভয় কর, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া থাক, নির্ম্মম সংসার তোমাকে ছিন্ন ভিন্ন করিবে তোমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। Carlyle এই কথা বুঝিতেন। তিনি তাঁহার Past & Present পুস্তকে (sphinx) স্ফিংকসের প্রহেলিকা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন *।

ইতিবৃত্তবেত্তা ফ্রুড (Froude) সাহেব দুই খণ্ড পুস্তকে কার্লাইলের জীবনী প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আমরা অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে তাঁহার জীবনী আলোচনা করিব।

১৭৯৫ সালে কার্লাইল স্কটলণ্ড দেশে একলিফিকান Ecelefecan গ্রামে দরিদ্রের কুটীরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জনক একজন রাজ মিস্ত্রি ছিলেন। জনক জননী দরিদ্র হইয়াও কার্লাইলের শিক্ষার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে কার্লাইল এডিনবর (Edinburgh) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহার জননী লিখিতে জানিতেন না। কিন্তু পুত্রকে পত্র লিখিতে পারিবার জন্য তিনি লিখিতে শিখিলেন। কায়ক্লেশে

* The Sphinx sat by the way side, propounding her riddle to the passengers, which if they could not answer she destroyed them. Such Sphinx is this life of ours, to all men and societies of men

Past and Present bk. I Ch. II.

কোন প্রকারে আলু ও দাইল খাইয়া টমাস কার্লাইল বিশ্ব বিদ্যালয়ে থাকিয়া সেখানকার শিক্ষা সমাপ্ত করিলেন। এক্ষণে তাঁহার বয়স উনিশ বৎসর। জনক জননীর ইচ্ছা যে তিনি ধর্ম্মযাজকের পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু কার্লাইলের তাহা ইচ্ছা নহে। তাঁহার মনে হইল তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র অন্যত্র। একদিকে পিতার মনোরথ পূর্ণ করিবার বাসনা, অন্যদিকে তাঁহার নিজের প্রবৃত্তি ও কর্ত্তব্য জ্ঞান,— এই দুই বিরোধিপ্রবৃত্তির ভিতর তাঁহার হৃদয়ে তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। তিনি লিখিয়াছেন—"আমি আমার ঘরে প্রবেশ করিলাম, দ্বার রুদ্ধ করিলাম। নিম্নতম নরকের অতল গভীরতা হইতে ঘোর বিভীষিকাবলী দলবদ্ধ হইয়া আমার চতুর্দ্দিকে উত্থিত হইতে লাগিল। সংশয়, আশঙ্কা, অবিশ্বাস, ব্যঙ্গ, শ্লেষ,—আমি মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় তাহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিলাম। এই রূপে সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলিয়া গেল। এই সময় আমি আহার করিয়াছিলাম কি না তাহা আমি জানিনা, আমি পান করিয়াছিলাম কি না তাহা আমি জানি না, আমি ঘুমাইয়াছিলাম কি না তাহা আমি জানি না। কিন্তু আমি জানি যে, যখন আমি সেই কক্ষ হইতে বহির্গত হইলাম, তখন এই ভয়ানক একটা সংস্কার আমার হৃদয় অধিকার করিল যে আমি উদর রূপ একটা পৈশাচিক যন্ত্রের হতভাগ্য অধিকারী"। কার্লাইলের অন্তঃকরণে দৈব দৈত্যের যুদ্ধ এইরূপে হইতে লাগিল। এক দিকে আলোক, অন্যদিকে অন্ধকার; একদিকে কর্ত্তব্যজ্ঞান, অন্যদিকে সংসার ভীতি; একদিকে ভগবানের আদেশ, অন্যদিকে নিজের স্বার্থচিন্তা; ধন মান পদ ক্ষমতা ইহার জন্য ধাবিত হইব, অথবা সত্যের জন্য এই সকল বর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইব?

কার্লাইল এইরূপ সংশয়ের দোলায় আন্দোলিত হইতেছিলেন. তাঁহার সার্টর রিসার্টস (Sartor Resartus) গ্রন্থে তাহা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে :—

"আমার হৃদয় স্বর্গীয় নীহার-বিন্দু-সম্পাত-স্নিগ্ধ না হইয়া, তুষানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। আমি অবিরাম অনির্দ্দিষ্ট সেই প্রাণ-কেমন-করে ভয়ে কালাতিপাত করিতে লাগিলাম; ভীতিকম্পিত, কাপুরুষবৎ, জানিনা কিসের আশঙ্কায় অবসন্ন থাকিতাম। বোধ হইত, উর্দ্ধে নভোমণ্ডলে, নিম্নে ধরাতলে, সকল বস্তুই আমাকে আঘাত করিবে; যেন আকাশ ও পৃথিবী একটা বিরাট রাক্ষসের করাল কবল, আমি তাহার গহ্বরে পড়িয়াছি, আমাকে এখনি উদরসাৎ করিয়া

ফেলিবে এই ভয়ে বুক দুপ্ দুপ্ করিতেছে। এইরূপ ভাবে অভিভূত হইলাম। সমুদয় নগর ও উপনগরে আমি সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী ও শোচ্য। দিন এই রূপ যায়। একদিন উত্তপ্ত নিদাঘে আবর্জ্জনাময় সঙ্কীর্ণ গলি দিয়া চলিয়া যাইতেছিলাম * * * সহসা মনে হইল কিসের ভয়? কেনই কাপুরুষের ন্যায় মুখ ফুটিয়া কথা বলিতে পারি না, সতত সঙ্কুচিত, ভয়ে কম্পিত?—ঘৃণ্য দ্বিপদ, তোমার চরম অশুভের সমষ্টি কি হইতে পারে? মৃত্যু? ভাল মৃত্যু; আর রৌরব নরকের যন্ত্রণা, আর সয়তান ও মনুষ্য যাহা তোমার বিরুদ্ধে করিতে পারে বা করিবে। আচ্ছা, তাহাই হইল। কিন্তু তোমার কি মানসিক শক্তি নাই; যে দুঃখই হউক তুমি কি তাহা সহ্য করিতে পার না, মানসিক শক্তি দ্বারা পদদলিত করিতে পার না?—নরকের যন্ত্রণাতে দগ্ধ হইয়াও নরককে পদাঘাত করিতে পার না? তবে আসুক দুঃখ। আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। তাহাকে তৃণজ্ঞান করিব। যখন আমার মনে এবম্বিধ চিন্তা হইল, তখন যেন পাবক প্রবাহ আমার সমগ্র আত্মার উপর দিয়া চলিয়া গেল। তখন অধম আশঙ্কাকে চিরকালের জন্য মন হইতে বিদূরিত করিয়া দিলাম। তখন আমার বল হইল, অজ্ঞাত শক্তি আমাতে সঞ্চিত হইল। আমি তখন আত্মা—দেবোপম—আমার অসুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। তখন হইতে আর ভয় নাই, কাতর দুঃখ নাই। আছে অন্যায়ের প্রতি রোষ, আছে ভীষণ রোষকষায়িতলোচন, অদমিত স্পর্দ্ধা। সয়তান আমাকে লইতে আসিয়াছিল; আমার সমুদয় অন্তরাত্মা তাহাকে তাড়াইয়া দিল। বলিল "দূর হ, আমি তোর নহি, আমি স্বাধীন, তুই আমার অনন্ত ঘৃণার পাত্র।" এই প্রকারে তাঁহার অন্তরে, দৈত্যের উপর দেবতা জয়লাভ করিল।

তিনি পাদরি হইলেন না। কিছু দিন শিক্ষকের কার্য্য করিলেন। তাহার পর আইন অধ্যয়ন করিলেন। থিওডোর পার্কার যে কারণে ওকালতি ব্যবসায় গ্রহণ বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কার্লাইলও সেই কারণে সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন। কার্লাইল এডিনবরা রিভিউ লেখক শ্রেণীতে ভুক্ত হইলেন। এই সময় তাঁহার বিবাহ হইল। কিন্তু তাঁহার সংসার অচল হইল। তিনি দ্রুত রচনা করিতে পারিতেন না। দারিদ্র্য তাড়নে কার্লাইল ক্রেগনপটক (Craigenputtoch) স্থানে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর ভূসম্পত্তিতে আশ্রয় লইলেন।

এই স্থানে তিনি সাত বৎসর বাস করিলেন এবং ভলতেয়ার Voltaire বর্ণস (Burns) প্রভৃতি গ্রন্থকারদিগের সম্বন্ধে প্রবন্ধ এবং তাহার অমর গ্রন্থ সার্টস রিসার্টস রচনা করিলেন। কিন্তু ক্রেগনপটকে (Craigenputtoch) বাস করিয়া তাঁহাদিগের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা বড়ই দুষ্কর হইল। তখন তিনি সস্ত্রীক লণ্ডন নগরে যাইলেন এবং সার্টস রিসার্টস গ্রন্থের ক্রেতা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে যে ফল লাভ হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। হতাশ হইয়া দম্পতী ক্রেগনপটকে প্রত্যাগত হইলেন। দারিদ্র্যের মধ্যে এই স্থানে একদিন দূরাগত বীণাধ্বনির ন্যায় অভ্যাগত এমার্সনের মধুর আশ্বাস বাণী শুনিলেন। সুধীর মার্কিন মহাপুরুষ বলিলেন "ভ্রাতঃ অভিভূত হইবেন না"। তিনি বলিলেন সার্টস গ্রন্থ তাহার বড় আদরের সামগ্রী। দুই দিবস কর্ত্তব্যপরায়ণ স্কটল্যাণ্ডবাসী আর সেই প্রশান্ত প্রীতিময় অদ্বৈতবাদী মার্কিন প্রেমভরে আত্মায় আত্মায় সম্মিলিত হইলেন। মহাপুরুষ মহাপুরুষকে বুঝিলেন। যেন আমেরিকা ও ইউরোপ পরস্পরকে আলিঙ্গন করিল।

দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু কার্লাইলের অর্থকষ্ট দূর হইল না। শেষে অনশন মৃত্যু সম্ভাবনা উপস্থিত। তখন অনন্যোপায় হইয়া কার্লাইল তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় এবং কার্য্যান্বেষণার্থ আবার লণ্ডন মহানগরীতে গমন করিলেন। মহাপুরুষ ম্যাটসিনিকে এক দিন পরিধেয় বস্ত্র বন্ধক দিয়া আহার সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল, পাঠকের মনে পড়িবে। কার্লাইল এক্ষণে তাঁহার অতুলনীয় অদ্ভুত গ্রন্থ "ফরাসি বিপ্লব" রচনা করিতে লাগিলেন। অনেক পরিশ্রম অধ্যবসায় সহ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত করিলেন। তাঁহার বন্ধু মিলকে সমালোচনের জন্য পড়িতে দিলেন। মিল তাঁহার এক মহিলা বন্ধুকে পড়িতে দিলেন। মহিলাটীর দাসী তাহা বাজে কাগজ মনে করিয়া পুড়াইয়া ফেলিল। সর্ব্বনাশ! এত যত্নের এত পরিশ্রমের ফল এক দিনে ভস্ম হইয়া গেল। গ্রন্থকারের মনে অনির্ব্বচনীয় যন্ত্রণা হইল। তিনি আবার লিখিতে লাগিলেন। ক্রমে পুস্তকখানি সমুদয় লেখা হইল। কার্লাইল বুঝিলেন তাহা তাঁহার হৃদয়ের উত্তপ্ত শোণিতে লিখিত। পুস্তক প্রকাশিত হইল। Childe Harold প্রকাশে যেমন Lord Byron এক দিনে বিখ্যাত হইলেন, কার্লাইলও তেমনি, যে দিন ফরাসি বিপ্লব প্রকাশিত হইল, সেই দিনই সাহিত্য সমাজে প্রসিদ্ধ

হইলেন। তবে চাইল্ড হারল্ড প্রকাশের সময় লর্ড কবির বয়স ২৪ বৎসর; ফরাসি বিপ্লব প্রকাশের সময় দরিদ্র স্থপতি পুত্রের বয়স ৪৩ বৎসর। যাহা হউক কার্লাইলকে ইহার পর অন্নকষ্ট পাইতে হয় নাই। এক্ষণে সম্পাদক ও প্রকাশকগণের নিকট কার্লাইলের বড় আদর—তাঁহারা টাকা দিয়া তাঁহাকে রচনার জন্য সাধিতে লাগিলেন।

বক্তৃতা করিবার জন্য লোকে এক্ষণে তাঁহাকে টাকা দিতে লাগিল। তাঁহার ভাগ্যচক্র ফিরিল। গ্লাডষ্টোনের পরে তিনি Lord Rector of the University of Edinburgh মনোনীত হইলেন। যিনি এই পদ পান তাঁহাকে একটী বক্তৃতা করিতে হয়। যেখানে গ্লাডষ্টোনের অপূর্ব্ব বাগ্মিতা শ্রোতৃবর্গকে বিমোহিত করিয়াছিল, সেই স্থানে দেশের প্রধান পণ্ডিত মণ্ডলীর সম্মুখে বক্তৃতা করিবার কথা মনে করিয়া কার্লাইলের প্রথমে মনে একটু সঙ্কোচ হইয়াছিল। কিন্তু তাহার বক্তৃতা চমৎকার হইয়াছিল। Tyndall ঐ বক্তৃতাকে "perfect triumph" বলিলেন। ইহার কিছু পরে কার্লাইলের সহধর্ম্মিণীর মৃত্যু হয় এই দারুণ শোকের পর কার্লাইল আর পনর বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। কিন্তু আর কিছু বিশেষ লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। কার্লাইল জগতে যে শিক্ষা দিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই :—বিশ্বাস যতই ভাল হউক না কেন, যতক্ষণ তাহা কার্য্যে পরিণত না হইতেছে ততক্ষণ তাহা অসার। উপস্থিত কর্ত্তব্য কার্য্য পালন কর, পরবর্ত্তী কার্য্য কি, তাহা তুমি সহজে বুঝিতে পারিবে। ধর্ম্মনীতি তুমি যতটুকু বুঝিতে পার ততটুকু যদি তুমি কার্য্যতঃ না কর, তাহা হইলে তোমার ধর্ম্মনীতি বুঝিবার শক্তি ক্রমে হ্রাস হইয়া যাইবে। মানুষ এমন অবস্থায় পড়িতে পারে না, যেখানে তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য নাই, যেখানে তাহার জীবনের আদর্শানুরূপ কার্য্য হইতে পারে না। তুমি বীর হইতে চাহ, তুমি ধর্ম্মপ্রচারক হইতে চাহ, তুমি দেশহিতৈষী হইতে চাহ,—তোমার গৃহে, তোমার পরিবারের মধ্যে, তোমার প্রতিবেশীগণের মধ্যে, তোমার কার্য্যালয়ে, তোমার প্রতিকার্য্যে সেই বীরত্ব সেই প্রচারকত্ব, সেই স্বদেশপ্রেমিকতা বিকাশ করিবার প্রচুর অবসর, প্রচুর সুবিধা পাইবে। তুমি সম্রাট হইতে চাহ? তোমার কুটীরেই বিপুল সাম্রাজ্য তোমার পদতলে লুণ্ঠিত হইতেছে। ঈশ্বরের আজ্ঞা বিবেকবাণী, তাহা পালন কর, ধর্ম্মপথে অগ্রসর হও, দেখিবে তুমি দরিদ্র হইয়াও সম্রাট, তুমি ভৃত্য

হইয়াও প্রভু! আমরা ঈশ্বরের আদেশ পালন করিবার জন্ত এই স্থানে আসিয়াছি। "We are here, to do god's will." সাধু জীবনের এক মাত্র সোপান, আত্মত্যাগ, পরার্থপরতা। যে ব্যক্তি কেবল মাত্র নিজের সুখের জন্ত জীবন ধারণ করে, তাহার বিদ্যা বুদ্ধি শক্তি যতই অধিক হউক না কেন, সে প্রকৃতপক্ষে ধাপ্পাবাজ জুয়াচোর। যে ব্যক্তি কেবল মাত্র আত্মভোগরত; সে এই বিশ্বজগতের অর্থ ও মর্ম্ম ও নিয়ম কস্মিনকালে বুঝে নাই। মনুষ্য জীবন সখের খেলা নহে। তাহার গম্ভীর উদ্দেশ্য আছে। মনুষ্য জীবন ভগবানের উদ্দেশ্য সাধনার পীঠস্থান। উন্মীলিত নেত্রে, দিব্য দৃষ্টিতে, এই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মাকে দেখিব, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মার সৌন্দর্য্য ও গৌরব ও মহিমা অনুভব করিব। তাঁহারই ইচ্ছা, আমার ইচ্ছা নহে, আমার জীবনের পরিচালক হইবে। আমাকে তোমরা যতই ক্ষুদ্র মনে কর না কেন, যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা আমি পালন করিতে পারি, তাহা হইলে আমি মহান্; তাহা হইলে আমি আর সংসারের ভ্রূকুটী বা স্তুতি কিছুই মনে করিনা। তখন ভগবানের কৃপা ও সন্তোষ আমার জীবনের আলোক; বাহিরে দেখিতে আমার অবস্থা যতই মন্দ ও শোচনীয় বোধ হউক, ভিতরে প্রকৃত পক্ষে আমার অবস্থা ভাল, অন্তিমে আমার মঙ্গল। যখন ভক্তের সহিত ভগবানের মিল হইল, তখন ভক্ত সঙ্গীতের মধুর সুরে কার্য্য করিতে লাগিল, অবিরাম শ্রমের ভিতরে স্বর্গীয় শান্তি লাভ করিতে লাগিল। কার্লাইল স্বার্থপরতামগ্ন জড়-জগৎ-সুখ-বিভোর ইউরোপে এই শিক্ষা দিবার জন্য জন্মিয়াছিলেন। আমি মনে করি, প্রাচীন কালে পবিত্র ভারত ভূমিতে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যে শাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছিলেন, কার্লাইল উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে সেই শাস্ত্র ইউরোপের উপযোগী ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ করিয়া নিষ্কাম ভাবে নিয়ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর, নিন্দা স্তুতির প্রতি, ফলাফলের সুখ দুঃখের প্রতি, দৃষ্টিপাত করিও না।

এই প্রবন্ধে কার্লাইল সম্বন্ধে আমার মুখ্য কথা যাহা বলিবার ছিল তাহা বলিয়াছি। কিন্তু বোধ করি অনেক পাঠক মহাত্মা কার্লাইল প্রদত্ত শিক্ষা সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করিতে চাহেন। তাই, বারান্তরে আরও কিছু বলিব।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র লাল রায়।

বাঙ্গলার পলিটিক্স।

আরাম চেয়ারে শুয়ে ভেবে কূল পাইনে—
কিম্বিধ শাসন নীতি হবে ফিলিপাইনে!
ভ্রাতৃভাব স্বাধীনতা,
ম'ল কি বাঁচিল তথা;
বিচার হইবে এবে কি রকম আইনে,
রীতি নীতি দেশাচার চলিবে কি লাইনে?
গোঁয়ার বোয়ার জাতি
কেন করে মাতামাতি?
চলিয়াছে ডিওয়েট্ বাঁয়ে কিম্বা ডাইনে—
ভেবে ভেবে সে সমস্যা অন্ন আর খাইনে।
তিন কোটি মূল ধন
লয়ে যদি কোন জন
মাছ ধরে একেবারে চলে গিয়ে রাইনে,
বুঝিতে পারি না সাফ্
কতটা যে হয় লাভ,
বোধ হয় হয় কিছু ঠাওর ত পাইনে!
প্লেগে নাকি হয় মাটি
হনলুলু, ওটাহাটি,
দুর্ভিক্ষ হয়েছে নাকি নবাজোম্লা স্কাইনে?
কি হবে উপায় হায় ভেবে দিশে পাইনে।
কি হবে স্পেনের গতি?
চাষীর হতেছে ক্ষতি,
ফসল হল না ভাল এ বছর ভাইনে;
মিছাই জঙ্গল রাখা
আদপে হয় না টাকা,
—লোহার সুলভ দরে—ওকে কিম্বা পাইনে।

উথলিছে বড় শোক,
মরেছে অনেক লোক
হটেণ্টট্ দেশে হায় হীরকের মাইনে!
বল কি উপায় করি?
নদীতে ডাকাতি চুরী
হতেছে বিষম নাকি ভিক্টুলা ও টাইনে!
আমার না হয় ঘুম—
ইলেক্সনে মহা ধুম,
সবে বলে হগ চাই লায়ন্‌কে চাইনে।
আইরিস্ বিলে নাকি
লাগিয়াছে ঠোকাঠুকি,
মেরেছে থাপ্পড় বেলী ধরিয়া ও'ব্রাইনে।
যায় দিবা অনিদ্রায়
পলিটিক্স ভাবনায়;
অধিক লিখিতে আমি অদ্য আর চাইনে;
কেবল জিজ্ঞাসা করি,
যদি লই এডিটরি,
এত বিদ্যা লয়ে আমি কত পাব মাইনে?

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

জাতীয় কর্ম্মফল।

"All nature is but art unknown to thee,
"All chance direction which thou canst not see;
"All discords harmony not understood,
"All partial evil universal good."—Pope.

যেমন ব্যক্তিগত কর্ম্মফলে আমরা প্রত্যেকে পূর্ব্ব সুকৃতি দুষ্কৃতি ভোগ করিতেছি, ঠিক সেইরূপ জাতীয় কর্ম্মফলে আমাদের উপর দিয়া সুকৃতির স্নিগ্ধ

সমীরণ ও দুষ্কৃতির প্রবল ঝঞ্ঝাবাত চলিয়া যাইতেছে। উভয়বিধ কর্ম্মফলই সমান ভাবে দুর্ব্বোধ্য। কুখাদ্য উদরস্থ করিবামাত্র কদাহারজনিত শারীরিক পীড়া অনুভব করা যায় না। কখন এক দিন, কখন দুই দিন, কখন দশ দিন পরে তাহার ফলভোগ আরম্ভ হয়। কবে কোন কদর্য্য দ্রব্য ভোজন করিয়াছি কে মনে করিয়া রাখিতে পারে? এজন্য অনেক সময় হঠাৎ উদরের পীড়া উপস্থিত হইলে মনে হয়, অকারণ এরূপ কেন হইল? কিন্তু বাস্তবিক কারণ ক্রমান্বয়ে বহুদিন হইতে সঞ্চিত হইয়া রোগাক্রান্ত হইতে হইয়াছে। ওরূপ ক্ষেত্রে যে প্রকারে কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া দৈহিক বিপ্লবকে আকস্মিক বলিয়া মনে হয়, কর্ম্মফল জনিত বিঘ্ন বিপত্তি সমূহকেও তদ্রূপ অসঙ্গত বোধ করিয়া আমরা অদৃষ্টের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হই।

এই যে আমাদের দেশে আজকাল সর্ব্বদাই শুনা যাইতেছে, গৌরাঙ্গের হস্তে কৃষ্ণাঙ্গের নানাবিধ লাঞ্ছনা, অপমান, শারীরিক ও মানসিক জ্বালা যন্ত্রণা, এমন কি তনুত্যাগ পর্য্যন্ত, আবার তদুপরি রাজপুরুষগণের সুবিবেচনায় সর্ব্বত্র ঐ শ্রেণীর ব্যাপারে বিচার বিভ্রাট ঘটিতেছে;—এ সকল কাণ্ড কি কোন খাম্‌খেয়ালী আসুরিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত, না কোন ন্যায়বান্, পরম দয়ালু সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান প্রভুর সুশাসনাধীনে ঘটিতেছে? আপাত দৃষ্টিতে যদিও কোন সন্তোষজনক সমীচীন কারণ নয়নগোচর হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না, সমস্তই দারুণ কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন অন্যায় অত্যাচার অবিচারের প্রবাহ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, তত্রাচ বুঝিতে হইবে, বিশ্বাস করিতে হইবে যে ঐ সকল পরস্পর বিরুদ্ধভাবের অন্তরালে সামঞ্জস্য আছে, বিধাতার ন্যায় হস্ত কার্য্য করিতে ক্ষান্ত নয়, সুতরাং বিশিষ্ট কারণ সমূহ বিদ্যমান। জগৎকর্ত্তা সর্ব্বদর্শী ন্যায়বান্; তাঁহার সুবিশাল বিশ্বরাজ্যে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সকল প্রকারে সুনিয়ম অক্ষুণ্ণভাবে কার্য্য করিতেছে, কুত্রাপি ব্যভিচারের সম্ভাবনা নাই, পক্ষপাত দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, এবং তিনি সদা জাগ্রত—কস্মিনকালে বিরাম অবসর জানেন না; এরূপ অবস্থায় আকস্মিক ঘটনা বলিয়া কিছু বিশ্বাস করা যায় না, —কোন ব্যাপার অকারণ উপস্থিত হইল, ইহা কি প্রকারে মনে স্থান পাইতে পারে?

বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, জড় জগতে কোথাও

কোন বিষয়ে অনিয়ম দৃষ্ট হয় না ;—বিনা মেঘে বজ্রাঘাত বলিলে কেহ বিশ্বাস করে না ; কারণ সবাই জানে যে মেঘের সঙ্গেই বজ্রপাত সম্ভব, মেঘ ব্যতীত বজ্রের সম্ভাবনা প্রকৃতির কঠোর নিয়মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ, সুতরাং আকাশকুসুমবৎ অলীক। বিশ্বের সর্ব্বত্র সুনিয়ম সুশৃঙ্খলা, আর সৃষ্টির সর্ব্বোচ্চ ব্যাপার মানব-পরিবারের সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, উন্নতি অবনতির বেলায় তাহাদের ক্ষমতার বাহিরে যা-ইচ্ছা তাই ঘটিতেছে, কোন নিয়ম নাই, কোন বিচার নাই প্রতি-বিধানের কোন উপায় নাই, এ কথা বাতুলের পক্ষেও অবিশ্বাসযোগ্য। তার পর সৃষ্টি হইতে এ পর্য্যন্ত সবাই বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন, প্রচার করিয়া আসিতেছেন—জগদীশ্বর মঙ্গলময়, তাঁহার রাজ্যে অমঙ্গল সম্ভবে না। সুতরাং এরূপ না বুঝিয়া উপায় নাই যে যাহা কিছু আমরা অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, আকস্মিক বিপদ আপদ প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া থাকি সে সমুদয় আমাদের মঙ্গলের জন্যই ঘটিতেছে, আপাততঃ কটুবোধ হইলেও বিকট তিক্ত ঔষধের ন্যায় হিতকারী।

বিধাতার ইচ্ছায় অধুনা ইংরাজজাতি আমাদের দেশের অধীশ্বর, তাঁহাদের শাসনপ্রণালী, আইনকানুন অত্যুৎকৃষ্ট, কথাবার্ত্তা বক্তৃতা উপদেশ উদার এবং শ্রুতিমধুর। স্বয়ং সম্রাট অভয় দান করিয়া ঘোষণা প্রচার করিতেছেন,—শ্বেত কৃষ্ণ জেতৃজিতে কোন প্রকার প্রভেদ না রাখিয়া নিরপেক্ষভাবে সমগ্র সাম্রাজ্য সুশাসিত হইবে। সবই দেখিতে ভাল শুনিতে ভাল, ছাপা কাগজ পড়িতেও ভাল—বাহিরের লোকের মনে হয়, ভারত সাম্রাজ্যের প্রজার নিকট স্বর্গ সুখও তুচ্ছ। কিন্তু আমাদের দুরদৃষ্টবশতঃ অর্থাৎ আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মদোষে এরূপ ন্যায়পরায়ণ ইংরাজ জাতিও কথায় কাজে সব সময় সামঞ্জস্য রাখিতে পারেন না। এরূপ কেন হয়? এ প্রশ্ন অনেকের মনেই উদয় হয়। আবার নিজেরাই সাধারণ ভাবে প্রশ্নের উত্তরও দিতে ত্রুটি করেন না—স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া পক্ষপাত দোষ তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা ঠিক পথে চলিতে দেয় না। যে শ্রেণীর মোহবশতঃ ইঁহাদিগকে মধ্যে মধ্যে নিজেদের অঙ্কিত সরল পথ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হয় সে মোহের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া জীবের পক্ষে অসাধ্য না হইলেও দুঃসাধ্য ত বটেই। বিবেকী বৈরাগী পুরুষ ভিন্ন সাংসারিক মোহ অতিক্রম করিয়া চলা অন্যের পক্ষে অসম্ভব। ইংরাজ যদি

কেবলমাত্র আমাদের দুঃখে কাতর হইয়া পরার্থপরতার অনুরোধে অরাজকতা হইতে রক্ষা করতঃ আমাদের শাসনভার গ্রহণ করিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে অবশ্য আমরা তাঁহাদিগকে মোহাতীত মনে করিয়া তাঁহাদের কথা ও কাজে অমিলের আশঙ্কা আদৌ করিতাম না, কিন্তু তাহা ত নয়। উঁহারা সাধারণ মানুষের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে স্বার্থের বশীভূত হইয়া সাত সমুদ্র তের নদী পারে আমাদের শাসনভার গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন, সুতরাং যেখানে তাঁহাদের কোন প্রকার স্বার্থে ব্যাঘাত লাগে সেখানে তাঁহারা সাধারণ সাংসারিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া একটু এদিক ওদিক করিতে বাধ্য হন। এখন জিজ্ঞাসা করি, সাংসারিক জীব এ প্রকার ভিন্ন আর কি করিয়া থাকে ? আমরা নিজেরা এরূপ অবস্থায় কি করিতাম ? আমরা আপনাদিগকে ইংরাজের অবস্থায় ফেলিয়া যদি নিরপেক্ষভাবে বিচার করি তাহা হইলে দেখিতে পাই যে সম্ভবতঃ আমরা আরও খারাপ করিতাম। তবে এই প্রশ্ন হইতে পারে যে ওরূপ উদার আশাপ্রদ বাক্যব্যয় না করিলেই ত ভাল হইত। ইহার দুই উত্তর হইতে পারে :—প্রথম,—লম্বা কথার উপর ত কোনপ্রকার টেক্স নাই। দ্বিতীয়,—বাস্তবিক ইংরাজজাতি বড়ই ন্যায়পরায়ণ, তাঁহারা সরল মনে নিজেদের ক্ষমতা না মাপিয়া ভিতরের বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়াই উচ্চ কথা প্রচার করিয়া থাকেন, পরে যে বিশেষ বিশেষ স্থলে কথা রক্ষা করিতে অক্ষম হইবেন ইহা তখন ভাবিতেও পারেন না ; হয়ত অদূরদর্শিতাবশতঃ ইহাও বিশ্বাস করেন যে পরীক্ষার ক্ষেত্র কখন উপস্থিত হইবে না।

যখন মানুষ কোন কালেই স্বার্থপরতার হাত এড়াইতে পারে না তখন কি আমাদের কোন আশা নাই ? অনন্তকাল কি আমাদিগকে এই ভাবে লাঞ্ছিত উৎপীড়িত হইতে হইবে ? পৃথিবীর ধ্বংস পর্য্যন্ত কি ঈশ্বর গালে হাত দিয়া বসিয়া হতভম্বভাবে আমাদের দুর্দ্দশা দেখিতে থাকিবেন ? তাহা কখনই হইতে পারে না। যে ঘটনাগুলিকে আমরা আপাততঃ উপদ্রব অত্যাচার বলিয়া ভাবিতেছি, বাস্তবিক ওগুলি অন্যায় অরাজকতা নয়, উহাদের ভিতরে গভীর মঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। বিধাতার আদেশে তাঁহার কল্যাণকর নিয়মেই ওরূপ ব্যাপার সমূহ সংঘটিত হইতেছে ; কালপূর্ণ হইলে ওভাবে আর উহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যাইবে না। বিধাতা চিরকাল এক গুলিতে দশ

চিঁড়িয়া মারিয়া থাকেন, এ বিষয়ে তিনি বড় মিতব্যয়ী। দুষ্কৃতি বশতঃ যাঁহারা অন্যায় অত্যাচার করিতেছেন তাঁহারা ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িবেন, আমরাও দুষ্কৃতি বশতঃ অত্যাচারের কুফল ভোগ করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া পড়িব। উভয়ের কর্ম্ম ক্ষয় হইলে পরস্পরের প্রতি ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া সুমিষ্ট সম্বন্ধ দাঁড়াইবে। কোন্ কোন্ পথ দিয়া উহা সম্পন্ন হইবে তাহা এখন লোকচক্ষুর অগোচর; তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে ক্রমান্বয়ে অন্যায় অত্যাচার করিতে করিতে উৎপীড়নের ভীষণ ভাব এত তীব্র হইয়া উঠে যে উৎপীড়ক নিজে তাহার নিকট সঙ্কুচিত হইয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারেন যে ঐ সকল কার্য্য দ্বারা তাঁহার হৃদয়রাজ্যে কি ভয়ানক ক্ষতি হইয়াছে। এতদ্দ্বারা শিক্ষালাভ করতঃ তাঁহার উন্নতি হয়। অপর পক্ষে উৎপীড়িত নিজ কর্ম্ম ফল ভোগ করিতে করিতে নানা বিষয়ে জ্ঞান উপার্জ্জন করতঃ মঙ্গলের দিকে অগ্রসর হন—চরমে উভয়েরই কল্যাণ হইয়া থাকে।

আর একটী উদাহরণ দ্বারা জাতীয় কর্ম্মফলের দৃষ্টান্ত দিতে চেষ্টা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। বর্ত্তমান সময়ে চীনদেশে যে উপদ্রব চলিতেছে স্থূল দৃষ্টিতে বোধ হয় যেন উহা কেবল মাত্র ইউরোপের স্বার্থের ব্যাঘাত হওয়াতেই সংঘটিত, অন্য কোন কারণ নাই। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়, এক হাতে কখনই তালি বাজে না। উক্ত কারণ ত আছেই, তদুপরে চীন দেশীয় জীবগণের জাতীয় দুষ্কৃতি জনিত কর্ম্মভোগ উহার দ্বিতীয় ও মুখ্য কারণ। চীন দেশের অবস্থা আমরা সম্যক্ অবগত নই; মোটামুটি এই জানি যে উহারা অতি প্রাচীনকাল হইতে সভ্যতা লাভ করিয়া বহু বিষয়ে বিস্তর উন্নতি করিয়াছে, উহারা অসভ্য বর্ব্বর নহে। কিন্তু এবারকার গোলযোগে তাহাদের ভিতরকার যে সকল কথা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে উহারা "সভ্য" হইলেও নিতান্ত অত্যাচারী জাতি। নিজ কর্ম্ম দোষে উহারা এবার এরূপ ভাবে বিপন্ন। এই বিভ্রাটের দ্বারা তাহাদের বিলক্ষণ কল্যাণ হইবার কথা—কর্ম্ম ক্ষয় পর্য্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতেই হইবে। বহুকাল হইতে চীনেরা স্ত্রীলোকের প্রতি যেরূপ অসদ্ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, তাহা বিনা দণ্ডে আর চলিতে পারে না। বালিকা বিক্রয় এবং অবলাগণকে ক্রীতদাসীরূপে ব্যবহার, এই মহাপাপ চীন সাম্রাজ্যকে আজ বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। প্রায় এক কোটী বালিকা

যুবতী ও প্রৌঢ়া ক্রীতদাসী ভাবে দুঃসহ জীবন অতিবাহিত করিতেছে। রমণীগণের প্রতি অত্যাচার ব্যতীত আরও অনেক নিষ্ঠুর ব্যবহার চীনদেশে প্রচলিত। ধর্ম্ম দেশ হইতে পলায়ন না করিলে কোন রাজ্য বিদেশীয়ের ক্রীড়নক হইতে পারে না।

উপসংহারে আর একটী জাতির কথা উল্লেখ করিব। আমাদের মধ্যে হয় ত অনেকের বিশ্বাস যে বুয়রগণ একেবারে নিরীহ, সুবর্ণলুব্ধ ইংরাজগণ নাহাক তাহাদের দেশ আক্রমণ করিয়া গ্রাস করিতে বসিয়াছেন। বাস্তবিক কথা, বুয়রগণ বহুকাল হইতে তাঁহাদের অধীনস্থ কৃষ্ণকায়দিগের প্রতি ভীষণ অত্যাচার করিয়া আসিতেছেন; সেই দুষ্কৃতির ফলে এই একটা সামান্য ছুতা-নাতা ধরিয়া তুমুল যুদ্ধ বাধিয়াছে, যাহাতে তাঁহারা উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছেন। উভয় দিকের কর্ম্মভোগ হইতেছে। দেখা যাউক কত দিনে দুই জাতির কর্ম্ম ক্ষয় হয়।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

"প্রথম সম্ভাষণ।"

(১)

(তুমি) কাল ডেকেছিলে
সুমধুর বোলে
শ্রবণে রয়েছে লাগিয়া;
হৃদয়ের তারে
এখনো ঝঙ্কারে
সে আবার, প্রিয়ে, অমিয়া —
মুরলী কি ছার!
বীণা—অসুতার,
নীরস কোকিল, পাপিয়া;
বাসন্তি পবন
স্বনে না এমন
নব কিশলয়ে বহিয়া;
কল নিনাদিনী
গিরি নিঝরিণী
এত সুধা কোথা বরষে!
শিশু—হাসিরবে
দেহ মন কবে
পুলকিত এত হরষে?

(২)

(তুমি) প্রেমের ভাষায়
ডাকনি আমায়
আদর করিয়া ডাকনি,
পথের সকলে
ডাকে যাহা বলে
তাই বলেছিলে, স্বজনি;

(তনু) তাড়িতের প্রায়
শিরায় শিরায়
আনন্দ প্রবাহ ছুটিল,
ভাবাবশমন
হইনু যখন
সে আহ্বান কানে পশিল।

(৩)

(তুমি) জান কি, রূপসি,
কত ভাল বাসি
কত পূজা করি তোমারে ?
তোমারি চিন্তায়
দিবা নিশি যায়
লোকালয়ে, বনে পাথারে ;
সুখ যাহা মনে.
তোমারি ধেয়ানে
দুখ, তুমি ছাড়া ব্যসনে,
আশা, তোমা লাভ,
নিরাশা-সন্তাপ
তোমা'সহ নাহি মিলনে।
(আমি) লোভ করি শুধু
হেরি মুখ বিধু,—
নখাগ্রও তব নেহারি ;
(আমি) ক্রোধ করি চিতে
তোমাকে হেরিতে
সুযোগ পাইতে না পারি !
কাচের গোলকে
দীপ যথা থাকে
মাথা কুটে কীট সকাশে,
মানস-মোহিনি,
আমিও তেমনি
হাহাকার করি হতাশে।

(৪)

যদিও, ললনে,
তোমারি চরণে
বিকায়েছি আমি আপনা ;
তুমি হায় হায়
চাহনা আমায়
অপাঙ্গেও মোরে হের না !
এ দুঃখ আমার
কোথা রাখি আর ?
উপজে বিরাগ হৃদয়ে
(আমি) সব তেয়াগিব
কাননে পশিব
আর না ফিরিব আলয়ে।
এ প্রেম আমার
নহে বলিবার
কোন মানুষের শ্রবণে,
কাঁদিব বিরলে
সেই বনতলে
বনতরু লতা চরণে।
অতি গোপনেতে
হৃদয় বেদীতে
এ অনল শিখা পুষিব,
(আমি) পুড়িয়া পুড়িয়া
বিমল হইয়া
গ্রহণীয় তব হইব।

(৫)

(এবে) কথনো কখন
দিও দরশন
সেবকের কাছে আসিও,
কভু দয়া করি
এ পরাণ ভরি
মধু মুখে মোরে ডাকিও—

(যথা) কাল ডেকেছিলে
সুমধুর বোলে
শ্রবণে যা' আছে লাগিয়া
হৃদয়ের তারে
এখনো ঝঙ্কারে
যে আহ্বান, প্রিয়ে, অমিয়া!

শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ নিয়োগী।

পুত্রশোকে

সান্ত্বনা অন্বেষণে।

১

জাহ্নবী, তোমার কুলে শীতল হইতে,
জুড়াতে প্রাণের জ্বালা এসেছি জননী!
তব নিরমল জলে দুঃখ বিনাশিতে,
আশা করি প্রাণে লয়ে শোকের কাহিনী!

২

কিন্তু ঘুচিল না, মাগো পুত্র-হারা ব্যথা,
নিভিল না জ্বলিছে যে, আগুন হৃদয়ে!
ক্ষণ তরে না ভুলিল মন সেই কথা,
রহিল মা বক্ষমাঝে শূল বিদ্ধ হয়ে!

৩

নিশ্বাস ফেলিতে বুকে রহিল বেদনা,
রহিল মরমে আঁকা সে স্নেহের ছবি,
রহিল তোমার তীরে মম স্নেহকণা,
জীবন গগনে মোর, সান্ধ্য স্বর্ণ রবি।

স্মৃতি।

১

দেখিতে দেখিতে গত হয় একমাস,
ভুলেও গিয়াছি তার মূরতি মোহন।
সেই অধরের মাঝে মৃদু মৃদু হাস,
স্নেহের চাহনি শোভা প্রফুল্ল আনন।

২

ভুলেছি বলিতে কেন ব্যথা বাজে বুকে,
সেত নাই তবু কেন অমঙ্গল ভয়?
আর তো জনমে তারে না হেরিব চোখে,
জানি, তবু তারি তরে প্রাণে আশা রয়।

৩

সে আশা কি? বুঝি না তো, এ কি, ভ্রম ঘোর?
বিদায় করিয়া পুনঃ, তারি তরে আশ,
সে যেন আমারি কাছে রহে নিশি ভোর,
শীতলতা অনুভব করি নিজ পাশ।

৪

মৃত্যু কি? কিছুই নয়, সে তবে আমারি,
কোলের সোণার চাঁদ আছে তবে কোলে?
তা না হলে, সদা কেন অনুভব করি,
বক্ষেতে স্নেহের সুধা অধীরে উথলে।

শ্রীমতী মোহিনী দেবী।

মধুরিমা।

(উপন্যাস)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ফাল্গুন মাস। পত্র পুষ্প শোভিত মধুময় মধুমাসে, সুখময় উদাস সমীরণে মন যেন কোথায় কোন দেশে অজ্ঞাতসারে লইয়া যাইতেছে। ফুল আবেশে স্পন্দিত, মানুষও আত্মহারা, প্রকৃতি স্বপ্নময়ী আবেশ পূর্ণা, কি জানি কেমন আশা ও আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত; রক্তিম কিশলয়ে মুক্তাফল প্রতিবিম্বিত শিশির মালা, নূতন শাখে কোকিলের কুহুধ্বনি! এই মধুমাসে, মধুর মলয়ে কুজন-সঙ্গীত-মুগ্ধ —বসন্তে, সেই দোল পূর্ণিমার শুভ্র-চন্দ্রমাশালিনী যামিনীতে নীলিমার জন্ম হয়। অদ্য সেই দোল পূর্ণিমায় নীলিমার জন্মোৎসব, কত আনন্দের হাস্যে গৃহ ধ্বনিত, কত স্বজন বান্ধবের একত্র সম্মিলন হইয়াছে, সকলেই উৎসবে মত্ত, কিন্তু যাহার জন্য এত আনন্দ, এত উৎসব, সে "নিধির" অঞ্চল ধরিয়া শচীন দাদার বাড়ীতে চলিয়াছে।

পীতাম্বর রায়ের বাটীর দক্ষিণ পার্শ্বে শচীন্দ্রনাথের বাটী। ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী সরস্বতীপুর গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ন্যায়পরায়ণ, ধার্ম্মিক ব্যক্তি; তাঁহারই উপযুক্ত তনয় শচীন্দ্রনাথ। শচীন্দ্রনাথ সুপণ্ডিত সচ্চরিত্র। শরীর খুব বলিষ্ঠ, রং শ্যামবর্ণ, মুখশ্রী খুব ভাল।

প্রভাতে শচীন্দ্রনাথ বাহিরের বারান্দায় একখানা চৌকীর উপর বসিয়া একজন মুসলমানের নিকট পারসী ভাষা শিক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে নিধির অঞ্চল ধরিয়া নীলিমা সেখানে উপস্থিত; শচীন্দ্রনাথ একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো নীল, তুমি যে আজ এত সকালে এসেছ? বিড়াল ছানা এ বাড়ীতে এসেছে নাকি?"

নীলিমা—শচীন দাদা, সেই মেয়েটী কোথায়?

শচীন্দ্র—সে বোধ হয় এখনও ঘুমুচ্ছে। পিসিমার কাছে বাড়ীর মধ্যে যাও, তিনি জাগাইয়া দিবেন।

নীলিমা নিধিকে টানিতে টানিতে বাড়ীর মধ্যে গেল, শচীন্দ্রনাথ একমনে বালিকার সরল রূপমাধুরী দেখিতে লাগিলেন।

শচীন্দ্রনাথের মাতা তাঁহাকে ৩ বৎসরের শিশু রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। দশম বর্ষ বয়স অবধি পিতার স্নেহে প্রতিপালিত হইয়া—পিতাকেও হারাইলেন, সংসারে কেবল জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্যামাসুন্দরী ও পিসিমা রহিলেন। শ্যামাসুন্দরী শ্বশুরালয়ে চলিয়া গিয়াছেন। আপাততঃ একমাত্র পিসিমাই সংসারে আছেন। নীলিমা ধীরে ধীরে পাক শালার বাহিরে আসিয়া কোমল স্বরে ডাকিল "পিসিমা !"

পিসিমার উনানে তরকারী চড়ান ছিল, তিনি সেখানে হইতেই ডাকিলেন "কেরে নীলমণি, আয় ঘরে আয়।"

নীলিমা নিধির অঞ্চল ছাড়িয়া পিসিমার পিঁড়ির অর্দ্ধেক অধিকার করিয়া পৃষ্ঠদেশ ঘেঁসিয়া বসিল, ও ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল "পিসিমা, সেই ছোট মেয়েটী কোথায় ?"

পিসিমা হাসিয়া বলিলেন, ঘুমিয়ে আছে ?

নীলিমা বলিল, তার নাম কি ?

পিসিমা বলিলেন, মধুরিমা।

উভয়ের কথাগুলি শেষ না হতে হতেই একটী স্থিরা সৌদামিনীর ন্যায় কনক বরণী, বালিকা সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল, নীলিমা বসিয়া ছিল তাড়াতাড়ি উঠিয়া অপরিচিতার হাত ধরিল, সে একটু ভীত ও বিস্মিতের ন্যায় নীলিমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিল, নীলিমা বলিল, "তুমি আমাদের বাড়ী চল, তোমাকে পুষি দিব, পুতুল দিব, মাও দিব, বাবাও দিব, বল যাবে তো ?" সে কিছুই উত্তর দিল না, নীলিমা আর বিলম্ব না করিয়া একেবারে তাহাকে কাপড় ধরিয়া বাড়ী লইয়া চলিল। বলা বাহুল্য নিধিও সঙ্গে ছিল।

যথাকালে নীলিমা ও মধুরিমা পীতাম্বর বাবুর অন্তঃপুরে পঁহুছিলে সকলেই নূতন বালিকাটীকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। পীতাম্বর বাবু সকলকে তাহার পরিচয় দিয়া বসিতে বলিলেন।

মা ডাকিলেন, মেয়ে সঙ্গিনীর হাত ধরিয়া নিকটে আসিল। মা বলিলেন, "নীল্ ওকে এখন ছেড়ে দাও, ঝী ওকে বাড়ীতে রেখে আসুক, তার পর আবার বিকেলে খেলতে আসবে।" মেয়ে কিছুতেই রাজী না হইয়া বলিল, "মা, তুমিই যে এর মা, এর যে মা নাই ? আহা এ যে পথে হারিয়ে গিয়েছে মা ? এ

কোথায় যাবে ?" শিশুর সরল মুখে দয়ার কথা শুনিয়া জননীর চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, কন্যার মুখ চুম্বন করিলেন—মেয়ে বলিল "এ মেয়েকে চুমু খাও" মাতা তাহাই করিলেন। বৃষ্টির ক্ষুদ্র বারিকণিকাতে পাষাণও ভিজিয়া থাকে!

নিধি নীলিমাকে স্নান করাইতে লইয়া গেলে মধুরিমারও স্নান করা সেই সঙ্গেই হইল, তখন উভয়ে মাতার নিকট যাইল; পীতাম্বর বাবুর স্ত্রী অলঙ্কার সকল বাহির করিয়া মেয়েকে সাজাইতে বসিলেন, মেয়ে বলিল "তা হবে না, মধুরিমাকেও পরাইতে হইবে।" মাতা কি করেন অগত্যা দুজনকেই অলঙ্কারাদি পরাইয়া সাজাইয়া দিলেন। উভয়েই এক প্রকার বসন ভূষণে ভূষিত হইয়া শচীন বাবুর বাড়ী পুনরায় পিসিমার নিকটে চলিল।

পিসিমা রন্ধনশালায় বসিয়া রাম প্রসাদী সুর ধরিতেছিলেন এমন সময়ে পশ্চাৎ হতে বড় মধুর স্বরে কে ডাকিল "পিসি", পিসিমা তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইলেন—দেখিলেন, দুইটী বালিকা হাসিতেছে, সেই হাসির ছটায় মস্তকস্থিত ফুলের মুকুট আরও উজ্জ্বল দেখাইতেছে, পিসিমা অবাক হইয়া গেলেন—নীলিমার শৈশবের সরল উদারতায় তাঁহার মনে হইল এ দেবী। পিসিমার চিন্তা শেষ না হতে হতেই নিধি আসিয়া আবার উভয়কে লইয়া চলিল, নীলিমা যাইতে যাইতে বলিল "পিসি মধুরিমা আমার সই হয়েছে"। পুরোহিত পূজা করিয়া চণ্ডীপাঠ করিলেন, পাঠ শেষ হইলে নীলিমাকে লইয়া আসিতে বলিলেন। পীতাম্বর বাবু, তাঁহার স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন সকলেই এক স্থানে সমবেত হইয়াছেন, ধূপ ধূনার গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতেছে, নানা প্রকার সুগন্ধ, পুষ্প চন্দন কর্পূর ইত্যাদির পবিত্র সৌরভে ভক্তিহীন হৃদয়েও ভক্তি সঞ্চার হইতেছে। সকলেই নীলিমার অপেক্ষায় রহিয়াছেন এমন সময়ে নিধি নীলিমাকে ও মধুরিমাকে লইয়া আসিল, পীতাম্বর বাবু তাহাকে তাড়াতাড়ি কোলে লইতে গেলেন সে কোলে আসিল না, পাছে মধুরিমার হাত ছাড়া হয় এই ভয়। পীতাম্বর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "নীল্ কোলে আস্‌বিনা কেন ?"

নীলিমা বলিল, "সইকে কোলে নাও। ওর আগে বাবা হও!" পীতাম্বর বাবু দুজনকে দুই কোলে লইয়া বসিলেন, ক্রমে ক্রমে সকলের আশীর্ব্বাদ হইয়া গেল, নীলিমা সইকে লইয়া পুতুল খেলিতে বসিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়, আঁধার ধীরে ধীরে পৃথিবীকে কাল বসনে আবৃত করিবার বাসনায় অতি মৃদু পাদ বিক্ষেপে গৃহে প্রাঙ্গনে তরুতলে ছায়া বিস্তার করিতেছে; শচীন্দ্রনাথ একখানা ইংরাজী পুস্তক হাতে করিয়া অন্দরস্থ বারান্দায়, আরাম কেদারায় শয়ন করিয়াছেন, মধুরিমা উঠানে একটা বিলাতি কুকুর কোলে করিয়া বসিয়া রহিয়াছে, তাহার কেশ গুচ্ছ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, কুকুরের মুখে চুমু খাইতে গিয়া মধুরিমার চুলগুলি তাহার চোখে কাণে লাগিলে সে বিরক্ত হইয়া ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল, হঠাৎ কুকুরের ডাক শুনিয়া শচীন্দ্র ফিরিয়া চাহিলেন—দেখিলেন মধুরিমার কাল চুল সাদা কুকুরের গায়ে পড়িয়া বড় আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছে। মধুরিমা কুকুরের দুই গালে দুই হাত দিয়া ধরিয়া বলিল "ওরে বাঁদর, তোমাকে আমি চুমু খাচ্চি আর তুমি ঘেউ ঘেউ করছ।"

শচীন্দ্রনাথ বালিকার সরল কথা শুনিয়া একটু হাসিলেন ও ডাকিলেন, 'মধুরিমা!' মধুরিমার ডাকটী বড় মিষ্ট লাগিল, আনন্দে হাসিয়া মুখখানি শচীন্দ্রের দিকে ফিরাইল, কুকুরও সুবিধা পাইয়া ছুটিয়া পলাইল, শচীন্দ্র ডাকিলেন "মধুরিমা শোনো?"

মধুরিমা তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, তিনি বলিলেন, তুমি নীলিমাদের বাড়ী আজ যাবে না?

মধুরিমা বলিল, না, আমার ও বাড়ী ভাল লাগে না।

শচীন্দ্র বলিলেন, কেন? নীলিমা তো আমার চাইতে তোমায় ভাল বাসে?

মধুরিমা বলিল, ইস, কে বোল্‌লো?

শচীন্দ্র বলিলেন, কেন, আমি বলিতেছি।

মধুরিমা বলিল, "তোমার মিথ্যা কথা", বলিয়া আঙ্গিনায় একটা আম্র গাছ ছিল তাহারই তলায় দাঁড়াইল।

পিসিমা দূর হইতে দেখিতে ছিলেন, তাড়াতাড়ি আসিয়া মধুরিমার হাত ধরিয়া আবার বারান্দায় আনিয়া বসাইলেন ও মধুরিমাকে বলিলেন "না, তোমার আজকে আর নীলিদের বাড়ী যেতে হবে না এখানেই শুয়ে থাক"—মধুরিমার মনে বড় আনন্দ হইল। সে আকাশের চাঁদ হাতে পাইল।

যথা সময়ে শচীন্দ্র ও মধুরিমার আহারাদি হইয়া গেল, শচীন্দ্রনাথ আপনার শয়ন গৃহের শয্যায় শয়ন করিলেন ; পিসিমাও সেই ঘরের মেঝেতে বিছানা পাতিয়া শয়ন করিলেন, তাঁহারই নিকটে মধুরিমা শয়ন করিল। মধুরিমা আনমনে কত কি বকিতেছিল, পিসিমা একমনে ইষ্টনাম জপিতেছিলেন, মধুরিমার কি মনে হইল সে ডাকিল "মা"।

পিসিমা বলিলেন, কেন মা ?

মধুরিমা বলিল, মা তুমি যে বলেছিলে শচীন বাবুর বিয়ে, তা কই বিয়ের বাজনা বাজল না ?

পিসিমা—হাঁ বাজবে বৈকি ?

মধুরিমা—হাঁ মা তুমি কি বিয়ের দিন লাল কাপড় পরবে ?

পিসিমা—দূর পাগলী বিধবা কি লাল কাপড় পরে ?

মধুরিমা—কেন পরে না মা ?

পিসিমা,—আমার যে বর মরে গিয়েছে ?

মধুরিমা—হাঁ মা বর কি তোমায় ভালবাসতো ?

পিসিমা—দূর পাগলী ও কথা কি বলে, তুই ঘুমো দিকি, রাত অনেক হয়ে পড়লো।

বলা বাহুল্য মধুরিমা ঘুমাইয়া পড়িল। শচীন্দ্র এতক্ষণ শুইয়া শুইয়া মধুরিমার সমস্ত কথা শুনিতেছিলেন ; এইবার পিসিমাকে ডাকিয়া বলিলেন "ওগো পিসিমা মধুরিমা কি বলছিল গা ?"

পিসিমা—হাঁ, ওর কথা শুনলে আর চলে না।

শচীন্দ্র—তাতো বটেই, তবে দেখেছ মধুরিমা আমাদের কাছ থেকে যেতে চায় না ?

পিসিমা—তাতো সত্যি, নীলি ছাড়ে না তাই যায়।

উভয়ের কথাবার্ত্তা চলিতেছে এমন সময়ে পীতাম্বর বাবুর চাকরাণী প্যারী আসিয়া মধুরিমাকে লইয়া যাইতে চাহিল। পিসিমা বলিলেন "আজ রাত্রে থাকুক কাল ভোরে যাইবে।" প্যারী চলিয়া গেল।

শ্রীমোহিনী দেবী।

মানসী সৌন্দর্য্যের প্রতি।

তুমি জীবনের মোর সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সুখ,
মোর জীবনের গর্ব্ব, পরাণ সম্বল,
তোমারে জেনেছি তাই জীবন সফল
ঘুচিয়াছে হৃদয়ের অতৃপ্তির দুখ !

তুমি জীবনের মম সন্তোষ সরল
সহজ আনন্দখানি, হে চির সুন্দর !
তোমারে বুঝেছি তাই জীবন অমর
পরিপূর্ণ স্নিগ্ধ শোভা শান্ত নিরমল !

তুমি জাগায়েছ প্রাণে মহত্বের আশা
এ মোর জীবনব্যাপী সৌন্দর্য্য বিকাশ
তুমি শিখায়েছ মোরে হৃদয়ের ভাষা
কামনার সম্পূর্ণতা তোমাতে বিকাশ।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

প্রাপ্তি স্বীকার।

কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে "নবপ্রভা"র বিনিময়ে আমরা নিম্ন লিখিত পত্র ও পত্রিকা সকল পাইতেছি :—

১। নব্যভারত; ২। প্রদীপ; ৩। স্বাস্থ্য; ৪। সঞ্জীবনী; ৫। পন্থা; ৬। কৃষিতত্ত্ব; ৭। বিকাশ (সাপ্তাহিক); ৮। বিকাশ (মাসিক); ৯। প্রচারক; ১০। প্রয়াস; ১১। উৎসাহ; ১২। মহাজন-বন্ধু; ১৩। প্রবাসী; ১৪। অন্তঃপুর, ১৫। পূর্ণিমা; ১৬। শ্রীবেঙ্কটেশ্বর সমাচার (নাগরী সাপ্তাহিক); ১৭। সখী; ১৮। প্রকৃতি; ১৯। ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্ট; ২০। বীরভূমি; ২১। লহরী; ২২। চিকিৎসক ও সমালোচক; ২৩। জন্মভূমি; ২৪। আরতি; ২৫। বসুমতী। ক্রমশঃ

নবপ্রভা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

১ম খণ্ড। { কলিকাতা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮ সাল। } ৪র্থ সংখ্যা

সন্ন্যাসে বিকাশ।

ধর্ম্ম ও ধনের সম্মিলন।

My lords—you are the great and the rich. That is perilous.—*Victor Hugo.*

O golden age, whose light is of the dawn,
And not of sunset, forward and not behind,
Flood the new heaven and earth.—*Whittier.*

ধনীর প্রতি দরিদ্রের উক্তি।

হে ধনী! আপনার প্রতাপ ও শাসন আমাকে পিশিয়া ফেলিতেছে। এই প্রকাণ্ড পৃথিবীটা আমার জেল্‌খানা হইয়াছে। ভগবান্ আমার পিতা, এই পৃথিবী তাঁহ'র ভূমি। তাঁহার সম্পত্তি। তোমরা যাঁহার সন্তান, আমিও তাঁহার সন্তান। তবে আমি আমার বাপের বিষয় সম্পত্তির ভাগ পাইনা কেন? হে ধনী! তুমি তোমার হিস্যাও লইলে, আমার হিস্যাও লইলে। আমার পৈত্রিক বিষয় হইতে তুমি আমাকে বঞ্চিত করিলে কেন? তুমি বলিবে, "বেটা তুই কে? তোর আবার পৈত্রিক সম্পত্তি কোথা"? গরিব বলিয়া আমাকে হতমান করিওনা, গালি দিলে তোমার মনে যেমন লাগে, আমার ও তেমনি লাগে। আমার পৈত্রিক সম্পত্তি নহে? তুমি বলিবে, "তোর সম্পত্তি যদি হইত, তোর সম্পত্তি আমার হইল কেমন করিয়া"। কেমন করিয়া, বলিব?

মহাশয়! রাগ করিবেন না। রাগিয়া যেন লাথি মারিবেন না। আজিও আমার চেওড়া পিঠে আপনার লাঠির দাগ অনেক আছে। আপনার লাঠির গুতো, বাপ রে বাপ, ভাবিলে ভয়ে বুক দুর দুর করে, বলুন মারিবেন না; আমি বলিতেছি, কেমন করিয়া আমার অংশ আপনার হাতে গেল। আমরা বোকা, আমরা অজ্ঞান। চোক থাক্‌তেও আমরা কাণা। আমরা দিন রাতই রাতের আঁধারে থাকি। রাতির আঁধারে তোমরা মোদের হিস্সাটা চুরি করিলে, দখল করিয়া লইলে। "বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা" মানে কি? "যাহারা বীর পুরুষ তাহারাই দুনিয়ার মালিক হইবে? জোর যার, মুলুক তার"? তোমাদের জোর কি আমাদিগের চেয়ে অধিক? তোমরা অধিক লোক, না আমরা অধিক লোক? আমরা যদি সকলে এক কাট্টা হই, এক মত হই, তোমরা কোথা থাক? জোর নহে, জোর নহে, ফাকি, ফাকি; আমরা বোকা আমরা অজ্ঞান, তাই তোমরা আমাদের ভেড়া করিয়া রাখিতে পেরেছ। আমাদের আলো নাই, আমরা বেকুব, আমাদের চোক ফুটে নাই, দিন রাতই আঁধার। কিন্তু মহাশয়, আঁধার চিরকাল থাকিবে না। প্রভাত আসিবে। ঐ প্রভাত আসিতেছে।

ঐ জ্ঞানের সূর্য্য, আকাশের পূর্ব্বদিকে লাল নিশান উড়াইয়া, নবপ্রভা ছড়াইতে ছড়াইতে, আসিতেছে। চোখ থাকে, দেখুন। অজ্ঞান ও অত্যাচার চিরকাল ভগবানের রাজ্যে টিকিতে পারে না। দেখ দিনি, তোমরা দুনিয়াটা কি করিয়া ফেলিয়াছ। পা রাখিবার জায়গা পাইনা, সহরে গেলে বাতাস পাই না, হাঁপ লাগে। ধর্ম্ম কি নাই? আমরা খাটি, তোমরা খাও। আমাদের শস্য তোমরা লও। সংসারে এ'ন ফেরাবি ও চাতুরী। এ পাপ সংসার, পুণ্য সংসার আসিতেছে। তখন কেহ কাহারও দাস থাকিবে না; তখন সকলেই স্বাধীন। তখন কাহারও ঢিবি ঢিবি টাকা থাকিবে না; তখন সকলেই প্রচুর আহার পাইবে, সকলেই সুখস্বচ্ছন্দে থাকিবে। তখন যাহারা খাটীবে, তাহারা খাইবে, তাহারা পাইবে। তখন মানুষ মানুষের পায় পড়িবেনা। তখন সকলেই ভাই, ভাই,—সকলেরই কোলা কোলি, সকলেরই আনন্দ, তখন মিথ্যা চাতুরি ও অজ্ঞানের আঁধার থাকিবে না; তখন কেবল আলোক। তখন সত্যের নবপ্রভা, দয়ার নবপ্রভা, ঝরিবে চারিদিকে। হে হরি! তোমার রাজ্যে সেই-দিন কবে আসিবে।

দরিদ্রের প্রতি সহৃদয় ধনীর উক্তি।

গরিব ভাই, তোমার অবস্থা যে এত খারাপ, তাতে তোমারও দোষ আছে, কেবল যে আমাদের দোষ, তা নহে। তুমি ধনী লোককে দুষিতেছ। কিন্তু যে ধনীকে দুষিতেছ, নিজে তাহারই মত ধনী হইবার একান্ত ইচ্ছা কি তোমার হয় না? তুমি ঠিক সত্য করিয়া বল দেখি, যখন তুমি দেখ, আমি জুড়ি হাঁকাইয়া যাইতেছি,—সম্মুখে মুকুট-মণ্ডিত-কচুয়ান, পশ্চাতে চামরধারী সহিসদ্বয়, অশ্ব গম্ গম করিয়া গর্ব্বে ছুটিতেছে, সম্মুখের লোক দুই ধারে সরিয়া যাইতেছে—সত্য বল দেখি, তখন তোমার আমার মত হইতে সাধ যায় কি না। তুমি যে বৈশাখের নিষ্ঠুর রৌদ্রে ক্ষেত্রকর্ষণ করিয়া ঘর্ম্মাক্তকলেবর হও সেই বৈশাখমাসে যখন দেখ যে, দিব্য শীতল ঘরে আমি বসিয়া আছি, পাখা টানিতেছে, তখন তোমার ইচ্ছা হয় কি না যে, তুমি ঐরূপ শীতল ঘরের মধ্যে বসিয়া থাক, আর তোমাকে একজন পাখাওয়ালা বাতাস করে। তুমি যখন দেখ, যদিও আমি এক দিনও মাঠে লাঙ্গল ধরি না, বীজ বপন করি না, মাথায় মোট বহি না, আদৌ পরিশ্রম করি না, তথাচ ঘরে বসিয়া নানা ব্যঞ্জন মৎস্য ঘৃত দুগ্ধাদিযোগে তোফা মিহি গোবিন্দভোগ চাউলের অন্ন আহার করি,—তখন বিনা পরিশ্রমে, ঐরূপ উপাদেয় আহার করিতে তোমার বাসনা হয় না কি? নিশ্চিতই হয়। ইহাতে কি বোধ হয়? সংসারে ধনী লোক থাকে তাহাতে তোমার আপত্তি নাই। সংসারে লোকে সহিস হইয়া অশ্ব ও প্রভু সেবা করে, তাহাতে তোমার আপত্তি নাই। সংসারে লোক পাখা টানে তাহাতে তোমার বস্তুতঃ আপত্তি নাই। তোমার আপত্তি কেবল এই যে, তুমি ধনী না হইয়া আমি ধনী হইয়াছি। তোমার আপত্তি এইজন্য যে, ভৃত্যগণ তোমাকে সেবা না করিয়া আমাকে সেবা করিতেছে। নহে কি? আর দেখ আমরা ধনীলোক যে জাঁক জমক করিয়া থাকি, বাহ্য আড়ম্বরের জন্য যে এত ব্যয় করি, কেন? সাধারণ লোক তাহা দেখিয়া আমাদিগের প্রশংসা করিবে, মান্য করিবে, এই জন্য। এই সাধারণ লোক কাহারা? তোমরা গরিব লোক। একজন ধনী ব্যক্তি অপর ধনী ব্যক্তির জাঁক জমকে মোহিত হয় না। কিন্তু তোমরা গরিবলোক, যখনই ধনীর জাঁক জমক দেখ, তখনই "বাহবা বাহবা" কর, হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাক, এবং সেই জাঁক জমকের মধ্যে ধনীকে দেখিলে, তাহাকে

তখন সুখসৌভাগ্যশালী বৈকুণ্ঠবাসী লক্ষ্মীপতি নারায়ণ মনে করিয়া, তোমরা সর্ব্বাগ্রে তাহাকে প্রণাম কর; বলিয়া ফেল "ইহারই জীবন সার্থক।" ধনীকে তোমরা বাস্তবিক ঘৃণা কর না, ধনীকে তোমরা হিংসা কর। তাহাকে গালি দেও, হিংসাতে; ধর্ম্মজ্ঞানে নহে। যদি তোমরা ধর্ম্মজ্ঞানবশতঃ, ধনীকে নিন্দা করিতে, যদি ধনীর অবস্থা স্পৃহনীয় মনে না করিতে, তাহা হইলে যখন ধনী সাধারণ গরিব লোককে দেখাইবার জন্য, আড়ম্বর করিত, তখনি তোমরা বলিতে "বেটা কি আহাম্মক। আমরা গরিবলোক দুটা 'বাহবা' দিব বলিয়া এত সাজ সজ্জা, এত বড় মানুষি, এত জাঁক জমক করিতেছে, আহাম্মক আবার আমাদিগের নিকট বড় হইতে চাহে; সে আমাদিগের নিকট খোসনামের কাঙ্গাল। আমরা যাহ শ্রম করিয়া উৎপন্ন করিয়াছি, তাহাই মূঢ়তা বশতঃ নষ্ট করিয়া অপব্যয় করিয়া, সমাজের ক্ষতি করিয়া, বিশেষতঃ আমরা গরিবলোক, আমাদিগের ক্ষতি করিয়া, আমাদিগেরই নিকট প্রশংসা প্রত্যাশা করিতেছে"। কিন্তু জাঁক জমক দেখিয়া তোমরা তাহা ত বল না।

ভাই গরিব, তুমি বলিয়া থাক সংসারে উপার্জ্জনের চারিটী মাত্র পথ আছে। শ্রম করা, ভিক্ষা করা, চুরি করা, এবং ডাকাতি করা। যে শ্রম করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে নাই—সে না হয় ভিক্ষুক, না হয় চোর, না হয় ডাকাইত। ভিক্ষাতে কেহ প্রায়ই বড় মানুষ হয় না। সুতরাং সমাজে তিন শ্রেণীর (ধনী) লোক ধরা যাইতে পারে—শ্রমী, তস্কর ও দস্যু; তুমি বলিতেছ —"ঠিক ঠিক"। সুতরাং ধনী যদি শ্রমী না হয়, তাহা হইলে, সে না হয় চোর, না হয় ডাকাইত। তুমি যদি যথার্থই এইরূপ বিবেচনা করিতে, তাহা হইলে শ্রম বিবর্জ্জিত ধনী লোককে দেখিলেই ভাবিতে "ঐ চোর যায়, ঐ ডাকাইত যায়।" তুমি কি যথার্থই তাহাই মনে কর? যখন ধনীলোক দেখ, তোমার মনে হয়, সে দেবেন্দ্রবাঞ্ছিতপদারূঢ়? তোমার কি তাহাকে দেখিয়া এমন মনে হয় না যে, "আমি এই জীবনে কবে এই সুখ সম্ভোগ করিব।' যদি তাহাকে তুমি চোর বা ডাকাইত বলিয়া ঘৃণা করিতে, তাহা হইলে তুমি কখনই তাহার ন্যায় চোর বা ডাকাইত হইবার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিতে না।

হে গরিবগণ। তোমরা কেবল ধনীকে বৃথা দ্বেষ কর তাহা নহে। তোমরা নিজের মধ্যেও পরস্পরকে দ্বেষ কর। তাহা যদি না হইত তোমরা সকলে

সম্মিলিত হইয়া এক যোগে, নিজের উন্নতি করে, ধনী দিগের বিরুদ্ধে, নিজস্ব রক্ষা করিয়া আপনাদিগের অবস্থা ভাল করিতে পারিতে। গরিব ভ্রাতা, তুমি বলিলে আমরা তোমাদিগকে প্রতারণা করিয়া তোমাদিগের অংশ আত্মসাৎ করিয়াছি। বিশেষতঃ যে ভূমি সর্ব্ববীজপ্রকৃতি, সর্ব্ব শস্যের আধার, তাহা হইতে তোমাদিগকে প্রকারান্তরে বঞ্চিত করিয়া পশুবৎ খাটাইয়া থাকি। "প্রতারণা"? ঠিক্ কথা কি? তোমাদিগের জ্ঞান বুদ্ধি অল্প, তুমি নিজেই স্বীকার করিয়াছ। সংসারে, জ্ঞান বল। তোমার জ্ঞান নাই, সুতরাং তোমার বল নাই। তোমরা অসংখ্য হইয়াও দুর্ব্বল; আমরা কতিপয় লোক মাত্র হইয়াও প্রবল। ইহাতে কি শিখিলে? যেরূপে পার জ্ঞান লাভ কর। গরিবদিগের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার কর। ঈশ্বরের অভিপ্রায়, লোকে জ্ঞান লাভ করিবে। কষ্ট পাইয়া লোকে কষ্ট হইতে উদ্ধার হইবার উপায় অন্বেষণ করে। সেই উপায় জ্ঞানলভ্য। সুতরাং দুঃখ লোককে জ্ঞানের দিকে লইয়া যায় পূর্ব্বে দেখাইয়াছি কষ্ট হইতে উদ্ধারের জন্য, পরস্পরের প্রতি দ্বেষ ত্যাগ করিয়া, অর্থাৎ পরস্পরকে ভাল বাসিয়া, সম্মিলিত হওয়া উচিত। অতএব দুঃখ হইতে উদ্ধার হওয়ার উপায় প্রীতি। সুতরাং দেখিলে, দুঃখ হইতে প্রীতির উদ্ভব; দুঃখ হইতে জ্ঞানের উদ্ভব! যখন প্রীতির ও জ্ঞানের উচ্চ সোপানে উঠিবে, তখন তুমি দরিদ্র হইলেও অলস ধনীকেও দ্বেষ করিবে না, তাহাকে দয়া করিবে, অনুকম্পার পাত্র বিবেচনা করিবে, এবং চিকিৎসক যেমন রোগীর চিকিৎসা করেন, তেমনি তাহাকে চিকিৎসা করিবে। তখন তুমি বুঝিবে তুমিই প্রকৃত পক্ষে ধনী, সে বস্তুতঃ দরিদ্র। তখন দেখিবে তুমিই রাজা, সে তোমার প্রজা।

পাপী ধনী যে, সেও ক্রমে বুঝিবে যে শ্রম না করিয়া খাওয়া পাপ। সে বুঝিবে যে, গরিব লোক ১ম অবস্থায়—গর্দ্দভবৎ; তখন সে নিতান্ত মূর্খ, নিতান্ত নিস্তেজ। গর্দ্দভের উপর ধনী আরোহণ করিয়া ইচ্ছামত প্রহার করে, চালাইয়া থাকে। ২য় অবস্থায়—অশ্ববৎ। তখন গরিবের একটু জ্ঞান ও তেজ হইয়াছে, পীড়ন করিলে কখনও ছোটে, কখনও ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করে, সুবিধা পাইলে কখনও বা চাট মারে। যথা, রোমক রাজ্যে "পূত পর্ব্বতে" (Mons Sacer) দরিদ্র সেনার এবং পরে লিসিনিয়ান আইন (Licinian Laws); ইংলণ্ডে "লেভেলার" ও "চার্টিষ্ট" (Chartists) উচ্ছ্বাস। বঙ্গে, কচিৎ প্রজা কর্ত্তৃক নীল

কর বা জমীদারের প্রহার। দরিদ্রের ৩য় অবস্থায়—অশ্ব রূপান্তরিত হইয়া সিংহ হয়, আরোহীকে ভক্ষণ করে; যথা, ইংলণ্ডে ধনী গণের প্রতিনিধি রাজা প্রথম চার্লস ছিন্নমস্তক; ফরাসি দেশে, হতভাগ্য রাজা ষোড়শ লুই মশানে নীত ও শমন সদনে প্রেরিত; রুষিয়াতে, সম্রাট্ গুপ্ত ডিনামাইট প্রয়োগে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত। দরিদ্রের ৪র্থ অবস্থায়—নৃসিংহ দয়ার অবতার রূপে আবির্ভূত; যথা, দরিদ্র সূত্রধর-পুত্র ঈশা।

আর ধনীরও তিন অবস্থা দেখিতে পাইবে। ১ম অবস্থা, শৃগাল বা শার্দ্দুলবৎ—দুরাত্মা, প্রতারক, উৎপীড়ক ও খাদক। ২য় অবস্থা, তখন একটু জ্ঞান ও প্রীতির বিকাশ হইয়াছে। তখন মেষপালক বা গোপালকবৎ। তখন দরিদ্রের উপর উৎপীড়ন তত করেনা, তাহাকে পালন করিয়া দোহন করে। ৩য় অবস্থা, তখন ধনীর ধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ হয়, তখন ধনী ভ্রাতৃবৎ। তখন ধনী গরিবের মূর্খতা, অজ্ঞান, অনাহার প্রভৃতি দুঃখ দেখিয়া কারুণ্যে পরিপূর্ণ। তখন রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিলেও ধনী তাহা হইতে অবতরণ করিয়া দীন জনের সহিত ক্রমে সম্মিলিত হন; তখন লব্ধধন ত্যাগ করিয়া ধনী প্রমাণ করেন, ধন তুচ্ছ, ধর্ম্মই শ্রেয়। যথা, জগতে, বুদ্ধদেব,—কলিকাতায়, লালা বাবু। তখন রাজা ও ভিক্ষুক সমান। তখন প্রেমের প্লাবনে সব একাকার—বৃক্ষতলে সিংহাসনে বা। তখন ধর্ম্ম গরিবের বন্ধু, ধনীর বন্ধু। বুঝিলে গরিব ভাই, এক মাত্র ধর্ম্মই তোমার বন্ধু ও আমার বন্ধু; তোমারও পরিত্রাতা, আমারও পরিত্রাতা।

গরিব, তখন মস্তক প্রণত করিয়া বলিলেন,—আপনাকে প্রণাম করি। সহৃদয় ধনী উত্তর দিলেন,—আমি দেবতা নয়, তোমারই মত তুচ্ছ মনুষ্য। তুমি ধনতত্ত্ব বলিয়া একটা কথা শুনিতে পাইবে। তাহার সার মর্ম্ম তোমাকে বলিতেছি। ধনতত্ত্ব যতদিন ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত না হইবে, পৃথিবীর ধন যত দিন ধর্ম্মসম্মত প্রণালীতে বিভক্ত না হইবে, ততদিন জীবের দুঃখ বন্ধন হইতে মুক্তি নাই। কয়েকটা সাহেব, ইয়ুরোপে কারলাইল, রসকিন, টলস্টয়, কেন-ওয়ারদি, তাহাদিগের নাম অবশ্য তুমি জান না। তাঁহারা আরও কেহ কেহ এই সনাতন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন। পুরাকালে আর্য্য ঋষিরাও এই মূলমন্ত্র বুঝিয়া সমাজের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সূক্ষ্মভাবে দেখিলেই ইহা বুঝিবে। "হে দরিদ্র, ধর্ম্মের মন্দিরে জ্ঞান ও প্রীতি মন্ত্রে, দীক্ষিত হও। ধর্ম্ম ও

ধন, শিব ও শক্তি, হর ও গৌরীর শুভবিবাহ সম্পাদন হইবে। সে দিন ধনী ও দরিদ্রের অসাম্য উঠিয়া যাইবে। সেই দিন এমন কুমার প্রসূত হইবেন যিনি দারিদ্র্য স্বরূপ তারকাসুরকে অনায়াসে বধ করিবেন। হে দরিদ্র আইস, তুমি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, তোমাকে আমি আলিঙ্গন করি।

দরিদ্র। হে দেব, আমি তোমাকে আবার প্রণাম করি, যে জ্ঞান ও দয়া তোমাতে দেখিতে পাইতেছি, তাহাকে প্রণাম করি। তুমি বস্তুতঃ আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তুমি সবল, আমি দুর্ব্বল; তুমি জ্ঞানী, আমি মূর্খ। আমরা গরিবলোক, দুঃখ সাগরে ডুবিতেছি—জ্ঞানিও দয়ালু ধনী লোক, শিক্ষা দ্বারা আমাদিগকে জলের ভিতর হইতে টানিয়া না তুলিলে, আর কে তুলিবে, কে রক্ষা করিবে? বুঝিলাম দরিদ্রদিগের ত্রাতাগণের মধ্যে আপনি একজন। অদ্য হইতে আপনার দলস্থ হই লাম, আপনার শিষ্য হইলাম।

ধনী। ভাই বল, "ভগবতে নম"।
দরিদ্র। "ভগবতে নম"।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

মনু-সংহিতা ও মনুষ্য-সমাজ।

বেদ ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের প্রথম ও প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ। বেদ পাঠ করিলে ভারতীয় আর্য্যজাতির সভ্যতার প্রারম্ভ সময়ের ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, বাণিজ্যাদির অবস্থা জ্ঞাত হওয়া যায়। বেদে আর্য্যজাতির সামাজিক অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে;—কিন্তু সে বর্ণনা এত অপরিস্ফুট যে তাহা সহজে সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইবার নহে। অন্ততঃ তদ্দ্বারা তদানীন্তন আর্য্যসমাজের প্রকৃত অবস্থা অনুভূত হয় না। বেদের পরবর্ত্তী পুরাণ ও তন্ত্রের আলোচনা দ্বারাও উক্ত উদ্দেশ্য সফল হয় না। কেন না,—পুরাণ সকল ঐতিহাসিক ঘটনামূলক এবং তন্ত্র সমুদয় ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা পরিপূর্ণ। কেবল একমাত্র সংহিতাই বিশুদ্ধ সামাজিক চিত্রে চিত্রিত। প্রকৃতপক্ষে সংহিতাকারগণই (১) সমাজের সংস্থাপক,

(১) মন্বত্রি বিষ্ণু হারীত যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্ব সম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়নো বৃহস্পতিঃ॥
পরাশর ব্যাস শঙ্খ লিখিতা দক্ষ গৌতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজকাঃ॥

সংরক্ষক ও পরিপোষক। সংহিতার মুখ্য উদ্দেশ্য,—মনুষ্যের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যাবতীয় সংস্কার, সামাজিক বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের পরস্পর সম্বন্ধ, কর্ত্তব্য ক্রিয়াকলাপ, ভিন্ন ভিন্ন জাতির জীবিকা, ব্যবস্থা, রাজনীতি, শাসনপ্রণালী, প্রেত্যকর্ত্তব্য, ঔর্দ্ধদেহিক ব্যবস্থা ও বিবিধ আবশ্যক বিষয় ব্যাপারের বিধি ব্যবস্থাপন। সুতরাং প্রাচীন আর্য্যসমাজের অবস্থা পরিজ্ঞান জন্য সংহিতা যেরূপ উপাদেয় গ্রন্থ অন্য কোন গ্রন্থই সেরূপ নহে। সংহিতার মধ্যে আবার মনু-সংহিতাই প্রাচীন ও প্রসিদ্ধতম পুস্তক। প্রাচীন আর্য্যসমাজে মনুসংহিতার ন্যায় প্রামাণিক গ্রন্থ আর দৃষ্ট হয় না। ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব,—সর্ব্ববেদেই মনুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।—"যৎকিঞ্চিৎ মনুরবদৎ তদ্বৈ ভেষজম্।" বৃহস্পতি বলিয়াছেন :—"বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যংহি মনোঃস্মৃতং। মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতি ন প্রশস্যতে।"

অপরঞ্চ,—"তাবচ্ছাস্ত্রাণি শোভন্তে তর্কব্যাকরণানি চ।
ধর্ম্মার্থ মোক্ষোপদেষ্টা মনুর্যাবন্নদৃশ্যতে॥"

মহাভারতে উক্ত আছে :—

"পুরাণং মানবোধর্ম্মঃ সাঙ্গোবেদশ্চিকিৎসিতং।
আজ্ঞা সিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ॥"

বাস্তবিক মনুর ন্যায় মাননীয় গ্রন্থ ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় নাই। বেদের ধ...ত মনুর ধর্ম্মবিষয়ক মতের সৌসাদৃশ্য দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে বেদের পর-...র্ত্তী আর্য্যধর্ম্ম শাস্ত্রই মনুসংহিতা। সেই জন্যই উক্ত সংহিতাকে লোকে "মানব ধর্ম্ম-শাস্ত্র" বলিয়া পূজা করে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত মনিয়র উইলিয়মস্ (M. Williams) বলেন :—"মনু-সংহিতা অতি প্রাচীনকালের রচনা নহে; উহা খৃষ্টের জন্মের কিঞ্চিন্ন্যূনাধিক ৫০০ বৎসর পূর্ব্বের রচিত।" প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পণ্ডিত এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ (Elphinistone) সাহেব অনুমান করেন মনুসংহিতা খৃষ্টের জন্মের ৯০০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সর্ উইলিয়ম জোন্স্ (Sir William Jones) বলেন :—"মনুর শাস্ত্রগ্রন্থ খৃষ্টের জন্মের ১২৮০ বৎসর পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।" কিন্তু অধুনা পণ্ডিত প্রবর প্রফেসর মোক্ষমূলার (Prof. Maxmuller) ডাক্তার বুলার (Dr. Buller) প্রভৃতি মনস্বীগণ সিদ্ধান্ত

করিয়াছেন, ছন্দে লিখিত মনুসংহিতা যাহা এখন দৃষ্ট হয় উহা প্রকৃত প্রাচীন সংহিতা নহে। অত্যধিক প্রাচীনতা প্রযুক্ত পুরাতন-মানব-ধর্ম্ম-সূত্র বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। বহু চেষ্টার পরে যাহা আবিষ্কৃত ও সংকলিত হইয়াছে—ইদানীং তাহাই 'মানব-ধর্ম্ম-শাস্ত্র' বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু উহা সেই আদিম ধর্ম্মসূত্র নহে। (১)

Prof. Maxmuller বলেন :—"As to the Laws of Manu, which used to be assigned to a fabulous antiquity, and are so still sometimes by those who write at random or at second hand, I doubt whether, in their present form, they can be older than the the fourth century of our era, nay I am quite prepared to see an even later date assigned to them. I know this will seem heresay to many Sanskrit scholars, but we must try to be honest to ourselves. Is there any evidence to constrain us to assign the Manava Dharmasastra, such as we now possess it, written in continuous Slckas, to any date—anterior to 300 A. D.? and if there is not, why should we not openly state it, challenge opposition and feel graceful, if our doubts can be removed."—

(Vide, India what can it teach us.)

শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্ত বলেন :—"But the Dharmasutras of this ancient period, have a still further claim to our attention, because they are the originals which have been modified and copied and put into verse at a later age and transformed into those Law-books with which modern Hindus are familiar, such as Manu, Yajnavalkya &c. This was pointed out by Prof. Maxmuller thirty years ago, and the researches which

---

(১) "Manu's Dharma Sutra exists no longer, having been replaced by the later metrical code of Manu, which is no doubt based on the old Dharma Sutra."

Ancient India, Vo. II, P. 104.

"Among the Dharma Sutras which are lost and have not yet been recovered was the Manava Sutra or Sutra of Manu, from which the later metrical Code of Manu has been compiled."

Ancient India, Vol II. P. 8.

have been made since, have fully confirmed the fact. A world of conjectures and fancies about the code of Manu, being the work of legislator and rulers, has been exploded by this discovery and we now know what the so called Codes are and how and why they were framed. In there original Sutra form (often in prose, sometimes in prose and verse, but never in continuous verse like the latter Codes) they were composed just as the Srauta Sutras were composed."

আমরা সচরাচর দেখিতে পাই কতকগুলি শ্লোক পুরুষানুক্রমে সাধারণের অভ্যস্ত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহা কোন গ্রন্থ বিশেষে দৃষ্ট হয় না। সেই শ্লোকগুলি এখন কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক পুস্তকাকারে সংগৃহীত হইলে ভবিষ্যতে তাহা সংকলয়িতার রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে আশ্চর্য্য কি ? (১) মনু-সংহিতাও তদ্রূপ প্রাচীন কালাগত সামাজিক আইন সমূহের সার সংগ্রহ। পণ্ডিতবর মনিয়র উইলিয়মস বলেনঃ—"মনুসংহিতা ব্যক্তি বিশেষের রচিত নহে। উহা ভিন্ন ভিন্ন সময়ের বিভিন্ন পণ্ডিতের মত সমষ্টি।" এ অনুমান আমরাও সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি। প্রকৃতপক্ষে মনুসংহিতা কোন এক ব্যক্তির রচিত গ্রন্থ নহে। মনুও কোন এক ব্যক্তি নহেন;—উহা ভক্তি, গৌরব ও পুরাণত্ব প্রতিপাদক উপাধি মাত্র। শাস্ত্রেও বলে ভৃগু মনুর নিকট শ্রুত হইয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, সেইজন্য উহার নাম "মনু-সংহিতা।" আর 'মনু' শব্দটী যে আখ্যা মাত্র, তাহার প্রমাণ সংগ্রহের জন্য অধিক দূর যাইতে হইবে না; সমালোচ্য সংহিতাতেই মনুর পুত্র অপর মনুর উল্লেখ আছে।

অভিনিবেশ সহকারে মনুসংহিতা পাঠ করিলে প্রতীতি হয় উহা সমগ্র আর্য্য রাজ্যের সম্পূর্ণ শাসন বিধায়ক গ্রন্থ। সুতরাং উহা আর্য্য সমাজ গঠনের

(১) বিষ্ণুশর্ম্মা চাণক্য প্রভৃতির শ্লোকগুলি প্রায় এই প্রকারের। বর্ত্তমান সময়ে এডুকেশন গেজেটে ধারাবাহিকরূপে কতিপয় উদ্ভট শ্লোক প্রকাশিত হইতেছে। সংগ্রহকার যথেষ্ট অনুসন্ধান দ্বারা প্রায় সহস্র পরিমিত শ্লোক সংকলন করিয়াছেন। এখন উহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইলে সাহিত্য জগতে আদরের বস্তু হইবে সন্দেহ নাই। মুদ্রাঙ্কন সময়ে যে যে শ্লোক যে যে স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে এবং যাঁহার যাঁহার নামে প্রসিদ্ধ তৎ তৎ বিষয়ে কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত রাখিয়া প্রাচীন পণ্ডিতগণের গৌরব রক্ষা করা উচিত।

প্রথমাবস্থা হইতে প্রণীত হইয়া আসিতেছে। সময় ও সমাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে উহা সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণাবস্থায় পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই লিপিবন্ধন কোন্ সময়ে সম্পাদিত হইয়াছিল তাহা স্থির করা অতীব দুরূহ। আবার এইরূপ সংকলন ও লিপিবন্ধন কতবার হইয়াছে তাহারই বা স্থিরতা কি। কেন না, কতকগুলি বচন বৃদ্ধ মনু বচন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে বোধ হয় প্রথম লিপিবন্ধন সময়ে যেগুলি বাদ পড়িয়াছিল সেইগুলি উক্ত নামে কথিত হইয়াছে।

ইয়ুরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মনিয়র উইলিয়মস্ বলেন:—"মনু-সংহিতা বেদের অব্যবহিত পরবর্ত্তী গ্রন্থ নহে; মহাভারতের অন্ততঃ কিয়দংশও উহার পূর্ব্ববর্ত্তী। কেন না, মনু সংহিতায় লিখিত আছে:—'শ্রাদ্ধ কালে শ্রাদ্ধিয় ব্রাহ্মণ সমীপে বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, আখ্যান, ইতিহাস, পুরাণ ও খিলপাঠ করিবে।(১) এই যুক্তি আমরা সমীচীন বোধ করি না। কেন না তাঁহারই যুক্তি অনুসারে ইতিহাসের ন্যায় আখ্যান, পুরাণ ও খিল মনুর পূর্ব্বে রচিত বলিয়া ধরিতে হয়। কিন্তু গারুড় পুরাণে, ব্রহ্মপুরাণে এবং মহাভারতের অনেক স্থানে মনুর উল্লেখ আছে। সুতরাং মনু-সংহিতা ঐ সমুদয় পুরাণ এবং ইতিহাসের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ। অপিচ, মনু সংহিতায় এক সীমাবদ্ধ আর্য্যাবর্ত্ত ব্যতীত অন্য কোন স্থানের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু মহাভারতে উক্ত আর্য্যাবর্ত্ত ব্যতীত অনেক স্থানের উল্লেখ আছে। অপর, মহাভারত বর্ণিত সময়ে যে মনুক্ত প্রথানুযায়ী বিবাহাদি কার্য্য সম্পাদিত হইত তাহা মহাভারতের সুভদ্রা হরণ পর্ব্বাধ্যায়ে কৃষ্ণোক্তিতে এবং অনুশাসন পর্ব্বে ভীষ্মোক্তিতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় সুতরাং মনু-সংহিতা যে মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ তাহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। এতাবতা প্রমাণিত হইতেছে—বিলুপ্ত প্রাচীন ধর্ম্মসূত্র সম্বন্ধে কোন সন্ধান না পাওয়া গেলেও ছন্দ লিখিত আধুনিক ধর্ম্মসূত্র পুরাণাদির বহু পূর্ব্বে—খৃষ্ট জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ বিদ্যারঞ্জন।

---

(১) "স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েৎ পিত্রে ধর্ম্ম শাস্ত্রাণি চৈবহি।
আখ্যানানিতিহাসাংশ্চ পুরাণানি খিলানি চ॥"

সীতা।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান প্রান্তর। কাল প্রভাত।

কৃষকত্রয়।

১ম কৃষক। সুবৎসরটা এবার কিন্তু পড়েছে খুব খুড়ো।

২য় কৃষক। সুবৎসর! তা বোলে! গাঁয়ের যত বুড়ো বুড়ো
সবাই বলছে—"এমন আবাদ, ফসল এমনধারা,
কখনও ত বাপের জন্মে দেখিনিক তারা।"

৩য় কৃষক। হবেনাই বা কেন! যখন শ্রীরামচন্দ্র রাজা;
সীতা রাণী রাজলক্ষ্মী।

১ম কৃষক। পাঁচটি বছর হাজা
তারিপরে এমনি ফসল।

২য় কৃষক। এ অযোধ্যাধাম পুণ্যভূমি।

৩য় কৃষক। ধন্য রাজা।

সকলে। জয় সীতারাম।

[কৃষকগণের প্রবেশ ও অপরদিক হইতে রাজগুপ্তচরের প্রবেশ।]

গুপ্তচর। এরা সবাই ভারি খুসী।—রামের জয় রবে;
এবার দেখ্‌ছি আকাশজুড়ে তুমুল কাণ্ড হবে।
পৃথিবীটা এম্নি বটে. যেখানে যা ঘটে;
সেটা কিনা শেষে গিয়ে রাজার নামে রটে।
হল যদি অনাবৃষ্টি—রাজার অপরাধ;
হল যদি বর্ষাভাল,—রাজার ধন্যবাদ।
রাজ্যে শান্তি রৈল—তাতে রাজার পুণ্য খালি;
শত্রু এলো রাজ্যে সবাই রাজায় পাড়ে গালি;
সুস্থ কায়ে রাজার উপর সবারই সন্তোষ;
দেশে যদি মড়ক এলো—রাজা বেটার দোষ।

আমরা বেটা কেউই নইকি রাজা বেটাই সব ;
আজ যে শুনি আকাশজুড়ে রাজার জয়রব।

[একদল লোকের গাইতে গাইতে প্রবেশ ও প্রস্থান।]

ইক্ষ্বাকু কুলতিলক রঘুবর ধন্য চরিত সে রাম ;
তাপস তপো বিঘ্ন কর সব প্রবল রাক্ষসনাম
যাঁর ভুজবল বিনির্ম্মূলত ধন্য চরিত সে রাম।
যাঁর ভুজবল নিহত রাবণ বিজিত লঙ্কাধাম ;
যাঁর পদতল দলিত সাগর ধন্য ধন্য সে রাম।
গঠিত সুন্দর রাজ্য বিস্তৃত শান্তিময় সুললাম ;
যাঁর বিরচিত নীতিবিধি সব ধন্য চরিত সে রাম।
প্রজার রঞ্জক, প্রজানন্দন বিহিত কর অবিরাম ;
স্বার্থবর্দ্ধক, সত্যপালক ধন্য ধন্য সে রাম।
দীর্ঘভুজ আজানুলম্বিত শান্ত সৌম্য শ্যাম ;
বিশ্বরবি অভিরাম সুন্দর ধন্য চরিত সে রাম।

গুপ্তচর। বলছিলাম না ? রাক্ষসেরা মোলো নেহাৎ গেরোয়
তাতে কিনা পরিশেষে রাজার নামটাই বেরোয়
লক্ষ্মণেরও বীরত্বে ত মোলো মেঘনাদ
কপী কুলও মোলো—হলো রামের ধন্যবাদ—
—এই যে এরা কারা কারা আসে আবার এই পাড়ায়
এঃ যে ভারি চেঁচাচ্ছেসব।—একটু সরে' দাঁড়াই।

[অন্তরালে অবস্থিতি]

[একদল লোকের প্রবেশ]

১ ব্যক্তি। রাজার সভার খবর রাখো।
২ ব্যক্তি। না না, কি ? কি খবর ?
৩ ব্যক্তি। শুনি শুনি বল নাহে
১ ব্যক্তি। কথা ভারি জবর
শুন্‌লে তোমরা অবাক হবে।
৪ ব্যক্তি কথাটা কি শুনি

১ ব্যক্তি। শুন্‌বে ? তবে শোন ! শোন !—সেদিন যত মুনি
রাজার কাছে এসে কিনা এমনি কোরে দাঁড়ায় !
—দেখ্‌লেই আমার গাটা জ্বলে যত হতচ্ছারায়—
বল্লে কিনা—শুনছো বটে—বল্লে কি না সীতা
ঐ যে সীতা—বল্লে যে তাঁর রাবণ বেটা পিতা।

২ ব্যক্তি। বল কিহে ?

১ ব্যক্তি। বলি কি হে !

৩ ব্যক্তি। গাঁজা খুরি

৪ ব্যক্তি। আসল !

৫ ব্যক্তি। করা উচিত ঋষিদের এ গাঁজার উপর মাসুল।

গুপ্তচর। এ কথাটা নতুন বটে।

১ ব্যক্তি। আবার শোন বলি—
পরের দিনে কিলি বিলি বাড়ির অলি গলি—
মর্কট এবং বানরেতে গেল কিনা ছেয়ে
রাজার যত সাবেক সখা তাদের সঙ্গে ধেয়ে
রাজার গিয়ে কোলাকুলি দেখে বলব কিরে
হাস্‌তে হাস্‌তে হাস্‌তে গেল পেটের নাড়ী ছিঁড়ে-

২ ব্যক্তি। দেখছিলাম না তাদের সেদিন রাস্তা দিয়ে যেতে ;

৩ ব্যক্তি। যাচ্ছিল কি তারাই বটে কলা খেতে খেতে ?

১ ব্যক্তি। আবার শোন—দুদিন পরে, এমনি সময় দুপর,
কিম্বা এরির একটু আগে, রাজার সভার উপর
এল একটা ভীষণ ব্যাপার, বিভীষণ তার নাম
রাবণের সে ভায়েরা ভাই। তারে গিয়ে রাম
নিয়ে গেলেন অন্তঃপুরে ;—দেখা কল্লেন রাণী।

২ ব্যক্তি। সেটা রাজার উচিত হয় নি—

১। ব্যক্তি। নিজে নাহি জানি
পরের ব্যাপার শোনা কথা।—সীতার বদন খানি
হয়ে গেল এতটুকু—কালীবর্ণ রাণী।

দেখে বল্লে লঙ্কাপতি " বিনিশ্চিত থাক,
কিছু বলিনিক বাণী, কিছু বল্‌ব নাক ।"

২ ব্যক্তি । ইরির ভিতর এত ব্যাপার ।

৩ ব্যক্তি । বাবা সবাই সমান ।
কারু না হয় প্রমাণ আছে কারু নেইক প্রমাণ
সাধু এবং পাপীর মধ্যে তফাৎ মাত্র এই—
এঁদের বাবা প্রমাণ আছে ওঁদের প্রমাণ নেই

৪ ব্যক্তি । হতেও পারে ।

৩ ব্যক্তি । অসম্ভব কি !

১ ব্যক্তি । জানেন ভগবান্
এটা যেন রটে নাক ।

২ ব্যক্তি । না না । রাম ! কাণ
দিয়েছেন যে বিধি দুটো শুনে যেতে হয় ।

৪ ব্যক্তি । চল চল বাড়ি চল ।

৩ ব্যক্তি । হরি ! দয়াময় !
পৃথিবীতে কিনা বাবা, সবাই বামী রামী
কেবল কিনা বাবা ধরা পড়েছিলাম আমি ।

[ব্যক্তিদিগের প্রস্থান]

গুপ্তচর । রাজার বাড়ীর মধ্যে থেকে আমরা যা না শুনি
দেওয়াল ফুঁড়ে শোনেন সেটা এঁরা যন্ত গুণী ।
বলছিলাম না ?—কথায় কথায় রাজার যশোগান ।
কথায় কথায় রাজার নিন্দা রাজার অপমান ।
বিনা গুণে প্রশংসা ও নিন্দা বিনা দোষে
বিনা কারণ স্তুতি কুৎসা জগৎশুদ্ধ ঘোষে
রাজার কাছে বলব নাকি এ কথাটা গিয়ে
কাজ কি যত ছোট লোকের ছোট কথা নিয়ে ?

[প্রস্থান] ।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—প্রাসাদ প্রান্তস্থ উপবন। কাল—জোৎস্না রাত্রি।

রাম সীতা।

রাম। সরযূর তীর ; অতি অতি ধীর শিশির শীতল সমীরণ ;
উড়িছে চকোর সুধাপানে ভোর ; মর্ম্মর মুখর উপবন ;
ভরা পরিমলে নিকুঞ্জে, বিরলে হেসে ফুল ঢলে ফুলগায় ;
যেন দিবা শেষে, পরীকুল এসে স্নান করে এই জোছনায় ;—
সুধার তরঙ্গে সুললিত অঙ্গে ঢালি, নানা রঙ্গে,—কথা কয়
সখী সনে সখী—প্রেয়সি নিরখি ধরণী আজ কি মধুময়।

সীতা। মনে পড়ে প্রিয় ?—ঢালিত অমিয় এমনি চন্দ্রমা সেই দিন !
গোদাবরী তীর, সে পর্ণকুটীর ;—সেই দিন আর এই দিন।

রাম। কোন্ দিন ভালো ?

সীতা। হৃদয়ের আলো ! যখনই তুমি কাছে রও,
তখনই ভালো, সেই পুরাকালো ভালো, ভাল নাথ এখনও।
যবে কাছে থাক, কিছু দেখি নাক, তোমাতেই রহি মগন ;
নাথ ! তুমিভরা আমরি এধরা, তুমি ভরা ওই গগন।
—অহো কি কঠোর সে কদিন মোর লঙ্কায় ছিলাম যতদিন।
বরষের মত মাস হত গত, যাইত মাসের মত দিন।
তখনওত নাথ ! এমনিই চাঁদ মাথার উপরে উঠিত ;
মলয় পবনে শিহরি, হরষে অশোকের কলি ফুটিত ;—
তবে কেন নাথ ! কি দিন কি রাত হুহু করে জলে'যেত প্রাণ ?
তবে কার লাগি নিশিনিশি জাগি' হইত না যেন অবসান !
নয়নের জলে অবসান হলে' কোন মতে নিশা ; নীলিমায়
উঠিলে তপন, জাগিত এ মন নিত্যই নূতন নিরাশায়।
বরিষার ঘন-শীতল পবন বাড়াইত শুধু এ হুতাশ ;
শরতের শশী, উঠিত যেন সে করিতে আমারে উপহাস,

বসন্তে এ প্রাণে কোকিলের গানে ঢালিত যেন সে হলাহল ;
মলয়ের বায় বিঁধিত এ গায়, দূষিত ঠেকিত পরিমল !
শত শত চেড়ী সদা মোরে বেড়ি রহিত, বসন্তে কি শীতে ;
কাটাত দিবস হইয়া বিবশ উৎসব করিত নিশীথে :
বিকট হাসিত, কভুবা শাসিত, কভুবা করিত পরিহাস ;
তারা বুঝিতনা এ তীক্ষ্ণ যাতনা এ তীব্র বেদনা বারো মাস।
শুধু নিরুপায় অনন্ত দয়ায় চাহিয়া রহিত নীলাকাশ ;
করিতই শুধু নিজমনে ধূধূ বারিধির নীল জলরাশ !
অহো কি কঠিন সেই কয়দিন ! কি ঘোর যাতনা দিবারাত।
এখনো তা স্মরি সভয়ে শিহরি, কেঁপে কেঁপে উঠি প্রাণনাথ।

রাম। কাছে এস, কি এ মিছা ভয় প্রিয়ে ? কেন এখন ও ভয় পাও ?
আছো মোর কাছে ! সে দিন গিয়াছে ; প্রেয়সী সে সব ভুলেছ ?
কি হেতু আশঙ্কা ? এ নহেত লঙ্কা ; নিহত রাবণ পাপে তার ;
এ অযোধ্যা ধাম, এ তোমার রাম ঘেরিয়া তোমায় চারিধার।
তার বাহু দিয়ে ; নহে সেও প্রিয়ে তোমার রক্ষণে বল হীন।—
এনোনাক মনে সেই দুঃস্বপনে।—ভুলে যাও প্রিয়ে সেই দিন !

সীতা। না না না, জানিনা কেন তা পারিনা কেন তবু চিত্ত সদা ধায়
সেইদিন পানে, বারণ না মানে ; দেখি তবু সে বিভীষিকায়
বিকল হৃদয়ে যেন মুগ্ধ ভয়ে, ব্যাধবাণ বিদ্ধ হরিণীর
মত, আততায়ী পানে ফিরে চাহি, শুনি ধ্বনি তার মুরলীর।
অথবা যেমন পান্থ কোন জন ব্যাঘ্রের তাড়নে দ্রুত ধায়,
গৃহদ্বারে আসি, তবু অবিশ্বাসী তবু ভয়ে ভয়ে ফিরে চায়।
দুর্দ্দিন লঙ্কার হারাইয়া তার শীকার খুঁজিয়া অযোধ্যার
দ্বারে আসি ধেয়ে যেন বাধা পেয়ে, ঘুরিছে ঘেরিয়া চারিধার
এপুরীর ; চায় শুদ্ধ সুবিধায় সদাই আমাকে তোমার ও
হৃদয় হইতে ছিনিয়া লইতে—তাই যদি তুমি কভু হও
নেত্র অন্তরাল ক্ষণমাত্রকাল, ভয় হয় পাছে পুনরায়
তোমাকে হারাই ; শিহরি সদাই কি দিবায় তাই কি নিশায় !

রহিলেই একা, ভাবি বুঝি দেখা পাবনাক আর প্রাণনাথ—

রাম। না না প্রাণেশ্বরি ! সদা বক্ষে ধরি রাখিব তোমারে মোর সাথ
র'বে নিরবধি, পাইয়াছি যদি, প্রেয়সী !

সীতা। জানিনা পরমেশ !
কি কপালে আছে ! টেনে লও কাছে আরো কাছে বুঝি এই শেষ,
শেষ দেখা নাথ

রাম। একি অশ্রুপাত, একি বিকম্পিত কলেবর !
ভয়াকুল হেন এ চাহনি কেন ? কেন পাণ্ডুমুখ ?

সীতা। [দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহকারে] প্রাণেশ্বর !

রাম। চিত্ত প্রেয়সীর কি হেতু অধীর হেন পূর্ব্বে তাহা দেখিনাই।
কে হানিল অদ্য সংশয়ের বাণ ও কোমল বক্ষে, বল তাই।
এ গদগদ ভাব এত ঘনশ্বাস, কেন কাঁপে ঘন বক্ষস্থল ?
ক্রুর বাষ্প হেন নীলনেত্রে কেন, পড়ে গড়াইয়ে অশ্রুজল।

সীতা। টেনে লও বুকে

রাম। গৃহ অভিমুখে এখন প্রেয়সী চল যাই
রজনী গভীর ; সরযূতীর ঢাকিয়া আসিছে কুয়াশায় ;
অই দেখ ঢুলে ঢুলে পড়ে ভূমে সমীরণ ; চন্দ্র অস্ত যায়
দূর কর তবে এ কল্পনা সবে।—শয়ন মন্দিরে চল যাই।

[নিষ্ক্রান্ত]

প্রেমিক শমরীয়।*

আমাদের মধ্যে বিস্তর লোক এরূপ বিশ্বাস করেন যে ইউরোপের খৃষ্টান জাতি সমূহ কেবল আসুরিক বল ও জড়বিজ্ঞানাদির চর্চ্চা দ্বারা পৃথিবীর উপর আধিপত্য করিতেছেন ; দয়া ধর্ম্মের বড় ধার ধারেন না। শ্বেতকায়গণ বিশেষ ইংরাজজাতি নিতান্ত নিষ্ঠুর, ধর্ম্মহীন ; সমবেদনা সহানুভূতি আদৌ জানেন না। দুঃখীর দুঃখে কাতর হইয়া তাহার দুঃখ নিরাকরণে উঁহারা কোনপ্রকার চেষ্টা

* The Good Samaritan.

করেন না; নিজের ও নিজের পরিবারবর্গের ধান্দাতেই তাঁহারা সর্ব্বদা ব্যস্ত, অন্যের দিকে তাকাইবার তাঁহাদের অবকাশ মাত্র নাই;—এইরূপ অনেকেরই ধারণা। সাধারণভাবে দেখিতে গেলে, এদেশে অধিকাংশ ইংরাজ যেভাবে জীবন যাপন করেন, তাঁহাদের হিসাবে বিচার করিতে গিয়া আমরা এরূপ বিশ্বাসে উপনীত হইতে বাধ্য। গৌরাঙ্গ দেখিলেই ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতার মনে একটা ভয় বা সঙ্কোচের কারণই উপস্থিত হয়, যেন মনে হয়, সাদা চামড়া হইলেই কাঠিন্যের অবতার। আমাদেরও বহুকাল পর্য্যন্ত শ্বেতচর্ম্মের প্রতি এইরূপ একটা বিদ্বেষ বদ্ধমূল ছিল। বিলাত যাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাজপথে চলিবার সময় ধবলকায় দেখিলেই শতহস্ত অন্তর দিয়া হাঁটিতাম;—কি জানি নিকটস্থ হইলে পাছে কোনরূপ বিভ্রাটে পড়ি। পরস্পরের মধ্যে পরিচয়ের নিতান্ত অল্পতা হেতুই এরূপ অপ্রেমের ভাব পরিলক্ষিত হয়।

কয়েক বৎসর হইল কলিকাতার জেনেরল এসেম্ব্লি কালেজের হলে ইংলণ্ডের লোকের মধ্যে খৃষ্টীয়ধর্ম্মের প্রভাবসম্বন্ধে তদনুকূলে কিছু বলিয়াছিলাম; তজ্জন্য সভাস্থলেই আমাকে বিলক্ষণ তিরস্কৃত হইতে হইয়াছিল। শুধু সাধারণ অজ্ঞ লোকে প্রতিবাদ করেন নাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারী যুবক অতি মধুর ভাষায় এরূপ কতকগুলি কথা প্রচার করিলেন যাহা দ্বারা আমার অভিজ্ঞতা একেবারে পাঁচকড়া মূল্যের বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল! তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন যে ইংলণ্ডের বিস্তর লোক খৃষ্টের নাম পর্য্যন্ত কখন শুনে নাই, এরূপ তিনি পাঠ করিয়াছেন। হইতে পারে, এরূপ লোক ইংলণ্ডে আছে বা কিছু দিন পূর্ব্বে ছিল, কোন নাটক নবেল হইতে তিনি ওরূপ সংবাদ সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু ঐ ভিত্তির উপরে একটা সমগ্র জাতির প্রতি শ্লেষ স্থাপন করা তাঁহার মত শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে কতখানি উচিত হইয়াছিল, জানি না। যাহা হউক উহা শুনিয়া আমি ত অবাক হইলাম; অথচ শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেই বিশেষ আনন্দ অনুভব করিলেন। অবশ্য সে দিবস আমার অনেক গুরুতর অপরাধ হইয়াছিল; যেহেতুক আমি সমবেত ভ্রাতৃগণের গোচরার্থ বিলাতের দৈনিক জীবনের ব্যবস্থা প্রভৃতি অনেক বিষয়ে ইংরাজ জাতির সদ্‌গুণের ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম। আমার উদ্দেশ্য এই ছিল যে ওরূপ ভাবে অপর জাতির সদ্‌গুণালোচনা করিলে আমাদের মনে ঐ সকল বিষয়ে উৎকর্ষলাভের আকাঙ্ক্ষা উত্তেজিত হইতে

প্রায়ে দুর্ভাগ্যবশতঃ ফল বিপরীত হইল। বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগকে নানা কারণে জগতের নিকট মাথা হেঁট করিয়া থাকিতে হইয়াছে; আমরা এখন যেরূপ অবনত অবস্থায় পড়িয়াছি তাহা হইতে উঠিয়া সভ্য জগতের সহিত সমকক্ষতা করিবার শক্তি লাভ করিতে গেলে আমাদের আহার বিহার পরিচ্ছদাদি জীবন যাপনের ব্যবস্থা সমূহের দেশকালোপযোগী পরিবর্ত্তন নিতান্ত আবশ্যক—এই শ্রেণীর প্রস্তাব সমূহ অনেকের নিতান্ত, কটু বোধ হইল। শেষটা উপাধিধারী অনুপাধিধারী বিস্তর শ্রোতার এ পরিমাণে উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছিল যে কেহ কেহ আমার বক্তৃতার মধ্যেই চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"আমরা যে এখনও সমগ্র জগতের সভ্য জাতির শীর্ষস্থানীয় হইয়া আছি, উহা একশত বার সত্য !!! এক শত বার সত্য !!!" "আমরা সমস্ত সভ্য জাতিকে এখনও শিক্ষা দিতেছি।" ইত্যাদি। আসল কথা, শ্বেতাঙ্গের প্রতিষ্ঠায় খড়্গহস্ত। শেষে স্পষ্টই শুনিলাম যে তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে আমি ইউরোপের নিন্দা করিয়া আমাদের যশোগান করিব। অবশ্য আমার ইচ্ছা ছিল যে প্রাচীন আর্য্য মহাত্মাগণের জীবন ও ব্যবস্থা সমূহের বিষয়ে প্রশংসা দ্বারা উপসংহার করিব। কিন্তু কপাল-গুণে আমাকে ততদূর অগ্রসর হইতে দেওয়া হইল না—গোড়াতেই বিদেশীয়ের সদ্‌গুণে প্রতিষ্ঠা অনেকের কর্ণে এতই বিষবৎ হইল যে আমাকে মাঝখানে বক্তৃতা বন্ধ করিতে হয়। নিজের গুণ ও পরের দোষ শতমুখে প্রচার করিবার প্রবৃত্তি আমাদের আজকাল বড়ই প্রবল দেখা যায়। নিজের গুণ ও পরের দোষ দেখিবার কোন দরকার নাই; বরং তাহাতে নিজেদের বিশেষ ক্ষতি, ইহা আমরা একেবারেই বুঝিতে অক্ষম হইয়াছি। তাহা না হইলে আমরা অবনতই বা হইব কেন? অবনতির অবস্থার উহা একটা প্রধান লক্ষণ।

যাহা হউক "গুড সামারিটানের" কথা যে কেবল বাইবেল গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ আছে, কার্য্যতঃ খৃষ্টীয় জগতে দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহার প্রতিবাদ স্বরূপ পাঠকবর্গের সম্মুখে মধ্যে মধ্যে দুই একটী জীবন্ত ঘটনার উল্লেখ দ্বারা দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিতে চেষ্টা পাইব। বোধ হয় অনেকেই "গুড সামারিটানের" গল্পটী জানেন তত্রাপি উহা এখানে বাইবেল হইতে অবিকল অনুবাদ করিয়া দিলাম।

'আর দেখ, এক জন ব্যবস্থাবেত্তা (আইনজ্ঞ) উঠিয়া তাঁহার পরীক্ষাচ্ছলে

কহিল, "কি হইলে আমি অনন্ত জীবনের অধিকারী হইব ?" তাহাকে কহিলেন ব্যবস্থায় কি লেখা আছে ? কিরূপ পাঠ করিতেছ ? সে উত্তর করিয়া কহিল "তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত শক্তি, ও সমস্ত চিত্ত দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে এবং তোমার প্রতিবাসীকে আত্মতুল্য প্রেম করিবে। তিনি তাহাকে কহিলেন, "যথার্থ উত্তর করিলে, তাহাই কর, তাহাতেই রক্ষা পাইবে।" কিন্তু সে আপনাকে নির্দোষ দেখাইবার বাঞ্ছায় যীশুকে বলিল, "ভাল আমার প্রতিবাসী কে ?" যীশু উত্তর করিলেন, "এক ব্যক্তি যেরুজেলম হইতে যেরিকোতে যাইতেছিল। পথিমধ্যে দস্যুদলের হস্তে পড়ে; তাহারা তাহার সমস্ত কাপড় চোপড় পর্য্যন্ত খুলিয়া লয়, এবং তাহাকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করত মৃতপ্রায় অবস্থায় ফেলিয়া পলায়ন করে। ঘটনাক্রমে এক জন যাজক সেই পথ দিয়া যাইতেছিল, সে তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া পথের অন্য পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। পরে এক জন লেবীয় সেইভাবে উক্ত স্থান দিয়া চলিয়া যান। শেষে একজন শমরীয় সেই পথে উপস্থিত হইয়া করুণার্দ্রচিত্তে আহত ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল, এবং নিকটে গিয়া তাহার ক্ষত স্থান সমূহে তৈল ও দ্রাক্ষারস ঢালিয়া দিয়া নেকড়া জড়াইয়া দিল। তৎপরে নিজ বাহনের উপর স্থাপন করিয়া এক পান্থশালায় লইয়া গিয়া তাহার অনেক সেবা শুশ্রূষা করিল। পর দিবস পান্থশালার কর্ত্তাকে দুইটী স্বর্ণমুদ্রা দিয়া বলিল, "এই ব্যক্তির যত্ন করিও, তাহাতে এতদপেক্ষা অধিক যাহা কিছু ব্যয় হয় আমি ফিরিয়া যাইবার সময় তোমাকে দিয়া যাইব।"—তোমার কেমন বোধ হয়, ঐ তিন জনের মধ্যে কে ঐ দস্যু হস্তে আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতিবাসীর কার্য্য করিল ? সে কহিল, যে তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিল সেই। তখন যীশু কহিলেন "তুমিও গিয়া সেইরূপ কর"—লুক্ ১০ম, ২৫—৩৭।

সুবিশাল লণ্ডন নগরে কে কাহার খোঁজ করে ? এরূপ লোকারণ্যের ভিতর নিজের মাথা ঠিক রাখাই মস্কিলের কথা পরের ভাবনা কে ভাবিতে পারে ? কিন্তু সেখানে বিস্তর লোক পরের ভাবনা ভাবিতেছে, এবং ধর্ম্মগ্রন্থে যাহা পাঠ করে জীবনের কার্য্যে তাহা পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। নিম্নলিখিত জীবন্ত ব্যাপারটী তাহার একটী উদাহরণ।

বৃটীশ সাম্রাজ্যের রাজধানীর নিতান্ত একটা অন্ধকার গলিতে একখানি অতি

ক্ষুদ্র গন্ধবণিকের দোকান।* দোকানদার তিন চারি মাস হইল এক বিধবা পত্নী রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। অসহায়া অবলার স্কন্ধে চাপাইয়া গিয়াছেন এক তিন বৎসরের পুত্র, আর দিয়া গিয়াছেন পাঁচ সাত জন পাওনাদার মহাজন। দোকানখানি অর্থাভাবে রক্ষা করা কঠিন, তার উপর ঋণদায়; এই অবস্থায় বিধবা অপোগণ্ড শিশুকে কোলে করিয়া কেবলই কাঁদে আর ভগবানকে ডাকে। এমতাবস্থায় বালক একদিন সন্ধ্যাকালে দোকান ঘরের টেবিলের উপর বসিয়া খেলা করিতেছে, হঠাৎ একটী প্রৌঢ় ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে সম্বোধন করত বলিলেন, "একা বসিয়া আছ। তোমার মা কোথায়? তাঁহাকে শীঘ্র ডাক, আমার বিশেষ প্রয়োজন।" ক্ষণমাত্র তাঁহার সৌম্য মুখমণ্ডলের প্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া বালক তাড়াতাড়ি টেবিল হইতে নামিয়া ভিতরের ঘরে প্রবেশ করত উচ্চৈস্বরে বলিল, "মা! একজন দয়ালু ব্যক্তি তোমাকে ডাকিতেছেন"। আশ্চর্য, আগন্তুকের প্রফুল্ল মুখশ্রী হাবভাব ও ঐ কয়টী কথাতেই দেবোপম শিশুর মনে ছাপ পড়িয়াছে, লোকটী দয়ালু প্রেমিক। বালকের উক্ত কথাতে মহাত্মার মুখে একটু হাসির ভাব আইল, তদবস্থাতে তাঁহার সম্মুখে বিধবা উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়ের কি প্রয়োজন?"

উত্তর—"এই পল্লীতে আমি শুনিলাম, তুমি বিষম দায়গ্রস্ত। উদ্ধারের এই একটী উপায় আছে।" বলিয়া টেবিলের উপর এক তোড়া গিনি রাখিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বগল হইতে একখানি নূতন বাইবেল লইয়া রমণীর হস্তে অর্পণ করত বলিলেন, "আর এই পুস্তকখানি।" "থলিটী তোমার দোকান রক্ষ করিবে, আর পুস্তকখানি তোমার আত্মার রক্ষার পথ প্রদর্শন করিবে। জগদীশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া থাক। গুড্ বাই" দেবদূত সামারিটান প্রস্থান করিলেন। আর ইহজন্মে পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ নাই।

পঁচিশ বৎসর পরে উক্ত বালক ইংলণ্ডের কোন পল্লীগ্রামের গির্জায় পাদরী নিযুক্ত হইয়া তথায় প্রথম রবিবারের উপদেশের প্রারম্ভে বলিলেন "আমি তখন নিতান্ত শিশু; মাতার নিকট শুনিয়াছি, কোন অপরিচিত ব্যক্তির দয়াতে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন—তাঁহার দয়াগুণে জননী ঋণ মুক্ত হন, এবং পরিত্রাতা ভগ-

* Grocer's shop বাঙ্গলা প্রতিশব্দ না জানায় "গন্ধবণিকের দোকান" বলিলাম।

বানকে লাভ করেন। সেই মহাপুরুষকে আমরা একবার মাত্র দেখিয়াছিলাম, জীবনের আর কখন তাঁহার দর্শনলাভ আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। কিন্তু আমরা কোন কালে তাঁহার ও তাঁহার পরিবারবর্গের আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা করিতে বিস্মৃত হই নাই। তিনি বাস্তবিকই প্রেমিক সমারিটান ;—কোন প্রকার বাক্যব্যয় না করিয়া কেবল একটীমাত্র মহৎ কার্য্য দ্বারা তিনি আমাদের আত্মাকে ঈশ্বরের দিকে ধাবিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।" উপাসনা কার্য্য সমাপ্ত হইলে উপাসকমণ্ডলীর একজন বৃদ্ধ উঠিয়া বলিলেন ;—"মহাশয় যাঁহার কথা উল্লেখ করিলেন তিনি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর ; কয় বৎসর হইল স্বর্গগত। তিনি আপনার মাতার একজন প্রধান পাওনাদার ছিলেন। যে দিন তিনি আপনাদের দোকানে যান সেই দিন প্রাতে কোন ধর্ম্মগ্রন্থে এই কয়টী কথা পাঠ করিয়া তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হন, "পরম পিতা ঈশ্বরের নিকট প্রকৃত পবিত্র ধর্ম্ম এই—পিতৃহীন এবং বিধবাদিগের দুঃখ দূর করা।" তদবধি তিনি বিস্তর সদনুষ্ঠান করেন ; এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে এই গির্জা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আজ আপনি তাহার পাদরী।"

পাঠক এখন দেখুন, এই জীবন্ত ঘটনাসমূহ অদ্ভুত উপন্যাস, নাটক, নবেলকে হারাইয়া দেয় কি না? আশ্চর্য্যকর্ম্মা বিধাতার লীলা অদ্ভুত। অবশেষে ঐ বালক সেই মহাত্মার স্থাপিত গির্জায় পাদরী :—আর কি চাই !!! দয়ার কার্য্যে দয়াময় এই প্রকার বিচিত্র লীলাই প্রকটিত করিয়া থাকেন। ধন্য তাঁহার মহিমা !

দয়াপ্রার্থী সেবক—

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

তবু।

দীন তুমি হীন তুমি তুচ্ছ ধূলি সম
তবু প্রিয়তম
রাজরাজেশ্বর তুমি চিরপূজ্য মম।

মূর্খ তুমি নিরক্ষর বর্ণজ্ঞান হীন
তবু চিরদিন
আমার নিকট তুমি পণ্ডিত প্রবীণ!

রূপ নাহি, শোভা নাহি, তুমি কদাকার
তবু প্রাণাধার!
আমার নিকট তুমি, চির সুকুমার!

দিনান্তের ভিক্ষালব্ধ শাক-অন্ন তব,
ওগো অভিনব
তাই মোর রাজভোগ, দাও সুখে লব :

জীর্ণ পত্র আচ্ছাদিত কুটীর তোমার
সেই সে আমার
কাঞ্চন প্রাসাদ সম, শান্তির আগার!

বৃক্ষতলে তৃণরাশি, তোমার সকাশে,
তব সহবাসে,
কুসুম-শয়ন সম সুষমা, বিকাশে।

কি বেদনা, কি যাতনা কিবা সে বিপদ
ওগো স্নেহাস্পদ!
তুমি যদি কাছে থাক, সব ত' সম্পদ।

যে বা তুমি হও নাথ ধরার মাঝার
সর্ব্বসুখসার।
থাক্ বা না থাক্ কিছু হে প্রিয় তোমার,

তবু তুমি সব মোর সর্ব্ব কামনার
সব সাধনার
তুমিই সে সফলতা—দেবতা আমার।

শ্রীতমাললতা বসু।

মধুরিমা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দশ বৎসর অতীত হইল, পিশিমা এক দিন জিদ করিতে লাগিলেন যে কাশীধাম যাত্রা করিতে হইবে। শচীন্দ্রনাথ অগত্যা কাশী যাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। কাশী যাইবার দিন স্থির হইল। আগামী কল্য পিশিমাকে লইয়া শচীন্দ্র কাশীধাম যাত্রা করিবেন, মধুরিমার মনে বড় আঘাত লাগিল, সে বলিল মা, আমাকে লইয়া চল। বৃদ্ধা বলিলেন যে, সেখানে তুমি যাইয়া থাকিতে পারিবে না, নীলিমার কাছে থাক আবার আমি শীঘ্রই আসিব। পীতাম্বর দাদা তোমার পিতার খোঁজে অনেক লোক লাগাইয়াছেন, খবর পাওয়া গেলেই তোমাকে তিনি দিয়া আসিবেন ইত্যাদি বুঝাইয়া মধুরিমাকে পীতাম্বর বাবুর বাটীতে পাঠাইয়া আহারাদি করিয়া সকলে নিদ্রা গেলেন।

প্রভাত হইল। সরস্বতীপুরের রাস্তা ঘাটে ক্রমশঃ আলোক ছড়াইয়া পড়িল। মধুরিমা ধীরে ধীরে অন্দরের দ্বার খুলিয়া শচীন্দ্রনাথের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পিশিমা সবে উঠিয়া বারান্দায় বসিয়া হরিনাম করিতেছিলেন, এমন সময়ে মধুরিমা অতি ধীরে এক পা দুই পা করিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, তিনি বলিলেন "আয় মা, আজ তোর মুখখানা অত মলিন কেনরে? মধুরিমার চক্ষু ছল ছল করিতেছিল, সে অনিমেষ নয়নে পিশিমার মুখপানে চাহিয় রহিল, পিশিমা তাহাকে বসিতে বলিয়া স্নান রন্ধন ইত্যাদির চেষ্টায় চলিয়া গেলেন, মধুরিমা উঠিয়া শচীন্দ্রের গৃহে গেল। শচীন্দ্র একমনে পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। মধুরিমা মৃদু-পাদ-বিক্ষেপে আসিয়া নিকটে চুপ করিয়া দাঁড়াইল, তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না। বালিকা মধুরিমা শচীন্দ্রকে দেখিতে প্রত্যহ ৫।৬ বার করিয়া আসিত, শচীন্দ্র আহার করিতে বসিলে পাখা লইয়া তাড়াতাড়ি বাতাস করিতে যাইত। যখন সন্ধ্যা রাত্রিতে বাতি জ্বালিয়া শচীন্দ্র টেবিলে হাত রাখিয়া বঙ্কিম ভাবে হেলিয়া পড়িতেন, বালিকা স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত, দিনে দিনে, পলে পলে, বালিকার হৃদয়ে শচীন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি গাঢ়তর অঙ্কিত হইতেছিল, সে সরলা বালিকা কি জানে যে তাহার জীবনের কি ভাবে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল। সে নিত্য দেখে আজও

তেমনি দেখিতেছে বটে, কিন্তু মনটা বিষাদ ভরা। শচীন্দ্র পড়িতে পড়িতে একটা কিসের শব্দে মুখ ফিরাইলেন; দেখিলেন, প্রতিমার মত স্থির মূর্ত্তিতে মধুরিমা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। শচীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন কি মধুরিমা? তুমি কখন এলে? মধুরিমা বলিল, আজ কি তোমরা সত্যই কাশী চলিলে? শচীন্দ্র বলিলেন, হাঁ, তোমার মনেকি বড় কষ্ট হচ্ছে? কেন আমিতো ফিরিয়া আসিব? এইবার মধুরিমার চক্ষু জলে ভরিল, সে সেখান হ'তে চলিয়া গিয়া আম্রতলায় দাঁড়াইল, কুকুরটা তাহাকে দেখিয়া কোলে উঠিবার জন্য লেজ নাড়িতে লাগিল,—সে দিন মধুরিমা তাহাকে আদর করিল না, দেখিয়া সে বেচারী ফিরিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল, সকলের আহারাদি হইলে মধুরিমাও পিশিমার নিকটে বসিয়া আহার করিল, বেলা ১২ টা বাজিল।

আজ মধুরিমার প্রাণ বড় অধীর হইয়া উঠিয়াছে; সে কখনও গৃহে, কখনও বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, মধুরিমার তো কেহ এখানে নাই তবে কার জন্য এত বিষাদ!

বিদায়ের সময় উপস্থিত! মধুরিমা শূন্যপ্রাণে, অশ্রুভরা চোখে, দাঁড়াইয়া আছে। পিশিমা বলিলেন "মা, ভালকরে থেকো, শচীন্দ্র থাকবে সর্ব্বদা খোঁজ খবর লইবে, তোমার কোন চিন্তা নাই।"

মধুরিমা তাঁহাকে প্রণাম করিল, দুই ফোটা অশ্রু ভূমিতে গড়াইল, পিশিমাও চক্ষু মুছিলেন। যথাকালে পিশিমা গাড়ীতে উঠিলেন, শচীন্দ্রও "আসি তবে" বলিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। কোচমান গাড়ী হাঁকাইল।

মধুরিমা সেইখানে বসিয়া খুব কাঁদিল। মাতৃহীনা হইয়াও তাহার তো যাতনা এত ছিল না, একি যাতনা! পিশিমার মাতৃসম স্নেহ হারান অপেক্ষা যেন আর একটা কোন স্নেহের অভাবে বালিকার মর্ম্মস্থল আলোড়িত হইল।

নিধি ঝি আসিয়া দেখিল যে, মধুরিমা বসনে মুখাবৃত করিয়া অনবরত রোদন করিতেছে। তখন সে অনেক বুঝাইয়া বাড়ী লইয়া গেল; পীতাম্বর-বাবুর স্ত্রীর নিকটে নিধি যখন মধুরিমাকে লইয়া গেল তিনি দেখিলেন বালিকার সুন্দর বদনমণ্ডল অশ্রুপরিপ্লুত—যেন বর্ষাসিক্ত গোলাপপুষ্প।

অপরাহ্ন; সূর্য্যদেব অস্তাচলগামী। দুই একটা রজনী গন্ধর্ব্ব সারাদিবসের রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া, সন্ধ্যার শীতল সমীরণে হেলিয়া দুলিয়া সৌরভ ঢালিল!

বাগানে সান বাঁধান স্থানে কৌচের উপর নিলীমা ও মধুরিমা বসিয়া আছে। আজ দুই দিন হইল শচীন্দ্র নাই, মধুরিমার নয়নের অশ্রু শুখাইতেছে না। নীলিমা কত যত্ন করিয়াছে কোন রকমে হাসাইতে পারে নাই। আজ, আবার তাহাকে ভুলাইবার জন্য বাগানে লইয়া আসিয়াছে, কিন্তু সে মেয়ে ভুলিবার নয়। অনেক ক্ষণ অন্য চিন্তার পর নীলিমা বলিল "সই, কথা কবে না ?"

মধুরিমা মৃদুস্বরে বলিল, "কেন কবনা ভাই ?

নীলিমা বলিল, "কই আর কথা কও, তুমি শচীন দাদারা যেয়ে অবধি একটী কথাও—কওনা ?

মধুরিমা "কেন রোজই তো কথা বলি, আজ কেন অমন করে আমায় বল্‌ছো ?"

নীলিমা আদরের ভাবে সইয়ের গলদেশ হস্ত দ্বারা বেষ্টন করিয়া বলিল, "না সই আমি তোমায় রাগের কথা কিছু বলিনি, তুমি দিন রাত মুখ ভার ক'রে থাক, আমার বড় মনে দুঃখ হয়, তাইতে অমন কথা বলেছি।"

মধুরিমা, সরলা প্রেমময়ী বালিকার আদরের কথায় ক্ষণেকের জন্য দুঃখ ভুলিল, যেমন ঘন নীরদের মাঝে সৌদামিনী সহসা চমকিত হয়, তেমনি ক্ষীণ হাসি বিষাদময়ী মধুরিমার অধর প্রান্তে দেখা দিল। সে হাসি দেখিয়া নীলিমা বড় সুখী হইল। বালিকার মুখে শৈশবের সরলতাময়, প্রণয়ের ভাষা শুনিতে কেমন সুন্দর! অনেকক্ষণ উভয়ের মধ্যে কত কথা হইল। পরে রাত্রি হইবে বলিয়া উভয়ে বাড়ী চলিল। মধুরিমার হাসি মুখ আবার বিষাদ ছায়ায় ঢাকিল!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শচীন্দ্রনাথের কাশী যাত্রার তৃতীয় দিবস অতীত হইয়াছে। প্রাতঃকাল ৬টার সময় শচীন্দ্র বাড়ী পঁহুছিলেন। কেমন একা ভাল লাগিল না, মধুরিমা ও নীলিমাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। প্রেরিত লোকের সঙ্গে উভয়েই আসিলে শচীন্দ্র অনেকগুলি কাঠের খেলনা বাহির করিয়া উভয়কে দিয়া বসিতে বলিলেন, তাহারা উভয়েই বসিল। শচীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মধুরিমা খেলনা পছন্দ হয়েছে ?" মধুরিমা বলিল, "হাঁ খুব ভাল," নীলিমাকে জিজ্ঞাসা করাতে

সে চুপ করিয়া থাকিল কিছুই বলিল না। শচীন্দ্রনাথ পুনরায় নীলিমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন নীল্, খেলনা পছন্দ হয়েছে?" নীল কিছু উত্তর না দিয়া একটু ঘাড় নাড়িয়া, খেলনাগুলি কাপড়ে লইয়া, বাড়ীর দিকে দৌড়িয়া পালাইল। মধুরিমাও "সই দাঁড়াও দাঁড়াও" বলিতে বলিতে পশ্চাতে ছুটিল। শচীন্দ্রনাথ আবার একা পড়িলেন। সুতরাং স্নান আহারাদি সমাপন করিয়া পড়িতে বসিলেন।

নীলিমা প্রথমে বাড়ী যাইয়া খেলনাগুলি মাতাকে দেখাইল, তাহাতেও তৃপ্তি হইল না; পিতাকে দেখাইবার জন্য বহির্ব্বাটীতে দৌড়িয়া চলিল, এমন সময় মধুরিমা বসন টানিয়া ধরিল, বলিল "তবে রে দুষ্টু, পালালে যে?" নীলিমা অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "বাবাকে খেলনা দেখাইব"।

পীতাম্বর বাবু ও তাঁহার একটী বন্ধু বাহিরের একটা ঘরে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, এমন সময়ে নীলিমা নিকটে আসিয়া ঝুপ ঝাপ করিয়া কতকগুলি খেলনা পিতার পার্শ্বে ফেলিয়া "বাবা, শচীন দা খেলনা দিয়েছেন দেখ" এক নিশ্বাসে এই কয়টী কথা বলিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বসিয়া পড়িল। পীতাম্বর বাবু, কন্যাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিলেন "পাগ্‌লী অত কি ছুটীতে আছে? পড়িয়া গেলে হাত পা ভাঙ্গিবে যে?" মধুরিমা এমন সময়ে আড়াল হইতে উঁকি দিতেছে দেখিয়া নীলিমার বড় হাসি পাইল, সে মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে হাসিতে সেখান হতে পলাইয়া নিধির নিকট ছুটিল, খেলনা পীতাম্বর বাবুর নিকটেই পড়িয়া রহিল। নীলিমা চলিয়া গেলে, পীতাম্বর বাবুর নিকটে যিনি বসিয়াছিলেন সেই ভদ্র লোকটী জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় এ কন্যাটী কি আপনার?"

পীতাম্বর বাবু বলিলেন "আজ্ঞা হাঁ।"

ভদ্রলোক। "আপনার কন্যার সঙ্গে আমার পুত্রের যদি বিবাহ দিতে আপনার আপত্তি না থাকে তাহলে এখন হইতেই স্থির হইল, এই বালিকা আমার পুত্রবধূ হইবে।"

পীতাম্বর বাবু। "যে আজ্ঞা, আপনার পুত্রের সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহ হইবে, ইহার অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে?" উভয়ের কথাবার্ত্তা শেষ হইলে ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শচীন্দ্র পাঠ সমাপন করিয়া যখন উঠিলেন তখন বেলা ৪টা। তিনি বেড়াইতে যাইবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় মধুরিমা খেলনার ছুতা করিয়া আসিয়া উপস্থিত। শচীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "মধুরিমা কেমন আছ?" মধুরিমা বলিল "ভাল আছি।" শচীন্দ্রনাথ দাঁড়াইয়াছিলেন। মধুরিমা একখানা তক্তাপোষের উপর বসিয়াছিল। পরে তিনি সেই তক্তাপোষের ধারে বসিলেন, পুনরায় বলিলেন "মধুরিমা কেমন আছ?" মধুরিমার একটু আশ্চর্য্য বোধ হইল, দুইবার কেন জিজ্ঞাসা করা, ভাবিয়া মুখের দিকে একবার চাহিল, দেখিল তিনি অন্যমনস্ক হইয়া কি দেখিতেছেন, সে অপ্রতিভ হইল, আর কেন জানি না মনে একটু দুঃখও হইল, বোধ হয় যেন তেমন আদর হয় নাই, শচীন্দ্র অন্যমনস্ক হইয়াই বলিলেন "মধুরিমা, তুমি বাড়ী যাও, আমি একটু বেড়াইয়া আসি।" মধুরিমা খেলনা ফেলিয়াই ধীরে ধীরে চলিয়া গেল, সরল প্রাণে ব্যথা লাগিল।

শচীন্দ্রনাথ বেড়াইয়া যখন ফিরিলেন তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন মধুরিমার খেলনাগুলি সেখানে পড়িয়া আছে ভাবিলেন লইতে ভুলিয়াছে। চাকর আসিয়া আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল। শচীন্দ্র ভগিনীকে একখানা পত্র লিখিতে বসিলেন; পত্র এই,—

দিদি,

পিশিমা কাশী চলিয়া গিয়াছেন, আমি একা বড় কষ্ট অনুভব করিতেছি। তুমি মিত্র মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া দিন কতকের জন্য আসিলে আমি বড় সুখী হইব। আমার শরীরও ভাল নাই।

তোমার স্নেহের শচীন।

পত্র লেখা সমাপ্ত হইল। তিনি দ্বারবান বেহারি সিংকে পত্র লইয়া সেই মুহূর্ত্তেই রওনা হইতে বলিলেন। "যো হুকুম", বলিয়া দ্বারবান চলিয়া গেল। শচীন্দ্র যেন কিছু অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন, ঘরে আর ভাল লাগিল না বাহিরের বাগানে গেলেন, দেখিলেন যে রাত্রিটী বড় মনোহর হইয়াছে। জ্যোৎস্নায় সমস্তই প্লাবিত। সুমন্দ গন্ধবহ কুসুমের সুরভি বহিয়া আনিতেছে। পাপিয়ার মধুর ঝঙ্কারে আকাশের এপ্রান্ত হইতে ও প্রান্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কৃষকের

সারা দিবসের রৌদ্রদগ্ধ জীবনের সুখগীতি, মরমের নিভৃত বেদনা জাগাইতেছে। জ্যোৎস্নামাখা সবুজ নরম ঘাসের উপর শয়ন করিবার শচীন্দ্রের বড় সাধ হইল; ঘর হইতে একখানা মাদুর পাতিয়া শয়ন করিলেন; উপরে, দিগন্তপ্রসারী সুনীল নভোমণ্ডল—অগণ্য তারকা হীরকের ন্যায় ঝক্ ঝক্ করিতেছে, মধ্যে রজতগোলক চন্দ্রমা হাসিতেছে। নীচে শ্যামল তরু লতা, তৃণ সমস্তই চন্দ্রালোকে অপরূপ মাধুরী ধারণ করিয়াছে, এমন শুভ্র সুখময়ী যামিনীতে শচীন্দ্রনাথের হৃদয়ে আজি শান্তি নাই, হৃদয়ের আবেগে অংশ শিথিল হইয়া উপাধানে মস্তক রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন "যদি পীতাম্বরবাবু নীলিমার সহিত বিবাহ না দেন তা হলে কি হইবে? না, নিশ্চয়ই দিবেন; তবে আমি পিতৃমাতৃহীন বলিয়া যদি না দেন।" এইবার মনে বড় আঘাত লাগিল, স্নেহময় পিতা, স্নেহময়ী মাতার কথা স্মরণ করিয়া প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল; মনকে অনেক বুঝাইলেন, ভবিষ্যতের আশায় আবার বুক বাঁধিলেন। এই সব মনে তোলাপাড়া হইতেছে ইতিমধ্যে চাকর আসিয়া আহারের জন্য ডাকিল, শচীন্দ্রনাথ উঠিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রমানাথ মিত্র বেশ সঙ্গতি সম্পন্ন গৃহস্থ। তাঁহার দুইটী পুত্র নাম সুরনাথ, ও অমরনাথ; সুরনাথের বয়স ৫ বৎসর, অমরনাথের বয়স ৩ বৎসর। রমানাথবাবুর বাটীতে অনেক লোক, তাঁহার মাতা ও এক পিশি, এক জেঠাই, ও এক বিধবা ভগিনী, একজন আরও আত্মীয়া ছিলেন, আর তাঁহার পত্নী শ্যামাসুন্দরী।

প্রাতঃকালে রমানাথবাবু বাহিরের ঘরে বসিয়া আছেন। জন কতক প্রজা খাজনার টাকা কিছুদিন দেরী করিয়া লইবার জন্য বলিতে আসিয়াছে। দূরে বাগানে মালি সাজি লইয়া ফুল তুলিতেছে। সুরনাথ ও অমরনাথ খান কতক ইঁট ও সুরকি লইয়া বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে নিযুক্ত। সম্মুখে একটা দেশী কুকুর ক্ষুধাতুর হইয়া, দুই ভাইয়ের দিকে কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। একজন পশ্চিম দেশীয় দোবে, দ্বারবানের বেশ পরিয়া, কাহার উপর বীরত্ব করিবে ভাবিতেছে ও গোঁফ খুব জোরে মোচড়াইতেছে, এমন সময়ে, অমনিই একজন ধনুকের মত গোঁফ বাঁকান মাথায় লাল মুরেট্টা বাঁধা—হিন্দুস্থানী দ্বারবান সেই খানে আসিয়া উপস্থিত। দোবেজী দেখিয়া বলিল "তুম কোন হ্যায়ই।"

আগন্তুক বলিল "হাম তোমারা মনিবকা শ্বশুরার কা চাপরাশী হুঁায় ।"

দোবেজী সসম্ভ্রমে বলিল 'সীতারাম ভাইয়া ।'

আগন্তুক ব্যক্তিও "সীতারাম ভাইয়া" বলিয়া অভিবাদন করিল ও ছিটের মেরজাইয়ের পকেট হ'তে একখানা চিঠি বাহির করিয়া দোবেজীর হাতে দিয়া বলিল "বাবুকো দে আও"। তখন দোবেজী লাঠি ঠক ঠক করিতে করিতে মনিবের হাতে যাইয়া পত্র খানা দিল। রমানাথ বাবু পত্র পাঠ করিয়া সমস্ত বুঝিলেন, দোবেজীকে বলিয়া দিলেন, সে যেন চাপরাসীকে খুব যত্ন করে,' পরে অন্দরে চলিলেন।

রমানাথ প্রথমে গৃহিণীর শয়ন গৃহে গেলেন, সেখানে একজন চাকরাণী ঘর ঝাটাইতেছিল, সহসা মনিবের আগমনে তাহার আশ্চর্য্য বোধ হইল। সে সম্মার্জ্জনী ফেলিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। রমানাথ নিরুপায় হইয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ধরিয়া ডাকিলেন 'স্থর'। স্থর মাতার নিকট বসিয়া দুগ্ধপানে ব্যস্ত ছিল, পিতার আহ্বান শুনিয়া দুগ্ধ মুখে লইয়াই বলিল 'উঁ,' পিতা আবার ডাকিলেন 'শীঘ্র শোন্', এই বার ছেলে মুখ থেকে বাটী নামাইয়া রাখিল; দুগ্ধ না খাইলে মাতার মেজাজ বড় খারাপ হয়, সুতরাং মাতার কোপদৃষ্টিতে একবার চাহিয়া ছেলে পিতৃ আজ্ঞা পালন করিতে ছুটিল, মাতার দৃষ্টি দেখিয়াও দেখিল না। শিশু অমর নাথ একটু হাসিয়া বিজ্ঞতার সহিত বলিল "দাদা বড় দুষ্টু, মার কথা শোনে না, আমি কেমন সব দুদ খেয়েছি" মাতা হাসিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিলেন।

স্থর নাথ নাচিতে নাচিতে আসিয়া মাতার কাণে কাণে বলিল, "বাবা তোমায় ডাকছেন"। শ্যামাসুন্দরীর আশ্চর্য্য বোধ হইল, অসময় কুঞ্জে বঁধু কি মনে করে? এই ভাবিতে ভাবিতে দুগ্ধের পাহারায় স্থরকে বসাইয়া ঘরে গেলেন। রমানাথ স্ত্রীকে রাগাইতে বড় ভালবাসিতেন। তিনি প্রণয়িনীর পদশব্দ শুনিয়া তাড়াতাড়ি একটা আলমারীর পার্শ্বে লুকাইলেন। শ্যামাসুন্দরী প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই, তাহার বড় রাগ হইল, বলিলেন "রোসো তো দুষ্ট ছেলের মজাটা দেখাই, আমার সঙ্গে চালাকী" বলিয়া গৃহের বাহিরে যাইবার উপক্রম করিলেন, এমন সময় রমানাথ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বাধা দিলেন, বলিলেন গরীবের কসুর হইয়াছে, যে শাস্তি হয় দিন, শিশুর দোষ কি?

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, ছেলেকে দিয়াই তার বাপকে শিক্ষা দিতে হয়।

দুজনার কথা বার্ত্তা চলিতেছে এমন সময়ে রমানাথ হাতটা লুকাইলেন, শ্যামাসুন্দরী কৌতূহল পূর্ণ হইয়া বলিলেন "ওটা কি দেখি দেখি"? রমানাথ হস্তমুষ্টি বদ্ধ করিয়া বলিলেন যদি পার তো জোর করিয়া খোল না কেন।

শ্যামাসুন্দরী অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিলেন; শেষে না পারিয়া রাগের ভাণ করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। রমানাথ আগ্রহ সহকারে হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন "ছিঃ অত রাগ ভাল নয়, তুমি হলে আমার প্রাণের সখী অমন করে চলেগেলে বিরহে ক্ষুধানল এখনি প্রজ্বলিত হয়ে উঠবে।" শ্যামা সুন্দরী, অভিমান ভরে একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "তোমার কেবল ঠাট্টা" রমানাথ হাসিয়া একখানি পত্র তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন, "সতীর নিমন্ত্রণে ভোলার প্রাণ যে আকুল হয়েছে, তার কি উপায়?"

শ্যামাসুন্দরী পত্র হাতে করিয়াই দেখিলেন, ভ্রাতার পত্র, বহুদিনপরে ভ্রাতার পত্র পাইয়া স্নেহময়ী ভগিনীর কমল নয়নে অশ্রু দেখা দিল, তাড়াতাড়ি অশ্রু মুছিয়া পত্রখানা পাঠ করিলেন, ভাই বড় স্নেহের জিনিস, বিশেষতঃ পিতা মাতা অকালে ছাড়িয়া গেলে ভাই ভগ্নীর ভালবাসা বড় গভীর হয়। শ্যামাসুন্দরী মাতার মৃত্যু হইলে শিশু ভাইটাকে বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন; মায়ের মত মানুষ করিয়াছিলেন বলিয়া সুধু ভ্রাতৃস্নেহ যে হইয়াছিল তাহা নহে অনেকটা পুত্রস্নেহের ভাবও হইয়াছিল। প্রবাসী পুত্রের হস্তাক্ষর দেখিলে মাতৃহৃদয় যেমন আনন্দে উথলিয়া উঠে, তেমনি মাতৃসমা ভগিনী শ্যামা সুন্দরীর হৃদয়ও উথলিয়া উঠিল। রমানাথ সেই স্নেহের ভাব দেখিয়া মোহিত হইয়া গেলেন! রমানাথ বাহির বাটীতে চলিয়া গেলেন। শ্যামাসুন্দরী শাশুড়ী ঠাকুরাণীর আদেশ লইতে চলিলেন।

রমানাথের বাড়ী চকমিলান। মধ্যে খুব বড় আঙ্গিনা, সানদিয়া বাঁধান। আঙ্গিনার সঙ্গে চারিদিকেই বাঁধান। রোয়াক, পরে বারান্দা, পূর্ব্বদিকে পুষ্করিণী, ফুলবাগান ইত্যাদি, পশ্চিম দিকে বহির্ব্বাটী, দক্ষিণ দিকে দোতালা শয়ন গৃহ, উত্তর দিকে রান্নাঘর পূজার দালান ইত্যাদি। বাড়ীর মধ্যের উঠানের পার্শ্বের রোয়াকে তুলসীর দেবী রহিয়াছে। তুলসীর একধারে ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিতেছে, এক ধুনুচিতে ধুনার ধূম উঠিতেছে। শ্বেত, নীল, পীত, লোহিত নানা বর্ণের

পুষ্প দিয়া বিধবা রমণীগণ তুলসী গাছকে সুন্দর সাজাইয়া দিয়াছেন। সেই পবিত্র স্থানে বসিয়া রমানাথের স্নেহশীলা জননী শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। এমন সময়ে শ্যামাসুন্দরী পত্র খানি লইয়া তাঁহার চরণের নিকট রাখিয়া চলিয়া গেলেন। রমানাথের মাতা পত্রখানা পাঠ করিয়া ডাকিলেন "শিবরাণী"। রান্নাঘর হইতে একটী রমণী বাহির হইলেন, বয়স আন্দাজ পঁচিশ হইবে, বর্ণ গৌর, মুখশ্রী ভাল, পরিধানে থান ধুতি, মুখে বিষাদের ছায়া সর্ব্বদাই ঢাকিয়াছে। রমণী নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলে, রমানাথের মাতা তাঁহাকে বলিলেন "দেখ, বউমার ভাই বউমাকে যাইবার জন্য পত্র দিয়াছেন, পরশ্ব বুধবার প্রাতে বউমা যাইবেন, বলিয়া দিও। আর সেখান হতে যে লোক এসেছে তাকে যেন খুব যত্ন করা হয়।" কথা শেষ হইলে, তিনি পুনরায় পাঠে মনযোগ দিলেন। শিবরাণী ভ্রাতৃজায়াকে সংবাদ দিতে চলিলেন।

শ্রীমোহিনী দেবী।

আকাঙ্ক্ষা।

যমুনা যৌবন আর বাঁশরীর রব
রাস-রাতি জাগরণ, ঝুলন উৎসব,
জড়িমা বিমূঢ় এই স্বপন আবেশ
আজ দুর হয়ে যাক্, হয়ে যাক্ শেষ!
হে বিশ্বমন্দিরবাসী সুন্দর দেবতা,
নব ছন্দে লেখ আজি হৃদয়ের কথা,
এ গীতে ভরিয়া দেও সরল উচ্ছ্বাস
বিহঙ্গের মুক্ত সুখ, ফুলের সুবাস
প্রভাতের সূর্য্যালোক নিশীথ চন্দ্রিমা
অমানিশা ধ্যানমৌন নির্লিপ্ত মহিমা,
উদার করুণা দাও সুমঙ্গল হাসি
বিশ্ব-পরিপ্লাবী স্নেহ উঠাও উচ্ছ্বাসি,

গণ্ডী আঁকা মোহ মুগ্ধ গুহা অন্ধকারে
প্রেম রাখিব না রুদ্ধ রুধিয়া সবারে।

এই প্রেম গীতিখানি বহে যাক ধীরে
নির্ঝর ধারার মত, তার দুই তীরে
বিস্তারি কোমল সুখ শ্যাম দূর্ব্বারাজি,
ফুটায়ে কুসুম শত ধরণীরে আজি
করুক সুন্দর তব দরিদ্র কুটীরে
লয়ে যাক্ পরিতৃপ্তি, স্নিগ্ধ স্বাদুনীরে
দূর করি দিক্ তৃষা প্রাসাদের তলে
ধরণীর ব্যাথাখানি করুণ কল্লোলে
শুনায়ে বহিয়া যাক্, গ্রামে গ্রামান্তরে
নগর নগরী বক্ষে অরণ্যে প্রান্তরে
দিক্ স্নেহ দিক্ দয়া দিক্ শান্তিবারি
নিরন্তর সুনির্ম্মল লাবণ্য বিস্তারি
আপন অতল বক্ষে, ক্রমে এক দিন
মহাসিন্ধু গীত মাঝে হইবে বিলীন।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

আমার ডেপুটী-জীবন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(২য় সংখ্যা ৯৮ পৃষ্ঠার পর)

আমি যথাসময়ে, আহারাদি করিয়া বহির্ব্বাটীতে আসিবার অল্পক্ষণ পরেই, কৃষ্ণচন্দ্রবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আমার স্বর্গীয় অগ্রজ শিবগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহপাঠী এবং শৈশব সুহৃৎ। সুতরাং আমি তাঁহাকে অগ্রজের মত ভক্তি করিতাম,—তিনিও আমাকে কনিষ্ঠের ন্যায় স্নেহ করিতেন।

আমি কৃষ্ণবাবুর হাতে আলবোলার নলটী দিয়া, সংক্ষেপে বিনোদিনীর ইতিহাস বিবৃত করিয়া কহিলাম,—যেপর্য্যন্ত মোকর্দ্দমা শেষ না হয়, সে পর্য্যন্ত তিনি আপনার গৃহে রহিবেন এবং আপনি যত্ন সহকারে মোকর্দ্দমা চালাইবেন। যে অর্থের প্রয়োজন হয়, আমি সমস্ত দিব।

কৃষ্ণচন্দ্রবাবু কহিলেন,—"সে জন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না। যাহা করিতে হয় আমি করিব। এখন তিনি কোথায়?"

আমি তখন অমলাকে ডাকিলাম। অমলা আসিলে পর বলিলাম,—"সুধাংশুবাবুর স্ত্রীকে ডাকিয়া দাও।'

অমলা—"তিনি রান্না করিতেছেন,—আজ পাঁচ দিন আহার হয় নাই।

অমলার কথায় আমরা উভয়েই চমকিয়া উঠিলাম। উঃ কি পিশাচ। ইহারাই কিনা আমাদের সমাজের স্তম্ভ (!)। এমন সমাজে ধিক্।

কৃষ্ণচন্দ্রবাবু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। বিবাহ বিষয়ে আমাকে কত উপদেশ দিলেন। আমি কান পাতিয়া একে একে সব শুনিতে লাগিলাম,—কিন্তু, কোনও উত্তর দিলাম না! প্রায় অর্দ্ধ প্রহর পরে, অমলা সুধাংশুবাবুর স্ত্রী ও পুত্রকে সঙ্গে করিয়া আনিল। বিনোদিনী আসিলে, সুধাংশুবাবুর পুত্রের হাতে দশটি টাকা দিয়া কহিলাম,—"ইঁহারই নাম কৃষ্ণচন্দ্রবাবু।" যে পর্য্যন্ত মোকর্দ্দমা শেষ না হয়, সে পর্য্যন্ত ইঁহারই গৃহে থাকিবেন। ইনি আপনাকে আপন কন্যার ন্যায় দেখিবেন, এবং যত্নসহকারে মোকর্দ্দমা চালাইবেন। তার পর, মোকর্দ্দমা মিটিয়া গেলে,—আমি লইয়া আসিব। এই বলিয়া অমলাকে সঙ্গে দিয়া, কৃষ্ণচন্দ্রবাবুর সহিত বিনোদিনীকে তাঁহারই গৃহে পাঠাইয়া দিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যথাসময়ে আমার এজ্‌লাসে হিমাংশুমোহনের মোকর্দ্দমা উঠিল। কৃষ্ণচন্দ্রবাবুর জেরার চোটে মোকর্দ্দমা ফাঁসিয়া গেল। আমি হিমাংশুমোহনকে বেকসুর খালাস দিয়া, পুলিসের দারগা প্রভৃতি কয়জনকে এবং নরপিশাচ রাজা ভবানীপ্রসাদের নরপিশাচ নাএব উদ্ধবচন্দ্রকে দণ্ড বিধির—২১১ ধারার অভিযোগে ফৌজদারীতে দিলাম। তবে সে সব বিষয় এখানে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি যে, রজত মুদ্রার অপার মহিমাবলে এবং সুসভ্য ইংরেজের আদালত

ও বিচারপতিদের অপার মহিমাবলে, সকলেই মুক্ত হইল। লাভের মধ্যে এই ঘটনার অল্পদিন পরেই, ঘোরচক্রান্তে পড়িয়া, আমাকে অন্যত্র বদলি হইতে হইল।

মোকর্দ্দমা মিটিবার পরদিনই, বউদিদিও অমলা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, বিনোদিনী ও হিমাংশুমোহনকে গৃহে আনাইলেন। আমি হিমাংশুমোহনকে সুবিধাজনক একটা চাকুরী দিবার মনন করিয়া একটু সুবিধা ও অবসর খুঁজিতেছিলাম। এমন সময়ে, হঠাৎ আমাকে জলপাইগুড়ী বদলি হইতে হইল। অনন্যোপায় হইয়া, আমি সকলকে সঙ্গে করিয়া জলপাইগুড়ী যাত্রা করিলাম। জলপাইগুড়ী আসিবার সময়ে, বিনোদিনী ও হিমাংশুমোহনকে সঙ্গে করিয়া আসিলাম।

নূতন স্থানে,—বিশেষতঃ, অস্বাস্থ্যকর স্থানে আসিয়া একপ্রকার বনবাস ভোগ করিতে লাগিলাম। এই সব কারণে, এখানে আসিয়া কাহারও সহিত বড় একটা মিলিবার মিশিবার প্রবৃত্তি হইত না; এই প্রকারে প্রায় দুই মাস অতিবাহিত হইলে পর, মাসিক বিংশ মুদ্রা বেতনে, হিমাংশুমোহনকে আমাদের আফিসে একটা ক্লার্কের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। হিমাংশুমোহন চাকুরীতে নিযুক্ত হইবার একমাস পরে, পৃথক বাসা করিবার অভিপ্রায় জানাইল। কিন্তু, আমি তাহাতে বাধা দিয়া বলিলাম,—এখন দুই বৎসর বাসা না করিয়া, আমার বাসাতেই থাক, আর এই অবসরে বেতনের টাকাটা মজুত করিয়া নাও! অগত্যা হিমাংশুমোহন ও বিনোদিনী আমার কথায় স্বীকৃত হইয়া আমার বাসাতেই বাস করিতে লাগিল। এইরূপে, অন্যের অলক্ষ্যে, এইখানেই বিষ বৃক্ষের বীজ বপন করিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

জলপাইগুড়ী আইসার চারি পাঁচ মাস পর হইতে, হঠাৎ দিন দিন আমার চিত্তচাঞ্চল্য জন্মিতে লাগিল। আশৈশব আমি ইন্দ্রিয়দমনে রত ছিলাম, সুতরাং সহসা চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ বুঝিতে পারিলাম না। তবে দিন দিন দণ্ডে দণ্ডে, সুধাংশুমোহনের স্ত্রী বিনোদিনীকে দেখিবার স্পৃহা বাড়িতে লাগিল। নিভৃতে বসিয়া তাঁহার সহিত সুখ দুঃখের গল্প করিতে অভিলাষ জন্মিতে লাগিল, আর সেই সঙ্গে বিনোদিনীর সহিত প্রথম সাক্ষাতের সেই নিশি,—আর সেই নিশীথে

বিনোদিনীর সেই অশ্রুসিক্ত বদনের যে অতুলনীয় শোভা দেখিয়াছিলাম,—এখন দিবা যামিনী সময়ে অসময়ে,—সকল সময়ে কেবল অনন্যচিত্তে তাহাই ভাবিতাম। সতত বিনোদিনীর সেই দেববাঞ্ছিত রূপরাশির বিষয় ভাবিতাম,—অথচ ভাবিবার উদ্দেশ্য পাইতাম না! আমার মনের এইভাব বাহিরে যাহাতে প্রকাশ না পায়, সতত তাহার যত্ন ও চেষ্টা করিতাম। কিন্তু আমার শত যত্ন ও চেষ্টা বিফল হইয়া যাইতে লাগিল। আমার মনের ভাব মুখে ব্যক্ত হইতে লাগিল। এইরূপ অবস্থায় একদিন রাত্রিতে বউদিদি আহার করাইতে বসাইয়া, আপনি সম্মুখে বসিয়া হাসিমুখে কহিলেন,—"ঠাকুরপো! একটা কথা বলিব,—শুনিবেন কি?"

আহার করিতে করিতে আমি বলিলাম,—বলুন না কেন? আপনার কথা কবে না শুনিয়াছি।

বউদিদি একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন,—"আপনার আর একটা বিয়ের সম্বন্ধ আসিয়াছে। কন্যা দেখিতে বড় সুন্দরী এবং বয়স্থা। আমাদের ও কন্যাপক্ষের মত হইয়াছে। এখন আপনার আদেশ পাইলেই হয়!

বিনোদিনীর সাক্ষাতের পর হইতেই সময় সময় ভাবিতাম যে, এত দিন বিবাহ না করিয়া ভাল করি নাই। বোধ হয়, বিবাহ করিলে, বিনোদিনীর প্রতি আমার এত লালসা হইত না। কিন্তু, এখন উপায় নাই। একবার ভাবিলাম "দুর হউক ছাই, বিয়ে ক'রে ফেলি।" আবার ভাবিলাম,—"না, বিবাহ করিব না। যদি বিবাহ করি, তবে বিনোদিনীকে বিবাহ করিব। আমি সমাজকে বড় ভয় করিতাম না। এবং বলিতে কি, বঙ্গের বর্ত্তমান সমাজের ঘৃণিত ব্যবহার দেখিয়া, সমাজে ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের,—পুণ্যের নামে পাপের প্রশ্রয় দেখিয়া, দিন দিন ঘৃণায় আমার অন্তর জ্বলিতেছিল। সুতরাং ভাবিলাম বিনোদিনী যদি স্বীকৃতা হন তবে, বিনোদিনীকে বিবাহ করিয়া এক দিন সংসারী হইব। কিন্তু, বিনোদিনীর মনের কথা না জানিয়া সাধারণে সে কথা প্রকাশ করা অকর্ত্তব্য, এই ভাবিয়া বউদিদীর প্রশ্নের উত্তরে বলিলাম,—"আর কেন? বিবাহ যদি করিতাম, তবে বহু পূর্ব্বেই করিতাম।"

এবার বউদিদী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—"যতই কেন বলুন না, আপনি এখন দো'টানার মধ্যে পড়িয়াছেন। আমি তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি।"

আমি কহিলাম—"কিসে কি বুঝিয়াছেন।"

আবার পূর্ব্বের ন্যায় মধুর হাসি হাসিয়া বউদিদী বলিলেন,—"আপনি, হয়ত জানেন না যে, সময়ে মানুষের মনের ভাব মুখে ব্যক্ত হয়।"

আমি অনিচ্ছার সহিত কহিলাম,—"আমার মুখের ভাবে আপনি কি বুঝিলেন।"

এবার বউদিদী গম্ভীর ভাবে ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—"কেন? সত্য কথা বলিলে, আপনি রাগ করিবেন না তো।"

আমি—"না।"

বউদিদী—"সত্য, বলিতেছেন?"

আমি—"হাঁ, সত্য বলিতেছি। আর আপনার কথায় কবে রাগ করিয়াছি।"

বউদিদী—"তাহা সত্য বটে। আমার বিশ্বাস,—বিশ্বাস কি? সত্য ধারণা এখন বিনোদিনীতে আপনার মন পড়িয়াছে।"

আমি চমকিয়া উঠিলাম; কিন্তু প্রকাশ্যে বলিলাম,—"না, সে সব কিছুই নহে।"

বউদিদী,—তবে সতত আপনার মুখখানি বিষাদে পূর্ণ কেন? আপনি এত দিন তো সতত হাসি মুখে থাকিতেন।"

আমি—"নানা কারণে উপরওয়ালা আমার উপর বড় বিরক্ত। এই দেখুন এমনি স্থানে আমাকে বদলী করিয়াছে, যে, ঠিক যেন বনবাসে আছি।"

বউদিদী আর কোনও উত্তর করিলেন না—আমার কথাই বিশ্বাস করিলেন। স্ত্রীজাতি অবলা—অবলাকে ভুলাইতে বেশী বেগ পাইতে হয় না। বউদিদীকে ভুলাইতেও বেশী বেগ পাইতে হইল না। এই প্রকারে আহারক্রিয়া সম্পাদন করিয়া উঠিয়া গেলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আরও কয় দিন কাটিল। দিন দিন বিনোদিনীর উপর আমার বলবতী লালসা জন্মিতে লাগিল। সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত স্রোতস্বতীর স্রোত বেগ রোধ করা মনুষ্যের যেমন অসাধ্য, বিনোদিনীর প্রতি আমার লালসাকে দমন করাও, আমার পক্ষে তেমনই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। এইরূপে আমি দিন দিন প্রবল

প্রবৃত্তি স্রোতে ভাসিয়া চলিলাম। কিন্তু, হায়, বিনোদিনি,—মনে হইল বিনোদিনী কি পাষাণী। আমি যাহার জন্য দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে অসহ্য হৃদয়-যন্ত্রণায় আজি কত দিন হইতে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি; আর পাষাণী বিনোদিনী কিনা, অম্লান অন্তঃকরণে বউদিদী ও আমার সহিত হাসিয়া খেলিয়া আপনার প্রত্যেক মুহূর্ত্তটী পরম সুখে অতিবাহিত করিতেছিল। হায়, রমণি! ইহ-সংসারে তোমাদের হৃদয়ের এ রহস্য ভেদ করিবার শক্তি আমাদের নাই।

এইরূপে আরও কয় দিন কাটিল। আজ বিনোদিনী ছাড়া বাসায় আর কেহ ছিল না। অমলা ও বউদিদী, এখানকার কোনও রাজকর্ম্মচারীর গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। সুধু, একা বিনোদিনী বাসায় ছিলেন। দেখিতে দেখিতে বেলা হইল। আমি স্নান করিয়া আসিলে পর, বিনোদিনী আমাকে আহার করাইতে বসাইলেন। কি ছাই আহার করিব। মনে করিলাম আজি একবার বিনোদিনীকে আমার মনের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিব। বলিব, বলিব মনে করিলাম,—কিন্তু কণ্ঠাগত প্রাণ হইলেও, সহসা কিছু বলিতে পারিলাম না।

ক্রমে ক্রমে বেলা দুইটা বাজিয়া গেল। এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া আপনার মনে সাহিত্যালোচনা—সাহিত্যালোচনা কি ছাই মাথা মুণ্ডু করিতেছিলাম,—বলিতে পারি না। বেলা দুইটা বাজিবার পর, সহসা কি মনে করিয়া, হাতের পুথি ফেলিয়া উঠিলাম। তার পর ধীরপদবিক্ষেপে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

আমি ধীরে ধীরে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে, শয়ন গৃহের রকের উপর পড়িয়া বিনোদিনী অগাধ নিদ্রায় ঘুমাইতেছেন। তাঁহার অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া, ক্ষণ কাল জন্য আমি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহাতে তাঁহার যে সৌন্দর্য্য রাশি ফুটিয়াছিল,—আমি দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অতৃপ্ত নয়নে তাহা দেখিতে লাগিলাম। সত্য; কিন্তু দেখিয়া হৃদয়ের তৃপ্তি হইল না,—আবার দেখিতে লাগিলাম। ঘনকৃষ্ণকুন্তল রাশি বসন্ত বায়ু তাড়িত হইয়া উড়িতেছে, উড়িতে উড়িতে কখন শরতের মেঘাচ্ছন্ন শশধরের ন্যায় মুখখানি ঢাকিয়া ফেলিতেছে, কখন বা মেঘমুক্ত শশধরের ন্যায় কেশ রাশি মুখের উপর হইতে উড়িয়া পড়িতেছে। একদিন সেই প্রথম সাক্ষাতের দিন, বিনোদিনীর

অশ্রুসিক্ত বদনের অপূর্ব্ব মাধুরী দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছিলাম ; আর আজ চিন্তাশূন্য উজ্জ্বল ললাট আর প্রফুল্ল বদনের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া মোহিত হইয়া উভয়ের তুলনা করিলাম। মনে হইল এ পৃথিবীতে যাহারা সুন্দর তাহারা যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন তাহাকে সুন্দর দেখাইবে। যাহাই পরিধান করুক না কেন, তাহাই তাহার ভূষণ হইবে—কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্। এইভাবে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত বিনোদিনীকে দেখিবার পর হঠাৎ মনে হইল—হায়, আমার এই আশাশূন্য, উদ্দেশ্যশূন্য জীবন,—এই অসার জীবনে যদি একবার এই অমূল্য রতন কণ্ঠে ধারণ করিতে পারিতাম, মনে হয় আমার এই আশাশূন্য উদ্দেশ্যশূন্য অসার জীবন কি সুখের কি শান্তির হইত। আর এই কুসুমসুকুমার আশুতোষ যদি আমার হইত, তবে আমার পক্ষে এই বন্ধুর সংসার কত সুখের স্বর্ণ ভূমি হইত।" যখন আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, এই চিন্তায় একেবারে ডুবিয়া যাইতেছিলাম, এমনই সময়ে হঠাৎ বিনোদিনী চারু-নয়ন-যুগল উন্মীলন করিয়া আমাকে দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া স্রোতপ্রহত বেতস পত্রের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া পরিধেয় বস্ত্রে আপাদ মস্তক আবৃত করিয়া লজ্জাজড়িত কণ্ঠে ধীরে ধীরে কহিলেন,—"আপনি কি জল চান।" বাসায় থাকিলে, এমনই সময়ে আমি একবার জলপান করিতাম।

বিনোদিনীর কথার উপর উত্তর আমি করিলাম, "না," আমার উত্তরে বিনোদিনীর মনস্তুষ্টি হইল না। তাহাই তিনি কহিলেন,—"তবে কি চান? আমাকে কি আপনার কোন প্রয়োজন আছে?"

আমি উদ্বেলিত হৃদয়ে কহিলাম,—"আছে,—বিনোদিনী।" এ পর্য্যন্ত আমি আর কখনও বিনোদিনীর নাম ধরিয়া ডাকি নাই। আজিকার দিনে এই সর্ব্ব প্রথমে নাম ধরিয়া ডাকিলাম।

বিনোদিনী,—কি প্রয়োজন?"

আমি ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া কহিলাম,—"বিনোদিনি।" আর বলিতে পারিলাম না,—লজ্জা আসিয়া কণ্ঠরোধ করিয়া দিল।

বিনোদিনী আমাকে নিরুত্তর হইতে দেখিয়া, পুনরায় কহিলেন,—"কি বলিবেন? বলুন না,—লজ্জা কি?"

আমি,—"বিনোদিনি, কি বলিব। আজ কয় দিন হ'তে তোমাকে একটা কথা বলিব বলিব মনে করি,—মনে করি সত্য, কিন্তু পাছে তুমি কি ভাব, এই ভাবিয়া বলিতে পারি নাই।"

বিনোদিনী এবার সরলতা পরিপূর্ণ হাসি হাসিয়া কহিলেন,—বলুন, না—কি বলিবেন। আমরা আপনার আশ্রিতা, প্রতিপালিতা আমাদিগকে কোন কথা বলিতে আপনার আবার লজ্জা কি? আর আপনি যাহা বলিবেন, বিনা বিচারে প্রাণপাত করিয়া তাহাই প্রতিপালন করিব।"

হঠাৎ অপরিচিত অন্ধকার পথে, একবার মাত্র বিদ্যুৎ চমকিলে, পথিক যেমন আপনার গন্তব্য পথ স্থির করিয়া লয়, এবার বিনোদিনীর কথায়, আমিও তেম্নি আপনার পথ পাইলাম। শেষ কহিলাম—"আমি আজি তোমাকে যাহা বলিব, বিনা বিচারে তুমি কি তাহাই প্রতিপালন করিবে?"

বিনোদিনী—"কেন আমার কথায় কি আপনার বিশ্বাস হয় না।"

আমি—"বিশ্বাস হয়। তবে কি না স্ত্রীজাতি বড় পাষাণী। সকল সময়ে তাহাদের হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হয় না।"

সহসা আমার কথায় বিনোদিনীর সর্ব্ব শরীরে স্বেদধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে থাকিবার পর, স্ত্রীজনোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিলেন—আচ্ছা, আমি যেন পাষাণ হলেম। কিন্তু, দিদি,—দিদিও কি পাষাণী! আর সাক্ষাৎ সরলতার আধার সে অমলা,—সে অমলাও কি পাষাণী।" বিনোদিনী বউদিদীকে দিদি বলিয়া ডাকিতেন, আর বয়ঃকনিষ্ঠা বলিয়া অমলার নাম ধরিয়া ডাকিতেন।

বিনোদিনীর কথায় সহসা আমি উত্তর দিতে পারিলাম না,—সুতরাং চুপ করিয়া রহিলাম।

আমায় নিরুত্তর হইতে দেখিয়া ক্ষণকাল পরে বিনোদিনী কহিলেন—"কি বলিবেন,—বলুন। আমি সাধ্যানুসারে আপনার আদেশ পালন করিতে অন্যমত করিব না।"

এবার আমি কহিলাম—"তোমার নিকট আমার অনুরোধ,—আমার আদেশ পালন কর আর না কর, দেখিও এ কথা যেন কর্ণান্তরে প্রবেশ না করে।"

বিনোদিনী স্বীকৃতা হইলেন।

আমি কহিলাম,—"দেখ, বিনোদিনি! এক দিন তোমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিব, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম,—তোমার কি তাহা মনে আছে।"

হৃদয়ের পূর্ণ আবেগ ভরে বিনোদিনী কহিলেন—"আছে বৈ কি ? এ জীবনে কখন কি আপনার সে উপকার ভুলিতে পারিব। এক দিন সংসারের সব ভুলিতে পারিব,—এমন যে স্নেহ পুত্তলী আশু—সে আশুতোষকেও ভুলিলে ভুলিতে পারিব; কিন্তু এ জীবন থাকিতে আপনার অনুগ্রহ ভুলিতে পারিব না। এক দিন, আপনি আমাদের কুলমান জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন,—জীবনে কখনও কি তাহা ভুলিতে পারিব।"

আমি,—"উত্তম কথা। আমি এক দিন তোমার যে যৎসামান্য উপকার করিয়াছিলাম, জীবনে তাহার কোন প্রতিদান গ্রহণ করিব, স্বপ্নেও কখনও ভাবি নাই। কিন্তু, এখন দেখিতেছি আমার সেই ক্ষুদ্র দানের প্রতিদান গ্রহণ না করিলে আমার জীবন সংশয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

আমার কথায় ও মনের আকুলতায় বিনোদিনীর মুখখানি ক্রমে ক্রমে বড় মলিন হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু তথাপি সেই মলিন আননে ঈষৎ মলিন হাসি—সরলতা পরিপূর্ণ মলিন হাসি হাসিয়া বিনোদিনী কহিলেন,—"কি প্রতিদান চাহিতেছেন।"

আমি,—দেখ, বিনোদিনী, সে দিন তোমাকে বাঁচাইতে আমি যেমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, আশা আছে, তুমিত আমাকে বাঁচাইতে সেইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবে ?

বিনোদিনী,—"প্রতিজ্ঞা কি ? আপনার মঙ্গলের জন্য সামান্য ত্যাগ স্বীকার তো দূরের কথা, আমার এ ক্ষুদ্র জীবন, এ জীবন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারি,—প্রতিজ্ঞা তো সামান্য কথা।

বিনোদিনীর কথায় এবার আমার নিরাশ হৃদয়ে ক্ষীণ আশার সঞ্চার হইল। আমি কহিলাম "প্রতিজ্ঞা করিলে কি ? তুমি যদি স্বীকার করিলে, আমি যাহা তোমাকে বলিব,—তোমার পক্ষে তাহা ন্যায় হউক, আর অন্যায় হউক, তুমি আমার কথা রাখিবে,—যদি এই প্রতিজ্ঞা কর, তবে তোমাকে একটী অনুরোধ করিব ; নচেৎ আমি আর কোন কথাই বলিব না।

বিনোদিনী অম্লান অন্তঃকরণে কহিলেন,—প্রতিজ্ঞা করিলাম। আমার

পক্ষে ন্যায় হউক, আর অন্যায় হউক, আপনি আজ যাহা আদেশ করিবেন বিনা বিচারে তাহাই আমি প্রতিপালন করিব।

বিনোদিনীর কথায় আমার মন অনেকটা প্রফুল্ল হইল। আমি তখন বলিলাম,—"শুন, বিনোদিনী—আমি তোমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করি; তুমি কি তাহাতে অসম্মত আছ?" আমার কথা শুনিয়া, বিনোদিনীর হৃদয়ে একটু চাঞ্চল্য তরঙ্গ ভঙ্গিও হইল না,—একটুকু চিত্ত বিকারও জন্মিল না। রমণী হৃদয়ের ন্যায় রমণী হৃদয়ই রহিল। আমি তখন ভাবিলাম,—বিনোদিনী কি পাষাণী, অথবা পাষাণ অপেক্ষাও বিনোদিনীর হৃদয় কঠিন। আমি পুনরায় বলিতে লাগিলাম,—"দেখ দেখ বিনোদিনী! তোমাকে ভুলিবার জন্য এই দীর্ঘকাল, আপনার সঙ্গে কত যুদ্ধ করিয়াছি; কিন্তু, আর না,—আর এ অসহ্য হৃদয়যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না। তাই স্থির করিয়াছি—হয়, তোমাকে আপনার করিব, নয় আত্মহত্যা করিয়া জীবনের সব জ্বালার শেষ করিব।"

আমার কথাগুলি একে একে শুনিয়া, স্থিরভাবে, অথচ পরিষ্কার কণ্ঠে বিনোদিনী কহিলেন,—"পারিবেন কি? আত্ম-হত্যা করিয়া জীবনের সকল জ্বালার শেষ করিতে পারিবেন কি?"

উদ্বেলিত হৃদয়ে আমি বলিলাম,—"পারিব। তোমাকে কণ্ঠরত্ন করিতে না পাইলে আত্মহত্যা করিয়া জীবনের সব জ্বালা শেষ করিব। আর এ অসহ্য হৃদয় যাতনা সহ্য করিতে পারি না।"

বিনোদিনী তীব্র হাসি হাসিয়া কহিলেন,—'আমি স্থির জানিতেছি আপনি কখনও আত্মহত্যা করিতে পারিবেন না।"

আগ্রহভরে কহিলাম—"কেন পারিবনা—বিনোদিনি"। বিনোদিনী পূর্ব্বেরন্যায় স্থিরকণ্ঠে কহিলেন—আমি হিন্দু বিধবা—চিরব্রহ্মচারিণী। আমাকে বিবাহ করার ইচ্ছা আপনার পক্ষে অধর্ম্ম। আমি হিন্দুবিধবা আমি পুত্রবতী। বিবাহের প্রস্তাব কাণে শুনিলেও আমার পাপ হয়; ওকথা বলিবেন না, উহাতে আমার পুত্রের অকল্যাণ হইবে। জানেন বিধবারা পূর্ব্বে স্বেচ্ছায় সহমরণে স্বর্গে যাইত। হিন্দু বিধবা আপনি আমাকে কুপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিবেন না। আপনি ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিবেন না।

আমি—"কৈ, আমিতো ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিনাই। জীবনে কখনও ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিবনা।"

আবার মর্ম্মভেদী-তীব্র হাসি হাসিয়া বিনোদিনী কহিলেন,—"ইহাই কি আপনার ধর্ম্মপথ।"

আমি,—"বিনোদিনী, বৃথায় আমাকে তিরস্কার করিতেছ,—আমার চিত্ত বশ নহে।"

এবার বিনোদিনী উন্মাদিনীর ন্যায় হাসি হাসিয়া, কহিলেন,—"হায়! এসংসার এক অপূর্ব্ব স্থান।"

আমি,—"কেন? কিসে এ সংসার অপূর্ব্ব স্থান।"

বিনোদিনী—"কেন, কি? এক দিন আপনাকে দেখিয়া আমার দেবতা বলিয়া বোধ হইয়াছিল।"

আমি,—"আর, আজ।"

বিনোদিনী,—"ক্ষমা করিবেন,—আর বলিব না।"

আমি কহিলাম,—"বল বল, বিনোদিনী, যে, আজ আমি পিশাচ।"

এবার হঠাৎ কি জানি কেন, বিনোদিনী একবার স্নেহ পুত্তলী পুত্র আশুতোষের মুখ চুম্বন করিলেন। তার পর ধীরে ধীরে কহিলেন,—হাঁ। আজ সত্য সত্যই যেন আপনাকে পিশাচের ন্যায় বোধ হইতেছে।

আমি,—তোমাকে আপনার করিতে পারিলে,—তোমার সহিত বিবাহ হইলে, আবার আমি দেবতা হইতে পারিতাম। তার পর এখন প্রতিজ্ঞা পালনের কি করিবে? তুমিতো প্রতিজ্ঞা করিয়াছ,—"ন্যায় হউক অন্যায় হউক আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে?"

বিনোদিনী—আবার তীব্র হাসি হাসিলেন। এতদিন বিনোদিনীকে এমন তীব্র হাসিতে দেখি নাই। উঃ কি হাসি; আর এই হাসির প্রত্যেক লহরীতে সতীত্বের জয় ঘোষণা করিতেছিল। অল্পক্ষণ হাসিয়া কহিলেন,—"আচ্ছা, প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা প্রতিপালন না করিলে কি পাপ হয়।"

আমি,—প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে অনন্ত নরক—জীবনে মরণে অনন্ত নরক ভোগ করিতে হইবে।

আবার ধীরে ধীরে বিনোদিনী কহিলেন,—"আচ্ছা আর সতীরমণী যদি

স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করে তাহার কি পাপ হয়? আপনি ভাবিতেছেন আমার স্বামী নাই। আমার স্বামী আছেন। স্বর্গে। তিনি আপনার ও আমার কথা শুনিতেছেন তিনি এই মুহূর্ত্তে তাঁহার পুত্রের মুখের পানে তাকাইতেছেন, আমার মুখের পানে তাকাইতেছেন। আপনাকে শেষ উত্তর কি দেই তিনি ব্যগ্রভাবে তাহা শুনিবার জন্য আমার পানে চাহিয়া রহিয়াছেন"। বিনোদিনী ঊর্দ্ধে আকাশের দিকে উন্মাদিনীর ন্যায় বিস্ফারিত চক্ষে তাকাইয়া সহসা বলিলেন হা নাথ,—চির আরাধ্য দেব—চিরকাল আমি তোমারই।

তখন বিনোদিনীর ইন্দীবর নয়নে অশ্রুধারা দরবিগলিত হইল—কপোল ও ললাট লোহিত বর্ণ হইল—ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল—আকাশের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া। বিনোদিনী সম্পূর্ণ রূপান্তরিত—সাক্ষাৎ দেবী—অতীন্দ্রিয়, স্থূল পার্থিব দেহ বর্জ্জিত জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী। তাঁহাকে দেখিয়া আমার বাসনা বিলুপ্ত হইল। আমি তস্করের ন্যায় সঙ্কুচিত হইয়া বলিলাম "আমাকে ক্ষমা করুন। বিনোদিনী আমার পানে তাকাইলেন। কারুণ্য পরিপূর্ণ সেই দৃষ্টি। তিনি কহিলেন,—"দেখুন, সংসারে ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ ছাড়া, আর কি কোনও পবিত্র বন্ধন নাই।"

আমি—কেন, বিনোদিনি, আবার সে কথা কেন?

এত দিন পরে, আমার মোহ নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। হৃদয়ের পূর্ণ আবেগভরে কহিলাম,—"বিনোদিনি! ভুল,—ভুল, আমার বড় ভুল হইয়াছিল। এতক্ষণে আমার সে ভুল গেল। তুমি কে? স্বর্গের দেবী! আর আমি নরকের কীট; তাই তোমাকে চিনিতে পারি নাই। আজ দীর্ঘকাল পরে তোমায় চিনিলাম। এখন তোমার নিকট আমার প্রার্থনা,—পূর্ব্ব অপরাধ ভুলিয়া যাও। পূর্ব্ব কথা ভুলিয়া আমায় ক্ষমা কর।

বিনোদিনী,—আমি ক্ষমা করিবার কে? যিনি ক্ষমা করিবার কর্ত্তা, প্রার্থনা করি তিনি আপনাকে ক্ষমা করিবেন।"

আমি,—"বিনোদিনি! আজ আমার কঠোর পরীক্ষার দিন।"

আমার কথায় বিনোদিনী বাধা দিয়া কহিলেন—"না, আজ আপনার পরীক্ষার দিন নহে। আজ আমারই কঠোর অগ্নিপরীক্ষার দিন। কেন না, নারীজাতির হৃদয় অসার—পদ্ম পত্রের জল—সতত চঞ্চল। কখন এ হৃদয়

সমুদ্রে একটু বাতাস উঠিবে, কখন এ সমুদ্রে ভীষণ কামনার তরঙ্গভঙ্গ হইবে, কখন সেই তরঙ্গের মাঝে পড়িয়া, কর্ণধার হীন তরণীর ন্যায়, এ জীবন তরী পাপসাগরে ডুবিবে,—বলিতে পারি না। তবে এ যাত্রা যে, এ তরী রক্ষা করিতে পারিলাম—ইহাই আমি সৌভাগ্য জ্ঞান করি ? ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা যে, অধঃপতনের পূর্ব্বেই যেন আমার এই শোক দুঃখ পরিপূর্ণ অসার জীবন তরীকে অনন্তকাল জন্য অনন্তকালের-সমুদ্রে ডুবাইতে পারি।” এই বলিয়া আবার প্রেমভরে অশ্রুপ্লাবিত নেত্রে পুত্রের মুখচুম্বন করিলেন।

আমি কহিলাম,—বিনোদিনি, আর কেন ? আজিকার এই যুদ্ধে, যখন তুমি জয়শালিনী হইয়াছ,—জয়শালিনী হইয়া শিরে যে বিজয় মুকুট পড়িয়াছ জগদীশ্বর চরণে প্রার্থনা করি—অনন্তকাল এই বিজয় মুকুট মাথায় পরিয়া অনন্ত গৌরবে, এই দুঃখ পূর্ণ জীবন যাপন কর।”

বিনোদিনী আবার ক্ষণকাল কি ভাবিলেন। তার পর ধীরে ধীরে—অতি ধীরে ধীরে কহিলেন,—“দেখুন, আজিকার এই পুণ্য দিন হইতে আপনার সহিত একটী নূতন সম্বন্ধে আবদ্ধ হইব। আজি হইতে আপনি ভ্রাতা,—আমি আপনার ভগ্নী। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সংসারে ইহা হইতে পুণ্যময় পবিত্র সম্বোধন আর কিছুই নাই। অমলা যেমন আপনার কনিষ্ঠা ভগ্নী—আজি হইতে আমিও তেমনি আপনার কনিষ্ঠা ভগ্নী হইলাম।”

আমি উদ্বেলিত হৃদয়ে কহিলাম—উত্তম। আজিকার এই পুণ্য দিন হইতে, আমি তোমার ভ্রাতা,—তুমি আমার সহোদরা কনিষ্ঠা ভগ্নী হইলে। আজিকার এই দিন হইতে আগে বিনোদিনী—পাছে অমলা।”

আবার কি জানি, বিনোদিনী ক্ষণকাল আপনার মনে আপনি কি ভাবিলেন তার পর হাসি মুখে কহিলেন,—“দাদা”। আহা, কি পবিত্র ও মধুর সম্বোধন! এমন পবিত্র ও মধুর সম্বোধন থাকিতে কি না অপবিত্র সম্বোধন পাতাইবার জন্য লালায়িত হইয়াছিলাম! বিনোদিনী কহিলেন,—“দাদা, আজিকার এই শুভদিনে আপনার এই অনাথিনী ভগ্নীর একটি অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে। এক দিন এই অনাথিনীর কথা রক্ষা করিয়াছিলেন। আশা আছে, আজিকার দিনে তাহার একটি ক্ষুদ্র প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া তাহার জীবনকে অমৃতধারায় সঞ্জীবিত করিবেন।”

আমি,—"কি প্রার্থনা—বিনোদিনি!

বিনোদিনী মধুর অধরে মধুর হাসি হাসিয়া কহিলেন,—"আপনি একটী বিবাহ করুন। আজিকার এই শুভ দিনে ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।"

আমি—"আবার কেন সে অনুরোধ।"

বিনোদিনী—"কেন আমাদিগকে কি সুখী করা আপনার কর্ত্তব্য নয়।"

আমি,—"বিবাহ ছাড়া আর কিছুতেই কি তোমাদিগকে সুখী করিবার উপায় নাই।"

বিনোদিনী,—"থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাতে আমাদের চিত্তবিনোদ না হইতেও পারে। তাহা ছাড়া আর একটি বিশেষ কারণ আছে।"

আমি,—"আর কি কারণ আছে।

বিনোদিনী,—"আর কারণ,—সংসারে কি স্ত্রী কি পুরুষ,—বিবাহ না করিলে কাহারই মনুষ্যত্ব জন্মে না। দেখুন—রাগকরিবেন না—দেখুন আপনি যদি বিবাহিত হইতেন তবে আজ আমার সহিত যে ব্যবহার করিলেন এরূপ ব্যবহার কখনও করিতেন না।"

আমি,—"আবার কেন সে কথা তুলিতেছ বিনোদিনী?

বিনোদিনী,—দিদি ও অমলার আন্তরিক ইচ্ছা আপনি বিবাহ করেন—আমারও সেই ইচ্ছা।

আমি,—"তোমাদের নিকট প্রার্থনা আর আমাকে এ বিষয়ে কোনও অনুরোধ করিও না।" এই বলিয়া আমি বহির্ব্বাটীতে উঠিয়া গেলাম।

রাজনৈতিক ভূমিকম্প

ফরাসী বিপ্লব।

(৬৭ পৃষ্ঠার পর)

অনন্তর ২৩ শে জুনের সেই বিখ্যাত অধিবেশন হইল। রাজা সভা প্রবেশ করিলেন। সভাসদ্‌গণ পাষাণ-প্রতিমাবৎ নিশ্চল, নিস্তব্ধ; কেহ কোনপ্রকার সম্ভ্রম প্রদর্শন করিতে উৎসুক নহেন। কিন্তু রাজা তাহা উপেক্ষা করিলেন, তিনি সম্মানলাভের প্রত্যাশায় সভা প্রবেশ করেন নাই, তিনি ফ্রান্সের প্রজা-

বর্গকে সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা দান করিতে আসিয়াছেন। সভার কার্য্যারম্ভ হইল। রাজা প্রতিনিধিগণের জাতীয়সমিতিসংস্থাপনমন্ত্রণা নিতান্ত দূষণীয় বলিয়া বক্তৃতা করিলেন। তাঁহাদের আচরণে ষ্টেট্স জেনারল নামক মহাসভায় যে স্বাতন্ত্র্য ও বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইয়াছে, এবং তন্নিমিত্ত সাধারণের শান্তি যে প্রকার ব্যাহত ও ভবিষ্যতের সুখাশা যে রূপ অন্ধীভূত হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিয়াও তিনি নিরতিশয় ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন।

অনন্তর রাজার আদেশসমূহ পঠিত হইল। প্রথম আদেশে ষ্টেট্স জেনারেল নামক মহাসভা দৃঢ়ীকৃত, ও পূর্ব্ববৎ বিভাগত্রয়ে বিভক্ত থাকিয়া বিধিবদ্ধ হইল। তৃতীয় বিভাগ হইতে ১৭ ই জুন তারিখে জাতীয় সমিতি সংগঠন বিষয়ে যে সকল মন্তব্য ঘোষিত হইয়াছিল, তাহা প্রত্যাখ্যাত হইল। মহাসভার আহ্বান অধিবেশন প্রভৃতি রাজার ক্ষমতাধীন রহিল। দ্বিতীয় আদেশে অর্থনিবন্ধন পদমর্য্যাদার লাঘব করা হইল। সম্ভ্রান্ত ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের কর নিষ্কৃতির অবসান হইল। রাজ পরিবারের ব্যয় নিয়মিত হইল। জাতীয় ঋণের সুব্যবস্থা করা হইল। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা অর্পিত হইল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও সম্মান-পদবী সুরক্ষিত হইল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও দণ্ডবিধি সংশোধিত হইল। রাজানুগ্রহে প্রজামাত্রের সমভাগ সংবিহিত হইল। দেশময় রাজপথ সমূহ রক্ষার সুবন্দোবস্ত হইল, এবং প্রাদেশিক সমিতি সংস্থাপনের অনুমতি হইল।

পাঠান্তে রাজা আনন্দ গদ্ গদ্স্বরে কহিলেন, "আমি আমার প্রজার জন্য অদ্য যে সমস্ত দান করিলাম, অন্যকোন দেশে কোনরাজা তাহা করেন নাই; আবার ফ্রান্সের প্রজাবৃন্দ এই সমস্ত দানের যাদৃশ যোগ্য হইয়াছেন, অন্য কোন দেশের প্রজাগণও তাহা হইতে পারে নাই।"

বস্তুতঃই এ সমস্ত সামান্য দান নহে। দেশবিশেষে ইহাতে আসন্ন উপপ্লব রক্ষা হইতে পারিত, কিন্তু ফ্রান্সে সেরূপ হইল না। অথবা যখন সুমধুর ভাষা ও স্নেহময় দান লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিত, সে সময় ফ্রান্স হইতে চলিয়া গিয়াছিল। রাজা, পরদিন তিন বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন গৃহে সমবেত হইবার আদেশ দিয়া সভাভঙ্গ করিলেন। সম্ভ্রান্ত ও পুরোহিতবর্গ তদনুসারে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, কিন্তু প্রজা-প্রতিনিধিবর্গ স্ব স্ব আসন পরিত্যাগ করিলেন না।

অনন্তর জনৈক দূত আসিয়া তাঁহাদিগের নিকট রাজ অভিপ্রায় ব্যক্ত

করিলেন। মিরাবো তখন সঙ্গিগণকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, "আমি স্বীকার করি, অদ্য রাজা আমাদিগকে যে সমস্ত বিষয়ে স্বাধীনতা দান করিয়াছেন, সাধারণের সুখশান্তির জন্য তাহা যথেষ্ট হইতে পারে, কিন্তু এই সমস্ত রাজদানের প্রতি কিছুমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। আমাদের রাজা একেশ্বর ইহা যেন আমরা বিস্মৃত না হই; এবং একেশ্বরেরা এক সময়ে দাতা ও সময়ান্তরে দত্তাপহারী হইয়াছেন, ইহাও জগতের ইতিবৃত্তে নিতান্ত বিরল নহে। আর রাজা আমাদিগকে কি স্বাধীনতাই বা অর্পণ করিলেন? তিনি সভায় আদেশ প্রচার করিতেই আসিয়া ছিলেন; আমরা কি কেবল নীরবে আজ্ঞা পালন করিতেই আসিয়াছি? ঐ দেখুন বন্ধুগণ! আমাদের চতুঃপার্শ্বে সুসজ্জিত রাজসেনা দণ্ডায়মান, এখন বীরোচিত ভাবে আমাদের সেই টেনিস্ ক্রীড়াঙ্গনের শপথ প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য হইতেছে।" সহচরদিগকে এইরূপ উত্তেজিত করিয়া মিরাবো রাজদূতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "মহাশয়, প্রস্থান করুন, আপনার প্রভুকে বলুন, আমরা প্রকৃতিপুঞ্জের আদেশক্রমে এই স্থানে সমবেত হইয়াছি; জাতীয় সমিতি সংগঠনই আমাদের প্রতিজ্ঞা; আমরা সঙ্গীন সঞ্চালন ব্যতীত স্থান ভ্রষ্ট হইতে পারি না।"

আজি ফ্রান্সে রাজাদেশের কি অবমাননাই হইল! লুই না চাহিতে এত দান করিলেন, তাহার কি এই প্রতিদান হইল! অথবা রাজা শক্তিমান্ হইলে, তদীয় কৃপাকটাক্ষও ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা সহকারে গৃহীত হয়, কিন্তু দুর্ব্বল নৃপতির ভূরিপ্রমাণ দান ও ঋণ পরিশোধ ভিন্ন আর কিছুই বলিয়া গণ্য হয় না। লুইএর পক্ষেও তাহাই ঘটিল। লুই দুর্ব্বল, কেননা রাজকোষে অর্থ নাই, জাতীয় ঋণের ইয়ত্তা নাই; সমর বিভাগে বিশ্বস্ত লোক নাই। লুই দুর্ব্বল, কেননা তাঁহার পিতৃপিতামহগণ ফ্রান্সের প্রতি অত্যাচার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা ফ্রান্সের প্রস্তুত অন্ন বলপূর্ব্বক উদরস্থ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা লুইকে অনন্ত ঋণজালে জড়ীভূত করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ফ্রান্স আজি সহস্র বৎসরের লুণ্ঠিত ধন মান লুইএর নিকট এক দিনেই ফিরিয়া চাহিতেছে। দুই চারিটী সামান্য রাজনৈতিক দানে তাহার কি হইবে?

পর দিবস ডিউক অব্ আর্লেয়িন ও অপর ৪৬ জন সভ্য স্ব স্ব বিভাগ পরিত্যাগ করিলেন। কথিত আছে ডিউক মহোদয় কুলক্রমাগত আসন পরিত্যাগকালে

মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়া ছিলেন। তাঁহারা তৃতীয় বিভাগে যোগদান করিলে. সভাপতির আসন প্রদানে ডিউক মহাশয়ের সম্মাননা করা হয়, কিন্তু তিনি সে আসন গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল সিংহাসন, কিন্তু বিধাতা তাঁহার অদৃষ্টে গিলোটিন লিখিয়াছিলেন।

দেখিয়া শুনিয়া রাজা অবশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ও পুরোহিতবর্গকে তৃতীয় বিভাগে যোগ দিতে বলিলেন। তাঁহারা কহিলেন আমরা যথা সম্ভব সংখ্যায় উপরের বিভাগদ্বয় অধিকার করিয়া থাকিলে আপনাকে জাতীয় সমিতির আক্রমণ হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা করিতে পারিব ; যদিচ তাহাতে আমাদিগের নানাবিধ বিপৎপাতের সম্ভাবনা আছে তথাপি আপনার জন্য আমরা তাহাতে অণুমাত্র ও পশ্চাৎপদ হইব না। রাজা বলিলেন "আমি স্বার্থের জন্য আমার বিশ্বস্তবর্গকে বিষম বিপদে লিপ্ত হইতে দিব না। তাদৃশ প্রত্যক্ষ বিপদ্ হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করা আমার যেমন কর্ত্তব্য তেমনি অভিপ্রেত হইতেছে। আমি মনঃস্থির করিয়াছি। আমার জন্য যেন কাহারও কেশমাত্রের ও অপচয় না হয়। আমি সহজে আপনাদিগকে বলিতেছি, তাহা যদি যথেষ্ট না হয়, তবে ফ্রান্সের অধীশ্বর-রূপে আজ্ঞা করিতেছি, আপনারা অবিলম্বে তৃতীয় বিভাগে যোগদান করুন।" রাজাজ্ঞা প্রতিপালিত হইল। সম্ভ্রান্ত ও পুরোহিতবর্গ তৃতীয় বিভাগে গমন করিলেন, সেস্থানে রাজনৈতিক বাদানুবাদে সংখ্যার অল্পতা বশতঃ শীঘ্রই তাঁহাদিগের চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট রহিল না।

ফ্রান্সের জন সাধারণের, বিশেষতঃ পারীবাসিগণের ধারণা হইল, স্বর্ণযুগ আগত প্রায়। এদিকে শিক্ষিত লোকেরা দেশহিতৈষিতায়, সম্পন্ন লোকেরা দুর্ভাবনায়, ইতরলোকেরা অভাব-তাড়নায়, বণিকসম্প্রদায় উচ্চাশয়ে, যুবকেরা নবীকরণ-প্রিয়তায়, বৃদ্ধ ভীতিপরম্পরায়, সকলেই ব্যস্তসমস্ত সকলেই যেন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। ডিউক মহাশয়ের নব-নির্ম্মিত প্রকাণ্ড প্রাসাদ আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল হইল। ফ্রেঞ্চগার্ডনামক রাজসেনার তিনশত সৈন্য স্বদল পরিত্যাগ করিয়া ডিউক মহাশয়ের সমৃদ্ধিশালী ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিল। সকলে আনন্দে অধীর, অধীরতার শেষ সীমা,—সদ্বংশজাতা কুলকামিনীরাও অভ্যাগত সৈন্যদিগকে সাদরে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। উহাদের মধ্যে অগ্রগামী এগার জন সৈন্য রাজাদেশে ধৃত ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। জাতীয়

সমিতির প্রার্থনায় রাজা উহাদিগকে ক্ষমা করিতেও প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু জন সাধারণের সে বিলম্ব সহিল না। তাহারা অবিলম্বে ছয়সহস্র জুটিয়া কারার দ্বার ভঙ্গ করতঃ বিদ্রোহিগণের উদ্ধার সাধন করিল।

রাজা এইবার বিপ্লব উপস্থিত বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। বল প্রয়োগ ব্যতীত আর কিছুতেই রক্ষা হইবার সম্ভাবনা নাই বিবেচনা করিয়া তিনি স্বীয় সেনার উপর নির্ভর করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। বিশ্বস্ত বৃদ্ধ ব্রগ্‌লিও রাজসেনার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। রাজা সেনানীকে এই মর্ম্মে উপদেশ দিলেন "তুমি আমাকে সাহায্য করিতে নিযুক্ত হইলে; আমার তাদৃশ ধন নাই, সংপ্রতি সৈন্য-হীনও হইয়াছি, কারণ ইহা তোমার নিকট গোপন করিতে পারি না যে আমার সেনা বিভাগে সর্ব্বত্র বিশ্বাস-ঘাতকতার চিহ্ন দেখা দিয়াছে। যে সকল লোক ফ্রান্সের সিংহাসনকে বিপর্য্যস্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে, তুমি যদি অত্যাচার ও রক্তপাত না করিয়া তাহাদিগকে খর্ব্ব করিতে পার, তাহা হইলে আমার যাবতীয় অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে।" বৃদ্ধ ব্রগ্‌লিও তদনুসারে রাজ পথে সুসজ্জিত সৈন্য পরিচালন ও ভূরিপ্রমাণ আগ্নেয়াস্ত্র প্রদর্শন করিয়া সর্ব্ব সমক্ষে রাজশক্তির সজীবতা প্রতিপাদন করিতে লাগিলেন।

মিরাবো রাজার নিকট এই মর্ম্মে আবেদন করিলেন যে এই প্রকার উত্তেজনার সময়ে প্রকাশ্যস্থানে সৈন্যচালনা বিপদ্‌জনক বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে পুরবাসীদিগকে সংযত ও সুনিয়মিত না করিয়া বরং উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতে পারে। মিরাবোর আবেদন গ্রাহ্য হইল না। এমন কি সচিব প্রবর নেকার আবেদনের অনুকূলে বলিতে গিয়া অমনি কর্ম্মচ্যুত হইলেন। কেবল কর্ম্মচ্যুত কেন, তিনি অবিলম্বে ফ্রান্স পরিত্যাগ করিয়া যাইতেও সমাদিষ্ট হইলেন।

এই সংবাদে জন সাধারণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। ডিউক ভবন লোকাকীর্ণ হইল। ইতরপক্ষীয় জনৈক নেতা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল "সশস্ত্র হও, সশস্ত্র হও, আর রক্ষা নাই, নেকারের পদচ্যুতি ও প্রজাবন্ধুগণের হত্যা একই কথা; ঐ দেখ শ্যাম্প ডি মার হইতে সুইস্ ও জর্ম্মান সৈন্যগণ আমাদিগকে হত্যা করিতে আসিতেছে।"

বক্তৃতা মাত্রেই শত সহস্র লোক সশস্ত্র হইয়া উঠিল। তাহারা নেকার ও

ডিউকের প্রতিমূর্ত্তি স্কন্ধে করিয়া ঘোরতর জয়ধ্বনি করিতে করিতে রাজপথে বাহির্গত হইল। একদল রাজসৈন্য তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিল। তাহারা অজস্র শিলা বর্ষণে জনতার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিল না বটে, কিন্তু অন্যদিক হইতে একদল অশ্বারোহী আসিয়া জনতা ভঙ্গ করিয়া ফেলিল। বিবাদে দুই পক্ষের দুইটী লোক নিহত হইল। ফরাসী বিপ্লবরূপিণী শ্মশানকালী এই প্রথম বলি গ্রহণ করিলেন।

ফ্রেঞ্চ গার্ড নামক সেনা একরূপ অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল। সাধারণ লোকের সহিত মিশিতে পাইলে পাছে রাজার প্রতিকূলাচরণ করে, এইজন্য তাহাদিগকে স্ব স্ব বারিক ছাড়িয়া যাইতে দেওয়া হইত না। আজি সেই সার্দ্ধ তিন সহস্র লোক সংহত বলে লৌহদ্বার ভগ্ন করিয়া বাহির হইল। তাহারা অবিলম্বে জন সাধারণের সহিত মিলিত হইয়া প্রধান প্রধান বারুদাগার ও বন্দুকের দোকান সমূহ লুণ্ঠন করিল। রাজকীয় অস্ত্রাগার অধিকার করিয়া তথা হইতে বিশ সহস্র বন্দুক ও কুড়িটী কামান লইয়া সাধারণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিল। গ্রীভ্ নামক স্থান যাবতীয় আগ্নেয়াস্ত্র ও বারুদের ভাণ্ডারে পরিণত হইল। অবিলম্বে পঞ্চাশ সহস্র বল্লম প্রস্তুত ও ইতর লোকদিগের মধ্যে বিতরিত হইল। এতদ্ব্যতিরেকে ৪৮ সহস্র আগ্নেয়াস্ত্রধারী সৈন্য সংগৃহীত হইল। ইহাই প্যারীর সেই ন্যাশনাল গার্ড নামক সেনার সূত্রপাত, বিপ্লব সময়ে যাহাদের সদসৎ কার্য্য পরম্পরা জগতের ইতিবৃত্তে অবিনশ্বর হইয়া রহিয়াছে।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই ব্যাষ্টীল দুর্গ আক্রান্ত হইল। তথাকার শাসন কর্ত্তা ডি[illegible]জন কর্ম্মচারীর সহিত ধরাশায়িত হইলেন। ক্ষিপ্ত ইতরবৃন্দ তাঁহাদের মৃতদেহ বল্লমের অগ্রে তুলিয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে গ্রীভ্ যাত্রা করিল। পথিমধ্যে একজন ধনাঢ্য বণিক্ তাহাদের সন্দেহে নিপতিত হইলেন। তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া বিচারার্থ ডিউকভবনে লইয়া যাইতেছিল এমন সময়ে কোন পামর তাঁহাকে গুলি করিলে, অপরেরা তদীয় মৃতদেহ দীপস্তম্ভে টাঙ্গাইয়া রাখিয়া গেল।

এই সংবাদে জাতীয় সমিতি অত্যন্ত বিপদ্ গণিলেন। তাঁহারা রাজ শক্তি খর্ব্ব করিতে যতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, সাধারণ শান্তির জন্য তাঁহাদের দায়িত্ব ও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহা তাঁহারা অবগত ছিলেন। কেহ প্রস্তাব

করিলেন রাজ সদনে দূত প্রেরণ করা যাউক, তিনি অবিলম্বে সৈন্য-সংবরণ করুন। কেহ বলিলেন "দেখা যাউক, রাজা স্বয়ং কি ব্যবস্থা করেন। সাধারণ লোকের ন্যায় রাজারও যদি ভূয়োদর্শনে শিক্ষা লাভ হয়, তাহাও হইতে পারে।"

পরদিন প্রাতঃকালে রাজা স্বয়ং জাতীয় সমিতি গৃহে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দুই সহোদর ব্যতীত তাঁহার সঙ্গে অন্য কোন অনুচর ছিল না। রাজা সভ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহোদয়গণ! আমি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে আপনাদিগের সহিত পরামর্শ করিতে আসিয়াছি। রাজধানীতে যেরূপ বিষম গোলযোগের সম্ভাবনা দেখিতেছি তাহাতে ব্যক্তি মাত্রেরই সতর্ক হওয়া উচিত। আমি যে জাতীয় সমিতির বিশ্বস্ততার উপর একান্ত নির্ভর করি, তাহা আপনারা আমার এই প্রকার আগমনেই অনুভব করিয়া থাকিবেন। আমি ভার্সেলি এবং প্যারী হইতে সেনাদল স্থানান্তরিত করিতে আদেশ দিয়াছি। আপনারা কি আমার সদভিপ্রায় সাধারণের গোচর করিবেন না?" সভ্যেরা সম্মত হইলেন। অবিলম্বে প্যারীতে শুভ সমাচার প্রেরিত হইল। সভাপতি বেলি নগরের মেয়র এবং লাফেট্‌ জাতীয় সেনার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন।

অনন্তর রাজা ভার্সেয়েল হইতে প্যারী যাত্রা করিলেন। অনাহূত লক্ষাধিক ইতর লোক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। তাহাদিগের চীৎকারে কর্ণ বধির প্রায়, এবং হাব ভাবে কি নিদারুণ বিভীষিকাই বিস্তার করিতে লাগিল! অসহনীয় অপমানের মধ্যে রাজা প্যারী উত্তীর্ণ হইবামাত্রেই কয়েক সহস্র প্যারী বাসী ইতর তাঁহাকে লইয়া পুনরায় ভার্সেয়েল যাত্রা করিল। এই অভাবনীয় ঘটনা দর্শনে অভিজাত তন্ত্র এক কালে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। শতাধিক সম্ভ্রান্ত পরিবার সেই মুহূর্ত্তেই ফ্রান্স পরিত্যাগ করিলেন। বিশ্বস্ত সেনাপতি ব্রগলিও তাঁহাদের অনুগমন করিলেন। দৈনন্দিন পলাতকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিপ্লবের গতি অব্যাহত হইয়া উঠিল। রাজাও এককালে নিঃসহায় হইয়া পড়িলেন।

এই সময়ে জাতীয় সমিতি রাজসচিববর্গের কার্য্যকলাপে দোষারোপ করিবা মাত্রেই তাঁহারাও দেশত্যাগী হইলেন। রাজা ফাউলনকে শ্রেষ্ঠ সচিবের পদে নিযুক্ত করিলেন। ইতরবৃন্দ ক্রোধে অধীর হইয়া ফাউলনকে ধৃত এবং

বেলি ও লাফেটের সমক্ষে উপস্থাপিত করিল। তাঁহারা তদীয় জীবন রক্ষার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। সেই ভীষণ ও প্রচণ্ড জনতা দেখিতে দেখিতে ফাউলনকে দীপস্তম্ভে লট্কাইয়া দিল এবং অবিলম্বে তাঁহার মস্তক লইয়া তদীয় জামাতা বার্থিয়ারের নিকট উপস্থিত হইল। বার্থিয়ার মৃত গুরুকে নমস্কার করিলেন। অমনি ইতরবৃন্দ তাঁহারও প্রাণ সংহার করিল পামরেরা উভয় মস্তক বল্লমে আরোপিত করিয়া জয়োল্লাসে প্যারী প্রদক্ষিণ করিতে চলিল।

অতএব সর্ব্বজনপ্রিয় সচিব নেকার সদলে পুনরাহুত হইলেন। নেকার আসিয়া দেখিলেন আর রক্ষা নাই, সমগ্র রাজ সেনা বিদ্রোহের পরিচয় দিয়াছে। সমগ্র ইতর ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রমজীবীরা স্ব স্ব ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া লুণ্ঠনের উপর নির্ভর করিতেছে। গ্রাম্য ইতর অনবরত ভূম্যধিকারীর মস্তক লক্ষ্য করিতেছে সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিয়াছে; কেহ কাহারও অধীনতা বা আনুগত্য স্বীকার করিতেছে না। বেলজাঙ্ক নামক জনৈক সৈনিক কর্ম্মচারী অধীনস্থ সৈন্যদিগকে শাসন করিতে গিয়া নিহত হইয়াছেন। পিশাচেরা তাঁহার মৃত দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ পর্য্যন্ত করিয়াছে।

আর জাতীয় সমিতি কি করিতেছেন? তাঁহারা ইতর মত্ত মাতঙ্গের শৃঙ্খল খুলিয়াই দিয়াছেন কিন্তু এখন আর তাহাকে বশে আনিতে পারিতেছেন না। সভায় অনবরত "শান্তি শান্তি" বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। ঘোর দুর্ভিক্ষ আপতিত; দারিদ্র বিমোচন সভায় কতিপয় মাত্র লোকের অন্ন মিলিতেছে। দুই কোটী লোকের ক্ষুধা নিবৃত্তির কোনই উপায় দেখা যাইতেছে না।

শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তী।

কোহিনুরের ইতিহাস।

পৃথিবীর রাজা রাজড়ার ঘরে যত প্রকার মণি মাণিক্য আছে তন্মধ্যে কোহিনুর অতি প্রাচীন হীরক। যে আদত রত্নের উহা একখণ্ড মাত্র, তাহা ইউরোপীয়গণের হিসাবে পাঁচ হাজার বৎসরের উপর হইল গোলকুণ্ডা খনি হইতে উদ্ধৃত হয়। ঐতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত সমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশ যে কুন্তীপুত্র কর্ণরাজ উহার প্রথম অধিকারী। মহাভারতের সময়ে কর্ণ উহা

ব্যবহার করিতেন, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন উহার আকৃতি হংসডিম্বের ন্যায় ছিল; ওজন ছিল প্রায় ৯০০ নয় শত কারাট।

হস্তিনাপুর পতনের পর, কাহার হস্তে উহা তিন খণ্ডে বিভক্ত হয়, নির্ণয় করা কঠিন। যাহা হউক, নানা বিদেশীয়ের হাত ফিরিয়া কোহিনুর-খণ্ড পুনরায় দিল্লীতে মোগল সম্রাট বাবরের নিকট উপস্থিত হয়। ফরাসি পর্য্যটক টাবর্ণিয়ে ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন তথায় গমন করেন, বাদশাহ তাঁহাকে উহা দেখাইয়াছিলেন। তখন ডিম্বাংশের আকৃতি, ওজন ২৮০ কারাট। বাবর টবের্ণিয়েকে বলিয়াছিলেন, যে কোন আনাড়ী হীরাকাটের হাতে পড়িয়া উহা নষ্ট হইয়াছে।

১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নাদির শাহের লুণ্ঠিত ধন রত্নের সঙ্গে উক্ত হীরক খণ্ড পুনরায় দিল্লী ত্যাগ করে। নাদির শাহই উহার নাম করণ করেন 'কোহিনুর' (জ্যোতিঃ শৈল)। নাদির শাহের কোন বংশধর উহার লোভে সহোদরের চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত করিতেও ক্রটি করেন নাই।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাব কেশরী রণজিৎসিংহ কোহিনুরকে উদ্ধার করতঃ পুনরায় ভারতে আনিয়া নিজের হাতের বাজুতে রক্ষা করেন; লর্ড অকলাণ্ড উহার মূল্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় রণজিৎ বলেন "পাঁচ জুতা," অর্থাৎ উহা এত মূল্যবান্ যে কোন বাজারে বিক্রীত হইবার সামগ্রী নহে, যে ব্যক্তি অধিকারীকে জুতা মারিয়া উহা কাড়িয়া আনিতে পারে, উহা তাহারই সম্পত্তি। তিনি স্পষ্ট বলিয়াছিলেন, "আমি এক জনকে পাঁচ জুতা মারিয়া ছিনাইয়া আনিয়াছি, আবার আমাকে যদি কেহ পাঁচ জুতা মারিয়া উহা লইয়া যাইতে পারে তবে উহা তাহার। সুতরাং পাঁচ ঘা জুতা প্রহারই উহার মূল্য।"

রণজিতের মৃত্যুর ফলে তাঁহার কথা ফলিল। কোম্পানি বাহাদুর তৎপুত্র শিশুদলীপকে "পাঁচ জুতা" মারিয়া পাঞ্জাব রাজ্যের সঙ্গে উহা কাড়িয়া লইলেন। তৎপরে কিছুদিন কোম্পানির বাক্সে বদ্ধ থাকে। এই সময়ে লর্ড লরেন্সের অনবধানতা বশতঃ একবার হারাইয়া যায়। মহাত্মা লরেন্স একজন প্রকৃত অনাসক্ত বৈরাগী ছিলেন। ওরূপ উদার প্রেমিক সরল সাধু প্রকৃতির বড়লাট আমরা আর একটী পাই নাই, শীঘ্র যে পাইব, এরূপ আশাও কম। পঞ্জাব অধিকারের পর লরেন্স তৎপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিয়োজিত হন; দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত কোহিনুর তাঁহার জিম্মায় রাখা হয়। আপিস হইতে ওয়েষ্টকোটের পকেটে ফেলিয়া উহাকে গৃহে আনেন; তার পর ওরূপ সাত-রাজার-ধন-এক মাণিক হীরকরাজের কথা একেবারেই বিস্মৃত হন। কাপড় চোপড় উঠাইবার সময় সর্দ্দার-বেহারা ওয়েষ্ট কোট পকেটে একটা সামান্য টিনের কৌটা দেখিতে পাইয়া নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর সামগ্রী বোধে উহা রদী কাগজের টুক্রিতে ফেলিয়া দেয়। কএক মাস পরে যখন বিলাত হইতে উহার তলব হয় তখন উহার প্রাপ্তি পর্য্যন্ত লরেন্স সম্পূর্ণ বিস্মৃত। পরে মনে পড়িল, যে উহা তাঁহার হাতে দেওয়া হইয়াছিল। যাহা হউক মনে মনে অবশ্য খুব উদ্বিগ্ন হইলেও, কোন প্রকার বিচলিত ভাব প্রকাশ না করিয়া আপিসের কাজ সমাধা করতঃ সন্ধ্যার সময় বাংলাতে আসিয়া অনুসন্ধানে জানিলেন, ওরূপ অমূল্যরত্ন

কোহিনুর ঘরের এক-কোণে-স্থিত পরিত্যক্ত-কাগজের-ঝুড়িতে পড়িয়া আছে। সর্দ্দার বেহারা কৌটাটি উদ্ধার করিয়া আনিলে তাহাকে উহা খুলিয়া দেখিতে বলিলেন। মূর্খ বেহারা বলিল "হুজুর ইহাতে এক খণ্ড কাচ মাত্র আছে।" ঐ "কাচ খণ্ড" তাহার হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া লরেন্স ধড়ে প্রাণ পাইলেন। এই সময়ের মনের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি নিজে বলিয়াছিলেন, "ওরূপ বিপদে আমি জীবনে কখনও পড়ি নাই। কোহিনুর না পাওয়া গেলে কোম্পানি বাহাদুর এবং সাধারণ লোকে নিশ্চয় মনে করিত আমি উহা আত্মসাৎ করিয়াছি। কেহ বিশ্বাস করিত না যে কোহিনুরের ন্যায় মূল্যবান সামগ্রী বেখেয়ালী বশতঃ কেহ হারাইয়া ফেলিতে পারে।"

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি বাহাদুর ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়াকে কোহিনুর উপঢৌকন দেন। তৎপূর্ব্বে উহা আর একবার হীরাকাটের হাত ঘুরিয়া আসিয়াছে; সুতরাং ওজনে ১৮৬ কারাট মাত্র তাহার পর ইংলণ্ডে উহার আয়তন আরও কমিয়া গিয়াছে; বর্ত্তমান গুরুত্ব ১০৬ কারাট মাত্র। আকৃতিতে এখন গোলাপ ফুলের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সম্রাট মহিষী আলেক্‌জাণ্ড্রার বক্ষঃভূষণ রূপে বিরাজ করিতেছে।

কর্ণ রাজের হীরকের দ্বিতীয় খণ্ড রুষ-জারের রাজদণ্ডে শোভমান। উহার নাম "উর্ল্‌ক" ওজন ১৯৪ কারাট। উহা বহুকাল দাক্ষিণাত্যের ত্রিচিনপল্লী নগরস্থ কোন মন্দিরে দেব মূর্ত্তির শিরোভূষণ রূপে বিরাজ করে। তথা হইতে জনৈক ফরাসি জহুরি কর্ত্তৃক অপহৃত হয়। অনেক বিঘ্ন-বাধা অতিক্রম করিয়া উক্ত ফরাসি চোর উহা পারস্য রাজ্যের সম্মুখে উপস্থিত করত অতি সামান্য মূল্যে (বিশ হাজার টাকা মাত্র) বিক্রয় করে। হঠাৎ বাদশাহ হত হওয়ায় রাজ প্রাসাদ লুণ্ঠিত হয়। সেই সময়ে উহা শাফ্রাস নামক জনৈক আর্ম্মানীর হস্তগত হয়। সে ব্যক্তি উহা রুষিয়ার জারের নিকট লইয়া গিয়া বিক্রয় করিবার মানস করে। এমন সময়ে, নূতন নরপতি তদারক করিয়া যখন দেখিলেন রত্ন অপহৃত, তখন রাজ্য মধ্যে ইহার বিলক্ষণ অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। হীরক লইয়া পারস্য রাজ্য অতিক্রম করিয়া বাহির হওয়া শাফ্রাসের পক্ষে বিষম মুস্কিলের বিষয় দেখিয়া সে এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিল; উরুদেশের একস্থান ছিন্ন করিয়া মাংসের ভিতর উহাকে স্থাপন করতঃ উপরের মুখ সেলাই করিয়া ফেলিল। ক্ষতস্থান আরোগ্য হইলে শাফ্রাস্ যখন রুষিয়াভিমুখে যাত্রা করে, তখন সন্দেহ প্রযুক্ত অনেকবার তাহাকে খানাতল্লাসী দিতে হয় এমন কি সময়ে সময়ে তাহার প্রতি কঠোর যন্ত্রণা প্রয়োগ করাতেও ত্রুটি হয় নাই। দুর্দ্ধর্ষ শাফ্রাস্ সমস্ত সহ্য করতঃ পারস্যের সীমা অতিক্রম করিয়া রুষ রাজধানীতে উপনীত হয়। রাণী কাথারিন্ হীরক খণ্ড ক্রয় করিতে সম্মত হইলেও চল্লিশ সহস্র পাউণ্ড মূল্য দিতে অক্ষম হওয়াতে শাফ্রাস্ হলণ্ডের রাজধানী আম্‌ষ্টার্ডাম্ নগরে চলিয়া যায়, তথায় উহাকে কাটাইবার ইচ্ছা করে। এমন সময়ে রুষিয়ার কাউণ্ট উর্ল্‌কের নজরে পড়ায় তিনি কাথারীণের জন্য উহা ক্রয় করেন। যাহা শাফ্রাস্ ৪০ হাজার পাউণ্ডে বেচিতে চাহিয়াছিল; এখন তাহার দাম হইল নব্বই হাজার পাউণ্ড নগদ, আট শত পাউণ্ড বার্ষিক বৃত্তি, এবং তৎসঙ্গে একটী উচ্চ ওম্‌রাওর উপাধি। মণি মাণিক্যের মূল্য এই রূপই;—যদি কাহারও নজরে লাগে, সে খুব বেশী দাম দিতে কাতর হয় না। বাস্তবিক, সখের জিনিস গরজ মত কখনও অধিক কখনও অল্প মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। জহরাৎ সখের জিনিসের মধ্যে চূড়ান্ত।

তৃতীয় খণ্ড ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে খোরাশান প্রদেশের অন্তর্গত কুচা নগরের লুণ্ঠন কালে আব্বাস্ মির্জা নামক কোন ব্যক্তির হস্তগত হয়; ইহার ওজন ১৩২ কারাট। এই খণ্ড বহুকাল কোন কৃষকের গৃহে চকমকি পাথর রূপে অগ্নি উৎপাদন কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। বিভক্ত হওয়ার পর উহা কি প্রকারে কোথায় যায়, সে সম্বন্ধে কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

শ্রীচন্দ্র শেখর সেন।

নবপ্রভা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

১ম খণ্ড। } কলিকাতা, শ্রাবণ, ১৩০৮ সাল। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

কর্ম্মবাদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা।

এই প্রবন্ধে যাহা কিছু লিখিত হইতেছে তাহার সকল কথার বিচার প্রার্থনীয়। লেখকের উদ্দেশ্য এই যে সুবিজ্ঞ পাঠকগণের মধ্যে কেহ এই সকল গুরুতর বিষয়ের আলোচনা দ্বারা যদি আমাদিগকে আলোক প্রদান করিতে পারেন, তাহা হইলে বড়ই উপকার হয়। অবশ্য এস্থলে আলোচনা মানে কোন লিখিত শাস্ত্রগ্রন্থের রচনাদির প্রমাণ প্রয়োগ নহে, যুক্তিতর্ক দ্বারা সুন্দর বৈজ্ঞানিক ভাবে বিচার। গোঁড়ামী সকল বিষয়েই খারাপ; পূর্ব্বপোষিত কোন মতামতের পক্ষপাতী হইয়া বিচারে বসিলে তাহা কখনই সুবিচার হইতে পারে না। আবার এমন অনেকে আছেন যাঁহাদের উক্ত মতামতগুলি কোন সাধু মহাত্মার প্রচারিত বাক্যের উপর বিলক্ষণ দৃঢ় ভাবে স্থাপিত। প্রত্যেক কথায় তাঁহাদের একই উত্তর,—"যদি এরূপ হইত তাহা হইলে তিনি বলিতেন, তিনি যখন ও সম্বন্ধে ওভাবের কোন কথাই বলেন নাই, তখন কি প্রকারে বিশ্বাস করি?" এই "তিনি" যে সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন না, এবং বিশ্বব্যাপারের আগা-গোড়া সমস্ত বিষয়ের সকল প্রকার সত্য প্রচার করিতে আসেন নাই, ইহা তাঁহাদিগকে বুঝান কঠিন। এই প্রকাণ্ড "তিনি"-শব্দ যে সংসারে বিস্তর অনর্থপাত করিয়াছে, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বেশী করিয়া বলিতে হইবে না। এবম্প্রকারের অনেক ছোট বড় "তিনি" এ সংসারে হইয়া গিয়াছেন, এখনও হইতেছেন, আরও কত হইবেন,

তাহার সংখ্যা করা কঠিন। এই "তিনি"গণ প্রচার কালে বুঝিতে পারেন না যে ভবিষ্যতে তাঁহাদের কথার নানাজনে নানারূপ অর্থ করতঃ বিস্তর জীবকে অন্ধকারে ফেলিয়া সময়ে সময়ে বিষম বিভ্রাট ঘটাইবে। এই সকল টীকাকার যে কেবল জ্ঞানান্ধতা বশতঃ অর্থবোধে অক্ষম হইয়া ওরূপ ক্ষতি করিয়া থাকেন এমত নহে; উঁহাদের মধ্যে অনেকে নীচ স্বার্থসিদ্ধি বা স্বমত পরিপোষণোদ্দেশে জানিয়া শুনিয়া বিকৃত অর্থ প্রচারে প্রয়াস পান। ধর্ম্মপ্রচারক "অবতার" শ্রেণীর মহাজীবগণ সরল চিত্তের সাধুপুরুষ; তাঁহারা জানেন যে স্বর্গের সত্য বিকৃত করিবার সাধ্য মানুষের অসম্ভব; সুতরাং তাঁহারা জীবিতকালে তৎসম্বন্ধে কোনপ্রকার আশঙ্কা মনে স্থান দেন না। অথচ যেমন তাঁহাদের তিরোধান হয় অমনি চারিদিক হইতে নানাশ্রেণীর শিষ্য সেবক সহচর অনুচর উপস্থিত হইয়া মহাকোলাহলের সহিত তাঁহাদের প্রচারিত সত্যের দোহাই দিয়া নিজের নিজের মতানুযায়ী টীকা টিপ্পনী আরম্ভ করেন।

একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে* জীবের পরিণামাদি সম্বন্ধীয় জটিল বিষয় সমূহের মীমাংসা যে সহজ, তাহা কেহই বিশ্বাস করেন না। তবে বারম্বার অনুসন্ধান আলোচনা এবং ব্যাকুল হৃদয়ে সত্যলাভের চেষ্টা দ্বারা আমাদের বর্ত্তমান ধারণা-শক্তি অনুযায়ী যথাপ্রয়োজন আলোক পাইবার আশাও করা যাইতে পারে।

—কেবলমাত্র বুঝিবার ত্রুটি বশতঃ যদি কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সরল সত্যানুসন্ধায়ীর দ্বারা কোনপ্রকারের ভ্রান্ত মত প্রচারিত হয়, এবং তৎকালে উহা সর্ব্বসাধারণে গ্রাহ্যও করেন, তাহার সুফল পরে এই দাঁড়ায় যে ক্রমাগত উহার বিচার করিতে করিতে অবশেষে লোকে খাঁটি সত্যে উপনীত হইয়া থাকে।— অনেকেই জানেন যে ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা টোরিচেলী† কর্ত্তৃক বায়বীয়-ভার সম্বন্ধীয় সত্য আবিষ্কৃত হয়। তৎপূর্ব্বে "ফিউগা ভাকুই"‡ ভ্রান্ত মতের প্রচলন ছিল। প্রকৃতিতে কোন স্থান একেবারে শূন্য থাকিতে পারে না§—এই অসীম

*Eternal problems of life.

† Evangeliste Torricelli, Italian physicist & mathematician.

‡ *Fuga vacui.*

§ Nature abhors vacuum.

বিশ্ব সর্ব্বত্র পূর্ণ রহিয়াছে, কোথাও বিন্দুমাত্রও অংশ নাই যেখানে একেবারে কিছুই নাই। ইত্যাকার মতের উপর নির্ভর করিয়া পিচ্‌কারী, চীনাফল প্রভৃতির ক্রিয়া সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জগৎ একপ্রকার মোটামুটি সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছিলেন। পরে প্রক্রিয়া দ্বারা যখন দেখা গেল, ঐ শ্রেণীর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যন্ত্র সম্বন্ধে উক্ত নিয়ম খাটে না, অর্থাৎ তেত্রিশ ফুট উর্দ্ধপর্য্যন্ত জল উঠে তদুপরি খালি থাকিয়া যায়, তখন কোন প্রকার সমীচীন মীমাংসা করিতে অক্ষম হওয়ায় গালিলিও প্রমুখ পণ্ডিতগণ একটা রফা-রফিয়তের মত স্থির করিলেন,—তেত্রিশ ফুট উর্দ্ধ পর্য্যন্ত উক্ত নিয়ম খাটে বেশী হইলে খাটে না। গালিলিওর মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্য টোরিচেলী ওরূপ অবুস্থবু মত লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনি বিস্তারিত প্রক্রিয়া দ্বারা দেখিলেন যে জলের পরিবর্ত্তে পারদ ব্যবহার করিলে অধিকতর গুরুত্বহেতু উহার উর্দ্ধগতি তেত্রিশ ফুটেরও অনেক কম হইয়া থাকে। তখন বুঝিতে পারিলেন যে তরল পদার্থের ওরূপ উর্দ্ধগতির কারণ বায়বীয়-ভার ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে বায়বীয়-ভারের কথা এখন পাঠশালার বালকেরাও জানে টোরিচেলীর পূর্ব্বে তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল, এবং তাঁহার দ্বারা এক ভ্রান্ত মতের খণ্ডন চেষ্টায় আবিষ্কৃত হয়।

তাই বলিতেছিলাম যে "জন্ম জন্মান্তর" "কর্ম্মফল" "পরলোকে অনন্তোন্নতি" "করুণাবাদ" ইত্যাদি জীবের নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ সম্বন্ধে যদিও কোন সুনির্দ্ধারিত মত সর্ব্ববাদী সম্মত রূপে অদ্যাপি গৃহীত হয় নাই, কিন্তু ঐ সকল গুরুতর বিষয়ে বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের মতামত বারম্বার আলোচনা করিলে স্বপক্ষ বিপক্ষ গণের সমস্ত যুক্তি তর্কের বিচার করিতে করিতে আমাদের নিকট নিশ্চয়ই একটা আলোক পঁহুছিবার সম্ভাবনা।

মৃত্যুর পর লোকলোকান্তরে ভ্রমণানন্তর মানুষ আপন কর্ম্মফলে পুনরায় ইহলোকে জন্মগ্রহণ করতঃ পূর্ব্ব সুকৃতি দুষ্কৃতি ভোগ করিয়া থাকে। বিশ্বের সর্ব্বত্র কঠোর নিয়মের শাসন, গাত্রের কোন অংশে সূচিকা বিদ্ধ করিলে তথা হইতে রক্ত নির্গমন যেমন উহার অনিবার্য্য ফল :—সহস্র যাগ যজ্ঞ, পূজা হোম, উপাসনা প্রার্থনা, মন্ত্র তন্ত্র দ্বারা অন্যথা হয় না; তদ্রূপ ভাল মন্দ যে সকল চিন্তা বাক্য ও কার্য্য আমাদের দ্বারা প্রসূত হইতেছে জন্মান্তরে আমাদিগকে

তাহার প্রত্যেকটার ফলভোগ করিতেই হইবে, কোন প্রকারে এই কঠিন নিয়মের একতিল ব্যতিক্রমও অসম্ভব। এবম্বিধ মত ইদানীং অনেকেই গ্রহণ করিয়াছেন। আর্য্য ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে ইহা বহুল প্রচারিত, কিন্তু আধুনিক থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায় উহাকে সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন।

উক্ত মতের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে উহা দ্বারা দুর্ব্বল অসহায় মানব সন্তান সরল ব্যাকুল অনুতাপ দ্বারাও ক্ষমালাভে বঞ্চিত যদি হয় তাহা হইলে দয়াল পিতার দয়ার স্থান কোথায় থাকে? ক্ষমাই দয়ার প্রধান ও মহত্তম কার্য্য। ওরূপ বিশ্বাস পোষণ করিলে উপাসনা প্রার্থনা প্রভৃতির ব্যবহার ত উঠিয়াই যায়; ক্ষমা করুণারও ঐ দশা ঘটে। কঠিন নিষ্ঠুর মানুষকে যখন উপাসনা প্রার্থনা অনুতাপাদি দ্বারা বশীভূত হইয়া প্রতি নিয়ত শত শত অপরাধী ব্যক্তিগণকে মার্জ্জনা করিতে দেখা যায়, তখন দয়াময় পতিত পাবন দীনবন্ধু অপার করুণাবশতঃ কাহাকেও কখন ক্ষমা করেন না, এ কেমন কথা হয়? নিম্নে নরলোকে যাহা সর্ব্বদা দেখা যায় উর্দ্ধে ভগবানের সিংহাসন সমক্ষে তাহা নাই, ইহা কি প্রকারে বিশ্বাস করিতে পারি? তবে যদি বুঝিতে পারা যায় যে সংসার একটা প্রকাণ্ড অন্ধ জড়শক্তির দ্বারা পরিচালিত, তদুপরে কোন প্রকার চৈতন্যের আধিপত্য নাই, সে স্বতন্ত্র কথা। তাহা হইলে দয়া ক্ষমা প্রভৃতির উৎপত্তি কোথা হইতে? ঐ সকল দেবোপম বৃত্তি কি স্বতঃই মানব হৃদয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছে? অসৎ হইতে সতের আবির্ভাব বিজ্ঞানবিরোধী। যেমন জড় শক্তি সমূহের ভাণ্ডার প্রকৃতি তেমনি চৈতন্য সম্পর্কীয় সমস্ত বিষয় পুরুষ বা ঈশ্বরে অবস্থিত। যাঁহারা সংসারকে একটা প্রকাণ্ড কলের মত স্থির করিয়া বসিয়া আছেন তাঁহারা কেবল এক দিক মাত্র দেখিয়া উক্ত প্রকারের সিদ্ধান্তে উপনীত। সংসারে ক্ষমা নাই, দয়া নাই, সমস্ত ব্যাপার কঠোর নিয়মের অধীন, একথা তাঁহাদেরই মুখে শোভা পায়। যাঁহারা দেখেন, জড় চৈতন্যের মিলন ভূমি এই বিশ্বব্যাপার অনেক স্থলে জড় শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইলেও মোটের উপর সম্পূর্ণ রূপে চৈতন্যের অধীন, তাঁহারা দিব্য চক্ষে ইহাও দেখিয়া থাকেন যে ন্যায়বান অথচ দয়াময় প্রেমময় একজন সর্ব্বোপরি রাজরাজেশ্বর রূপে বিরাজমান। তাঁহার শাসনদণ্ড প্রেমের, কঠোর আইনের নহে, তিনি

ভালবাসিয়াই মঙ্গলের জন্য দণ্ডবিধান করেন, তাঁহার আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য নহে।

জন্ম জন্মান্তর ও কর্ম্মফল সম্বন্ধে থিয়সফিষ্টগণ বহু গ্রন্থ প্রচার দ্বারা সংসারের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। মৃত্যুর পরে কোন্ কোন্ অবস্থায় লোক লোকান্তর দিয়া পুনরায় ধরাধামে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইবে সে বিষয়ে ইউরোপ আমেরিকার ভ্রমণ বৃত্তান্তের ন্যায় প্রত্যক্ষ বর্ণনা সকল আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছেন। "মৃত্যু ও তদনন্তর" নামক পুস্তকে বিবি বেসান্ত স্পষ্ট বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি বিস্তর কষ্ট সহকারে বহুদিন পর্য্যন্ত আফ্রিকা পরিভ্রমণ করতঃ তথাকার জীব উদ্ভিদাদির বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন, ঘরে বসিয়া বিদেশ কখন না দেখিয়া কেহ তাঁহার দ্বারা প্রচারিত কোন বিষয়ের প্রতিবাদ করিলে তিনি যেরূপ হাসিয়া উড়াইয়া দেন, আমাদের বর্ণিত পারলৌকিক সম্বাদ সম্বন্ধেও সেই কথা।"*

বড়ই শক্ত কথা!!! এপ্রকার জোরের সহিত যে কথা প্রচারিত হয় তাহা সহসা উড়াইয়া দিতে কাহার সাহস হয়? হয় প্রচারক নিতান্ত শঠ মিথ্যাবাদী, তাঁহার কথা দ্বারা সংসারকে প্রতারণা করিতে বসিয়াছেন, নতুবা মূর্খ বর্ব্বর ঘোর মানসিক বিকার গ্রস্ত হইয়া প্রলাপ বকিতেছেন মাত্র; অবিশ্বাস করিতে

* In this way those regions become to him matters of knowledge, as definite, as certain, as familiar, as if he should travel to Africa in ordinary fashion, explore its deserts, and return to his own land the richer for the knowledge and experience gained. A seasoned African explorer would care but little for the criticisms passed on his reports by persons who had never been thither. He might tell what he saw, describe the animals whose habits he had studied, sketch the country he had traversed, sum up its products and its characteristics. If he was contradicted, laughed at, set right, by untravelled critics, he would be neither ruffled nor distressed, but would merely leave them alone. Ignorance cannot convince knowledge by repeated asseveration of its nescience. The opinion of a hundred persons on a subject on which they are wholly ignorant is of no more weight than the opinion of one such person. Evidence is strengthened by many consenting witnesses, testifying each to his knowledge of a fact, but nothing multiplied a thousand times remains nothing.

Death—and After?

Annie Besant. F. T. S.

গেলে এ প্রকার মীমাংসা ভিন্ন গতি নাই, নচেৎ ষোল-আনা বিশ্বাস করিতে সবাই বাধ্য।

থিয়সফিষ্টদিগের গ্রন্থে পারলৌকিক দণ্ড পুরস্কারের আদৌ উল্লেখ মাত্র নাই। সদসৎ কর্ম্মের ফল ইহলোকে পুনরাগমন করতঃ ভোগ করিতে হইবে। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান যত টুকু তাহাতে ত জানি যে, পৃথিবীর সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেই বিশ্বাস করিয়া থাকে যে এখানকার কাজের জন্য পরলোকে দণ্ডপুরস্কার ভোগ করিতে হইবে; তদনন্তর যাহাই হউক:—পুনরায় এখানে আসিতে হউক, অন্য কোন গ্রহ বা লোকে যাইতে হউক, বা অদেহী অবস্থায় অনন্তকাল উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়াই ব্যবস্থা।

একটী কথা মোটেই বুঝিতে পারি না:—অপরাধ স্মরণ না থাকিলে দণ্ডের উদ্দেশ্য সাধিত হয় কি প্রকারে? পূর্ব্বজন্মে যে যে কুকর্ম্ম করিয়াছি তাহা আদবেই মনে নাই অথচ তজ্জন্য কষ্টভোগ করিতেছি, এরূপ হইলে কি সংসারকে করুণাময়ের রাজ্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায়? থিয়সফিষ্টগণ এক কথায় সারিয়া দেন:—পাপ পুণ্য দণ্ড পুরস্কার কিছুই নয়, বারম্বার ঠেকিয়া শিখিয়া আমাদিগকে বর্ত্তমান বাদের নিয়মানুযায়ী ক্রমাগত উন্নত হইতে হইবে। তাই আবার জিজ্ঞাসা করি;—এরূপ অন্ধকারে মাথা ঠোকাঠুকি কি অনন্ত জ্ঞানের আধার প্রেমময়ের রাজ্যের ব্যবস্থা হইতে পারে?

নানাপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় উপরে কয়েকটী মনের কথা পাঠক মহোদয়গণকে জানাইলাম। কেহ যদি সমীচীন উত্তর দানে কৃতার্থ করেন। নিজে কিছুই জানিনা বুঝিনা; বড় কথা বড় লোকের সাজে, আমরা কিরূপে এত গভীর বিষয়ের বিচার করিব? বিবি বেসান্ত প্রমুখ থিয়সফিষ্টগণ অতি উচ্চ শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত। তাঁহাদের সমস্ত কথা আমাদের মত লোককে ঘাড় পাতিয়া মানিয়া লইতে হয়। তবে উঁহাদের প্রচারিত মত বিশ্বাস সম্বন্ধে আলোচনার অনেক বিষয় আছে, সময়ান্তরে দেখা যাইবে।

জিজ্ঞাসু শ্রীচন্দ্রশেখর সেন

উপনিষদের কথা।

(২৩ পৃষ্ঠার পর)

সামবেদে ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব, এই বেদ চতুষ্টয়ই সমস্ত উপনিষদ্ গ্রন্থের আকর। প্রত্যেক বেদের অন্তর্গত বহুতর উপনিষৎ আছে। কাল ক্রমে তাহার অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে; আর কতকগুলি এখনও প্রচলৎ আছে। প্রচলৎ উপনিষদের মধ্যেও যে সকল উপনিষৎ অধীত ও অধ্যাপিত হয়, তন্মধ্যে সামবেদীয় 'ছান্দোগ্যোপনিষৎ' অতি উত্তম ও বৃহত্তর; এমন কি এক বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ভিন্ন আর যত উপনিষদ্ আছে, কেহই আকারে ও অর্থ-গৌরবে ইহার সমকক্ষ নহে। ইহার গল্পভাগ বড়ই রমণীয়। ছান্দোগ্যোপনিষৎ পাঠে প্রবৃত্ত হইয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেই একটী আখ্যায়িকা দৃষ্টিগোচর হয়।

পিতা আরুণি, পুত্র শ্বেতকেতু।

তাহার বক্তা হইলেন—পিতা আরুণি, আর শ্রোতা হইলেন—পুত্র আরুণেয় শ্বেতকেতু। আখ্যায়িকার অবতারণা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, জ্যেষ্ঠপুত্র শ্বেত-কেতু যথাকালে ও যথারীতি উপনীত হইয়াও ব্রাহ্মণোচিত ব্রহ্মচর্য্যে ও বেদা-ধ্যয়নে পরাঙ্মুখ ছিলেন। বেদবিদ্যাবিশারদ মহামুনি আরুণি, পুত্রের তাদৃশ দশা দর্শনে দুঃখিত হইয়া, প্রিয়তম পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'বৎস শ্বেতকেতো! দেখ, আমাদের এই পবিত্র বংশে এমত কোন লোক জন্ম পরিগ্রহ করেন নাই, যিনি একেবারে বেদবহির্মুখ হইয়া এবং ব্রাহ্মণোচিত কর্ত্তব্য-বিহীন হইয়াও আপনাকে মিথ্যা ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মবন্ধু বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জিত হন নাই। বৎস! তুমিও শান্ত, সুধীর ও বিদ্যাগ্রহণে সমর্থ, অতএব, যাও, তুমিও, অস্মৎ-কুলোচিত গুরু-গৃহে উপস্থিত হইয়া, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বেদবিদ্যা অভ্যাসে নিযুক্ত হও"।

পুত্রবৎসল পিতা যেমন প্রাণাধিক পুত্রের ঐহিক ও পারলৌকিক কল্যাণ-কামনায় সারতম উপদেশ দিলেন, পিতৃভক্ত পুত্রও তেমনি অবিচলিত চিত্তে পিতৃ আজ্ঞা শিরোধারণপূর্ব্বক অবিলম্বে গুরু-গৃহে প্রস্থান করিলেন এবং গুরুগৃহে উপস্থিত হইয়া যথাবিধি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলেন।

ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে হইলে গুরুশুশ্রূষা, অগ্নিসেবা, অধ্যয়ন ও ইন্দ্রিয়-সংযম প্রভৃতি যে সকল নিয়ম অবশ্য প্রতিপালন করিতে হয়, শ্বেতকেতুর পক্ষে তাহার কিছুই বাকী রহিল না।

এইরূপে শ্বেতকেতু দ্বাদশ বৎসর কাল গুরুগৃহে বাস ও বেদাধ্যয়ন করিয়া, অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন; কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সঙ্গে জীবের পরম শত্রু অভিমানও সমধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; প্রতিনিয়তই তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, "আমি অধ্যেতব্য সমস্ত শাস্ত্রই অধ্যয়ন করিয়াছি, এখন আর আমার কিছুই অধ্যেতব্য নাই, যাহা কিছু জ্ঞাতব্য ছিল, তৎ-সমস্তই অবগত হইয়াছি, এখন আর কিছুই জানিবার নাই; সমস্ত বেদার্থ আমার করতলগত আমলকের ন্যায় অতি বিশদরূপে প্রকাশ পাইতেছে। আমার মত বেদবিদ্যা বিশারদ পণ্ডিত আর নাই"—এই বিষম অভিমান বায়ুর প্রবল হিল্লোলে বিনয়-নম্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল তাঁহার হৃদয় হইতে অপনীত হইল।

এই ভাবে শ্বেতকেতু আদ্যোপান্ত বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কথিতবিধ অহঙ্কারে মত্ত হইয়া গুরুর আজ্ঞা ক্রমে স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। স্বগৃহে প্রত্যাগত হইয়া পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের চরণ বন্দনা ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ-পূর্ব্বক আহ্লাদ ও অভিমান সহকারে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

সূক্ষ্মদর্শী পিতা আরুণি, তখন কৃতবিদ্য পুত্রের তাদৃশ গর্ব্ব দর্শন করিয়া বেশ বুঝিলেন যে, আমার পুত্র কেবল কতকগুলি শব্দমাত্র অভ্যস্ত করিয়া আসিয়াছে; কিন্তু, তৎসমুদয়ের প্রকৃত মর্ম্ম কিছুই গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাই অযথা অভিমানে স্ফীত হইয়া নিজের কল্যাণকর পথ অবরুদ্ধ করিতেছে।

বিচক্ষণ আরুণি বহু চিন্তার পর মনে মনে স্থির করিলেন যে, শ্বেতকেতুর এই অভিমান কেবল পাণ্ডিত্য মূলক; যতদিন তাহার সেই অপূর্ণ পাণ্ডিত্যে ভ্রমপ্রদর্শন করা না হয় এবং যতদিন তাহার জ্ঞানের অপূর্ণত্ব বুঝাইয়া দেওয়া না হয়, ততদিন তাহার অযথা পাণ্ডিত্যাভিমান কখনই অন্তর্হিত হইবে না। অতএব প্রথমেই ইহার জ্ঞানের অপূর্ণত্ব প্রদর্শন আবশ্যক।

মহর্ষি আরুণি উক্তবিধ সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া প্রিয়তম পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"বৎস শ্বেতকেতো! তুমি যে তোমার গুরুর নিকট সমস্ত

শাস্ত্র ও তাহার তাৎপর্য্য অবগত হইয়াছ, তাহাতে আর সংশয় কি? কিন্তু বৎস! একটী মাত্র যে বস্তুতে শ্রবণ, মনন, জ্ঞান উৎপন্ন হইলেই এ জগতে আর কিছুই অশ্রুত, অমত (যে বিষয়ে চিন্তা করা হয় নাই) ও অবিজ্ঞাত থাকে না, সমস্তই নখদর্পণের মত প্রকাশ পায়; তুমি তদ্বিষয়ে তোমার গুরুর নিকট কোন প্রশ্ন করিয়াছিলে কি"?

বিদ্বন্মন্ত শ্বেতকেতু পিতার তাদৃশ অশ্রুতপূর্ব্ব কথা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিস্মিত ও সংশয়-সমাকুল হইয়া বিনীতবচনে পিতাকে বলিলেন যে,—"ভগবন্! ইহাও কি কখন সম্ভবপর যে, এক বস্তুতে শ্রবণ, মনন, ও জ্ঞান হইলেই জাগতিক সমস্ত বস্তুতেই শ্রবণ, মনন, ও জ্ঞান জন্মে? এক বিষয় শ্রবণ করিলেই যদি অন্য বিষয়ের শ্রবণ করা হয়, তাহা হইলে ঘট শ্রবণেও পট শ্রবণের এবং শঙ্খধ্বনি শ্রবণেও বংশীধ্বনি শ্রবণের কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে? অথচ তাহা কখনও হয় না। অতএব এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের কথা কিছুতেই সম্ভবপর নহে।—আর যদি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে কিরূপে সম্ভবপর হয়, তাহা আপনিই করুণা-পূর্ব্বক আমায় উপদেশ দিন।"

তখন করুণাময় পিতা, পুত্রের তাদৃশ শ্রদ্ধা ও আগ্রহাতিশয় দর্শনে পরম প্রীত হইলেন এবং পুত্রের জিজ্ঞাসিত বিষয়ে উপদেশ দিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু কোনও অলৌকিক তত্ত্ব বুঝিতে বা বুঝাইতে হইলে প্রথমে লৌকিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন; নচেৎ অলৌকিক তত্ত্বসকল অমার্জ্জিত হৃদয়ে কখনই স্থিতি লাভ করে না। মহামুনি আরুণি এই সিদ্ধান্তে নির্ভর করিয়া প্রথমেই লৌকিক দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া পুত্রকে বলিতে লাগিলেন,—

"হে সৌম্য! জগতে অসংখ্য অসংখ্য মৃণ্ময় বস্তু আছে; তন্মধ্যে যেমন কোন একটী মৃণ্ময় পাত্র অবগত হইলেই জগতের সমস্ত মৃণ্ময় পাত্রই পরিজ্ঞাত হইয়া যায়, অর্থাৎ জগতে যতপ্রকার মৃণ্ময় বস্তু আছে, তৎসমস্তই কেবল মৃত্তিকা; এক মৃত্তিকাই ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিযোগে "ঘট"-"শরাবাদি" বিভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র, বস্তুতঃ এসমস্তই মৃত্তিকা; এইরূপ জ্ঞান জন্মে। একথার তাৎপর্য্য এই যে, ঘট, শরাব (শরা) অথবা যে কোন মৃণ্ময় বস্তুর স্বরূপ নিরূপণার্থ বিচার করিলে সহজেই প্রতীতি হয় যে, ঐ সমস্তই মৃত্তিকা, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানুসারে 'ঘট' শরাবাদি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় মাত্র; বস্তুতঃ উহাদের

ভিতরে ও বাহিরে, এবং আদিতে ও অন্তে মৃত্তিকা ছাড়া আর কিছুই নাই। মৃণ্ময় ঘট উৎপত্তির পূর্ব্বেও মৃত্তিকাই ছিল, এবং পরিণামেও মৃত্তিকাই হইবে; উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল 'ঘট' এই নাম ছিল না, এবং কম্বুগ্রীবাদি আকৃতি বা অবস্থাবিশেষও ছিল না; এবং প্রধ্বংসের পরেও ঐ নাম ও রূপ অন্তর্হিত হইয়া একমাত্র মৃত্তিকারই সত্যত্ব প্রমাণ করিবে। সুতরাং উত্তম বিচার পূর্ব্বক একটীমাত্র মৃণ্ময় বস্তুর তত্ত্ব অবগত হইলেই বেশ জানা যায় যে, জাগতিক সমস্ত মৃণ্ময়ই মৃত্তিকা বা মৃত্তিকার পরিণাম মাত্র।

পুত্রবৎসল পিতা বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া একটীমাত্র দৃষ্টান্তে পরিতুষ্ট না হইয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন—"হে সৌম্য! একটীমাত্র সুবর্ণবিকারের (সুবর্ণ নির্ম্মিত বস্তুর) স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইলেই যেমন জগতের সমস্ত সুবর্ণময় পদার্থ পরিজ্ঞাত হয়, এবং যেমন একটী মাত্র লৌহময় অস্ত্র জানিলেই বেশ জানা যায় যে, জগতে লৌহময় অস্ত্র যত রকমই হউক, তৎসমস্তই লৌহ, কেবল তাহাদের নাম ও আকৃতি মাত্র পৃথক্।

বৎস! উক্ত উদাহরণত্রয়ে যেমন এক একটী মাত্র বস্তুর তত্ত্ব অবগত হইলেই তজ্জাতীয় সমস্ত বস্তুর তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়; আমার কথিত আদেশও ঠিক সেইরূপ"।

বিচক্ষণ পিতা পুত্রের মনোগতভাব পরীক্ষার্থ এবং রুচি ও আগ্রহ বৃদ্ধির নিমিত্ত এইমাত্র বলিয়াই বিরত হইলেন, কোন কথাই বিশেষরূপে ব্যক্ত করিলেন না।

তখন পিতার কথায় পুত্রের চৈতন্যোদয় হইল; তখন তিনি নিজ শিক্ষার অসম্পূর্ণতা ও আত্মগৌরবের অসারতা বুঝিতে পারিলেন; বুঝিয়া অতি বিনীত ভাবে পিতার নিকট বলিতে লাগিলেন,—"ভগবন্! আমার পূজনীয় গুরুদেব অভিজ্ঞ হইলেও তিনি আপনার অভিপ্রেত উপদেশের মর্ম্ম নিশ্চয়ই জানেন না; জানিলে কখনই তিনি আমার মত বিনীত ও আজ্ঞাবহ শিষ্যকে এরূপ উপদেশে বঞ্চিত করিতেন না। অতএব আপনিই কৃপাপূর্ব্বক ইহার উপদেশ প্রদান করুন। পুত্রের ঈদৃশ বিনীত বচনে পিতা পরিতুষ্ট হইলেন এবং যে উপায় অবলম্বন করিলে এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান হয়, তাহার উপদেশ প্রদানেও তিনি সম্মত হইলেন। (ষষ্ঠপ্রপাঠক প্রথম অধ্যায়।) শ্রীদুর্গাচরণ শর্ম্মা।

দাস রঘুনাথ।

"শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞীর করম চরণ বন্দন।
যাঁহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥
এই ছয় গোসাঞীর চিরদাস অনুদাস।
প্রার্থনা করয়ে শ্রীনরোত্তম দাস॥"

স্বার্থপরতা এবং আলস্য মনুষ্যের পদদ্বয়কে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখে। উক্ত দুইটী বিষয় পরিত্যাগ না করিয়া কেবল নাম সঙ্কীর্ত্তন, চক্ষু নিমীলন বা বাহ্যিক ক্রিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তদ্দ্বারা কোন প্রকার বিশেষ ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। পরমেশ্বরের জন্য সমস্ত বিসর্জ্জন করিয়া পথের ফকির হইতে না পারিলে স্বর্গীয় ব্রত সম্পন্ন এবং জীবনবৃক্ষে মধুময় ফল উৎপন্ন হয় না। রঘুনাথ গোস্বামীর জীবন আলোচনা করিলে তাহার জলন্ত প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

রঘুনাথ ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার হৃদয় পার্থিব ধনে সন্তোষ লাভ করিতে পারিল না। রঘুনাথ স্বর্গীয় প্রেমের ভিখারী হইয়া বিপুল পৈত্রিক সম্পত্তি, প্রবল সাংসারিক প্রলোভন এবং পিতা মাতা বনিতার সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সময়ে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য বঙ্গ এবং উৎকল খণ্ড প্রেমের বন্যায় প্লাবিত করিতেছিলেন। রঘুনাথ এই প্রেমের প্রবাহে অঙ্গ ঢালিয়া দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। রঘুনাথের পিতা এ বিষয়ে রঘুনাথকে অনেক বাধা দিতে লাগিলেন; কিন্তু রঘুনাথের হৃদয়ে ধর্ম্মের যে প্রবল স্রোত বহিতে আরব্ধ হইয়াছিল, তাহা আর কোন বাধা মানিল না।

এই সময়ে শ্রীচৈতন্য শ্রীক্ষেত্রে বাস করিতেছিলেন। রঘুনাথ তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য এক দিন গৃহ হইতে পলায়ন করিলেন। রঘুনাথের পিতা মাতা ইহা অবিলম্বে অবগত হইয়া লোক পাঠাইয়া রঘুনাথকে পথ হইতে ধরিয়া আনিলেন। হৃদয়ের বেগ সম্বরণে অক্ষম হইয়া রঘুনাথ আবার পলায়ন

করিলেন। তাঁহার পিতা পুনরায় তাঁহাকে ধরিয়া আনিলেন এবং আপনার বিপুল সম্পত্তি ও রাজ্যের ভার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। রঘুনাথের হৃদয় হরিনামে প্রমত্ত হইয়াছিল। স্নতরাং এ সকল প্রলোভন আর তাঁহাকে সংসারে আবদ্ধ করিতে পারিল না।

অবশেষে তাঁহার পিতা তাঁহার হস্ত পদ রজ্জুতে বন্ধন করিয়া গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন এবং প্রহরীদিগকে গৃহের চতুর্দ্দিকে সতর্ক থাকিতে বলিলেন।

রঘুনাথের ঈদৃশ দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া তাঁহার কুলপুরোহিত রঘুনাথের পিতাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন "অতুল ধনসম্পত্তি, বিপুল রাজ্যৈশ্বর্য্য এবং রূপবতী যুবতী বনিতার আকর্ষণ যাহাকে বাঁধিতে পারে নাই, তোমরা সামান্য রজ্জু দ্বারা কি তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে? ইহা তোমাদিগের বিষম ভ্রম এবং মূর্খতার কার্য্য হইতেছে"। কুলপুরোহিতের এবম্বিধ ভর্ৎসনা বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারা রঘুনাথকে মুক্ত করিয়া দিলেন।

রঘুনাথের গৃহে বিষম ক্রন্দনের রোল উঠিল। পিতা মাতা স্ত্রী ইত্যাদি সকলে তাঁহাকে অনেক বুঝাইতে লাগিলেন; কিন্তু হায়! যে একবার ধর্ম্মের মধুর আস্বাদ পাইয়াছে, সেই রসে মজিয়াছে, তাঁহার নিকটে এ সমুদয় বৃথা। রঘুনাথ বিষয় জাল ছিন্ন করিয়া রাত্রিযোগে পলায়ন করিলেন।

মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ পূর্ব্বক পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন অবগত হইয়া রঘুনাথ উন্মাদের ন্যায় তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনোদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রঘুনাথ দীনবেশে পদব্রজে দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া দ্বাদশ দিবসের পর নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলিত হইলেন। এই দ্বাদশ দিবসের দুর্গম পথে তিনি ত্রিসন্ধ্যা মাত্র আহার করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য দেবের সঙ্গে বাস করিয়া ধর্ম্মসাধন, নামসঙ্কীর্ত্তন ও ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলন। একদিন তিনি মহাপ্রভুকে "জীবনের কর্ত্তব্য কি" জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন "গ্রাম্যকথা বলিবে না কি শুনিবে না; ভাল খাওয়া কি ভাল পরিবার বাসনা মনে রাখিবে না; স্বয়ং অমানী হইয়া অন্যকে মান দিবে; তৃণাপেক্ষা আপনাকে হীন মনে করিয়া সর্ব্বদা হরিনাম কীর্ত্তন করিবে এবং ব্রজধামে রাধাকৃষ্ণের মানস পূজা করিবে।"

স্বার্থত্যাগ, সহিষ্ণুতা, দাস্যভাব ও আত্মনিগ্রহ—ভজনশীল ব্যক্তিগণের

পক্ষে এগুলি নিতান্ত আবশ্যক। গেরুয়া বসন পরিধান করিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে কেবল বক্তৃতা প্রদান করিলে ধর্ম্মসাধন হয় না; কিম্বা রবিবাসরীয় সান্ধ্য সম্মিলনীতে টানাপাখার হাওয়া খাইতে খাইতে নিমীলিতনেত্রে হে ঈশ্বর! হে ঈশ্বর! বলিয়া কেবল ডাকিলে ধর্ম্মসাধন হয় না। স্বার্থত্যাগ, দাস্যভাব, ধৈর্য্য ও আত্মনিগ্রহ ব্যতিরেকে জীবনবৃক্ষে কখনও ধর্ম্মের মধুর ফল ফলে না। রঘুনাথ সমস্ত দিন মহাপ্রভুর সেবা করিয়া অপরাহ্নে সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া ভিক্ষা করিতেন—যাত্রীক প্রদত্ত মহাপ্রসাদ সেবনে কোন ক্রমে প্রাণধারণ করিতেন কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তিরূপ বাহ্যিক বৈরাগ্য হইতে সময়ে অহঙ্কার জন্মিতে পারে মনে করিয়া তিনি পরে ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করিলেন। যাত্রীরা প্রসাদ সেবা করিয়া যে সকল পাতা ফেলিয়া যাইত, রঘুনাথ অতি গোপনে সেই সমস্ত পরিত্যক্ত পত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক উচ্ছিষ্ট আহার করিয়া জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। পরে তাহাও পরিত্যাগপূর্ব্বক কুকুরদিগের মুখ হইতে পতিত মহাপ্রসাদ দেবতাদুর্ল্লভ জ্ঞানে অতি যত্নে তাহা তুলিয়া লইয়া সেবা করিতেন।

"কুকুরের মুখ হতে, যদি পড়ে পৃথিবীতে,
দেবতা দুর্ল্লভ মানি খায়।"

রঘুনাথের মত এত কষ্ট এত দাস্যভাব ও এত ত্যাগ স্বীকার করিয়া জগতে অতি অল্প লোকেই ধর্ম্মসাধন করিয়াছেন। হায় ধর্ম্ম! তুমি রাজার সন্তানকে ভিখারী করিলে, কেবল ভিখারী নহে কুকুরের উচ্ছিষ্টাহারী করিয়া ছাড়িয়া দিলে।

রথযাত্রা উপলক্ষে এই সময়ে কতিপয় ভক্ত বঙ্গদেশ হইতে শ্রীক্ষেত্রে আসিলেন। তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে তাঁহাদিগের নিকট রঘুনাথের ভিক্ষাবৃত্তি ও উৎকট বৈরাগ্যের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পিতা মাতা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং অবিলম্বে বিবিধ খাদ্যদ্রব্য সহ চারিশত মুদ্রা তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। কিন্তু রঘুনাথ অকিঞ্চন বৈরাগী; ভিক্ষালব্ধ যৎসামান্য অন্ন দ্বারা প্রাণধারণ পূর্ব্বক হরিনাম কীর্ত্তন করাই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। সুতরাং পিতার প্রেরিত অর্থ নিজ সেবায় ব্যয় না করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সেবায় ব্যয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিষয়ীর অর্থে প্রভুর সেবা অবৈধ জ্ঞান করিয়া পরে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলেন।

নীলাচল ক্ষেত্রে নয়নাভিরাম গৌরচন্দ্রের পবিত্র সহবাসে রঘুনাথ ষোড়শ বর্ষ যাপন করিলেন। তাঁহার উৎকট বৈরাগ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে স্বীয় বক্ষস্থিত প্রিয় গুঞ্জমালা ও গোবর্দ্ধন শিলা উপহার দিয়া ভক্তি পূর্ব্বক তাহাদিগের সেবা করিতে আদেশ দিলেন। 'প্রভু শিলা দিয়া আমায় গোবর্দ্ধনের এবং মালা দিয়া রাধিকার শ্রীচরণারবিন্দে সমর্পণ করিলেন' ভাবিয়া তিনি আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তদবধি তিনি তুলসী ও জল দিয়া শিলা ও মালার পূজা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর দেহ ত্যাগের পর তিনি ব্রজে গমন করিয়া রাধাকুণ্ড তীরে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামীগণের সহিত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উৎসাহ সহকারে সাধন ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাপ্রভুর আদেশ ক্রমে শ্রীমৎ রূপসনাতন ও রঘুনাথ গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে একত্র বাস পূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তি প্রতিপাদক বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া জগতে তাঁহার প্রবর্ত্তিত প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার করেন।

শ্রীচৈতন্য আজ্ঞা পাঞা, ভাগবত বিচারিয়া,
যত ভক্তি সিদ্ধান্তে রক্ষণা।
তাহা পাঠাইয়া কত নিজ গ্রন্থ করি যত,
জীবে দিলা প্রেম চিন্তামণি॥
রাধা কৃষ্ণ রম্য কেলি নাট্য গাত পদ্যাবলী,
শুদ্ধ পরকীয় মত করি
চৈতন্যের মনোবৃত্তি, স্থাপন করিলা ক্ষিতি,
আস্বাদিয়া তাহার মাধুরী।

ব্রজধামে অবস্থান কালে রঘুনাথ সাধনার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আলস্য ও আসক্তি তাঁহার ত্রিসীমাও স্পর্শ করিতে পারিত না। দিবানিশি তিনি হরিনামের দুর্ভেদ্য ঘন জালে আপনাকে আবদ্ধ রাখিতেন। আহার ও নিদ্রার জন্য চারিদণ্ড কাল মাত্র নির্দ্দিষ্ট ছিল। ভোগ বাসনাকে সকল অনর্থের মূল জানিয়া তিনি সামান্য আহার দ্বারা ক্ষুন্নিবারণ, মলিন বসন পরিধান ও ছিন্ন কন্থা দ্বারা গাত্রাচ্ছাদন করিতেন। রাধাকুণ্ডের পবিত্র জলে ত্রিসন্ধ্যা অবগাহন, লক্ষ হরিনাম গ্রহণ, রাত্রিদিন শ্রীরাধাকৃষ্ণের মানস ভজন, সাড়ে সাত প্রহর কাল ইষ্টদেবের গুণগান, প্রহরেক কাল প্রেমাবতার

শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের মহিমা কীর্ত্তন, সহস্র বৈষ্ণবের পাদপদ্মে প্রণাম তাঁহার নিত্য কর্ম্ম ছিল। তাঁহার সাধন ভজনের বলে লুপ্ততীর্থ বৃন্দাবনের পুনরুদ্ধার হইল।

"ছেঁড়া কম্বল পরিধান　　　বনফল গব্য খান,
অন্ন আদি না করে আহার।
তিন সন্ধ্যা স্নান করি　　　স্মরণ কীর্ত্তন করি,
রাধা পদ ভজন যাহার॥
ছাপান্ন দণ্ড রাত্রি দিনে　　　রাধাকৃষ্ণ গুণগানে,
স্মরণেতে সদাই গোঙায়।
চারি দণ্ড শুতি থাকে　　　স্বপনে রাধাকৃষ্ণ দেখে,
এক তিল ব্যর্থ নাহি যায়।
গৌরাঙ্গের পদাম্বুজে　　　রাখে মন ভৃঙ্গরাজে,
স্বরূপেরে সদাই ধেঁয়ায়।
অভেদ শ্রীরূপ সনে　　　গতি যার সনাতনে,
ভট্ট যুগ প্রিয় মহাশয়॥"

বৈরাগ্যের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ শ্রীমৎ রঘুনাথ গোস্বামীর জীবনে কিরূপ প্রতিভাত হইয়াছিল, নিম্নলিখিত পদ পাঠে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীরূপ শ্রীসনাতন　　　যবে হৈল অদর্শন,
অন্ধ হইল এ দুই নয়ন।
বৃথা আঁখি কাঁহা দেখি　　　বৃথা প্রাণ কাঁহা রাখি,
এত বলি করয়ে ক্রন্দন॥
শ্রীচৈতন্য শচী সুত　　　তাঁর গণ হয় যত,
অবতার শ্রীবিগ্রহ নাম।
গুপ্ত ব্যক্ত লীলাস্থল　　　দৃষ্ট শ্রুতি বৈষ্ণব সব,
সবারে করয়ে পরণাম॥
রাধাকৃষ্ণ বিয়োগে　　　ছাড়িল সকল ভোগে,
সুখ রুখ অন্ন মাত্র সার।
গৌরাঙ্গের বিয়োগে　　　অন্ন ছাড়ি দিল আগে
ফল গব্য করিল আহার॥

সনাতনের অদর্শনে তাহা ছাড়ি সেইদিনে
কেবল করয়ে জলপান।
রূপের বিচ্ছেদ যবে জল ছাড়ি দিল তবে,
রাধাকৃষ্ণ বলি রাখে প্রাণ॥
শ্রীরূপের অদর্শনে না দেখি তাহার গণে,
বিরহ ব্যাকুল হইয়া কাঁদে।
হরি কথা আলাপন না শুনিয়া শ্রবণ,
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে আর্ত্তনাদে॥
হা হা রাধাকৃষ্ণ কোথা কোথা বিশাখা ললিতা,
কৃপা করি দেহ দরশন।
হা চৈতন্য মহাপ্রভু হা স্বরূপ মোর প্রভু,
হা হা প্রভু রূপসনাতন॥
কাঁদে গোঁসাঞী রাত্রিদিনে, ছাঁড়ি যায় তনু মনে,
ক্ষণে অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
চক্ষু অন্ধ অনাহার, আপনার দেহভার,
বিরহে হইল জর জর॥
রাধাকুণ্ড তটে পড়ি, সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি,
মুখে বাক্য না হয় স্ফুরণ।
মন্দ মন্দ জিহ্বা নড়ে, প্রেম-অশ্রু নেত্রে পড়ে,
মনে কৃষ্ণ করয়ে স্মরণ॥

রঘুনাথের দাস্যভাব আদর্শ স্থানীয় ছিল এবং সেই জন্য তিনি "দাস গোস্বামী" নামে বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত। তিনি শ্রীক্ষেত্রে ১৪ বৎসর এবং শ্রীবৃন্দাবনে ৪১ বৎসর কঠোর সাধন ভজনে যাপন করিয়া ১৫০৪ শকে, ৭৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মায়ীক দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণে লীন হন। ভক্ত বৈষ্ণবদিগের দ্বারা তাঁহার তিরোভাবোৎসব প্রতিবৎসর আশ্বিন মাসের শুক্ল দ্বাদশ তিথিতে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ভক্তিরসের বিমল মধুমুগ্ধ লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি শ্রীমৎ কবিরাজ দাস গোস্বামী "দাস রঘুনাথের" শিষ্য। যে ছয়জন গোস্বামী বৈষ্ণব সমাজের "আদি গুরু"

বলিয়া পূজিত, যাঁহাদিগের গুণানুকীর্ত্তনে বৈষ্ণব সাহিত্য মুখরিত, যাঁহাদিগের কৃপা অশেষ বিঘ্ন নাশ ও অভীষ্ট পূরণের মূল,—শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামী তাঁহাদিগের অন্যতম। প্লেগের এই দুর্দ্দিনে হরিভক্তি পিপাসু বঙ্গের ঘরে ঘরে ভগবদ্ভক্ত এই মহাগুরুর পুণ্যকাহিনী কীর্ত্তিত হইয়া নবজীবন প্রদানে সহায়তা করুক আমাদিগের ইহাই আন্তরিক কামনা। কারণ সাধু বাক্যে আছে,—

ভক্তি ভক্ত ভগবন্ত গুরু,
চতুর্নাম বপু এক।
যিন্‌কো পদ বন্দন করত,
নাশৈ দুঃখ অনেক॥

শ্রীঅনঙ্গমোহন চক্রবর্ত্তী।

আত্ম-জ্ঞান ও আত্ম-বিসর্জ্জন।

The mind may ponder its intellect for ages, and yet not gain so much self-knowledge as the passion of love will teach it in a day.—*Emerson.*

Self-renunciation is love in its highest form.

এই সংসারসমুদ্রের ভয়াবহ তরঙ্গে পড়িয়া আমাদের অনেকেই লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন। কোথায় ছিলাম, অথবা আদৌ ছিলাম কিনা, কেন আসিয়াছি, কোথায় যাইব, ইত্যাদি গভীর-তত্ত্ব বিষয়ক প্রশ্নসকলের কথা বলিতেছি না, কিন্তু যখন মনুষ্য নাম ধারণ করিয়া এই ভূমণ্ডলে বিচরণ করিতেছি, তখন মনুষ্য কাহাকে বলে, মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য কি, প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি উপায়ে লাভ করা যায়, এ সকলও ভাবিবার, বুঝিবার আমাদের অনেকেরই ইচ্ছা বা চেষ্টা নাই। পূর্ব্বতন ব্রহ্মবাদী দেবকল্প ঋষিগণ কিংবা শাক্যসিংহ কি শঙ্কর, খৃষ্ট কি চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহেন। আমরা সাধারণ মানব। সাধারণ মানবগণের ইচ্ছারুচি, মতি গতি, ভ্রম প্রমাদ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে আমরা একটু আলোচনা করিব। আহার বিহারাদি শারীরিক চেষ্টাসকলের কথা বাদ দিলে আমরা দেখিতে পাই যে, মানসিক বৃত্তি সকলের মধ্যে

যশোলিপ্সা বা প্রশংসা লাভের ইচ্ছাটি আমাদের বড়ই বলবতী। আমাদের মধ্যে যিনি যত চতুর, মনোগত ভাব গোপন রাখিতে তিনি তত পটু। কিন্তু আমরা হৃদয়ের গূঢ় উদ্দেশ্য যেরূপ কৌশলেই প্রচ্ছন্ন রাখি না কেন, অনেক স্থলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে আমাদের অনেক কার্য্যের, বিশেষতঃ আড়ম্বর-ময় মহৎকার্য্য গুলির মূলে প্রশংসা বা "বাহাবা" পাইবার ইচ্ছা পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান। এ জগতে নিস্বার্থ, সাত্বিক কার্য্য যে নাই—এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু আমাদের ন্যায় সাধারণ মানবগণের মধ্যে তাহা বড়ই বিরল। আমরা বিচারাসনে বসিয়া বিচার করিব, সেখানে প্রশংসা লইবার ইচ্ছা, আমরা সভাস্থলে বক্তৃতা করিব, সেখানে প্রশংসা লইবার ইচ্ছা, আমরা দয়াদাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণ সমূহের পরিচালনা করিব, সেখানে প্রশংসা লইবার ইচ্ছা, আমরা লোক শিক্ষার জন্য গ্রন্থাদি প্রণয়ন কিম্বা সম্বাদ পত্র বা সাময়িক পত্র লিখিব, সেখানে প্রশংসা লইবার ইচ্ছা, আমরা সর্ব্বত্যাগী উদাসীন হইব সেখানেও প্রশংসা লইবার ইচ্ছা। ফলতঃ সাধারণ মনুষ্যগণ সকল কার্য্যেই প্রধানতঃ রাজসিক বৃত্তি সমূহের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকেন। "বাহাবা" লইবার ইচ্ছা আমাদের রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জাতে মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। যশোলিপ্সা যে সর্ব্বতোভাবে মন্দ এমন কথা বলিতেছি না। বরং যশোলিপ্সাই অনেক স্থলে অনেক সাধুকার্য্যের প্রকৃত প্রসূতি। কিন্তু তাহা বলিয়া, যশোলিপ্সাকে হৃদয়ের একমাত্র আরাধ্যা বা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা করিয়া তাঁহারই আদেশে সকল কার্য্য করিতে গেলে আমাদের বড়ই আধ্যাত্মিক অধঃপতন হয়। কারণ আমরা যে সকল লোকের প্রশংসা সচরাচর প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাহাদের মধ্যে অনেকেরই কার্য্যাকার্য্য, ভাল মন্দ বিচার করিবার শক্তি নাই। এই শ্রেণীর লোকের প্রশংসার উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিলে, আমাদের সদসৎ বুদ্ধিটি ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া আইসে। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন তাঁহারাও প্রশংসা প্রদান কালে স্বার্থ বুদ্ধি বা লাভালাভ জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকেন। দানের সময় তাঁহাদের আদানের কথাটি বেশ মনে থাকে। ফলতঃ, তাঁহাদিগকে একপ্রকার Mutual Admiration Societyর সভ্য বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। পরস্পরের মধ্যে প্রশংসার বিনিময়ই ইহাঁদের কার্য্য। এই শ্রেণীর লোকের প্রশংসার উপর নির্ভর করিলেও আমাদের জ্ঞানদৃষ্টি খর্ব্ব হইয়া

আইসে। ফলকথা যে দিক দিয়াই দেখা যাউক না কেন, যশোলিপ্সাকে আমাদের কার্য্যসমূহের পরিণেত্রী হইতে দেওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে। সৎকার্য্যের পরিণাম ফল অবশ্য যশঃ বা সুখ্যাতি। কিন্তু কেবল সুখ্যাতির জন্য সৎকার্য্য করিতে গেলে, সৎকার্য্যের অর্দ্ধেক সততা নষ্ট হইয়া যায়। তবে আমাদের কর্ত্তব্য কি? প্রশংসার ইচ্ছা বাদ দিলে ত আমাদের সাধুকার্য্যে আদৌ প্রবৃত্তি থাকে না। সাধুতাই যাঁহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ গুণ, পরোপকারিতাই যাঁহাদের জীবন, দয়াদাক্ষিণ্যই যাঁহাদের সম্বল, অবশ্য তাঁহারা কোন কার্য্যে প্রশংসা বা নিন্দার অপেক্ষা করেন না। আত্ম-প্রতিষ্ঠার কথা দূরে থাকুক, তাঁহাদের কার্য্যসমূহ এমন কি কর্ত্তব্যবুদ্ধি দ্বারাও পরিচালিত হয় না। তাঁহাদের কার্য্যসকলের মূলে ভাল মন্দের বিচার কিম্বা লাভ ক্ষতির গণনা আদৌ নাই। হৃদয়ের অদম্য প্রেরণায় তাঁহারা সকল কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। সৎকার্য্যের জন্য তাঁহাদের হৃদয় স্বভাবতঃই আবেগময়, তাঁহাদের মন সাধুকার্য্য সাধনে সর্ব্বদাই উন্মুখ। এই সমস্ত মহাপুরুষগণ অবশ্য জগতের শীর্ষস্থানীয়। তাঁহারাই মনুষ্য সমাজের দৃষ্টান্তস্থল ও প্রকৃত উপদেষ্টা। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, আমাদের ন্যায় কর্ত্তব্যবুদ্ধিবিহীন, যশোলিপ্সু, স্বার্থপর মনুষ্যগণ দ্বারাই যে মানব সমাজ পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। এ লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন, মতিভ্রান্ত, বিপথগামী মানবমণ্ডলীর কি উদ্ধারের উপায় নাই? উপায় যদ্যপি নাই থাকিবে, তবে সাধুকার্য্যের ফল কি? সাত্ত্বিক জীবনের উপকারিতা কি? ধর্ম্মাচার্য্যগণের শিক্ষা ও উপদেশের উদ্দেশ্য কি? অসংখ্য নীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা কি? ফলতঃ নীচতা, সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি কলুষ রাশি অপনয়ন করিতে হইলে আমাদের সকলকেই মনে রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক শ্রেণীর মনুষ্যই একটী বিশাল, বিরাট সমাজশরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ। কেহ কাহাকেও বাদ দিয়া সমাজের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষা করিতে পারেন না। সাধু-মহাত্মগণও যেমন সমাজশরীরের অন্তর্গত, স্বার্থান্ধ নীচাত্মগণও সেইরূপ সমাজের অঙ্গীভূত। তবে মানব সমাজে তাহাদের স্থান পৃথক পৃথক, এইপর্য্যন্ত। সমাজ-শরীরকে সুস্থ রাখিতে হইলে সমাজের উৎকৃষ্ট অঙ্গগুলির স্বাস্থ্যের দিকে আমাদের যেমন দৃষ্টি রাখিতে হইবে, নিকৃষ্ট অঙ্গগুলির স্বাস্থ্যের প্রতিও ঠিক সেইরূপ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তবেই, যাঁহারা মনে করেন যে আমরা সমাজের

উক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছি—তাঁহাদের বিশেষ কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা সমাজের নিম্নশ্রেণীর জনসমূহের শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি সকল বিষয়েরই যথোচিত উন্নতিসাধনে কায়মনোবাক্যে পরিশ্রম করিবেন এবং মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি বুঝিয়া মন প্রাণ সমর্পণ করতঃ সেই একমাত্র উদ্দেশ্য সিদ্ধি বিষয়ে যত্নবান হইবেন। সমাজের স্থান বিশেষ অধিকার করিয়া যাঁহারা এই উদ্দেশ্য বা কর্ত্তব্য মনে না রাখিবেন তাঁহাদিগকে আমরা বহির্দৃষ্টিতে সমাজের বহির্ভূত মনে করিলেও করিতে পারি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জগতের সৃষ্টিকালাবধি আমরা সমাজের সহিত এমন ভাবে সংসৃষ্ট এবং পরস্পরের বা প্রত্যেকের সঙ্গে আমাদের এমনই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, যে আজ দুর্ব্বিনীত বা কর্ত্তব্য বিমুখ বা স্বার্থান্ধ মনুষ্যগণকেও আমাদিগের সমাজ শরীরের বহির্ভূত মনে করিবার অধিকার নাই। এক পরিবারের অন্তর্গত দুর্বৃত্ত সন্তানগণও যেমন সচরাচর পরিবারের ক্রোড়েই স্থান পাইয়া থাকেন, তদ্রূপ এই মানব সমাজের অন্তর্গত নিম্নতম শ্রেণীর মনুষ্যগণও এককালে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইতে পারেন না। এই ব্রহ্মাণ্ড গৃহের অধীশ্বর যাঁহাদিগকে নিজ সন্তান বলিয়া নিজ গৃহে স্থান দান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সমাজের অপকৃষ্ট বা অনাবশ্যকীয় অঙ্গ বলিয়া ত্যাগ করিবার শক্তি বা অধিকার মনুষ্যের কি প্রকারে সম্ভবে? মনুষ্যের সে অধিকার কখন নাই, কখন থাকিতে পারে না। অবশ্য সাম্রাজ্য সকলের উত্থান, ও পতন, জাতিবিশেষের অভ্যুদয় ও উৎসাদের মূলে আমরা মনুষ্যের কার্য্য অনেক পরিমাণে দেখিতে পাই, কিন্তু যাঁহারা বাহ্যঘটনামাত্র দেখিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন না, যাঁহারা সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাসের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, যিনি এই বিশ্বের স্রষ্টা, তিনিই ইহার নিয়ন্তা, পালয়িতা ও বিনাশকর্ত্তা। তাঁহারই অভ্রান্ত নিয়মাবলীর অধীন থাকিয়া এই বিশাল মানব সমাজও সৃষ্ট, পুষ্ট ও বিনষ্ট হইতেছে। এইরূপে এজগতে কত শ্রেণীর কত জাতীয় মনুষ্যের সৃষ্টি বৃদ্ধি ও ধ্বংস হইয়াছে কে বলিতে পারে? তত্ত্বদর্শীরা বলেন এই ব্রহ্মাণ্ডের এইরূপে কতবার সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশ হইয়াছে কে বলিতে পারে? যাহা হউক এই সকল গুরুতর কথা থাক, আমরা বলিতেছিলাম, সমাজের হীনবৃত্ত দুর্নীতিপরায়ণ অপকৃষ্ট মানবগণকেও আমাদের ভাল বাসিতে হইবে, তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধনে আমা-

দিগকে বদ্ধ পরিকর হইতে হইবে। উচ্চ শ্রেণীর মনুষ্যগণকে, তাঁহাদিগকে "ছোট ভাই সকল" মনে করিয়া তাহাদের শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক অভাব সকল পূরণ করিয়া দিতে হইবে। সমাজের মধ্যে যিনি যে পরিমাণে শক্তিমান এ সম্বন্ধে তাঁহার সেই পরিমাণে দায়িত্ব, এবং কর্ত্তব্যের ত্রুটিতে তাঁহার সেই পরিমাণে অপরাধ। তবে দেখা যাইতেছে সমাজে থাকিয়া কেবল আত্মোন্নতি সাধন করিলেই যথেষ্ট হইল না। আর জনসাধারণের হিত চিন্তা করিতে না শিখিলে, সমগ্র মনুষ্য-সমাজের উন্নতির দিকে দৃষ্টি না রাখিলে, আত্মবিসর্জ্জনের মন্ত্রে দীক্ষিত না হইলে প্রকৃত আত্মোন্নতিও কোন ক্রমে সম্ভবে না। স্বার্থপরতা থাকিতে কখন আত্মোন্নতি হয় না, এবং হৃদয়ের স্বার্থরূপ পূতি গন্ধ দূর করিতে হইলেও আমাদিগকে নিজ নিজ গৃহ পরিবারাদি গণ্ডী সকলের সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া সুবিশাল মানব সমাজের ইষ্টানিষ্টের ~ ... অবশ্যই চিন্তা করিতে হইবে। তবেই দেখা গেল, অপরের সম্বন্ধে, আমাদের ছোট ভাইদের সম্বন্ধে, শিক্ষা হীন, বিদ্যা হীন, অজ্ঞানাচ্ছন্ন মনুষ্য ভ্রাতাদের সম্বন্ধে, পথভ্রান্ত, নীতিহীন, ধর্ম্মহীন ভাই ভগ্নীদের সম্বন্ধে আমাদের অসংখ্য কর্ত্তব্য আছে। এই সকল কর্ত্তব্য যথার্থরূপে বুঝা এবং যথাযথ পালন করার নামই মনুষ্যত্ব। এই সকল কর্ত্তব্য বিশেষরূপে বুঝিতে গেলেই, আমাদের নিজ চরিত্র বিশেষরূপে বুঝা চাই—নিজেকে ভাল করিয়া চিনা চাই। নিজেকে নিজে চিনিতে পারিলেই আমরা অনায়াসে সকলকে চিনিতে পারিব। সকলের সুখ দুঃখ, অভাব অভিযোগ আর অপরকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে হইবে না। আত্মজ্ঞানরূপ মন্ত্রবলে অলৌকিক যোগ শক্তি প্রভাবে আমরা সকলকেই জানিব, সকলকেই বুঝিব। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে, সদসৎ বিচারে আত্ম-জ্ঞানই একমাত্র পরিচালক। আত্ম-জ্ঞান ব্যতীত আমরা কখনই বস্তু সকলের যাথার্থ্য নির্ণয় করিতে পারিব না। আত্মজ্ঞানহীন মনুষ্য সাধুকার্য্যে ব্রতী হইতে গেলেও বিপথগামী হইয়া পড়িবেন, ভাল করিতে গিয়া মন্দ করিয়া ফেলিবেন। তাই বুঝি শঙ্করাদি ধর্ম্মাচার্য্যগণ এবং সক্রেটিস্ প্রভৃতি বিদেশীয় মহাপণ্ডিতগণ আত্মজ্ঞানের এত গুরুত্ব স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আত্মপরিচয় বিশেষ করিয়া লাভ হইলেই আমরা বুঝিব যে, যে চৈতন্যময় ব্রহ্ম পদার্থ চরাচরস্থ সমুদয় প্রাণীর অন্তর্নিবিষ্ট থাকিয়া তাবৎ জগতকে চৈতন্যময় করিয়াছেন, যে ব্রহ্মশক্তি জীবজগত,

উদ্ভিজ্জগত প্রভৃতি সকল স্থানেই সমভাবে কার্য্য করিতেছেন, যে ব্রহ্মপদার্থের অস্তিত্বে আমাদের অস্তিত্ব, এবং যে সুবৃহৎ বিরাট আমি সমষ্টি জীবগণের মধ্যে ব্যষ্টিভাবে ক্ষুদ্র "আমি" রূপে প্রতিভাত হইতেছেন, সেই ব্রহ্ম পদার্থই আমাদের সকলের প্রাণ, সেই ব্রহ্ম পদার্থই আমাদের সকলের স্থিতি ও লয়স্থান এবং সেই ব্রহ্ম পদার্থ ভিন্ন আমাদের পৃথক জীবন বা অস্তিত্ব নাই। সাম্রাজ্য বা জগতের ধ্বংস পুনঃ পুনঃ হইতে পারে, কিন্তু সেই ব্রহ্ম পদার্থ অনাদি, অনন্ত, অবিনাশী। তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আমাদের কখন পরিভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনিই আমাদের নিয়ন্তা ও পরিচালক, শেষগতি ও বিলয়ভূমি।

আপনার ও জগতের হিত সাধন করিতে হইলে, আত্ম-জ্ঞান যে অবশ্য প্রয়োজনীয়, এ প্রবন্ধে তাহারই উল্লেখ মাত্র করা হইল। আত্ম-জ্ঞান না জন্মিলে যে কখন কাহার কোনরূপে কিছু উপকার করা যায় না, আমরা এমন কথা বলিতেছি না। আত্ম-জ্ঞানের সীমা যাঁহার যেরূপ বিস্তৃত, উপচিকীর্ষা বৃত্তিও তাঁহার সেইরূপ বিকশিত। উপযুক্ত আত্ম-দৃষ্টির অভাবে বৃহদাকারে না হউক, ক্ষুদ্রাকারেও অনেক সৎকার্য্য সাধিত হইতে পারে। এবং বস্তুতঃ অনেকে এরূপ বিস্তর সৎকার্য্য করিতেছেনও বটে। কিন্তু সকল কার্য্যে অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমিত আত্মদৃষ্টিরও আবশ্যকতা আছে। বাস্তবিকই আপনাকে ভাল করিয়া না চিনিলে, অপরকে ভাল চিনা যায় না। এই জন্যই আমরা বলিতে চাই যে বিশ্বহিতব্রতধারী মহাপুরুষগণ সকলেই অল্পবিস্তর যোগী বা আত্ম-দৃষ্টি সম্পন্ন। কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে তাঁহাদের সকলকেই ধ্যান ধারণা প্রভৃতি যোগাঙ্গ সকল যথারীতি সাধন করিতে হইয়াছে। এবং তাহারই ফলস্বরূপ তাঁহারা অলৌকিক অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন। এই অন্তর্দৃষ্টিই তাঁহাদের মন্ত্রসিদ্ধির মূল। প্রবন্ধের প্রারম্ভে আমরা যশোলিপ্সাকে মানব হৃদয়ের একটি বলবতী বৃত্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। এই যশোলিপ্সা এবং অন্যান্য নীচ প্রবৃত্তি আত্মজ্ঞান ব্যতীত আর কোন উপায়ে সহজে ত্যাগ করা যায় না। জগতের আদি কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলেই, আত্মতত্ত্ব অনুধাবন করিতে গেলেই, জগতের ও জগৎকর্ত্তার সঙ্গে নিজের ও প্রত্যেক জীবের কি সম্বন্ধ তাহা বুঝিতে গেলেই, আর নীচ বৃত্তি সকল দ্বারা প্রপীড়িত হইতে হয় না। উচ্চ চিন্তার সহিত হৃদয় বিশালতা প্রাপ্ত হয়, এবং সেই সঙ্গে

নীচ বৃত্তিগুলি একে একে বিদায় লইতে থাকে। আমরা অনেক বার আত্ম-জ্ঞানের কথা কহিলাম। কিন্তু আত্ম-জ্ঞান যে অনায়াসলভ্য নহে, বস্তুতঃ কঠোর সাধনার ধন একথা বলাই বাহুল্য। কি সাধনায়, কি উপায়ে, এই আত্ম-জ্ঞান লাভ করিতে হয়, এবং কি প্রকৃতির মানবগণ এই জ্ঞানলাভের প্রকৃত অধিকারী সে সকল এ প্রবন্ধের বিষয় নহে। আর সে সকল কথা যথাযথ রূপে বুঝাইবারও আমাদের সামর্থ্য নাই। ধর্ম্মাচার্য্যগণ এবং স্বদেশীয় বিদেশীয় সিদ্ধ মহাপুরুষগণই এ সকল বিষয়ের প্রকৃত উপদেষ্টা। আমরা এই মাত্র বলিয়া অদ্যকার প্রবন্ধ শেষ করিব যে আত্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্যই প্রত্যেক মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। জন্মে জন্মে আমরা সকলেই আত্মজ্ঞান রূপ সৌধ শিখরে আরোহণ নিমিত্তই সোপান প্রস্তুত করিতেছি। যদ্যপি সৌভাগ্য বলে আত্ম-জ্ঞান লাভ হইল তবেই বুঝিলাম জন্ম জন্মান্তরের ক্লেশরাশি দূরীভূত হইল, আনন্দময়ের আনন্দ ধামে উপনীত হইবার উপযোগী হইলাম। তখন আর এ ব্রহ্মাণ্ডে কেহ বা আপন এবং কেহ বা পর, কেহ বা উচ্চ এবং কেহ বা নীচ, কেহ বা সাধু এবং কেহ বা অসাধু কেহ বা প্রশংসনীয় এবং কেহ বা নিন্দনীয় থাকিবে না। বিশ্বপ্রাণ, বিশ্বনাথ যাহাদিগকে নিজ শক্তিতে সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন, এবং অসীম স্নেহ ও দয়ার পাত্র বলিয়া যাহাদিগকে নিজ ক্রোড়ে সযত্নে রক্ষা করিতেছেন, এমন কি রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি বিসদৃশ ঘটনা পুঞ্জের মধ্যে ফেলিয়াও যাহাদিগকে প্রতিনিয়ত স্বকীয় মঙ্গলময় রাজ্যে লইয়া যাইতেছেন, তাহারা সকলেই আমাদের প্রাণের ভাই, সকলেই আমাদের হৃদয়ের বন্ধু, সকলেই আমাদের আত্মার সখা। আমরা সকলেই পরস্পরের আত্মীয়। সকলের সুখে আমাদের সুখ, সকলের দুঃখে আমাদের দুঃখ। যখন আমাদের দুঃখী ভ্রাতাদের ক্রন্দনে আমাদের নিজ প্রাণ কাঁদিবে, যখন আমাদের দীন ভ্রাতাদের অনাহার-ক্লিষ্ট শুষ্ক মুখমণ্ডল দেখিয়া আমাদের সুখাদ্য ভোজনে প্রবৃত্তি থাকিবে না, যখন মলিন বেশধারী শীর্ণকায়, পাদচারী ভাই সকলকে দেখিয়া আমাদের যানারোহণে ইচ্ছা থাকিবে না, যখন অশিক্ষিত ও অজ্ঞানাচ্ছন্ন ভ্রাতৃমণ্ডলীর দুর্দ্দশা ভাবিয়া আমাদের নিজের জ্ঞান ও শিক্ষাকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হইবে, যখন স্বার্থান্ধ, দুর্নীতিপরায়ণ, পরদ্বেষী, অহিতকারী ভ্রাতৃগণকে দেখিয়াও আমাদের হৃদয়ে ঘৃণা ও দ্বেষের পরিবর্ত্তে দয়া ও প্রেম আবির্ভূত হইবে, যখন

যশঃ, মান, প্রভৃতি সামান্য স্বার্থের কথা দূরে থাকুক বিশ্বহিতের নিমিত্ত নিজ সুখ সম্পদ বিলাস বিভব এমন কি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতেও আমাদের হৃদয় উন্মুখ হইবে তখনই বুঝিব আত্ম-জ্ঞানের উন্মেষ হইয়াছে। নতুবা বক্তৃতায় কিম্বা প্রবন্ধে আত্ম-জ্ঞানের আলোচনা করিয়া কি ফল? আত্ম-জ্ঞান লাভই আমাদের প্রথম ও শেষ কর্ত্তব্য। যত দিনে, যেরূপে পারা যায় এই জ্ঞানলাভ করিতেই হইবে। এই জ্ঞান লাভ না করিতে পারিলে মনুষ্য জীবন বৃথা। শাস্ত্রমতে যতদিন এই জ্ঞানলাভ না হইবে ততদিন জীবাত্মার যোনি ভ্রমণ অনিবার্য্য। এই আত্ম-জ্ঞান লাভ হইলে আর স্বার্থ বুদ্ধি যশোলিপ্সার জন্য লজ্জিত হইতে হইবে না। তখন স্তুতি ও নিন্দা, দুই সমান হইয়া যাইবে, তখন লাভ ও ক্ষতি দুই তুল্য বোধ হইবে, তখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না। তখন সর্ব্বভূতে মৈত্রী ও দয়া, আত্মবিসর্জ্জন ও আত্ম-বিস্মৃতি সহজ ও আনন্দদায়ক হইয়া আসিবে। তখন অহংবুদ্ধি এককালে লোপ পাইবে। তখন জীব হিতার্থেই জীবনের উপযোগিতা এই মহাসত্য উপলব্ধ হইবে এবং মঙ্গলময় বিশ্বকর্ত্তার মঙ্গলময় উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আমাদের সংসারে স্থিতি ও বিনাশ ইহা বুঝিয়া জন্ম ও জীবন সার্থক হইবে।

দীনবন্ধু হেনরী জর্জ্জ।

ইংরাজি শিক্ষিত পাঠকগণের মধ্যে মহাত্মা হেনরী জর্জ্জ প্রণীত "উন্নতি ও দুর্গতি" (১) নামক পুস্তক অনেকেই পাঠ করিয়া থাকিবেন। আমরা অতি সংক্ষেপে এই সদাশয় গ্রন্থকর্ত্তার জীবনচরিত বিবৃত করিব, কারণ তাঁহার ন্যায় চিন্তাশীল ব্যক্তির জীবনী হইতে অনেক ভাবিবার, শিখিবার, ও বুঝিবার আছে।

দীনবন্ধু মহাত্মা হেনরী জর্জ্জ নিজে দরিদ্র, অন্ন বস্ত্রের কাঙ্গাল ছিলেন। অন্যান্য মহাপুরুষদিগের ন্যায় তাঁহার জীবন দুঃখ ও দারিদ্রের মধ্য দিয়া স্রোত-বাহিত হইয়াছিল। কখন ভিক্ষা করিয়া, কখন মুদ্রাঙ্কনের কার্য্য করিয়া, কখন বা অন্য উপায়ে তাঁহাকে গ্রাসাচ্ছাদনের যোগাড় করিতে হইত। তাঁহার এই

(১) Progress and Poverty.

দারিদ্র্যের সম্বন্ধে এইরূপ একটী গল্প তাঁহার পুত্রলিখিত জীবন চরিতে প্রকাশিত হইয়াছে:—এক দিন কার্য্যস্থান হইতে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন তাঁহার দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম হইয়াছে, চিকিৎসক বলিতেছেন "শিশুটীর গা মুছাইয়া দেওয়া হউক এবং তাহাকে কিছু খাইতে দেওয়া হউক, নতুবা তাহার অনাহারে মারা যাইবার সম্ভাবনা"। এই কথা শুনিয়া জর্জ্জ অশ্রুপূর্ণ নয়নে প্রথম সন্তানটীর হাত ধরিয়া ভিক্ষান্বেষণে বাহির হইলেন। জর্জ্জ বলেন:—"আমি পথ দিয়া চলিলাম, মনে দৃঢ় সংকল্প ছিল প্রথমেই যে সঙ্গতি-সম্পন্ন ব্যক্তিকে সম্মুখে পাইব তাঁহার নিকট হইতে অর্থ লইবই। একব্যক্তি যাইতেছিলেন, তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলাম। লোকটি অপরিচিত। আমি তাঁহাকে বলিলাম 'মহাশয়, আমাকে পাঁচটি ডলার দেন'। লোকটি আমাকে অর্থ ভিক্ষার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে পাঁচটি ডলার দিলেন। যদি এই ব্যক্তি আমার প্রার্থিত অর্থ না দিতেন তবে সম্ভবতঃ তাঁহাকে হত্যা করিতাম।" মহাত্মা জর্জ্জ আমেরিকান্ 'চোর রত্নাকর!'

হেনরী জর্জ্জ নিউইয়র্ক নগরের মেয়র‍্যাল্টি (Mayoralty) পদের জন্য আবেদন করেন। চিকিৎসকগণ সকলে একবাক্যে তাঁহাকে বলেন যে যদি তিনি এই পদ গ্রহণ করেন তবে নিশ্চিতই তাঁহার জীবন সংশয় হইবে। জর্জ্জ ইহাতে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না, প্রশান্তচিত্তে কহিলেন "আমি জানি ইহাতে আমার মৃত্যু হইবার অত্যন্ত সম্ভাবনা; এবং জানিয়া শুনিয়াই আমি এ পদ গ্রহণ করিতেছি। জনসাধারণের হিতকার্য্যে জীবন দান করা অপেক্ষা অন্য কিছুতেই মরণ সুখকর বা বাঞ্ছনীয় নহে। অথচ এমত মৃত্যুতে আমার কার্য্য সিদ্ধির যতদূর সুবিধা হইবে, আমি জীবিত থাকিলে ততদূর হইবার সম্ভাবনা নাই"। জর্জ্জের বন্ধুগণ জর্জ্জকে এই জীবনসংশয়কর কার্য্য গ্রহণে নিবারণ করিবার জন্য জর্জ্জ পত্নীকে বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠা রমণী তাহাতে সম্মত হইলেন না। জর্জ্জ স্বয়ং পত্নীর পরামর্শ চাহিয়াছিলেন। রাজপুত রমণীগণের ন্যায় মিসেস জর্জ্জ অবিচলিত অন্তঃকরণে কহিলেন "you must do your duty at whatever cost"! রাজপুত রমণীগণ পতি পুত্রকে সমরে পাঠাইবার কালে বলিতেন 'যদি যুদ্ধে জয় লাভ কর তবে পুনর্ব্বার আসিও, নচেৎ রণক্ষেত্র যেন তোমার গৃহ হয়'। জর্জ্জ-রমণী আজ তাঁহার

স্বামীকেও প্রকারান্তরে তাহাই বলিলেন!—বলিলেন 'যাহাই হউক না কেন তুমি তোমার কর্ত্তব্য সাধন কর'—অর্থাৎ জীবনে মরণে তুমি তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিস্মৃত হইও না। জর্জ্জের উপযুক্ত পত্নীর উপযুক্ত উত্তর, জর্জ্জ মনে দ্বিগুণ বল, দ্বিগুণ উদ্যম পাইলেন। জর্জ্জ স্থির করিলেন এই মেয়র্‌্যাল্‌টির পদ অবশ্যই গ্রহণ করিবেন। একদিন প্রতিযোগিতার চরম সময়ে জর্জ্জের মস্তিষ্ক বিকারের লক্ষণ দৃষ্ট হইল। সেই দিন রাত্রে শয়নকালে তাঁহার শারীরিক অসুস্থতার কথা প্রকাশ করেন। পরদিন প্রাতঃকালে জর্জ্জ-পত্নী দেখিলেন অপর একটি প্রকোষ্ঠে তাঁহার স্বামী একখানি চেয়ারে একটী হাত দিয়া দণ্ডায়মান; তাঁহার মুখশ্রী মলিন, দেহ কঠিন, পশ্চাৎভাগে স্কন্ধ কিছু নত, মস্তক উত্তোলিত চক্ষু প্রসারিত, দেখিলে বোধ হয় তিনি স্থির দৃষ্টিতে কিছু লক্ষ্য করিতেছেন। কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ থাকিয়া কয়েকবার ক্রমাগত বলিয়া উঠিলেন 'yes'! জর্জ্জ-পত্নী ধীরে ধীরে তাঁহাকে কৌচে আনিয়া শয়ন করাইলেন। জর্জ্জ আর কথা কহিতে পারিলেন না,—এই (yes) তাঁহার শেষ কথা, এইখানেই জীবনের সব ফুরাইল; জগৎ জানিতে পারিল না তিনি স্থির দৃষ্টিতে কি লক্ষ্য করিতেছিলেন, জানিতে পারিল না কোন্ প্রশ্নের উত্তরে yes এই সম্মতিসূচক বাক্য তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল।

মহাত্মা হেনরী জর্জ্জ অত্যন্ত উদ্যোগী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার অকপট সরল স্বভাবে যাঁহারা তাঁহার সংসর্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন, দরিদ্রের দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। তাঁহার এই সহৃদয়তার ফলে 'উন্নতি ও দুর্গতি' নামক পুস্তকের জন্ম। এই পুস্তক সম্বন্ধে কিছু বলিয়া, এই জীবনীর উপসংহার করিব।

মহাত্মা জর্জ্জ তাহার 'উন্নতি ও দুর্গতি' পুস্তকে এই প্রচার করিতেন যে,—'সকল প্রকার কর রহিত করিয়া কেবল ভূসম্পত্তির উপর কর প্রতিষ্ঠিত হউক।' তাঁহার মতে এইরূপ কর স্থাপনে দরিদ্রের আহার সংস্থান হইবে, তাহারা দুইবেলা দুই মুটা অন্ন পাইবে। জর্জ্জের এই যুক্তি আমাদিগের ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, এবং সম্ভবতঃ এই কারণে তিনি মুক্তিফৌজ (Salvation Army) এবং স্পেন্‌সারের নিকট এই কার্য্যের সহানুভূতি প্রাপ্ত হন নাই। ভারতবর্ষের ভূসম্পত্তির উপর কর প্রতিষ্ঠিত আছে, তথাপি ভারতের অবস্থা শোচনীয়, নিত্য

দুর্ভিক্ষ, নিত্য দরিদ্রের হাহাকার! আইনের দ্বারা দরিদ্রের দুঃখের প্রতিকার হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহার এক মাত্র প্রতিকারের উপায় সার্ব্বজনীন প্রীতি ও সর্ব্বভূতে দয়া। যখন দেখিব ভারতের প্রতি গৃহে—ধনীর প্রাসাদে ও দরিদ্রের পর্ণকুটীরে—দয়া ও প্রীতি এই দেবীদ্বয় বিরাজমানা, যখন দেখিব স্বার্থ, দ্বেষ ভুলিয়া সকলে বুদ্ধ ও চৈতন্যের ধর্ম্মে, মৈত্রী ও প্রেমে অভিসিক্ত, তখন বুঝিব দারিদ্র্যরূপিণী অমানিশার ঘোর অন্ধকার অপসারিত হইয়া ভারতভাগ্য গগণে ধীরে ধীরে নূতন কিরণ প্রতিভাত হইতেছে, তখন বুঝিব দরিদ্রের দুঃখ-রজনীর অবসান আগত প্রায়। আর যতদিন আধুনিক অবস্থার বৈলক্ষণ্য না ঘটিবে, যতদিন ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা ধনী ও দরিদ্র প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ না হইব, ততদিন আমাদের দুঃখের অবসান নাই, ততদিন ভারত অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিবে! তাই বলি, এস ভাই, পরম পিতা পরমেশ্বরে সকল সুখ দুঃখের দুর্ব্বহ ভার ন্যস্ত করিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি—

"সব বিদ্বেষ দূরে যায় যেন তব মঙ্গল মন্ত্রে,
বিকাশে মাধুরী হৃদয়ে বাহিরে তব সঙ্গীত ছন্দে!
তব নির্ম্মল নীরব হাস্য হেরি অম্বর ব্যাপিয়া,
তব গৌরবে সকল গর্ব্ব লাজে যেন সদা লাজে গো!"

সীতা।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—অন্তঃপুরের দালান। কাল—প্রভাত।

পূজানিরতা একাকিনী কৌশল্যা।

কৌশল্যা। রাত্রিকাল ঘন ঘন হয় উল্কাপাত
অগ্নিবৃষ্টি সম। চাহে কুপিত প্রভাত
রক্তবর্ণ। ডাকে শিবা মধ্যাহ্নে বিকট,
প্রাসাদ প্রাঙ্গণে যেন কোন সন্নিকট

বিপদে উচ্চারি'। নিত্য জানি না কি হেতু
নিশায় ঈশানে উঠে ধূম্র ধূমকেতু
অকল্যাণ শিখাসম, কিম্বা দীর্ঘ ছায়া
সন্নিহিত অনর্থের—তাই মহামায়া
ঈশানী কল্যাণময়ী বরদা, তোমার
চরণে অর্পি মা এই পুষ্পাঞ্জলি; আর
করি মা প্রার্থনা আজি, যেন নাহি হয়
আমার রামের কোন বিপত্তি। অভয়
দাও মা অভয়া। এই আশঙ্কা উদ্বেগ
কর দূর; সহসা উদিত বজ্র মেঘ
পশ্চিম গগন হ'তে দাও অপসারি';
দেবি চণ্ডি ভগবতি সর্বহর সংহারী
বিকট করাল মূর্ত্তি দেখা দাও ধরি
দুর্গতিনাশিনীরূপে,—দুর্গে ক্ষেমঙ্করি।
সীতা সীতা—

[নেপথ্যে] যাই মা

কৌশল্যা। মা আসিছে আমার
তার চারি ধারে দূর করি অন্ধকার,
সঞ্চারিণী পূর্ণজ্যোৎস্না সমা—

[সীতার প্রবেশ]

সীতা। কি মা?

কৌশল্যা। একি
কাঁদিতেছিলে মা? সীতা একি—চাহো দেখি;
একি পাণ্ডুমুখ? একি নয়ন পল্লব
অশ্রু অভিষিক্ত? একি? কেন মা? নীরব
রহিলে যে? বুঝিয়াছি। নাহি রাম কাছে
তাই এ আশঙ্কা।

সীতা। না মা

কৌশল্যা। হাঁ মা বুঝিয়াছি।

বুঝিয়াছ অন্তরের নিভৃত সন্দেহ।
আমিও যে ভালবাসি রামে। একই স্নেহ—
জননী দুহিতা জায়া অন্তরে বিরাজে
ভিন্নরূপ ধরি'। বৎসে, রাম রাজ্যকাজে
গিয়াছে চম্পকারণ্যে বশিষ্ঠের কাছে;
বুঝি কোন মন্ত্রণার প্রয়োজন আছে।
হওনা উদ্বেল বৎসে। নিশ্চিত কুশলে
তোমার আমার রাম আছে সুমঙ্গলে।
অতি শীঘ্র রাম গৃহে ফিরিবে নিশ্চয়।
নিশ্চিন্ত হও মা বৎসে! নাহি কোন ভয়
রামের মঙ্গল হেতু। নিকটে কি দূরে
প্রাসাদে প্রবাসে কিম্বা রাজ অন্তঃপুরে
শান্তি কি বিগ্রহে রাম করে নিত্যবাস
আমার স্নেহের দুর্গে। অনর্থ নিঃশ্বাস
স্পর্শে না তাহারে।—নাহি বিপদের ছায়া
আমি যার জননী ও তুমি যার জায়া
সুখী হোক রাম। আর আসন্ন জননী
তুমি সুখী হও বৎসে।

[বজ্রধ্বনি

সীতা। একি?

কৌশল্যা। বজ্রধ্বনি।

সীতা। নির্ম্মল আকাশে?

কৌশল্যা। [স্বগত] সত্য; কই মেঘ নাই
[প্রকাশ্যে] উঠিবে ঝটিকা বুঝি। চল কক্ষে যাই।
[যাইতে যাইতে] মা সর্ব্বমঙ্গলে দেবি! দেখিও মা সতি!
করিও সতত রক্ষা রামে ভগবতি! [নিষ্ক্রান্ত

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—বশিষ্ঠাশ্রম। কাল—প্রভাত।

রাম ও বশিষ্ঠ।

রাম। গুরুদেব একান্ত অসাধ্য এই কার্য্য।

বশিষ্ঠ। তাহা মানি,
অতি গুরু নিষ্ঠুর দুষ্ক্রিয় ইহা, রঘুবর জানি ;—
তথাপি করিতে হবে।—রাম, সর্ব্ব কর্ত্তব্য সবার
সহজ সুসাধ্য যদি, রহিল কি তার প্রশংসার ?
তথাপি নিস্তব্ধ ?

রাম। অতি তিক্ত এ পানীয় ভগবান্।

বশিষ্ঠ। জানি, অতি তিক্ত ইহা ; তথাপি করিতে হবে পান—
তথাপি নিস্তব্ধ ? রাম ভুলেছ কি জন্ম কোন কুলে,
কে তুমি ? কাহার পুত্র ? কার পৌত্র ? গিয়াছ কি ভুলে,
নরোত্তম ? সূর্য্যবংশে জন্ম তব—স্মরণ রাখিও—
পিতা তব দশরথ ; যে তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়
বৃদ্ধ বয়সের বহু তপস্যার ফল, সুকুমার
পুত্রদ্বয়ে দিল বনবাস ; বৎস, বল কি তাঁহার
কর্ত্তব্য পালন সেই হয়েছিল অতীব মধুর ?
দুঃসাধ্য কি পুত্রত্যাগ চেয়ে ত্যাগ রাজন্য বধূর।

রাম। দুঃসাধ্য নহে এ কাজ গুরুদেব—এ অসাধ্য কাজ,
কিরূপে সাধিব যাহা অসাধ্য ? আদেশ কর, আজ
রাজ্যের মঙ্গল হেতু দিব আপনারে শতবার ;
সহস্র জীবন চেয়ে প্রিয়তরা জানকী আমার।

বশিষ্ঠ। তাও জানি। কিন্তু আত্মহত্যা আর কর্ত্তব্য পালন
একটি পদার্থ নহে।—এই আত্মহত্যা পলায়ন
কর্ত্তব্যের যুদ্ধক্ষেত্র হতে ভীরু সৈনিকের মত।
কর্ত্তব্যপালন সহ্য করা বক্ষে বাণাঘাত শত
বীরসম সম্মুখ সমরে দৃঢ় সংযত সাহসে।

রাম। আপনি সহিতে পারি ;—কিন্তু ত্যাগ করিব কি দোষে
নিরপরাধিনী সীতা—

বশিষ্ঠ। তুমি ছিলে কিসে অপরাধী
যাহে হয়েছিলে বনবাসী ! কিসে কুম্ভকর্ণ আদি
দোষী ছিল যাহে তুমি নিধন করিলে সেই রণে
ভ্রাতৃ-পিতৃ-আজ্ঞাবহ স্বদেশ-বৎসল বীরগণে ?
কোন অপরাধে পুত্র পিতার ব্যাধির জন্য বহে
রোগের যন্ত্রণা ? বল কিম্বা কোন অপরাধে সহে
ধনহীন অনশন যন্ত্রণা ; ধনীর অন্তঃপুরে
যবে নিত্য স্বাদু অন্ন পুষ্ট করে বিড়াল কুক্কুরে ?
—এ বিশ্বে কে তুমি কেবা আমি ? কেহ নহে আপনার ;
সমাজ রক্ষিত সম্পত্তি সে, সমাজের অধিকার।
ব্যক্তির সর্ব্বেব ইচ্ছা সম্পদ, ব্যক্তির সর্ব্বসুখ,
বলি দিতে হবে সমাজের পদে ; থাকুক না থাকুক
কোন অপরাধ। ব্যাপি এ ব্রহ্মাণ্ড বিরাট প্রবাহে
চলিয়াছে অনন্ত নিয়ম স্রোত অব্যাহত। তাহে
ভেসে যায় নরনারী ; নাহি সাধ্য রোধিতে তাহারে ;
যুদ্ধ করে তার সঙ্গে শুদ্ধ শীঘ্র মগ্ন হইবারে।
স্বর্গ ও নরক, পাপ পুণ্য নহে সৃষ্ট বিধাতার ;
অপরাধ ? এ জগতে কে করিবে কাহার বিচার ?
কহিছে সমাজ 'নরহত্যা পাপ' সংগ্রামে বিগ্রহে
হয় যে সহস্র নরহত্যা,—পাপ তাহারে কে কহে ?
বিধাতা ?—তাঁহার স্বীয় শত হত্যা শত অত্যাচার
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিশ্বে—কে গণিবে কে করে বিচার ?

রাম। তবে পাপ পুণ্য নাই ?

বশিষ্ঠ। নাই।—প্রশ্ন কর ঝটিকায়
সে বলিবে 'নাই' ; প্রশ্নকর ঘোর প্রবল বন্যায়,

সে বলিবে 'নাই' ; যাও প্রশ্ন কর অশনি সম্পাতে
ভূমিকম্পে, দাবানলে, জরায়, দুর্ভিক্ষে, সর্পাঘাতে,
সকলে বলিবে এক বাক্যে 'নাই পাপ পুণ্য নাই'।
সমাজের অমঙ্গলকর কার্য্য যে সব, তাহাই
পাপ রঘুবর। পাপ পুণ্য সমাজের দণ্ডবিধি ;
আর তুমি অধিষ্ঠিত সেই সমাজের প্রতিনিধি ;
সমাজের ভৃত্যমাত্র।

রাম। গুরুদেব ! বুঝিনা এ বাণী ?
তুমি আজ্ঞা কর আমি কার্য্য করি। এই মাত্র জানি।

বশিষ্ঠ। যাও রঘুবীর যাও স্বকর্ত্তব্য সাধ মহারাজ !
বিপ্রজাতি এর চেয়ে করেছিল তিক্ততর কাজ,
করেছিল পিতার আজ্ঞায় মাতৃসংহার ভার্গব ?
—পত্নীত্যাগ হ'তে তিক্ত মাতৃবধ। অতীব সুলভ
নহে রাজ ভক্তি।

রাম। দাও পদধূলি দেব !

বশিষ্ঠ। যাও বীর—
ইক্ষ্বাকুকুলের দীপ ; শিব হোক অযোধ্যাপতির।

[নিষ্ক্রান্ত]

শ্রীদ্বিজেন্দ্র লাল রায়।

রাজসিংহাসন।

(দরিদ্র সেবায়)

There is only one pure kind of kingship ; an inevitable and eternal kind, crowned or not ; the kingship, namely, which consists in a stronger moral state, and a truer thoughtful state than that of others ; enabling you therefore to guide or to raise them.—

Sesame and Lilies by Ruskin.

১

রাজবিদ্যার কথা প্রায় শুনিতে পাওয়া যায়। ত্রেতাযুগে বশিষ্ঠ দেব ভগবান্ রামচন্দ্রকে রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন।

রামায়ণে দেখিতে পাই ভগবান্ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কতকগুলি চণ্ডাল, রাক্ষস, বানর এবং ভল্লুককে কোল দিয়া রাজর্ষি জনকের অযোনিসম্ভবা দুহিতা সীতাসতীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তৎপরে বিশাল রামরাজ্য সংস্থাপিত হয়।

সীতা মহাশক্তি দৈবীপ্রকৃতি লক্ষ্মী। বিষ্ণুর হৃদয়বাসিনী। সেই মহাশক্তি উদ্ধারের জন্য ভগবান্ স্বয়ং দীন চণ্ডালের সেবা করিয়াছিলেন। পরদুঃখ-কাতরতাই রামচন্দ্র কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত রাজধর্ম্মের মূলমন্ত্র। যোগবাশিষ্ঠে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

কর্ণেল ডালটন্ তাঁহার কৃত "এথ্নলজিতে" প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন যে, ত্রেতাযুগের বানরবংশের অবশিষ্টাংশ এখনও দ্রাবিড়ী, কোল এবং ছোট নাগপুরের ভুঁইরা বংশে পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের উত্তর খণ্ডে, নর্ম্মদার উৎপত্তি স্থানের পূর্ব্বাংশে এবং কিষ্কিন্ধ্যার পশ্চিমভাগে এখনও সেই রামায়ণে বর্ণিত ঘোর অরণ্য বিস্তৃত রহিয়াছে। সেখানে অনেক অসভ্যজাতি সনাতন রাজধর্ম্ম পালন পূর্ব্বক বহুকাল বাস করিয়াছিল। বিজাতীয় সভ্যতার সংঘর্ষণে এখনও তাহাদের পদচিহ্ন মুছিয়া যায় নাই। সেখানে প্রজাগণ রাজকপালে তিলক দিয়া প্রেম এবং সখ্যতার সিংহাসনে রাজবংশ স্থাপন করিয়া অনেক কাল সুখে কাটাইয়াছিল। এখনও সে রাজবংশ লুপ্ত হয় নাই। সেখানে এখনও রাজবংশ প্রজার সেবা করিয়া থাকেন।

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্।

গীতা—৯ম অঃ—২৯

"সমং ভূতেষু।" তিনি সর্ব্বভূতেই সমান। তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী হইয়াও দরিদ্র, উলঙ্গ, অষ্টধা প্রকৃতির বন্ধনমুক্ত, অরণ্যবাসী, পল্লবভোজী। তিনি দীন ভাবে সর্ব্বদাই দেখা দেন। অষ্টমশতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার কঙ্কালাবশিষ্ট দেহকে সেবা করিত। রাজবিদ্যার অবিনাশী

মন্ত্রবলে সেই পরদুঃখকাতর দরিদ্রসেবক বৌদ্ধ সম্প্রদায় ঘোর অরণ্য প্রদেশেও বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান করিয়াছিল।

বিংশশতাব্দীতে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানযোগে আমরা তাঁহার রূপ দর্শন করিতে ব্যস্ত! কিন্তু তিনি যে দ্বারে দাঁড়াইয়া। কোটী কোটী নরদেহ এবং নরপ্রকৃতি অবলম্বন করিয়া তাঁহার মহাশক্তি আমাদিগকে আবাহন করিতেছে, কিন্তু আমরা সেই শক্তি পদদলিত করিয়া স্বার্থের সেবায় রত! কত জাতি সেই শক্তি সুকৌশলে উদ্ধার করিয়া ইতিহাসে শীর্ষস্থান পাইয়াছে, সে রহস্য আমরা দেখিয়াও দেখিতে পাই নাই। তিনি কতরূপে দীন হীন কাঙ্গালের ভাবে বিচরণ করিতেছেন, তাহা আমরা জানি না। তাঁহার বিশ্বরূপ কি করিয়া দর্শন করিতে হয়, কি করিয়া সেবা করিতে হয় তাহা শিখি নাই। সহস্র বৎসরেরও পূর্ব্বে বশিষ্ঠ কথিত রাজবিদ্যা অস্তমিত স্বর্য্যের সহিত পাশ্চাত্য জগতে প্রচারিত হইয়াছে, আমেরিকা হইতে নব্য ইতালী পর্য্যন্ত ভাসাইয়া দিয়াছে। সেখানে পরদুঃখে মানবহৃদয় কাঁদিয়াছিল। সেখানে ভগবানের বিধানানুসারে রাজবিদ্যা রাজলক্ষ্মীরূপে আবির্ভূতা হইয়াছে।

দৈবী প্রকৃতি অন্তর্হিতা হইলে মূল প্রকৃতি তামসী শক্তিতে জগৎ গ্রাস করে। অর্দ্ধনিমীলিত নয়ন দীন শ্মশানবাসী রুদ্রকে পদদলিত করিয়া মহাশক্তি নিজ রক্তপানে উন্মত্তা। ফরাসী বিপ্লবের রুধির প্রাঙ্গণে, ষ্টুয়ার্ট বংশের অধঃপতনে আমেরিকার অভ্যুত্থানে, বুয়ার সমরপ্রাঙ্গণে, ভারতের দুর্ভিক্ষ শ্মশানে, কতবার দেখিতে পাইয়াছি। যাহাদের দেখি না, যাহারা ফিরিয়া যায়, যাহারা ভিখারীর বেশে আসে, যাহারা ভূমিকর্ষণ করিয়া আমাদের মুখে অন্ন তুলিয়া দেয়, যাহারা পর হইয়াও আমাদের আপনার, যাহারা প্রপীড়িত দুঃখসন্তপ্ত এবং মলিন হইয়া আমাদের পালন করে সেই প্রজা এবং দরিদ্রের দেহক্ষেত্রে মহাশক্তি অন্নপূর্ণার রূপ দেখিতে পাই। সেই শক্তির সেবা না করিয়া মহাবিদ্যার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়া প্রাণের তরাসে, অহঙ্কারের প্রতারণায়, সামান্য অর্থদানে শক্তিসেনাকে ভুলাইতে চাই। তাহা কি কখন সম্ভবে? তাহারা যে সন্ন্যাসী!

যাঁহারা জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া ইহার রহস্যোদ্ভেদ করিয়াছিলেন তাঁহারাই রাজা। যাঁহারা প্রজা পালন এবং প্রজার সেবা করেন তাঁহারাই ভগবানের সখা। প্রেম এবং সেবাই শক্তি উদ্ধারেরে মূলমন্ত্র। তাহাই ভক্তি এবং জ্ঞান। ভগবান্

রাজাও সাজেন, প্রজাও সাজেন। ইতিহাসে, বিজনে, জনপদে, সাম্রাজ্যে, এই রহস্য সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই। কথা অতি পুরাতন। কালের গতিতে কখনও নূতন হইয়া পড়ে।

২

দুইটী প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি আশ্রয় করিয়াই জগত। উভয় শক্তি ভগবানের প্রকৃতি। একটী আলোকময়ী এবং চৈতন্যপ্রদায়িনী, অপরটী তামসী এবং অচৈতন্যা। ভগবান্ উভয়ের সন্ধিস্থলে থাকিয়া জগত পালন করেন। উভয়ের সংঘর্ষণে সৃষ্টি। বহুযুগ ধরিয়া এই অপূর্ব্ব লীলা প্রচারিত হয়। এই লীলার অবসানে জগত আনন্দময় হইতে থাকে এবং কালবিধানে একটী শক্তি আকর্ষণ পূর্ব্বক ঈশ্বর প্রলয় উপস্থিত করেন। ইহা অতি পুরাতন শাস্ত্রের কথা।

দৈবী প্রকৃতির গুণ, একত্রীভূত করিয়া আনন্দময় সাম্য সংস্থাপন।

মূল প্রকৃতির গুণ, বিশ্লেষণ এবং দ্বন্দ্ব সংস্থাপন। বিজ্ঞান এই দ্বন্দ্বময়ী প্রকৃতির কর্ম্মকে জীবন সংগ্রাম বলিয়া উল্লেখ করেন। মূল প্রকৃতির বিস্তীর্ণ শক্তি পুঞ্জ একত্রীভূত করিয়া ভগবান চৈতন্যময়ী দৈবীশক্তি আরোপণ করিলে অসংখ্য জীবের সৃষ্টি হয়। এই বিশাল সৃষ্টি প্রকরণের কথা আমাদিগের আলোচ্য বিষয় নহে। মূল প্রকৃতির সংহারিকা শক্তির নাম কাল। ভগবান্ সেই কাল বিভাগ করিয়া জগত পালন করেন। কালের বশে একটী জীব তিরোহিত হইলেই দৈবীপ্রকৃতির অসীম শক্তি প্রভাবে পুনরায় সেই বিশ্লেষিত শক্তিপুঞ্জ একত্রীভূত হইয়া আবার নূতন জীবের উৎপত্তি হয়। এই প্রকার আবর্ত্তনের কোন বিশেষ স্তরে দৈবীপ্রকৃতির পালন ক্রিয়া জীবের সংস্কার স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। বিজ্ঞান তাহাকে Instinct কহেন। পিতামাতার স্নেহ সহানুভূতি, একতা, প্রভুভক্তি, আত্মত্যাগ, পরসেবা প্রভৃতি বৃত্তিগুলি পশুদিগেরও আছে। পশুদিগেরও রাজা প্রজাপালন করে এবং স্বীয় আহার্য্য লইয়া মুমূর্ষু জীবগণের প্রাণরক্ষা করে। তবে মানব পশু হইতে শ্রেষ্ঠ কিসে? মূল প্রকৃতির অষ্টধাগুণ মানব এবং পশুদিগের উভয়েরই আছে। পশুদিগেরও মন বুদ্ধি এবং অহঙ্কার আছে। তাহারাও "আমি" ও "তুমির" প্রভেদ জানে। তাহাদেরও সন্তান সন্ততি মরিয়া গেলে কাঁদিয়া বেড়ায়। তাহারাও রাজা মরিয়া গেলে অন্য রাজাকে অভিষেক করে। তাহাদেরও বিষয়াত্মিকা বুদ্ধি বিলক্ষণ আছে,

তবে মাত্রায় কিছু অল্প হইতে পারে। তবে মানুষের রাজায় ও পশুর রাজায় প্রভেদ কি?

পশুগণও প্রাণায়াম করে। সর্প হইতে অন্তপ্রাণায়ামী কে? তবে সর্প মহাযোগী নয় কেন? ক্ষুধার্ত্ত সিংহ সুষুপ্ত হরিণশাবককে সংহার করে না, তবে সিংহ ক্ষত্রিয় নয় কেন?

ইহার বিচার বিজ্ঞান এবং দর্শন উভয়েই করিয়াছেন। বহুকাল পূর্ব্বে এ প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। পশুদিগের সংস্কার প্রাকৃতিক (Natural instinct)। ইহা ভগবানের জীবদেহ রচনার একটী প্রণালী। এইরূপে অসংখ্য বর্ষ ধরিয়া দেহ রচনা হয়। মনও একটী ইন্দ্রিয়যুক্ত দেহ। ইহাতেই দৈবী প্রকৃতির শক্তি প্রাণরূপে থাকিয়া চৈতন্য উপস্থিত করে। পশুদিগের সংস্কার তাহাদের কর্ম্ম নহে। উভয় শক্তির মধ্যে পড়িয়া অন্ধের ন্যায় এই বিশ্বলীলার পথে তাহারা আবর্ত্তিত হইতেছে। যেমন তাহারা দৈবীপ্রকৃতির সংস্কারাবদ্ধ তেমনিই তাহারা মূল প্রকৃতির গুণে বিচলিত। কোনটীই তাহারা উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না। ইহাকেই বিজ্ঞান Organic Evolution বলে।

অহঙ্কার মন বুদ্ধি সকলই পশুর। মানুষের মধ্যেও অধিক ভাগ পশুপ্রধান এবং অল্পভাগ মানব? এখনও দেহতত্ত্ব পরীক্ষা করিয়া কাহার মানুষের ভাগ অধিক এবং কাহার পশুর ভাগ অধিক ইহা কেহ নির্ণয় করিতে পারেন না। দৈবী প্রকৃতির জ্যোতির্ম্ময় দেহে মানবের রূপ থাকে, জড় প্রকৃতির দেহে থাকে না।

যখন আত্মচৈতন্যের জ্যোতিঃ পশুর অন্ধকার হৃদয়ে ধীরে ধীরে স্বর্গ হইতে আসে তখন পশু মানুষ হয়। এই জ্যোতির অন্য নাম আত্মা। ইহা ঈশ্বরের কায়া। আত্মা পশুর অহঙ্কারময়ী দেহে আসিয়া জীবাত্মা হয়। নিজের প্রভুর রূপ দেখিতে পাইয়া উলঙ্গা প্রকৃতির আবরণ যুক্তা হয়। উভয় শক্তির মধ্যে তখন জীবাত্মা অহঙ্কারময় সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য বিচার করেন দুইটী পাখী এক বৃক্ষে আরূঢ়। জীব মস্তকে কর্ম্ম রূপে, পরম পিতা হৃদয়ে প্রাণরূপে। জীবাত্মাই মানবের মন (conscience); ইহা প্রাকৃতিক দেহরূপী বৈজ্ঞানিক মন নহে। ইহা ঈশ্বরের মানসপুত্র, ইহার আবর্ত্তন জড় দেহ হইতে হয় না। প্রতিদিন পশুর কর্ম্মে তাহার দায়িত্ব ছিল না, এখন জ্ঞানচক্ষু ধীরে ধীরে উন্মীলিত হওয়াতে সে দায়িত্ব আসিল। প্রারব্ধ কর্ম্মের সূত্রপাত হইল। শৈশবাবস্থা হইতেই

জীবাত্মা এই দেহের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কত কোটী যোনি ধরিয়া যে দেহ পিতা এবং মাতা রচনা করিয়াছিলেন সে দেহ ভাঙ্গিয়া শিশু পুনরায় নূতন গৃহ রচনা আরম্ভ করিলেন। উভয় প্রকৃতি স্তম্ভিত হইয়া গেল। প্রথম বয়সে শিশু নিজের জন্মগৃহ (chorda Dorsalis) হইতে বাহির হইয়া, সুষুম্নার পথে ছয়টি দ্বার দেখিয়া, পরম পুলকিত চিত্তে নিজের অস্থাবর সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিলেন। যৌবনে সেই সম্পত্তি ভোগে রত হইয়া কালচক্রে সুখদুঃখ ভোগ করিলেন। বার্দ্ধক্যে দেখিলেন 'আমার কিছুই নাই'। নৃশংসা মূলপ্রকৃতি ছলনা পূর্ব্বক শিশুর একটী অঙ্কের অভিনয় শেষ করিয়া দিল।

কিন্তু শিশু ইতি মধ্যেই সুখদুঃখের সংস্কার ময় একটী নূতন ঘর গড়াইয়াছে। সে গৃহ অমর। সেই সংস্কারগুলি আবার পূর্ব্ব সৃষ্টি প্রণালী অনুসারে একটী রক্তমাংস জড়িত উপযোগী দেহে জননী আরোপিত করিলেন। পুনরায় নূতন অঙ্ক আরম্ভ হইল।

নূতন দেহেও উভয় প্রকৃতির দ্বন্দ্বের বিরাম নাই। পিতা হৃদয়ে সাক্ষীরূপে অবস্থিত। শিশু মাতা পিতাকে জানে না। প্রত্যেক রক্তকণা এবং পরমাণু সমষ্টিতে থাকিয়া পিতামাতা যে শিশুকে পালন পূর্ব্বক রাজ সিংহাসনে বসাইয়াছেন সে শিশু তখন কেবল সুখদুঃখের তুমুল সংগ্রামে পড়িয়া আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। ইহাই মানবজীবন ও শিক্ষা।

একি দেহের শিশু? যে অবহেলায় মহাশক্তিময় প্রাকৃতিক নিয়মাবলী ভঙ্গ করিতে উদ্যত সে কি পশুর শাবক? যাহার সামান্য আবদারে বিশ্ব কম্পমান, যাহার সামান্য ইচ্ছাশক্তিতে প্রকৃতি আত্মবিসর্জ্জনোদ্যতা সে কি পরমাণু সমষ্টির আবর্ত্তন?

প্রাকৃতিক নিয়মের বৈলক্ষণ্যই মানব-চিহ্নতা-প্রতিপাদক। আজ রাজা হইয়া রাজ ঐশ্বর্য্য ফেলিয়া দিতেছি, কালি প্রজা হইয়া রাজার গৃহ ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছি, আজ কোমল শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সহাস্যমুখে তৃণশায়ী, কালি আত্মহত্যা করিতে উদ্যত; কেবল এক মনের খেলায়! সে মন কাহার!

যে মূলপ্রকৃতি এতদিন কালস্বরূপা হইয়া রাজলক্ষ্মীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছিল সে শক্তি জয় করিতে নবীন রাজা বদ্ধপরিকর। বহু দুঃখ পাইয়া বহু জন্ম কাটাইয়া শিশু পিতামাতার সন্ধান পাইল।

শিশু দেখিল মাতাপিতা শ্মশানে দীনবেশে স্তিমিত প্রদীপ হস্তে কোটী কোটী জীবের মুখে জল দিতেছেন। শিশু দেখিল যে মাতাপিতা হৃদয়ে এবং সর্ব্বভূতে। রাজ মাতা রাজরাজেশ্বরের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়াও দীনের সেবা করিতেছেন। ধীরে ধীরে পুত্র জনক জননীর পদতলে পতিত হইলেন।

গৌরী অবগুণ্ঠন মুক্তা হইয়া সহাস্য মুখে হাসিলেন। "বৎস, ইহারা তোমার ভাই! ইহাদের সেবাই কর্ম্ম। ইহারাই তোমার রাজশক্তি। এতদিন যাহা করিতেছিলে তাহা অকর্ম্ম, কিন্তু তাহারই মধ্য দিয়া কর্ম্ম দেখিতে পাইলে, অতএব অকর্ম্ম হইয়াও তাহারা কর্ম্ম।

সকলই তোমার। এই ধর্ম্মক্ষেত্রে বিশ্বরূপ দেখ!

তখন নবীন রাজা শ্মশানে বৈজয়ন্তী মালা লইয়া পিতার গলায় পরাইলেন। মা পিতার হৃদয়ে লুকাইলেন। পুত্র ভ্রাতৃগণের সহিত একত্র হইয়া পিতা মাতার শক্তি পাইয়া মানবের রাজা হইলেন।—ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হইল।

এইরূপে জগতের ইতিহাসে এক একটী শিশু শক্তিসঞ্চয় পূর্ব্বক রাজা হইয়াছেন। তাঁহারা গুরু। গ্যালিলী সমুদ্রতটে এবং কপিলাবস্তুর পার্ব্বতীয় ভূমে দুইটী শিশু পিতার শক্তি প্রচার পূর্ব্বক বিস্তীর্ণ রাজ্যের বীজ রোপণ করিয়াছিলেন। মানবের আভ্যন্তরিক দেহ সম্মার্জ্জিত হইলেই দৈবী প্রকৃতির জ্যোতিঃ সমধিক ভাবে বিকীর্ণ হয়। করুণা এবং সেবাই ভক্তির লক্ষণ। ভক্তিই শক্তির আধার। যাঁহারা জ্ঞানী বৈরাগ্যযুক্ত এবং সন্ন্যাসী তাঁহারা কর্ম্মযুক্ত হইয়াই ভক্তি এবং জ্ঞানের পার্থক্য দেখেন না।

এই বিশ্বমাঝে প্রাণিজগতে আমরা মানবের তাবৎ গুণই পশুতে দেখিতে পাই. কিন্তু পশু ভগবানের লীলা প্রচার করিয়াও তাহা জানেনা, বুঝে না। সেই লীলার রথে আরূঢ় হইয়া মানব তাঁহাকে দেখিতে পায় এবং প্রবর্ত্তিত চক্রের অনুবর্ত্তন করে। ইহা দ্বারাই তাঁহার সহিত জ্ঞান এবং ভক্তিতে যুক্ত হইয়া আনন্দময় হয়.—ইহারই আভ্যন্তরিক প্রক্রিয়া দর্শন করিতে গিয়া যোগীগণ আনন্দ পান। মুক্তি আবার কি? আনন্দই মুক্তি এবং মুক্ত পুরুষ আনন্দময় কর্ম্মযোগী। সেই আদিমকালের রাজগুরুগণের পদানুসরণ করিয়া যাঁহারা এ পথে ব্রতী হইয়াছেন তাঁহাদিগকে নমস্কার।

৩

পশুর ধর্ম্ম সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক। তাহাতে পাপ পুণ্য নাই, মানবের ধর্ম্ম দ্বন্দ্বময়, অতএব তাহাতে পাপ পুণ্য আছে। মানব নিজের ধর্ম্ম গড়িয়া লয় এবং তাহাতেই অহঙ্কারযুক্ত হয়। তাহার দায়িত্ব তাহাদেরই। প্রাকৃতিক ধর্ম্মমধ্যে ঈশ্বরের দৈবীপ্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যাঁহারা কর্ম্মে যুক্ত হন তাঁহারাই রাজপুরুষ। শক্তি তাঁহাদেরই করতলস্থ। প্রাকৃতিক নিয়মগুলি শীঘ্রই তাঁহাদের বশবর্ত্তী হইয়া পড়ে। এইরূপে দীর্ঘজীবী হইয়া রাজর্ষিগণ ধর্ম্মরাজ্য চালনা করেন। যাঁহারা বিচার ক্ষমতা সত্ত্বেও প্রাকৃতিক শক্তির অপব্যবহার করেন এবং ইন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া স্বার্থের উদ্দেশ্যে প্রজাপীড়ন করিয়া থাকেন তাঁহারাই মানব হইয়াও পশু।

রাজবংশ বর্ণশঙ্করাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। যেখানে সাধারণতন্ত্র প্রচলিত সেখানে রাজর্ষি নাই। পাশ্চাত্য জগতে গ্লাডষ্টোন প্রভৃতির ন্যায় কর্ম্মবীরগণ সচিবরূপে রাজধর্ম্ম অক্ষুণ্ণভাবে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। রাজনীতির মধ্যে রাজবিদ্যা কারলাইলের লেখনীতে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতে বহুকালাবধি উপদেষ্টা গুরু জন্মগ্রহণ করেন নাই। স্বয়ং মহাশক্তিমান্ কর্ম্মী না হইলে কেহ গুরুস্থানীয় হইতে পারেন না। আত্মমুক্তির দার্শনিক ছলনায় পড়িয়া, সুখ-শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া, বেদান্ত কিংবা যোগশাস্ত্রের দুর্ভেদ্য রহস্য মস্তকে আরোপিত করিলে জ্ঞানী হইতে পারা যায় বটে, কিন্তু কর্ম্মী হইতে পারা যায় না। যাঁহারা নয়নের অশ্রু, প্রেমের হাহুতাশ, পরদুঃখ কাতরতা, নির্ম্মম না হইয়াও হৃদয়ে দমন করিয়া তেজপূর্ণ নীরব স্থিরদৃষ্টিতে স্বীয় লক্ষ্য পথের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত তাঁহাদেরই শক্তির উপর ভবিষ্যতের ফলাফল নির্ভর করিতেছে। যাঁহাদের উপর দেশের শাসনের ভার তাঁহাদের মধ্যে এমন কয় জন আছেন? এই বিস্তীর্ণ বঙ্গদেশে, প্রায় সহস্রাধিক রাজকর্ম্মচারী দরিদ্র প্রজার সুখদুঃখের বিধান করিতেছেন, তাঁহারা এক মন্ত্রে দীক্ষিত হইলে কি না হয়? কেবল অর্থোপার্জ্জনের চিন্তায় এবং ধর্ম্ম ও সামাজিক দাম্ভিকতায় রত না হইয়া যদি প্রতিদিন একবারও দরিদ্রের মঙ্গল কামনায় প্রবৃত্ত হন, তবে শক্তি আর কত দূরে থাকে? রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যে একতা স্থাপন করিতে কয়জন চেষ্টাবান্? বরং কিছু কাল পূর্ব্বে বন্ধুগণের মধ্যে সহৃদয়তা ছিল, মন খুলিয়াও মুহূর্ত্তের জন্য কতজনে

সুখদুঃখের হাসি হাসিয়া জীবন কাটাইতেন, এখন গীতার মহান্ ধর্ম্মের আন্দোলন সত্বেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। জীবনসংগ্রাম কি এতই খরতর হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা জীবনসংগ্রামে বীরত্ব দেখাইয়া নিজের ইষ্ট সিদ্ধিপূর্ব্বক সুখে কাল কাটাইতেছেন তাঁহাদেরই বা পূর্ব্বের ভাব কোথায়?

আজ হাসির কথা বলিলে তাঁহারা চটেন, দুঃখের কথা বলিলে বিরক্ত হন। ভালবাসা সেকালের কথা, সহানুভূতি কষ্টকর। কেবল Parasite এর ন্যায় যাঁহারা তোষামোদ করিতে পারেন তাঁহাদেরই অন্নসংস্থান অবশ্যম্ভাবী।—ইহার ফল কি তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন না?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মানব প্রকৃতি দুইটী শক্তির মধ্যস্থলে। জাতীয় জীবনের এক যুগের খেলা অজ্ঞানতিমিরের সহিত অবসর গ্রহণ করিয়াছে। এখন পুনরায় অন্য দিক হইতে কতকগুলি পথিক আলোক হস্তে কর্ম্মের পথ দেখাইতে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহারা হাসেন, কাঁদেন, ভালও বাসেন। আজ বাঙ্গলায় ছদ্মবেশে অনেক রাজকর্ম্মচারিগণ দুঃখের কথা হাসিতে গাহিতেছেন; রাজবিদ্যার কথা নির্জ্জনে প্রাণের বন্ধুগণের সহিত প্রচার করিতেছেন। অনেকে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস অন্তর্নিহিত শক্তি দ্বারা দমন করিয়া স্থিরনেত্রে ভবিষ্যতের পথ মনোমধ্যে আঁকিয়া লইতেছেন। ঈশ্বর তাঁহাদের মঙ্গল বিধান করুন।

যে পথের পথিক হইতে চাই সে পথে শত্রু নাই। রক্তপাত না করিয়া হিংসা, চৌর্য্য, ছলনায় রত না হইয়া, যদি এই মহাশ্মশানে ক্ষুধিত সিংহকে বশে আনিতে পার তবে তোমা হইতে যোগী আর কে? এ কার্য্যে গুরু সহায় হন, উপরিতন রাজপুরুষগণ বাধা দেন না, ধর্ম্ম জগতে দরিদ্রসেবা একটী অবাধ বাণিজ্য, তাহার পুরস্কার কেবল স্বর্গ নহে, এই মর্ত্ত্যধামে রাজসিংহাসন।

একজন সেবক।

বুয়ার জাতির ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়।

ডাচ্ উপনিবেশ স্থাপন।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজদিগের ন্যায় নেথারল্যাণ্ড বাসী ডাচ্গণ (ওলন্দাজ) ভারতবর্ষে এবং ভারতসাগর মধ্যস্থিত দ্বীপ সমূহে বাণিজ্য জাহাজ প্রেরণ করিতেন। ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে ডাচ্গণ জাবা দ্বীপে আধিপত্য বিস্তার পূর্ব্বক এই দ্বীপে বটেভিয়া নগর সংস্থাপন করেন। এই সময় হইতে বটেভিয়া ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজধানী এবং প্রধান বাণিজ্য স্থান হইল।

তৎকালে ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য জাহাজ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া জাবা দ্বীপে গমন করিত। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে হারলেম্ নামাঙ্কিত ডাচ্ কোম্পানীর একখানি বাণিজ্য জাহাজ জল লইবার জন্য টেবিল উপসাগরে অবস্থান কালে ঝঞ্জাবাত দ্বারা (Bluberg Beach) ব্লুবর্গ বীচের সংঘর্ষণে ভগ্ন হইয়া পড়িল।

পোতারোহীগণ জাহাজের দ্রব্যাদি সহ তীরে উঠিয়া, প্রাণ রক্ষা করেন এবং অনন্যোপায় হইয়া বটেভিয়া হইতে স্বদেশাভিমুখী জাহাজের প্রতীক্ষায়, টেবিল পর্ব্বতের পার্শ্বস্থিত সমতল ক্ষেত্রে কুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। বটেভিয়া যাইবার সময় কিম্বা বটেভিয়া হইতে হলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন কালে ডাচ্-দিগের বাণিজ্য জাহাজের নাবিকদিগকে আফ্রিকার উপকূল হইতে জল এবং আহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত কিছু কাল অপেক্ষা করিতে হইত।

পূর্ব্বোক্ত ভগ্ন জাহাজের আরোহীগণ টেবিল পর্ব্বতের সমতল ক্ষেত্রে অবস্থান কালে বর্ষাঋতুর সমাগম দেখিয়া তাহাদিগের সহিত যে সকল ফল ও শস্যের বীজ ছিল তাহা বপন করিলেন। এই প্রদেশের ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা ছিল। বর্ষাবসানে তাহারা যথেষ্ট ফল শস্য লাভ করিয়া তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এতদ্ভিন্ন এই স্থানের নিকটবর্ত্তী আদিমনিবাসিগণের নিকট হইতে দ্রব্যের বিনিময়ে গো মেষ ইত্যাদিও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহাঁদিগের ছয় মাস এই স্থানে অবস্থানের পর বটেভিয়া হইতে হলণ্ড অভিমুখী জাহাজ এই স্থানে পৌছিল। সেই জাহাজে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অব্যবহিত পরেই প্রাগুক্ত হারলেম

নামাঙ্কিত ভগ্ন জাহাজের কর্ম্মচারী লিণ্ডার্ট জান সিন (Leendert Jan ssen.) এবং নিকোলাস্ প্রুট (Nicholas Proot) দক্ষিণ আফ্রিকার টেবিল পর্ব্বতের পার্শ্বে একটি বিশ্রাম-আবাস স্থাপনের জন্য ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট আবেদন করিলেন। তাঁহারা এই প্রদেশে ছয়মাস অবস্থান কালে এই প্রদেশের জলবায়ু এবং ভূমির উর্ব্বরতার সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং এই স্থানে বিশ্রাম আবাস স্থাপন করিলে যে বিশেষ উপকার হইবে তাহা সবিস্তারে আবেদন পত্রে উল্লেখ করিয়াছিলেন।

ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইহাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া ১৬৫১ সালে তিনখানি জাহাজ দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রেরণ করেন। এই তিনখানি জাহাজের সমুদয় আরোহীগণ কোম্পানীর বেতনভোগী কর্ম্মচারী ছিল। এই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনের অভিপ্রায় তাঁহাদের ছিল না, কেবল বটেভিয়া যাত্রী পোতারোহীদিগের জন্য একটি বিশ্রাম আবাস স্থাপনই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহারা আরও মনে করিয়াছিলেন যে, বটেভিয়া গমনকালে পথিমধ্যে যে সকল লোক রুগ্ন কিম্বা অসুস্থ হইয়া পড়ে তাহাদিগকেও আবাস আশ্রমে রাখিয়া যাইবার সুযোগ হইবে। তদ্ভিন্ন আশ্রম আবাসবাসী কর্ম্মচারিগণ বটেভিয়া অভিমুখী বা বটেভিয়া হইতে হলণ্ড অভিমুখী পোতারোহীদিগের নিমিত্ত কৃষিকার্য্য দ্বারা ফল শস্য উৎপাদন এবং ঐ স্থানের অধিবাসিগণের নিকট হইতে গো মেষ ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন।

কোম্পানী নিকোলাস প্রুটকে উক্ত বিশ্রাম আবাসবাসীদিগের অধ্যক্ষ পদ প্রদানের প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু প্রুট ঐ পদ গ্রহণে অসম্মত হইলে জন ভান রিবেক (Jan Van Riebeeck) অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলেন। ভান রিবেক ১৬৫২ সালের এপ্রিল মাসে তাহার সঙ্গীর তিন জাহাজস্থ লোক সহ টেবিল পর্ব্বতের সমতল ক্ষেত্রে পৌছিয়া মৃত্তিকাদ্বারা এক বৃহৎ দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং সেই দুর্গের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। ইংরাজ ইতিহাস লেখক Theal বলেন যে টেবিল পর্ব্বতের পার্শ্বস্থিত সমতল ক্ষেত্রের নিকটে এই সময়ে কেবল একদলমাত্র হটেণ্টট বাস করিত। ইহাদিগের দলে ৬০ জন লোকের অধিক ছিল না। ইহারা সমুদ্র তীরে বিচরণ করিত এবং শামুক, শঙ্খ ইত্যাদি জলজন্তু আহার করিয়া জীবন ধারণ করিত।

ইহারা কৃষিকার্য্য বিষয়ে কিছুই জানিত না। তাহাদের দলের নেতাকে ডাচ্‌গণ হেরি Harry নামে অভিহিত করিয়াছিল, ইতিপূর্ব্বে হেরি ডাচ্‌ দিগের জাহাজে একবার বটেভিয়া গিয়াছিল এবং ডাচ্‌দিগের ভাষাও কিছু কিছু শিখিয়াছিল। হেরির দলের লোকেরা দ্রব্যের বিনিময়ে ডাচ্‌দিগকে কখনও কখনও গো মেষ ইত্যাদি আনিয়া দিত। টেবিল পর্ব্বতের অনতিদূরে যে আর দুইটি হটেণ্টট দল বাস করিত তাহাদের মধ্যে কৃষিকার্য্য প্রচলিত ছিল। তাহারাও সময়ে সময়ে ডাচ্‌দিগের নিকট আসিয়া ইউরোপীয় ধাতু নির্ম্মিত দ্রব্যের বিনিময়ে গো মেষ ইত্যাদি প্রদান করিত। ডাচ্‌দিগের এই স্থানে বিশ্রাম আবাস স্থাপনের অষ্টাদশ মাস পরে হেরির দলস্থ লোকেরা একটি ডাচ্‌ বালককে হত্যা করিয়া গো মেষ হরণ পূর্ব্বক ফলস্‌ উপসাগরের অভিমুখে পলায়ন করিয়াছিল। ডাচেরা বহুচেষ্টা করিয়াও এই দলকে ধৃত করিতে কৃতকার্য্য হইলেন না। এই ঘটনা উপলক্ষেই হটেণ্টটদিগের সহিত ডাচদিগের বিবাদের সূত্রপাত হয়। কিন্তু থেলের লিখিত এই বিবরণ সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বোধ হয় না। হটেণ্টটগণ প্রথমে ক্ষতিগ্রস্ত এবং উৎপীড়িত না হইয়া কখন ডাচদিগের প্রতি অত্যাচার করে নাই। হটেণ্টটদিগের সহিত দ্রব্যাদির বিনিময় বন্ধ হইলে ডাচদিগের বিশেষ অসুবিধা হইত, তাহাদিগের আর বটেভিয়া যাত্রী পোতারোহীদিগের নিমিত্ত গো, মেষ ইত্যাদি সংগ্রহ করিবার সুযোগ থাকিত না। এই নিমিত্তই তাঁহারা সেই সময়ে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন না। অধিকন্তু অনতিবিলম্বে পূর্ব্বোক্ত হটেণ্টট দলের দুই একটী লোক বিশ্রাম আবাসে আবার আসিতে আরম্ভ করিলেও তাহাদিগকে কোনও প্রকার দণ্ড প্রদান করিলেন না। অধিক গো মেষ ইত্যাদি লাভ করিবার আশায় বিশ্রাম আবাসের অধ্যক্ষ জান ভান রিবেক অন্যান্য হটেণ্টটদিগের অনুসন্ধানে লোক প্ররণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টায় বহুসংখ্যক হটেণ্টট দল ইহাদিগের সহিত কারবারে প্রবৃত্ত হইল এবং যে উদ্দেশ্যে ডাচদিগের বিশ্রাম আবাস সংস্থাপিত হইয়াছিল তাহা সফল হইল। কিন্তু ঈদৃশ বিশ্রাম আবাস রক্ষণে অধিক ব্যয় হইতে লাগিল। ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই ব্যয় বহন করিতে অসমর্থ হইয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারী ভিন্ন অন্যান্য স্বাধীন লোক প্রেরণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর নয়জন কর্ম্মচারী কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক লিসবেক

নদীর পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড স্ব স্ব ভরণপোষণ ও বাণিজ্যার্থে চাষ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই নয়জনকেই আদিম উপনিবেশ স্থাপক বলা যাইতে পারে। কিছু কাল পরে আরও আটত্রিশজন কর্ম্মচারী কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন কৃষকের ব্যবসা অবলম্বন করিলেন। কিন্তু কৃষিকার্য্যে অনভিজ্ঞতা বশতঃ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই পুনর্ব্বার কোম্পানীর অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, কেবল পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু লোকেরাই চিরস্থায়ী উপনিবেশ বাসী হইয়া কৃষিকার্য্য করিতে লাগিলেন।

যদ্যপি এই সময়ে কোম্পানী নিয়ম করিয়াছিলেন যে, বিবাহিত না হইলে ডাচ কিম্বা জর্ম্মন স্থায়ী উপনিবেশকের অধিকার প্রাপ্ত হইবেন না, তথাপি কার্য্যতঃ এই নিয়ম রক্ষিত হয় নাই, কোম্পানীর অনেকানেক অবিবাহিত কর্ম্মচারী চিরস্থায়ী আবাস নির্ম্মানোপযোগী ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে এই স্থানে নিগ্রো দাস ক্রয় বিক্রয় প্রথা আরম্ভ হয়। এই বিষময় দাসত্ব প্রথা এবং বিবিধ প্রকার নিষ্ঠুরাচরণ হইতেই ধীরে ধীরে পাপানল প্রজ্বলিত হইয়াছে এবং এই পাপানল হইতেই উত্তর কালে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা সংগ্রামানলে ভস্মীভূত হইতেছে।

অদূরদর্শী, ধর্ম্মান্ধনীতি বিশারদ মনে করেন যে, ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছানুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সংগ্রামানল প্রজ্বলিত হয়, কিন্তু তাহা নহে। ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে প্রমাণ করিতেছে যে দুর্ব্বলের প্রতি বলবানের অত্যাচার, দেশ প্রচলিত দুর্নীতি, ধর্ম্মের বিকৃতাবস্থা এবং কুসংস্কার ও রাজপুরুষদিগের অন্যায়াচরণ হইতেই ঈশ্বরের অখণ্ডনীয় নিয়মানুসারে সংগ্রামানল প্রজ্বলিত হয়।

সমালোচনা।

বঙ্গদর্শন—নবপর্য্যায় জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়। প্রথম প্রবন্ধ—"প্রাচ্য ও "পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ।" এই প্রবন্ধটীর ভাল অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। প্রথম তিন পৃষ্ঠার পরে লেখক বলিতেছেন, আমরা গিজ্জার মত

উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ফরাসী মনীষী গিজোর মত হইতেছে এই,—য়ুরোপের প্রাচীন সভ্যতার একমুখী ভাব, অর্থাৎ প্রত্যেক সভ্যতা একটী ভাবকে আশ্রয় করিয়াই রহিয়াছিল। য়ুরোপের আধুনিক সভ্যতা বহুমুখী—। তাহাতে পুরোহিততন্ত্র রাজতন্ত্র প্রধানতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, ইত্যাদি তন্ত্ররাজি বিরাজমান থাকিয়া পাশা পাশি কাজ করিতেছে। গিজো লোক বড়, তাঁহার মত উপেক্ষণীয় নহে। দুঃখের বিষয়, গিজোর উক্ত তিনপৃষ্ঠাব্যাপী মতের সহিত লেখকের মতের সামঞ্জস্য দেখা যায় না। গিজো বলেন, য়ুরোপীয় সভ্যতা বহুমুখী। "চিরন্তন সত্যের পথ পাইয়াছে, তাহা জগদীশ্বরের কার্য্য প্রণালীর ধারা গ্রহণ করিয়াছে।" কিন্তু নবপর্য্যায় বঙ্গ দর্শনের লেখক বলেন "য়ুরোপের আধুনিক সভ্যতা ধর্ম্মকে প্রকাশ্য ভাবে অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।" এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে "আত্যন্তিক প্রাধান্য দিতেছে।" গিজোতে যে সভ্যতা ঈশ্বরানুমত অর্থাৎ ধর্ম্ম্য বলিয়া ব্যাখ্যাত প্রবন্ধ লেখকের নিকট তাহা অধর্ম্ম মূলক। গিজোতে যে সভ্যতা বহুমুখী, লেখকের মতে তাহা রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রধান যেন একমুখী। অথচ লেখক গিজোর মত যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিতে পারিলেন না। লেখক একস্থানে বলিতেছেন,—

ইয়োরোপে স্বাধীনতাকে যে স্থান দেয় আমরা মুক্তিকে সেই স্থান দিই, আত্মার স্বাধীনতা ছাড়া, অন্য স্বাধীনতার মাহাত্ম্য আমরা জানিনা। * * আমরা গৃহের মধ্যেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড পতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।"

ইহাতে বুঝিলাম, প্রাচীন হিন্দুদিগের আদর্শ অতি উচ্চ ছিল। উচ্চ আদর্শের ফল উচ্চ হইবে, এই আশা করা যায়; কিন্তু লেখক আর এক স্থানে বলিতেছেন,—

"এক সময় আর্য্যসভ্যতা আত্মরক্ষার জন্য ব্রাহ্মণশূদ্রে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রচনা করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে সেই ব্যবধান বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উচ্চতর ধর্ম্মকে পীড়িত করিল।" ইত্যাদি

ইহাতে হিন্দুদিগের জাতিভেদমূলক সভ্যতার নিন্দা বুঝায়। যদি হিন্দু সভ্যতার আদর্শ উত্তম ও উচ্চ ছিল, তাহা হইলে তাহার ফল কেমন করিয়া মন্দ ও নিন্দনীয় হইল। জাতিভেদ হিন্দু ধর্ম্মের বা হিন্দু সমাজের পরগাছা নহে। ইহা হিন্দু সমাজের ভিত্তি, হিন্দু সমাজের বিশেষত্ব। ইহা লেখক স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। "মোটের উপরে বর্ণাশ্রমই হিন্দুসমাজকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে—ইহাই তাহার মূল প্রকৃতিগত।"

যদি আপনি প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম বা হিন্দুসমাজের আদর্শ উচ্চ বলিতে চাহেন, তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্মস্থাপিত জাতিভেদ ও হিন্দু সমাজোপযোগী অর্থাৎ ভাল বলিতে হইবে। যখন হিন্দুগণ উন্নতি করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্যে, শৌর্য্যে, জ্ঞানবলে ও বাহুবলে, ধর্ম্মবলে ও নীতিবলে, জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন—তখন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের, জাতিভেদের, প্রবলতা পূর্ণ মাত্রায় ছিল। তবে কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে, জাতিভেদই হিন্দুদিগের পতনের মূল। এই জাতিভেদ কেবল যে প্রাচীন কালে হিন্দুসমাজে ছিল তাহা নহে। ইহা প্রকারান্তরে প্রাচীন গ্রীকের ও রোমের অভ্যুদয়কালে ছিল। রোমের পতনের পরে, য়ুরোপের ফিউডাল সমাজ লর্ড ও "ভ্যাসাল" এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল।

ভারতে ব্রাহ্মণে ও শূদ্রে যে প্রভেদ ছিল প্রাচীন গ্রীসে গ্রীক ও হিলটদিগের মধ্যে সেই প্রভেদ, প্রাচীন রোমে পাট্রিশিয়ান ও প্লিবিয়ান দিগের মধ্যে সেই প্রভেদ, পরে য়ুরোপের লর্ড ও ভ্যাসালের মধ্যেও সেই প্রভেদ লক্ষিত হয়। তবে য়ুরোপ সমাজের উচ্চ শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ নিম্নশ্রেণীকে পদতলে রাখিয়া পৃথিবীর ধন ও সৌখীন সামগ্রী সমুদায় নিজেরা ভোগ করিত; ভারতবর্ষে, ব্রাহ্মণেরা সমাজের শীর্ষস্থানে থাকিয়াও আপনাদিগকে ভিক্ষাজীবী করিয়া রাখিয়াছিলেন। জগতে এই দৃষ্টান্ত অতুলনীয়। সমুদয় ক্ষমতা ব্রাহ্মণের হস্তে, অথচ ব্রাহ্মণ ভোগী নহে, ব্রাহ্মণ ত্যাগী, ব্রাহ্মণ গৃহেও সন্ন্যাসী। আর, য়ুরোপে জাতিভেদ ধর্ম্ম-সংসৃষ্ট ছিল না, ভারতের জাতিভেদ ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট।

লেখক হিন্দুদিগের পতনের কারণ যেন এক কথায় মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। তিনি, বলেন "শূদ্রকে ব্রাহ্মণ উপরে উঠিতে দেয় নাই, কিন্তু শূদ্র ব্রাহ্মণকে নীচে নামাইল।" হিন্দুদিগের পতন কেন হইল এ অতি কঠিন প্রশ্ন, লেখক যত সহজে মীমাংসা করিয়াছেন তত সহজে মীমাংসা হয় না। কোন একটী জাতি উন্নত হইয়া পরে কেন পতিত হয় ইহা অতি বিস্তৃত প্রশ্ন।

কেহ কেহ বলেন যে, কোন ব্যক্তি জন্মিলে তাহার মৃত্যু হইবে ইহা নিশ্চিত; কিন্তু কেন হয় তাহা অদ্যাপি অজ্ঞাত। তেমনি কোন একটী জাতির উন্নতি হইলে, ক্রমে তাহার পতন হইবে ইহাও নিশ্চিত; কিন্তু ইহার কারণ অজ্ঞাত। ব্যাগিহট, জাতির উন্নতি ও অবনতির হেতু সম্বন্ধে, একটী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ

লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রথমে প্রত্যেক উন্নতিশীল জাতি কি কি নিয়ম সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক তাহা বিচার করিয়া ক্রমে ক্রমে স্থির করে, এবং তাহা সমাজে প্রবর্ত্তিত করে। এই সকল নিয়ম সমাজে ক্রমে দেশাচার বলিয়া পালিত হইয়া থাকে। তখন দেশাচার সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক। কিন্তু সমাজের আভ্যন্তরিক অবস্থার ও বাহ্যজগতের অবস্থাপরিবর্ত্তনের সহিত, এবং সংস্পৃষ্ট জাতিনিচয়ের অবস্থাপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, আত্মরক্ষার জন্য সমাজের নিয়ম প্রয়োজন মত পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হয়। কিন্তু দেশাচার যখন অতিশয় দৃঢ় ও কঠিন হয়, সমাজের লোকের বিচার শক্তি যখন দেশাচারে দমিত হয়, তখন সমাজের ব্যবস্থা, প্রয়োজন মত আর পরিবর্ত্তন করা হয় না। সুতরাং তখন সেই সমাজের পতন হয়। অতএব সমাজের উন্নতিরক্ষার জন্য, অবাধ বিচারের নিত্য প্রয়োজন। ব্যাগিহটের এই চিন্তাশীল মতটী এই স্থলে আলোচ্য নহে। বঙ্গদর্শনের লেখকের মতে শূদ্র ব্রাহ্মণকে নীচের দিকে টানিল, তাই ব্রাহ্মণ পড়িল, হিন্দুগণের অবনতি হইল। কিন্তু একথা যেমন বলা যাইতে পারে, তেমনি অন্যান্য শত সহস্র কথা ও বলা যাইতে পারে। যথা,—হিন্দুদিগকে পৌত্তলিকতা নীচে টানিল তাই হিন্দু সমাজের অবনতি হইল। হিন্দুসমাজে বিলাস বাড়িল, তাই হিন্দুসভ্যতার বিনাশ হইল। হিন্দুগণের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ হইল, তাই তাহাদিগের অধঃপতন হইল। ভারতবর্ষের উত্তাপে এবং আর্দ্র বায়ুতে হিন্দুদিগের দেহের বলক্ষয় হইতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে উদ্যম ও কর্ম্মপটুতা কমিয়া গেল, তাই হিন্দু শিথিল হইয়া অবনতির স্রোতে গা ঢালিয়া দিল। হিন্দুগণ ক্রমে ক্রমে স্বার্থপর ও সঙ্কীর্ণ ভাবাপন্ন হইল, তাহাদিগের স্বদেশপ্রীতি লুপ্ত হইল, তাই হিন্দুগণ বিদেশীয় শত্রুর পদানত হইল। বাল্যবিবাহে হিন্দুগণ ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, তাই তাহাদিগের তেজ ও সভ্যতার বিলোপ হইল।—ইত্যাদি।—ইত্যাদি।—

যিনি যে অবস্থাটী বিশেষ মন্দ বিবেচনা করেন, তিনিই সেইটী হিন্দু সভ্যতা লোপের হেতু বিবেচনা করিতে পারেন। কিন্তু ইহার মধ্যে কোনগুলি প্রকৃত কারণ তাহার প্রমাণ না পাইলে বুঝা যায় কিরূপে?

প্রবন্ধ লেখক বলেন আমাদের দেশে "বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যখন সেই উচ্চতর

ধর্ম্মকে আঘাত করিল তখন ধর্ম্ম তাহাকে আঘাত করিল"। ইহার অর্থ দুজ্ঞের্য়। প্রথমতঃ প্রবন্ধলেখক কি অর্থে ধর্ম্ম শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা বলেন নাই। যদি ধর্ম্ম অর্থে সমাজকে যাহা ধারণ বা রক্ষা করে, অর্থাৎ সমাজের মঙ্গলজনক কার্য্য হয় তাহা হইলে ধর্ম্ম রক্ষিত হইলে সমাজকে রক্ষা করে অর্থাৎ সমাজের মঙ্গল করে, লেখক এই যে কথা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ এই হয় যে, যাহাতে সমাজের মঙ্গল হয় তাহাতে সমাজের মঙ্গল হয়; অর্থাৎ কিছুই অর্থ হয় না। আর (নিম্ন বা ক্ষুদ্র) ধর্ম্ম উচ্চতর বা বিস্তৃত ধর্ম্মের অন্তর্গত না থাকিয়া তাহাকে কিরূপে অতিক্রম করে তাহা বুঝা কঠিন।

প্রবন্ধলেখক বলেন,

"আমাদিগের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সংকীর্ণতা নিত্য ধর্ম্মকে নানা স্থানে খর্ব্ব করিয়াছিল বলিয়াই, তাহা উন্নতির দিকে না গিয়া বিকৃতির পথেই গেল।"

প্রবন্ধলেখক নিত্য ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন। অনিত্য ধর্ম্ম ও নিত্য ধর্ম্মের লক্ষণ বলিলে লেখক যাহা বলিতেছেন তৎসম্বন্ধে তাঁহার নিজের পরিষ্কার ধারণা আছে কি না বুঝা যাইত।

এতক্ষণে যাহা বলা হইল তাহাতে প্রতীত হইবে যে হিন্দুদিগের আদর্শ প্রসঙ্গে প্রবন্ধে যাহা লেখা হইয়াছে তাহা পরস্পরবিরোধী। হিন্দু সমাজের আদর্শ আত্মার মুক্তি, অতি উচ্চ উদার। ইহা প্রাচীন মতাবলম্বী হিন্দুর কথা। কিন্তু হিন্দু সমাজের ভিত্তি স্বরূপ জাতিভেদ, হিন্দুদিগের পতনের কারণ ইহা নব্য মতাবলম্বী ব্রাহ্মের কথা। প্রবন্ধে দুইটী বিরোধী মতের সমর্থন করিবার চেষ্টা করায় একটা খিচুড়ী হইয়াছে।

তাহার পর লেখক পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন,—

"স্বার্থের প্রকৃতিই বিরোধ। য়ুরোপীয় সভ্যতার সীমায় সীমায় সেই বিরোধ উত্তরোত্তর কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে।

* * * * *

ইহাও দেখিতেছি, য়ুরোপের এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থপরতা ধর্ম্মকে প্রকাণ্ড ভাবে অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।"

লেখকের মতে, য়ুরোপীয় রাষ্ট্রীয় স্বার্থপরতা ধর্ম্মকে অবজ্ঞা করিতে "আরম্ভ"

করিয়াছে। যেন পূর্ব্বে রাষ্ট্রীয় স্বার্থপরতা ধর্ম্মকে অবজ্ঞা করে নাই, যেন য়ুরোপের কোন জাতি পররাজ্য পূর্ব্বে হরণ করে নাই! যেন বলে পরদেশ অধিকার করার পাপকার্য্যটা সম্প্রতি "আরম্ভ" হইয়াছে। যেন এতকাল "সাম্য ও সৌভ্রাত্র" মন্ত্রে য়ুরোপ মুগ্ধ ছিল, এতাবৎকাল প্রবল জাতি দুর্ব্বল জাতিকে হিংসা ও পীড়ন করে নাই। লেখক বোধ হয় বিস্মৃত হন নাই যে প্রাচীন গ্রীক আলেক্‌জাণ্ডারের নেতৃত্বে কত নিরপরাধ জাতির শোণিতে ধরাতল ভাসাইয়াছিল! লেখক বোধ হয় বিস্মৃত হন নাই যে, প্রাচীন রোমকগণ য়ুরোপ, আসিয়া, আফ্রিকা এই তিন মহাখণ্ডের কত বিদেশীয় জাতিকে অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়াছিল। তাই বোধ হয়, লেখক বলিলেন "গ্রীক ও রোমক সভ্যতারও মূলে এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ছিল।" বোধ করি ইহার অর্থ এই যে তাহারা অন্য জাতির দেশ কাড়িয়া লইত। ভাল,তাহার পর কি য়ুরোপে সাম্য সৌভ্রাত্র, ধর্ম্ম রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল? ভ্যাণ্ডাল, গথ ভিছিগথ, হুন প্রভৃতি জাতিগণ অন্য জাতির হিংসা করিয়াছিল কেন? তুমি বলিবে তাহারা অসভ্য ছিল। ভাল। স্প্যানিয়ার্ডগণ তাহাদিগের অভ্যুত্থানকালে আমেরিকাতে গিয়া পেরু প্রভৃতি জয় করিয়া ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিল কেন? আর হলাণ্ডে স্পেনবাসিগণ কি করিয়াছিল? অষ্ট্রেলিয়া কেন ইতালি গ্রাস করিয়াছিল? আর নেপোলিয়ান পরিচালিত ফরাসি জাতি কেন প্রায় সমুদয় য়ুরোপকে পদানত করিয়াছিল? সাম্য সৌভ্রাত্র নিবন্ধন কি? বঙ্গদর্শনের লেখক অদ্য যেন নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া সহসা দেখিলেন, য়ুরোপ বিরোধে কণ্টকিত হইতেছে ধর্ম্মকে প্রকাশ্যভাবে অবজ্ঞা করিতে "আরম্ভ" করিয়াছে। তিনি যেন অদ্য সহসা শুনিলেন "জোর যার মুলুক তার"। যেন এই কথা প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত নাই। য়ুরোপে কেন, ভারতবর্ষে, যেখানে লেখক কেবল মাত্র আত্মার স্বাধীনতা ছাড়া অন্য স্বাধীনতার মাহাত্ম্য দেখেন নাই, সেই ভারবর্ষে প্রাচীন পরাশর বলিয়াছেন, "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা"। তাহার অর্থ "জোর যার মুলুক তার" হিন্দুগণ এইরূপ বুঝেন নাই কি? অশ্বমেধযজ্ঞে কি প্রমাণ হয়? প্রাচীনকালে যে হিন্দুরাজা অতিশয় পরাক্রমশালী হইতেন তিনি দিগ্বিজয়ে নির্গত হইতেন। কি ভারতবর্ষে কি য়ুরোপে "জোর যার মুলুক তার"এই কথা নূতন নহে, এবংতদনুযায়ী কার্য্যও নূতন নহে। তবে পূর্ব্বে এবং এক্ষণকার মধ্যে প্রভেদ এই যে, পূর্ব্বে প্রায়ই

এক জাতি পরাক্রমশালী হইয়া অবশিষ্ট দুর্ব্বল জাতিগণকে পীড়ন করিতে চেষ্টা করিত। এক্ষণে অনেক জাতি এককালে প্রবল হইয়াছে। সুতরাং এক্ষণে দুর্ব্বল এবং নিপীড়িত জাতির সংখ্যা কমিয়াছে। ইউরোপের প্রায় সমুদয় জাতি এক্ষণে স্বাধীন, অত্যাচারের অতীত। অধুনা আসিয়াতে জাপান প্রবল। সুতরাং সেও অত্যাচারের অতীত হইয়াছে! এইরূপে আশা করা যাইতে পারে, অবশিষ্ট জাতিগণও ক্রমে ক্রমে সবল এবং আত্মরক্ষাক্ষম হইবে। এবং পৃথিবীতে এইরূপে পীড়িত জাতির সংখ্যা ক্রমশঃ কমিবে। জাতীয় অত্যাচার নিবারণ পক্ষে এ হইল বহিরঙ্গ উপায়। আর পক্ষান্তরে ধর্ম্মের যত প্রচার হইবে অত্যাচারও তত কমিবে। এই হইল অন্তরঙ্গ উপায়। এই অন্তরঙ্গ উপায়ে যুদ্ধ নিবারিত হইবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

যাহা হউক, রাষ্ট্রীয় স্বার্থ কেবল ইউরোপে দেখা যায় তাহা নহে। আসিয়াতে যখন যে জাতি প্রবল হইয়াছিল তখনই অন্য দেশ বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়াছিল। প্রাচীন পারস্যবাসিগণ পার্শ্ববর্ত্তী দেশ জয় করিয়াছিল। এমন কি গ্রীস আক্রমণ করিয়াছিল। মুশলমান জাতি যখন প্রবল হইয়াছিল তখন তাহারা নানা দিগ্‌দেশে বিজয় পতকা উড়াইয়াছিল, শাণিত তরবারিতে অগণ্য কাফের-মুণ্ডচ্ছেদন করিয়াছিল। লেখক, যে আর্য্য জাতিকে নিরীহ আধ্যাত্মিক মুক্তি-পরায়ণ বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন, তাঁহারাও অতি প্রাচীনকালে যখন প্রবল হইয়াছিলেন, তখন রণভেরী বাজাইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক পরকীয় দেশ জোর করিয়া অধিকার করিয়াছিলেন। "জোর যার মুলুক তার" ইহা ব্যতীত তাহাদিগের আর কোন "রাইট টাইটেল" ছিল না। সংক্ষেপে, আলোচ্য প্রবন্ধের তিনটী মূল কথাতেই প্রবন্ধের অসারতা দৃষ্ট হয় :—

১। লেখক নিজের মতের বিরোধী গিজোর মত উদ্ধৃত করিয়াছেন কিন্তু তাহা খণ্ডন করিতে পারেন নাই।

২। তিনি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম হিন্দুসমাজের ভিত্তি মানিয়া তাহার নিন্দা ও খনন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন অথচ এই ভিত্তির উপরিস্থিত বিশাল হিন্দুসভ্যতা-প্রাসাদ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

৩। যে রাষ্ট্রীয় স্বার্থপরতা লেখক আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার বিশেষত্ব বিবেচনা করেন, তাহা প্রাচীন ইউরোপেও পরিলক্ষিত হয় এবং আসিয়া মহা-

খণ্ডেও দেখা যায়। সুতরাং তিনি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার যে প্রভেদ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা দেখাইতে পারেন নাই।

আমি এই প্রবন্ধের কথঞ্চিত দীর্ঘ সমালোচনা করিতে বাধ্য হইলাম। অন্যান্য মাসিক পত্রের প্রধান প্রধান প্রবন্ধের এইরূপ সমালোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

পূর্ব্ব সংখ্যক বঙ্গদর্শনে শ্রীযুক্ত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় হিন্দুর সভ্যতার বিষয়ে যে প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন তাহা চিড়িয়া দেখিলে বুঝা যায় তাহার মধ্যেও সার নাই, তাহা কেবল যুক্তিহীন বাগাড়ম্বর মাত্র। ভরসা করি অন্য কেহ তাহার সমুচিত সমালোচনা করিবেন।

শ্রীরামমোহন চক্রবর্ত্তী।

যজ্ঞ।

১

শরতের কৃষ্ণ সন্ধ্যা, পূর্ণ নীরবতা,
স্তব্ধতায় নিশীথের গাম্ভীর্য্য সমান,
শেফালি সুরভি মাখা সমীর মমতা
পরশে পুলক তনু, মোহিত পরাণ।

২

দুইটি প্রেমিক হোথা অনন্ত হৃদয়,
বরষা প্লাবিত পূর্ণ তটিনীর প্রায়,
অনুরাগ স্ফীত বক্ষে, ভুলি সমুদয়
বিশ্বকাণ্ড বসিয়াছে প্রেমের শয্যায়।

৩

মিলনের পূর্ণানন্দ, সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া,
প্রতি লোমকূপ দিয়া হতেছে বাহির;
একটী চুম্বন শুধু পাবার লাগিয়া,
দুখানি অধর থড় হয়েছে অস্থির,—

অধর-পল্লবে অর্দ্ধ চুম্বনের রাগ
প্রীতি,-লাজ-প্রেম-হর্ষে নিরমিল যাগ।

শ্রীবনোয়ারীলাল গোস্বামী।

মধুরিমা।

উপন্যাস।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

জ্যৈষ্ঠ মাস, মধ্যাহ্নকাল। এই দুই প্রহরের নিদারুণ তাপে তাপিত হইয়া বকুল বৃক্ষের তলায় শয়ন করিয়া মধুরিমা গুন্ গুন্ স্বরে একটী গান গাহিতেছেন, এমন সময় পশ্চাৎ দিকে মনুষ্যের পদশব্দ শ্রুত হইল, ফিরিয়া দেখিলেন শচীন্দ্রনাথ!

শচীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "কি মধুরিমা কেমন আছ?" মধুরিমার বক্ষ কাঁপিতে লাগিল; তিনি অনেক কষ্টে উত্তর দিলেন—"ভাল আছি।"

শচীন্দ্র—"মধুরিমা, তুমি এখানে একা কেন? তোমার সই কোথায়?

মধুরিমা—"ঘুমাইয়া আছেন।"

শচীন্দ্র—"কাল তোমার সই কি এখানে আসিবেন?"

মধুরিমা—"এলে কি হবে?"

শচীন্দ্র—"একবার খালি দেখে চলে যাব। বল, কাল, সাথে নিয়া আসিবেত"।

এইবার মধুরিমার অসহ্য হইয়া উঠিল, তিনি মুখ ফিরাইয়া একটা গাছের পাতা ছিঁড়িতে লাগিলেন। শচীন্দ্র কোন উত্তর না পাইয়া আবার ডাকিলেন, —"মধুরিমা, কথার উত্তর দিলে না যে? কি ভাবছ"।

মধুরিমা—"ভাবছি যে সুধা ভেবে গরল খেয়েছি, তার উপায় কি"।

শচীন্দ্র—"মধুরিমা সে কি, তোমায় গরল কে দিলে"।

মধুরিমা—"যম"।

শচীন্দ্র—"ও কথা বলিও না। মধুরিমা ভুল না, কাল তোমার সইকে অবশ্য অবশ্য নিয়ে এস, আমি কাল নিশ্চয়ই আস্‌ব।"

এই কথা বলিয়া শচীন্দ্র চলিয়া গেলেন। মধুরিমা চতুর্দ্দিক আঁধার দেখিলেন। সেই দ্বিপ্রহর বেলায় মধুরিমার সহসা বোধ হইল যেন ঘোরা রজনী। তিনি ভাবিলেন—"আমার বাঁচিয়া আর সুখ কি? মরি না কেন? আত্মহত্যা—ভীষণ, আর শচীন্দ্র—মরিলে কি তাহাকে দেখিতে পাইব? আর দেখিয়াই কি হইবে। মৃত্যু, এক্ষণে তুমি আমার এক মাত্র শান্তিদাতা"।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

গভীর রজনী। সকলে নিদ্রিত। কিন্তু মধুরিমার চক্ষে নিদ্রা নাই, তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। ভাবিতেছেন, "শচীন্দ্র যদি আমার না হন, তবে এ জীবন আর কেন রাখি? আমি মরিব"। আবার ভাবিলেন "কিন্তু শচীন্দ্রের মনের কথা ঠিক জানিতে হইবে"। ক্রমে রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল। ঘড়িতে দুইটা বাজিল, মধুরিমা অতি সন্তর্পণে গৃহের দ্বারে শিকল দিয়া নিধিকে ধীরে ধীরে ডাকিলেন। মধুরিমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া নিধি বলিল "কে গা, দিদিমণি। কি বল্‌ছ?"

মধুরিমা—"খিড়কির দোরটা খোলা আছে, বন্ধ করিয়া দিয়ে আয়"—এই বলিয়া মধুরিমা বাহির হইয়া গেলেন। নিধির পাশ ফিরিতে, গা মোড়া দিতে যতক্ষণ সময় লাগিল ততক্ষণ মধুরিমা ফটকের বাহির হইয়া গেলেন! নিধি চোক রগড়াইতে রগড়াইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

মধুরিমা ফাটকের বাহিরে রাস্তায় যাইবা মাত্র একটা পেচক গম্ভীর স্বরে ডাকিল। মধুরিমা চমকিয়া একটু দাঁড়াইলেন, কেমন ভয়ের সঞ্চার হইল; ভাবিলেন 'কি করিলাম'। তিনি শচীন্দ্রনাথের বাটীর সন্নিকটস্থ পুষ্করিণীর তীরে সোপানের উপর বসিয়া করুণস্বরে একটা গান গাইতে লাগিলেন।

"কোথায় অকূলে ভাসিয়া চলিলাম অভাগিনী"।

শচীন্দ্রনাথ নিজের শয়ন ঘরে বসিয়া নীলিমার কথা লিখিতেছিলেন, সহসা অস্পষ্ট মৃদু গীতস্বর শুনিতে পাইলেন। হাতের লেখনী হাতে করিয়াই পুনরায় শ্রবণ করিলেন এইবার স্পষ্ট শ্রুত হইল:—

"কোথায় অকূলে ভাসি চলিলাম অভাগিনী"।

শচীন্দ্রনাথ কাল বিলম্ব না করিয়া একটা লণ্ঠন লইয়া দ্বার খুলিলেন মধুরিমাও দ্বার খোলার শব্দ পাইয়া গীত থামাইয়া দিলেন। শচীন্দ্রনাথ খুঁজিতে খুঁজিতে পুষ্করিণীর তীরে আসিয়া রমণী মূর্ত্তি দেখিয়া চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি শীঘ্র বল," কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না মধুরিমার তখন কণ্ঠ রুদ্ধ, চক্ষে জল, তিনি প্রস্তর মূর্ত্তির মত স্থির নিশ্চল।

শচীন্দ্র কোন উত্তর না পাইয়া রমণীর মুখের কাছে আলো লইয়া গেলেন এবং আশ্চর্য্য ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি! তুমি মধুরিমা একা, এত রাত্রে এখানে কেন" ?

মধুরিমা—"কেন শচীন বাবু এলে কি হয়?"

শচীন্দ্র—"লোকে মন্দ বলিবে। এখন তুমি বালিকা নও, যুবতী।"

মধুরিমা—যার মা নাই বাপ নাই, আপনার বলিতে যার সংসারে কেহ নাই, যে পথ হারা অনাথিনী, তার আবার লোক লজ্জার প্রয়োজন কি!"

শচীন্দ্র—"মধুরিমা যাহা করিয়াছ ক্ষমা করিলাম। আর কখনও এমন কাজ করিও না। বল তুমি এত রাত্রে এখানে কেন?"

মধু—"বলিব, চল তোমার ঘরে চল"।

শচীন্দ্র অগত্যা ঘরে গেলেন। মধুরিমা গৃহে প্রবেশ করিয়াই শয্যার উপর একখানা কাগজে লেখা "নীলিমা আমার আর কাহারও নয়" এই কথা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন! মধুরিমার কোমল হৃদয় যেন বাণবিদ্ধা কপোতীর ন্যায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল, মধুরিমার মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। শচীন্দ্র লজ্জা পাইলেন, মধুরিমাকে বলিলেন "ওকি, তুমি দাঁড়াইয়া রহিলে যে, ব'সনা," মধুরিমা তখন কতক প্রকৃতিস্থ হইয়া ভূমিতে বসিলেন। শচীন্দ্র আবার প্রশ্ন করিলেন "মধুরিমা তুমি কেন এমন সময় আসিলে বল"।

মধুরিমা—"কেন আসিলাম তাহা বলিতে পারি না। আমি আসিয়াছি বলিয়া তোমার যদি কষ্ট হয় তবে বল চলিয়া যাই"।

শচীন্দ্র—"না তাত বলি নাই। তুমি রাত্রে এরূপ ভাবে এখানে আসিয়াছ জানিলে তুমি যাহাদের আশ্রিতা তাহারা তোমাকে ও আমাকে কুসন্দেহ করিতে পারেন, তাই আমি তোমাকে বলিতেছি যে কাযটা ভাল হয় নাই"।

মধু—"তা, তাঁরা যাই ভাবুন না কেন, আমি ত আসিয়াছি আর সেখানে যাইব না"।

শচী—"ছি! তবে কি তুমি কুলটা"।

মধু—"নীলিমা যদি আসিত, তবে কি তুমি তাহাকে এমনি তিরস্কার করিতে"?

শচী—"তুমি এমন ভাবে কেন কথা কহিতেছ? তুমি কাহারও কি প্রণয়াকাজ্ক্ষিনী হইয়া গৃহের বাহির হইয়াছ"।

মধুরিমা মর্ম্মাহত হইয়া ধীরে ধীরে দ্বারের নিকট যাইয়া কেবল রুদ্ধ কণ্ঠে, "শচীন্দ্রকে ভালবাসি—মধুরিমারই শচীন্দ্র, আর কাহারও নয়" বলিয়া দ্বার হতে ছুটিয়া অদৃশ্য হইলেন।

শচীন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি বাহির হইলেন ক্রন্দন ধ্বনিতে কে বলিল, "জনমের মত চলিলাম। আমি চিরজীবন তোমারই দাসী"।

শচীন্দ্র পশ্চাতে ছুটিলেন, অনেক অন্বেষণ করিলেন কিন্তু সন্ধান পাইলেন না।

শ্রীমোহিনী দেবী।

দৈনিক-ঘটনা-সংগ্রহ।

আষাঢ়।

১লা আষাঢ়, ১৫ই জুন। সেন্টপিটার্সবর্গ নগরে পুনর্ব্বার বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়।

২রা আষাঢ় ১৬ই জুন। জর্ম্মন দেশের প্রধান মন্ত্রী পরলোকগত প্রিন্স বিসমার্কের প্রস্তর মূর্ত্তি বার্লিন নগরে উন্মোচিত হয়।

ভূপাল রাজ্যের বেগম সাহেবের মৃত্যু হয়

৬ই আষাঢ়, ২০শে জুন। চীনবাসীগণ বিনা যুদ্ধে ইয়াংস্থন নগর অধিকার করেন।

১৪ই আষাঢ়, ২৮শে জুন। ১৯০২ সালে ২৮শে জুন তারিখে ভারতেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ড রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন এই ঘোষণা পত্র লণ্ডন নগরে পঠিত হয়।

১৯শে আষাঢ়, ৩রা জুলাই। সেনাপতি কোচ ব্রানস্কী নগর হইতে পলায়ন করেন।

আমেরিকাতে অনেক নগরে অতিশয় উত্তাপ হয় ইহাতে অনেক লোকের প্রাণহানি হয়।

২৫শে আষাঢ় ৮ঠা জুলাই। ফিলিপাইন নগরে আমেরিকা কর্ত্তৃক অসামরিক রাজকার্য্য প্রচলিত হয়।

২৫শে আষাঢ়, ৯ই জুলাই। কিয়াংসীং নগরে ভীষণ জলপ্লাবন হয় এবং ন্যূনাধিক চারি সহস্র ব্যক্তি জলমগ্ন হয়।

২৬শে আষাঢ়, ১০ই জুলাই। সেনাপতি স্নীপার মরেসবর্গ অধিকার করেন।

২৭ আষাঢ়, ১১ই জুলাই। বুয়ারগণ হার্ট-কপের 'আউট পোষ্ট' সকল দখল করে।

২৯শে আষাঢ়, ১৩ই জুলাই। ডুমন নামক একজন যুবক সেণ্ট ক্লাউড হইতে ইফেল টাউয়ার পর্য্যন্ত বায়ুপোত পরিচালনে কৃতকার্য্য হন।

প্রিটোরিয়ার নিকটে বুয়ারগণ লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু শীঘ্রই বিতাড়িত হয়।

৩০শে আষাঢ় ১৪ই জুলাই। সেনাপতি ব্রড উডের বিগ্রেড টীন-রাজ্য খন্ড নগর অধিকার করে। কেপারষ্টোনের সৈন্য জীরষ্ট দখল করে।

নবপ্রভা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

১ম খণ্ড। } কলিকাতা, ভাদ্র, ১৩০৮ সাল। { ৭ম সংখ্যা।

আশা ও প্রীতি।

প্রথম বল্লী।

"আজ যেনরে প্রাণের মতন কাহারে বেসেছি ভালো
উঠেছে আজ মলয় বাতাস, ফুটেছে আজ মধুর আলো।"

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

"So long as man remains human he will have a moral sense, and, therefore, if any man were to endeavour on principle to achieve his own happiness without regard to the happiness of. others he would carry that in his own nature which must necessarily defeat his own object ; in shutting out all consideration for the happiness of others he would be most effectually closing the door to happiness against himself"—*Romancs.*

১

একটী চিত্র।

সন্ধ্যা হয়ে এল, সায়াহ্নের মলিন আঁধার চারিদিক ছাইয়া ফেলিল ; এমন সময় কে যেন এক ভিখারিণী অতি কাতর করুণ সুরে কীর্ত্তন গাইতে গাইতে চলিয়াছে ;—"দিন তো গেল, সন্ধ্যা হলো, পার কর আমারে। তুমি পারের কর্ত্তা,

জেনে বার্ত্তা, ডাকছি হে তোমারে॥ আমি আগে এসে, ঘাটে রইলাম বসে, যাদের সাধনের বল ছিল, তারা তরে গেল, আমি রহিলাম পড়ে। শুনি কড়ি নাইকো যার, তারে কর তুমি পার, আমি দিনভিখারী নাইকো কড়ি, দেখ ঝুলি ঝেড়ে॥" ভিখারিণীর চখে দর দর অশ্রুধারা ঝরিতেছে; বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছে; ব্যাকুলতায় যেন কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছে; তবু ভিখারিণী আলুলায়িত কেশে মলিন বেশে হৃদয়ভাঙ্গান সুরে গাইতে লাগিল, "শুনি কড়ি নাইকো যার, তা'রে কর তুমি পার, আমি দিন-ভিখারী নাইকো কড়ি, দেখ ঝুলি ঝেড়ে"—

* * * * *

নগরের প্রান্তে পাহাড়; পাহাড়সংলগ্ন নদী তর তর করিয়া বহিয়া চলিয়া যাইতেছে। পবিত্র প্রভাতের সুস্নিগ্ধ বায়ুহিল্লোল পাহাড়ের গাছপালাগুলি কাঁপাইতেছে। সেই ভিখারিণী আজ আবার এইখানে। ভিখারিণী আজ শান্ত—শান্তিময়ী; আর নৈরাশ্যে মলিন নহে। কেমন একটী মহতী সুখ-দায়িনী আশা, সেই সুন্দর পবিত্র স্নেহপূর্ণ অতীব কোমল মুখমণ্ডলে, পরিব্যাপ্ত। ভিখারিণী গাইতে গাইতে চলিয়াছে—সেই প্রাণ ভাঙ্গান প্রাণ জুড়ান "আশা-ওয়ারী" রাগিণীতে গাইতেছে;—

"নাহিক আর বিরস হৃদয়, নাহিক আর অশ্রুরাশি,
হৃদয়ে জড়ায় রে প্রেম, হৃদয়ে গড়ায় হাসি;
ভাঙ্গা ঘরে শূন্যভিতে শুন্‌বিনে আর দীর্ঘশ্বাসে,
কি দুঃখেতে কাঁদবে সে জন, প্রাণভরে যে ভালবাসে।
"আজ যেনরে প্রাণের মতন কাহারে বেসেছি ভালো;
উঠেছে আজ মলয় বাতাস, ফুটেছে আজ মধুর আলো।"

ভিখারিণীর সঙ্গে কয়েকটী অনাথ সন্তান সযত্নে সস্নেহে লালিত; সে তাহাদের লইয়া ঐ ভালবাসার সঙ্গীত হিল্লোলে,—

"আজ যেনরে প্রাণের মতন কাহারে বেসেছি ভালো;
উঠেছে আজ মলয় বাতাস ফুটেছে আজ মধুর আলো।"

—সুমধুর প্রভাতের সুস্নিগ্ধ বায়ু প্রকম্পিত করিয়া তটিনীসংলগ্ন মঙ্গলময় আশাপূর্ণ ধর্ম্মমন্দিরে চলিয়াছে। দূরে পূর্ব্বগগনে রক্তিম উদীয়মান রবির "আশা ও প্রীতির" ক্ষীণ নবপ্রভা দেখা যাইতেছে।

এস আমরা সকলে প্রার্থনা করি—হে ওজঃস্বরূপ! আমাদিগকে ওজস্বী কর; হে বীর্য্যস্বরূপ! আমাদিগকে বীর্য্যবান্ কর; হে বলস্বরূপ! আমাদিগকে বলবান্ কর; হে দয়াময় প্রেমময় ঈশ্বর, আমাদিগের হৃদয়ে প্রীতি ভক্তি ভালবাসা দাও; চরিত্র পবিত্র কর; চিত্তে শুদ্ধি দাও। আমাদিগকে বিনম্র ও বিনয়ী কর হে দীনবন্ধু আমাদিগকে ত্যাগ স্বীকারে দীক্ষিত কর।

২

কাজ কর্ম্ম সাঙ্গ হয়ে গেল। সকাল্ হতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সংসারের ধন্দায় ফিরিয়া ঘুরিয়া, বাড়ী ফিরিয়া আসিলে, যদি তোমার ব্যবসা-বানিজ্যের, চাকরী-'নকরীর', মকদ্দমা মক্কেলের, কাছারী জমিদারীর চিন্তা হইতে অব্যাহতি পাইবার কিঞ্চিন্মাত্র 'ফুরসৎ' বা অবসর থাকে,—অর্থাৎ তুমি যদি একটী আসল আস্ত অখণ্ড জানোয়ারে পরিণত হইয়া না থাক, তাহা হইলে অন্ততঃ মাঝে মাঝে মনে হইবে "এ জীবনটা কি, জীবনের আশা ভরসার উদ্দেশ্য কি"। কখন হয়তো সম্ভোগের অতি তৃপ্তিতে, কখন বা লালসালিপ্সার অবসাদে, কখন বা ইন্দ্রিয় সেবার নিস্ফলতায় মনে হইবে—"কোন্‌পথে যাইতেছি;"—তোমার মনটা স্বর্গীয় হতাশায় ব্যাকুল হইয়া উঠিবে। কলের মত, সংজ্ঞা বিহীন পুঁতুলের মত, চিন্তা-শূন্য পশুর মত, দশজনে যাহা করে দশজনে যেভাবে চলে, সেই ভাবে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছ; 'দুনিয়া'টা তখন নিতান্ত হাল্কা ফাঁকা হাওয়ার মতন বোধ হইতেছে। কিন্তু বিপদে আপদে নৈরাশ্যে—অন্ধকারে,—বিলাস সম্ভোগের পরি-তৃপ্তি, বা অতি তৃপ্তিতে বা অতৃপ্তিতে সময়ে সময়ে নিশ্চয়ই মনে হইবে যে "কেন বাঁচিয়া আছি,—কাহার অনুরোধে, কি উদ্দেশ্যে, কোন ভরসায় কি সুখের প্রলো-ভনে কেবল নিজের চিন্তার, নিজের ক্ষুদ্র সুখদুঃখ লইয়া বিব্রত আছি?" এই-প্রকার ভাব, এইপ্রকার প্রশ্ন, যে মাঝে মাঝে আমাদের সাংসারিকতা ও স্বার্থ-পরতাকে ব্যাকুলিত করিবে, ইহা, মহাজন মহানুভবদিগের জীবনী, কার্য্য ও চিন্তা, প্রমাণ করিয়া দিতেছে। যে দেশের লোক, অন্ততঃ গণ্যমান্যলোক, দেশের নেতা ও উপদেষ্টাগণ, এইপ্রকার ভাবে বিচলিত না হন; এবং তাঁহাদের জীবন ও আশা, এই সন্দেহপূর্ণ প্রশ্নের সদুত্তরে নিয়মিত ও পরিচালিত না হয়, সে দেশের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় বলিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার "গীতায়," নারদ তাঁহার "নারদসূত্রে" বা "ভক্তিজিজ্ঞাসায়", নাইট রোমানিস্ ম্যাকক্ তাঁহাদিগের

চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধে. বেন্থাম মিল হার্বটস্পেন্সার তাঁহাদিগের পুস্তকে, স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবু তাঁহার অমূল্য "ধর্ম্মতত্ত্বে," উপরি উক্ত সংশয়জড়িত প্রশ্নের উত্তরের প্রত্যাশায় ও নিরাকরণে ভূয়সী চিন্তা বিদ্যাবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়াছেন! বঙ্কিমবাবু লিখিয়া গিয়াছেন যে 'অতি তরুণ অবস্থা হইতে আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত "এ জীবন লইয়া কি করিব," 'লইয়া কি করিতে হয়?' সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোকপ্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি এবং কার্য্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্যবিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপণ করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি।" বঙ্কিমবাবু জীবনের উদ্দেশ্য আশা, ভরসা, কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কি নিরূপণ করিয়াছেন তাহা এখানে বিবৃত করিবার আপাততঃ প্রয়োজন নাই। তবে উপরি উক্ত প্রশ্ন, কাহারও বা অনেক সময়, কাহারও বা মাঝে মাঝে সংসারের চিন্তাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে, তাহার প্রমাণ খুঁজিলে অনেক মিলিতে পারে।

মানুষ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। নিতান্ত অলস হইলেও তাহাকে ভূত তাড়িত হইয়া কর্ম্ম বা চিন্তা করিতে হয়। মানুষ, একটা না একটা কাজ, একটা না একটা চিন্তা লইয়া ব্যস্ত। এই কাজ বা চিন্তার উদ্দেশ্য কি? নিজের বা অন্যের সুখ। কেন বাঁচিয়া আছি? অবশ্য সংসারের সুখভোগ সম্ভোগসুখের জন্য। খাটিয়া খাটিয়া প্রাণপাত করিয়া, কত অপমান লাঞ্ছনা হীনতা সহ্য করিয়া, কত জুয়াচুরীর ভিতর দিয়া, কত লোককে ঠকাইয়া, কত লোককে ঠেলিয়া ফেলিয়া, কত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া, অর্থোপার্জ্জন করিতেছি; কিসের জন্য? অবশ্য "সুখের" জন্য। প্রতিবেশী গৃহস্থের দুবেলা অন্ন জুটিল কি না, পীড়িত ঔষধ পথ্য পাইল কি না, দেখিবার, ভাবিবার, বা সন্ধান লইবার অবসর নাই; কেন?—পাছে নিরন্ন প্রতিবেশী, আর্ত্ত পীড়িত, আমার "সুখের" পথের কণ্টক হয়।—আর তুমি যদি খুব-পসারে উকীল হও,—তাহা হইলে মক্কেলের পর মক্কেল, মকদ্দমার পর মকদ্দমা; আরজী দাবী ও আপীল

লিখিতে লিখিতে রাত্রি ১টা ২টা বাজিয়া যাইতেছে! তোড়ার উপর তোড়া, লোহার সিন্দুক আল্‌মারি ভরিয়া যাইতেছে। স্ত্রীর ও মেয়েদের হীরার হার, মণি মুক্তার মালা, ছেলেদের মণি খচিত গার্ডচেন, ঘোঁড়া ও বাইক্‌, নিজের চক্‌-চকে ল্যাণ্ডো ও টগ্‌বগে জুড়ী। এত পরিশ্রম, এত অর্থোপার্জ্জন, এত বিলাসের আয়োজন কিসের জন্য? অবশ্য সুখের জন্য। আর তুমি যদি শিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত জমীদার হও, তাঁহা হইলে বিলাসের জন্য কত রকমই না আয়োজন করিয়াছ; সুন্দর সুবিশাল বাগান বাড়ী; কত নগ্ন প্রস্তর মূর্ত্তিতে সাজান; কত ফুলের গাছ ও কেয়ারী; কত কোমল শ্যাম ভেলবেট সদৃশ শষ্পাচ্ছাদিত ভূমি খণ্ড; বাগানের মাঝে মাঝে কত মঞ্জু কুঞ্জ; বাগান বাড়ীর আশ পাশে মরুৎ হিল্লোল তরঙ্গায়িত কত সুঠাম সুপারি গাছ; বাগানের মধ্যভাগে বিচিত্র তরণী সজ্জিত সুদীর্ঘ পুষ্করিণী; তার পর মাঝে মাঝে বিলাসী বন্ধুগণ লইয়া আমোদ প্রমোদের 'গার্ডন পার্টি'। এত খরচ এত ব্যয় এত সজ্জা, এত বিচিত্র বসনভূষণ কিসের জন্য? নিঃসন্দেহ, সুখের জন্য। কিন্তু আমি উপরি উক্ত ব্যক্তিগণকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা প্রভূত অর্থ লইয়া গাড়ী ঘোড়া বাইক চড়িয়া, স্ত্রী পরিবারকে মণিমুক্তায় সাজাইয়া, বিলাসিতায়, ইন্দ্রিয় সেবায়, নিজের নশ্বর জীবনটাকে সুখী করিতে পারিয়াছেন কি না।—যখন ব্যবহারে নূতনত্ব চলিয়া যায়, তখন মনে হয় কিনা যে, এ জীবনটা কি? এত সুখের আয়োজন করিলাম, কিন্তু সুখ কত দিনের, কয় ঘণ্টার জন্য দাঁড়াইয়া রহিল—সম্ভোগ সুখ, ইন্দ্রিয় সম্ভোগ স্থায়ী হইল কৈ; শরীর দুর্ব্বল শিথিল, মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান, লালসাবহ্নি নিস্তেজ, বিলাসের পরিণাম যে "অবসাদ তাহাই পাইলাম"। তবে পাঠক বলিতে পারেন যে যদি অর্থে, ইন্দ্রিয় সেবায়, বিলাসের বিবিধ উপকরণে সুখ না পাইল, তবে বিলাসী বিলাস হইতে, ধনী ধনোপার্জ্জন হইতে বিরত হয় না কেন? ভাই একবার নিজের জীবন ও কার্য্যের বিষয় পর্য্যালোচনা কর। যেটি করা উচিত ও করিলে বাস্তবিক সুখী হই, তাহা করিতে কত সময় অক্ষম হই এবং তাহার ফলে, পরিণামে কত অসুখী হই। জানি, নিয়মিত পরিমিত ব্যায়াম করিলে, শরীর সুস্থ থাকে, এবং শরীরটা সংসারের সর্ব্বপ্রকার উপভোগের উপযোগী হয়, তথাপি ব্যায়ামে বিরত থাকি। ভাবি, কাহারও মনে অযথা আঘাত দিব না; জানি তাহাতে নিজের ও অপরের অসুখ; তথাপি কত সময় অন্যের মনে

অযথা ক্লেশ দিই। ঔদরিক জানে যে বেশী খাইলে অসুখ করে; তবু কেবল মাত্র ক্ষণিক রসনাতৃপ্তি সুখের জন্য বেশী খাইয়া নিজেকে অসুখী ও স্বল্পায়ু করে। মাতাল জানে যে মদ খাইলে গত রাত্রির উত্তেজনার অনুরূপ পর দিনের নিস্তেজ অবসন্নতা আসিবে; সে জানে যে মদ খাইলে সে পশুরও অধম হইয়া যায়; তবু মদিরায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত রাখিয়া, নিজেকে চির দিনের জন্য অসুখী করে। সুতরাং অনেক সময় আমরা যাহা করি, তাহা সুখের উদ্দেশ্যে করিলেও, আমরা সুখ আনয়ন না করিয়া কেবল দুঃখেরই আয়োজন করি এবং পরিণামে যখন বুঝিতে পারি যে আমাদের কাজ কর্ম্ম, আশা উদ্দেশ্য আকাঙ্ক্ষা ভরসা, সুখের পথে না যাইয়া দুঃখের পথেই সোজা এক টানা চলিয়াছে, তখন অভ্যাসের ফলে, অদমিত অত্যধিক অনুশীলিত কুপ্রবৃত্তির তাড়নে, আর ফিরিয়া সুখের পথে আসিতে পারি না।—তাই জীবন ত ফুরাইয়া আসিল, কাহার কবে ডাক্ পড়িবে, তাহারও স্থিরতা নাই। তাই বলিতেছি, জীবনের উদ্দেশ্যটা কি একবার নিরূপণ করিবার চেষ্টা করা মন্দ নহে।

৩

জীবনের উদ্দেশ্য কি? অবশ্য প্রথম বেঁচে থাকা।—জীবন ধারণের জন্য গ্রাস আচ্ছাদনের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু এটী মনুষ্যের পক্ষে যথেষ্ট নহে; চরম সুখও নহে। জীবন রক্ষার জন্য পশুরাও চেষ্টা করিয়া থাকে। যদি কেবল খাইলে পরিলে, মানুষের সুখ হইত তাহা হইলে আমরা অন্য বিষয়ের জন্য এত লালায়িত হইতাম না।—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে জীবনের উদ্দেশ্য, সুখ; এখন কথা হইতেছে, জীবনের এই উদ্দিষ্ট সুখভোগ হয় কি প্রকারে?—যদি অর্থ সঞ্চয়ে, ইন্দ্রিয় সেবায়, বিলাসিতায় স্থায়ী সুখ হইল না, তবে কোন্ পথ অবলম্বন করিলে স্থায়ী প্রকৃত সুখলাভ করা যায়? আমরা বলি ভাই, লোককে প্রাণের সহিত ভাল বাসিলে—যদি দেখা যায়, আমাদের প্রবৃত্তির মধ্যে কোন্‌টী সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ও সুখদায়ী এবং কোন্‌টী সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়ভাবে আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে সেটী ভাল-বাসিবার প্রবৃত্তি—মনুষ্যে প্রীতি। মানব ইতিহাসের অতি শৈশবাবস্থা হইতে এই প্রীতি, এই ভালবাসিবার আগ্রহ, এই স্নেহ প্রবণতা—পরিলক্ষিত হয়। চিরকালই পিতা মাতা সন্তানকে ভালবাসেন, পতি পত্নীকে ভালবাসেন, ভ্রাতা

ভ্রাতাকে, ভাই ভগিনীকে ভালবাসেন, এবং উত্তরোত্তর এই ভালবাসার সম্প্রসারণ হইয়া আসিতেছে। শুধু যে তাঁহারা ভাল বাসে তাহা নহে; ভালবাসিয়া বিশেষ সুখভোগ করিয়া থাকেন।—আর যদি নিজের জীবন কেহ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন, জীবনের সুখ বা সুখস্মৃতির কথা ভাবিয়া দেখেন তাহা হইলে দেখিবেন কি? কৈশোরের নিঃস্বার্থ বন্ধুত্বে, যৌবনের আগ্রহপূর্ণ উচ্ছ্বসিত নিষ্কাম প্রীতি-প্রণয়ে যে সুখ পাইয়াছেন তাহার তুলনায় ইন্দ্রিয়ের ক্ষণিক উত্তেজনা ও আনন্দ, ধনী ও বিলাসীর সমগ্র উপকরণের উপভোগ, নিতান্ত হেয় ও অকিঞ্চিৎকর। হস্তকে সবল ও সক্ষম করা কার্য্য দ্বারাই হইয়া থাকে; হাত বাঁধিয়া রাখিয়া আড়ষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে হস্ত দেওয়া হয় নাই। সুতরাং যে প্রবৃত্তির স্ফূর্ত্তিতে চরম ও স্থায়ী সুখ, সেই প্রীতিপ্রবৃত্তির অনুশীলনই বিধেয়।—তাই বলিতেছিলাম, সংসারে সুখ যদি কিছু থাকে তাহা হইলে অন্যকে ভালবাসিয়া—সুতরাং 'সুখ' যদি জীবনের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে যে স্বার্থপর, যে কেবল নিজের সুখের জন্য নিজেকেই ভালবাসে, তাহার অদৃষ্টে সুখভোগ নাই। সে কেবল নিজের সুখ খুঁজিতে গিয়া, লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইতেছে, উদ্দিষ্ট সুখ হইতে বহুদূরে পড়িতেছে। তাই বলি, যদি আমাদের প্রবৃত্তি গুলি দেখিয়া বিচার করিতে হয় যে স্রষ্টা আমাদের কি "অভিপ্রায়ে" এই জগতে পাঠাইয়াছেন; তাহা হইলেও ইহাই স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, যে প্রবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী এবং সুখদায়ী ও দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল, তাহারই স্ফূর্ত্তি পরিণতি ও চরমোৎকর্ষ সম্পাদন, মানব জীবনের প্রধান লক্ষ্য, প্রধান আশা ও ভরসা। আর যদি দেখা যায়, মানুষে পশুতে ভিন্নতা কোন জায়গায়, তাহা হইলেও দেখা যাইবে, যে মানুষে এই প্রীতিপ্রবৃত্তি ও চিন্তাবৃত্তির বিদ্যমানতায়। পশু জীবনে এই দুই বৃত্তি বিশেষরূপ দৃষ্ট হয় না। আবার যদি আর এক দিক দিয়া দেখা যায়, অর্থাৎ সামাজিক ও প্রাকৃতিক উপযোগিতা হিসাবে, প্রীতিপ্রবৃত্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মানুষ একা থাকিলে পাগল হইয়া যায়; সুতরাং সে একা থাকিতে পারে না ও থাকেও না। মানুষ সামাজিক জীব। দশজন লইয়া সমাজ। সমাজে থাকিতে হইলে, সমাজের রক্ষা হেতু, আমাকে সমাজের অন্য লোকের কথা ভাবিতে হইবে। আমার যেটী লাভ করিতে হইলে আর নয় জনের অসুবিধা, ক্লেশ বা ক্ষতি, সমাজের রক্ষা হেতু, তাহা আমার করা অনুচিত। যদি সমাজের

সকলেই কেবল নিজের বিষয় ভাবে, নিজের সুবিধাটি খোজে, নিজের সুখের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে, অন্যকে গণনার মধ্যে না আনে, তাহা হইলে একটা ঘোর কলহ, বিতণ্ডা, হুড়াহুড়ি উপস্থিত হয় এবং সমাজটা কতকগুলা কুকুরের কাড়াকাড়িতে পরিণত হয়। কেহই সুখী হইতে পারে না। সুতরাং সমাজ রক্ষণের প্রধান উপায়, ভালবাসা প্রীতি। এবং প্রীতিই ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের প্রধান সুখ ও ভরসা। জীবনের প্রধান সুখ, প্রীতিতে, তাহার পর মহতী সুচিন্তায়। প্রীতিপ্রসূতসুখ স্থায়ী এবং সুখদায়ী ও মঙ্গলময়। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সুখ ক্ষণিক, অত্যধিক অনুশীলিত হইলে পরিণামে ক্লেশকর ও পীড়াদায়ক। আবার যদি চিন্তা প্রসূত সুখের কথা ভাবা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে সুচিন্তায় যে সুখ তাহার নিকট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখ নিতান্ত মলিন, হেয় ও অকিঞ্চিৎকর। একটী মহতী সুচিন্তায়, একখানি মহৎ সুকাব্য পাঠে যে সুখ পাওয়া যায় তাহা সর্ব্বলোক-সুন্দরী-মণ্ডলী মধ্যবর্ত্তী হইয়াও পাওয়া যায় না। তাই একজন বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক মনস্বী বলিয়াছেন যে 'The pleasures which are called intellectual *are much more productive of happiness* than those which are called *sensuous.* But if this is so, it clearly follows that the attainment of intellectual culture must be regarded as a higher object of life than the attainment of sensuous gratification, in however refined a form."

তাই বলিতেছি, আমরা জীবনকে ও সংসারকে যে ভাবেই দেখিনা কেন, বেন্থাম ও মিলের "হিতবাদ,' হার্বাট ও দারবিণ স্পেনসারের বিবর্ত্তন বা উপযোগিতাবাদ, রোমানিসের বৈজ্ঞানিক দর্শন মীমাংসা, এবং কার্লাইল রস্কিনের তীব্র জ্বালাময়ী পরদুঃখকাতরতা, অপূর্ব্ব হিন্দুধর্ম্মের বেদান্ত-গীতা-পুরাণের সুদৃঢ় ভিত্তি আরও সুদৃঢ়তর করিয়া দেয়; এবং গম্ভীর নিনাদে ঘোষণা করে যে প্রীতি ও সুচিন্তায়, মানবজীবনের চরম-সুখ,—এবং আমাদের নিজের সুখ, অন্যের সুখ অন্বেষণে, এবং অন্যের হিত সম্পাদনে। এই প্রীতিবৃত্তির পরিণতিতে, মানবহৃদয়ে, ভাল মন্দ-বিচার (Conscience) বা বিবেক, এবং চিন্তার স্ফূর্ত্তিতে, জগতের অসীমকার্য্যকৌশলে, অন্তর্নিহিত অসীম শক্তিতে, জগতে

পরিব্যাপ্ত অসীম-সৌন্দর্য্যে, আমাদের মনে, অসীম ভক্তি ও বিস্ময় (wonder or admiration) আনিয়া দেয়। তাই একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত অনেক দেখিয়া শুনিয়া, অনেক বুঝিয়া বোঝাইয়া বলিয়াছেন যে, "The Emotional *Happiness* of Love and the 'Intellectual *Happiness* of Thought are the *two Great objects of Life*."

হিন্দুধর্ম্মে—, উপনিষদে নারদসূত্রে গীতায় ভাগবতে বিষ্ণুপুরাণে ভক্তি প্রেম দান সম্বন্ধে যে সকল সুন্দর সুন্দর কথা বিবৃত আছে, তাহা পাঠ করিলে উপরি উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। "আনন্দই" হিন্দুধর্ম্মের মূল। হিন্দুরা ঈশ্বরকে "সচ্চিদানন্দ" বলিয়াছেন। যিনি প্রকৃত হিন্দু তিনি এই জগৎ বিশ্বকে "আনন্দ" পূর্ণ দেখেন, তিনি বিশ্বব্যাপী চৈতন্যকে "আনন্দে" মণ্ডিত দেখেন। তৈত্তিরীয়োপনিষদে বলা হইয়াছে যে এ জীবন দুঃখের নহে, আনন্দ উপভোগের জন্য। ভগবান এ সংসারে আমাদিগকে দুঃখভোগের জন্য পাঠান নাই; সুখ, আনন্দ, ভোগের জন্য পাঠাইয়াছেন। জীবন আনন্দ ভোগ করিবে এবং জীবন আনন্দে পরিসমাপ্ত হইবে। উপনিষদে আছে "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।"—"জানিতে পারিলেন যে, আনন্দ ব্রহ্ম। যে হেতু আনন্দ হইতেই এই প্রাণিসমূহ জন্মে, জন্মিয়া আনন্দে জীবন ধারণ করে, এবং আনন্দে প্রতিগমন ও প্রবেশ করে।" ইহা হইতে জীবনের মহত্তর, উচ্চতর আদর্শ আর কি হইতে পারে। আর যখন মনে হয়, এই আনন্দ অনুভব করিবার জন্য প্রীতিপ্রবৃত্তি মানবহৃদয়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ও সুখদায়ী,—এবং সামাজিকতার উপযোগী—করিয়া দেওয়া হইয়াছে, নিতান্ত দীনদুঃখীর মনেও আশার সঞ্চার হয়।—"নারদসূত্রে" এই প্রেম ও ভক্তিকে "অমৃতরূপ" বলা হইয়াছে; অর্থাৎ ভালবাসায়, প্রেমভক্তিতে যত সুখ এত 'সুখ' আর কিছুতে নাই। এই ভালবাসা ও প্রীতি বিভিন্ন অবস্থায় কি প্রকার আকার ধারণ করে তাহা মহাত্মা Prof. Sturdy তাঁহার "নারদসূত্র ব্যাখ্যায়" এই প্রকারে দেখাইয়াছেন :—Attachment through glory. Attachment through beauty. Attachment through worship. Attachment as a servant. Attachment as beloved. Attach-

ment as a child. Attachment as *Self-sacrifice.* Attachment by identification. Attachment by misery in separation (as in the case of lovers). এই প্রীতির সাধন সম্বন্ধে নারদসূত্রে রামানুজে, বিষ্ণুপুরাণে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর উপদেশ আছে। গীতায় এই ভালবাসা প্রীতিভক্তি সম্বন্ধে মহান্ উপদেশ আছে। কর্ম্ম ও জ্ঞান আবশ্যক; কিন্তু অসম্পূর্ণ; উহা ভক্তি ভালবাসা প্রীতির সহিত সংযুক্ত না হইলে অনেক সময় ক্লেশজনক ও পীড়াদায়ক হইয়া উঠে; সকাম কর্ম্মে সাংসারিকতা স্বার্থপরতা বৃদ্ধি করে; জ্ঞান, শুষ্ক ও কঠোর। ভক্তি দয়া, ভালবাসা প্রেম, মনোরম ও চিরসুখদায়ী।

"তবে পাঠক বলিতে পারেন যে, যদি "ভালবাসায়" "প্রীতিতে" এত "সুখ" তবে আমরা অপরকে তেমন ভালবাসিতে পারি না কেন? প্রথম কারণ আমরা মুখে যাহাই বলি না কেন, অনেকেই বিশ্বাস করি না যে, অর্থসঞ্চয় বিলাস ইন্দ্রিয়সেবা অপেক্ষা ভালবাসায় প্রীতিতে বেশী সুখ। এ বিষয়ের প্রতিনিয়ত চর্চ্চা আন্দোলন, অনুশীলন, অভ্যাস করিলে, এই "প্রীতিকে" জীবনের ধ্রুবতারা, জীবনের মুখ্য-লক্ষ্য করিলে, আমরা ক্রমে সকলকে ভালবাসিতে পারি এবং ভালবাসিয়া সুখী হইতে পারি। আমরা সুখের জন্য কত ব্যাকুল; সুখী হইবার জন্য কত প্রয়াস; সুখের জন্য কত আয়াস ও পরিশ্রম স্বীকার। কিন্তু যে পথটা অবলম্বন করিলে সুখী হইতে পারি, আমরা সে পথে যাই না। আমাদের দেশের যাঁহারা এখন নেতা বা উপদেষ্টার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন তাঁহাদের গন্তব্য পথের জ্ঞান বা দৃষ্টি নাই, কেবল হো হো গোলমাল করিয়া দিন কাটাইতেছেন। তাই রস্কিনের একজন সুযোগ্য সমালোচক বলিয়াছেন যে "We do but skin and film the ulcerous place in our social life. *But where theory leads, practice will follow,* if with a lame foot. And the silent leavening of English life, in all classes by those who have assimilated a large measure of Ruskin's ethical teaching is a good beyond calculation."—যদি প্রতি গৃহে, সন্তানদিগকে বাক্যে দৃষ্টান্তে, শিক্ষা দেওয়া হইত যে "প্রীতি," পরোপকার পরহিত, সুখের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়; যদি বিদ্যালয়ে বিদ্যামন্দিরে, উপদেশ ও

কার্য্যে এই "প্রীতির" অনুশীলন হইত, তাহা হইলে, আমাদের দেশের এমন দুর্গতি ও দুর্দ্দশা হইত না, এবং আমরা দ্বেষ, হিংসা পরশ্রীকাতরতায় এবং পরের অশুভচিন্তা করিয়া নিজেকে ও অপরকে অসুখী করিতাম না। যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মই দেখ না কেন, "প্রীতিই" উহার মূল ও দৃঢ় ভিত্তি। ভক্তি প্রীতি দয়া, হিন্দু ধর্ম্মে এক সূত্রে গ্রথিত। প্রীতি ভগবানে গুরুজনে অর্পিত হইলে ভক্তি; সমানে অর্পিত হইলে প্রীতি; এবং আর্ত্তে পীড়িতে দুর্গতে অর্পিত হইলে দয়া। মনুষ্যে প্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নাই। যদি ঈশ্বরে ভক্ত হও, তাহা হইলে মনুষ্যে প্রীতিপূর্ণ হইবে। যদি এই হিন্দুভাব যে "আমি সর্ব্ব ভূতে এবং সর্ব্ব ভূত আমাতে" আমাদের মনে ও চিন্তায় অনুপ্রবিষ্ট হয়, যদি আমরা "আপনাকে সর্ব্বভূতে সর্ব্বভূতকে আপনাতে" দেখিতে পাই, তাহা হইলে, দ্বেষ, হিংসা অশুভ-চিন্তা কোথায় চলিয়া যায়।—যে হিন্দু ধর্ম্মে এবম্প্রকার ভাব আছে, এরূপ উচ্চ আদর্শ আছে, যে দেশে বিষ্ণুপুরাণ এখনও ধর্ম্মগ্রন্থ, যে দেশে প্রহ্লাদ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আজ সেই দেশে এত বিবাদ এত বিসম্বাদ এত কলহ এত মানহানির নালিস এত কুৎসা রটনা, এত রেষারেষি; কেহ কাহারও ভাল দেখিতে পারে না; কেহ কাহারও ভাল ভাবিতে পারে না। ভাই একবার প্রহ্লা-দের উক্তিগুলি স্মরণ কর। সর্পদংশনে, শিলাচাপে, জ্বালাময় শূলাঘাতে, অগ্নিদাহনে, তাঁহার অটল নির্ভরতা, অসীম দয়া ভক্তি ও প্রীতি টলিল না; প্রহ্লাদ বলিতে-ছেন যে যখন "অন্যের মঙ্গল হইতেছে, আপনি হীনশক্তি দেখিয়াও আহ্লাদ করিও, দ্বেষ করিও না, কেননা দ্বেষে অনিষ্টই হইয়া থাকে। যাহাদের সঙ্গে শত্রুতা বদ্ধ হইয়াছে, তাহাদেরও যে দ্বেষ করে, সে অতি মোহেতে ব্যাপ্ত হইয়াছে, বলিয়া জ্ঞানীরা দুঃখ করেন।" * * * "অচ্যুত হরি যাহাদের হৃদয়ে অবস্থান করেন তাহাদের এইরূপ প্রভাব হইয়া থাকে। যে অন্যের অনিষ্ট চিন্তা করে না,—কারণাভাব বশতঃ তাহারও অনিষ্ট হয় না। যে কর্ম্মের দ্বারা, মনে বাক্যে পরপীড়ন করে, তাহার সেই বীজে প্রভূত অশুভ ফলিয়া থাকে। কেশব আমাতেও আছেন, সর্ব্বভূতেও আছেন, ইহা জানিয়া আমি কাহারও মন্দ ইচ্ছা করি না, কাহারও মন্দ করি না, কাহাকেও মন্দ বলি না। আমি সকলের শুভ

চিন্তা করি, আমার শারীরিক বা মানসিক, দৈব বা ভৌতিক অশুভ কেন ঘটিবে? হরি সর্ব্বময় জানিয়া সর্ব্বভূতে এইরূপ অব্যভিচারিণী ভক্তি করা পণ্ডিতের কর্ত্তব্য"। কোথায় প্রহ্লাদের আদর্শ শিক্ষা, আর কোথায় আমাদের শিক্ষা। যতদিন আমাদের দেশে, আবার এই প্রীতি ভক্তি দয়ার অনুশীলন প্রতিষ্ঠিত না হইবে, অর্থাৎ যতদিন লোকের মন ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট না হইবে, তত দিন আমাদের আর আশা নাই। ভগবানের রাজ্যে আশা নাই বলিতে বুক ফাটিয়া যায়। যে দুর্গত বঙ্গদেশে চৈতন্য, বিদ্যাসাগর, ভক্ত রাম প্রসাদ, পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব, রামতনু লাহিড়ী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, ভূদেব, বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে দেশের আশা ভরসা নাই, কেমন করিয়া বলিব। আশা আছে যে এই প্রীতির রাজ্য এই অভিশপ্ত ভারতভূমে আবার প্রতিষ্ঠিত হইবে। আশা আছে যে, যে হিন্দুর মজ্জায় মজ্জায়, ধমনীতে ধমনীতে, পূর্ব্ব পিতৃপুরুষের মহচ্চিন্তা, স্বার্থত্যাগ, মহান্ উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত তাহা আবার উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশিত হইবে। হিন্দু আবার বুঝিবে এবং জগৎকে স্পষ্টতররূপে বুঝাইবে যে প্রীতি, ভক্তি দান ভিন্ন জীবনে মরণে আর অন্য সুখ নাই। আবার অনুভব করিবে যে যদি কিছু করিতে হয় তাহার মূলে যেন ধর্ম্ম থাকে। তখন আমাদের স্বভাবে, কার্য্যে বাক্যে অসীম প্রীতি, কোমল বিনয়, শুভ্রশুদ্ধি, অচল সত্যনিষ্ঠা, সুদৃঢ় নির্ভীকতা, অচল নির্ভরতা আসিবে। তখন সম্পাদকগণ প্রহ্লাদের উক্তি স্মরণ করিয়া, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া, তাঁহার নিকট অনুকম্পা শক্তি সামর্থ্য ভিক্ষা করিয়া লিখিতে প্রবৃত্ত হইবেন। তখন জাতীয় সাহিত্য, প্রীতি ও ভক্তির কুসুমে পরিস্ফুট হইবে। তখন কবি, তাঁহার কার্য্যে ও কাব্যে, প্রীতি ও পরহিতের অসীম মহিমা, অসীম সুখ, অসীম আশা ও ভরসা তাঁহার সুগম্ভীর ও সুললিত ভাষায় কীর্ত্তন ও ঘোষণা করিবেন। তখন চরিত্রবান্ শুদ্ধচিত্ত ভগবদ্ভক্ত পরদুঃখকাতর রাজনৈতিক নেতা ও বক্তাগণের এবং কংগ্রেস সভামণ্ডলীর মধ্য হইতে একটী সম্মিলিত গভীর নিস্বার্থকারুণ্যপূর্ণ অভ্রভেদী বজ্রনির্ঘোষ প্রার্থনা উত্থিত হইয়া, অসীমশক্তি ভগবানের পাদ সমীপে উছলিয়া পড়িবে। যখন হিন্দু বুঝিবে যে, কৃষ্ণোক্ত সৎকর্ম্ম তাহাই যাহাতে জগতের হিত হয়, ঈশ্বর ভক্তি তাহাই যাহাতে মনুষ্যে প্রীতি জন্মায় তখন হিন্দু,

আর নগণ্য থাকিবে না, তখন হিন্দুর প্রীতিমহিমার রাজ্য দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িবে। তাই বড় আশা করিয়া বঙ্কিম বাবু তাঁহার পরিণত বয়সে, পরিণত বুদ্ধিতে ধর্ম্মজীবনের সফলতা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, বলিয়া গিয়াছেন যে, "তুমি দেখিবে বিশুদ্ধ ভক্তির হিন্দু, নব জীবন প্রাপ্ত হইয়া, ক্রম্‌ওয়েলের সমকালিন ইংরাজের মত বা মহম্মদের সমকালিক আরবের মত অতিশয় প্রতাপান্বিত হইবে"।

প্রণত প্রবাসী ভ্রাতা শ্রীহরেন্দ্রলাল রায়।

চুক্তির ইতিহাস।

আমি তোমাকে একশত টাকা দিলাম, তুমি সেই টাকা গ্রহণ করিয়া অঙ্গীকার করিলে যে, আগামী মাঘ মাসে আমার দোকানে ২৫ মণ চাউল দিয়া যাইবে; এটা একটা চুক্তি। দেশের যেমন ইতিহাস আছে, এই চুক্তি জিনিসটারও তেমনি ইতিহাস আছে। প্রথমে লোকে কি প্রকারে পরস্পরের সহিত ব্যবহার করিত, কি অবস্থায় সমাজে চুক্তির সৃষ্টি হইল, অনুসন্ধান করিলে তাহার ইতিহাস পাওয়া যাইতে পারে।

মানুষের মন সকল দেশেই একই রকম; যদি একই প্রকার ঘটনার মধ্যে পড়ে, তবে প্রায় সর্ব্বত্রই মানুষ একই কার্য্য করে। এই কারণে সকল দেশেরই ধর্ম্ম এবং সমাজ বিষয়ক অনুষ্ঠানগুলির প্রায় একই রকমের উৎপত্তির ইতিহাস পাওয়া যায়। একথা সত্য হইলেও অনেক স্থলে বিভিন্ন প্রকার কারণেও একই প্রকারের ব্যবহার বা অনুষ্ঠান ফলিতে দেখা যায়। ঠিক যে অবস্থায় এবং যে ঘটনাগুলির মিশ্রণে রোমীয় সমাজে চুক্তির সৃষ্টি হইয়াছিল, ভারতবর্ষে ঠিক তাহাই হইয়াছিল বলিয়া আমার মনে হয় না। মেন্ সাহেবের প্রাচীন ব্যবহার শাস্ত্রের ইতিহাসে চুক্তির যে ইতিহাস প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে সম্পূর্ণ প্রযুক্ত হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না।

পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস না থাকিলে এক সঙ্গে সমাজে বাস করা অসম্ভব। লোক সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায়, এবং দিন দিন সমাজের প্রসার যত বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই পরস্পরের প্রতি সত্যপরায়ণতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, নিয়মের কঠোরতা এবং বাঁধাবাঁধির প্রয়োজন হয়। সত্যপরায়ণতা সমাজের ভিত্তি।

প্রাচীন সমাজে সামাজিক জটিলতা এবং প্রসার অধিক ছিল না বলিয়া চুক্তির বাঁধাবাঁধি নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু একজন যাহা অঙ্গীকার করিলেন, তাহার পালনই যে তাঁহার পক্ষে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, একথা প্রাচীন সাহিত্যে ভূয়োভূয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই প্রকার কর্ত্তব্য রক্ষার প্রাচীন নাম সত্যপালন। এই সত্যপালনই এদেশের চুক্তির ইতিহাসের প্রথম মূল।

কিন্তু এই সত্যপালনে কেবল এক পক্ষই দায়ী; যাঁহার জন্য সত্য পালিত হয় তাঁহাকে কিছু করিবার থাকে না। এ কালের চুক্তি জিনিসটা এই যে, যদি তুমি আমার জন্য কিছু কর তবে আমি তোমার জন্য কিছু করিব। কিন্তু সত্যপালনে প্রতিজ্ঞার পারম্পর্য্য নাই। উপকার পাইয়া হউক বা না পাইয়া হউক, উপকারের প্রত্যাশায় হউক অথবা আমার খামখেয়ালীতে হউক, আমি যখন প্রতিজ্ঞা করিলাম যে তোমাকে কিছু দিব বা তোমার জন্য কিছু করিব, তখন আমাকে তাহা দিতে বা করিতেই হইবে, নচেৎ আমাকে সত্যভ্রষ্ট হইতে হয়। রাজা দশরথ কৈকয়ীর নিকট সত্যবদ্ধ হইয়াছিলেন যে তুমি যে বর চাও তাহাই দিব। তাহার পর রামাভিষেকের পূর্ব্বাহ্নে কৈকয়ীর কথায়, রাজা দশরথ রামকে বনে দিয়া সত্যরক্ষা করিলেন। যদি একালের হাইকোর্টে কৈকয়ী বাদিনী দশরথ প্রতিবাদী হইয়া মোকদ্দমা উঠিত, তাহা হইলে রাণীঠাকুরাণীর মোকদ্দমা মায় খর্চ্চা ডিসমিস হইয়া যাইত। প্রথম কথা উঠিত, যে কৈকয়ীর প্রার্থনার বিষয় রাজা দশরথের জানা ছিল কি না, দ্বিতীয় কথা যাহা চাহিবে তাহা দিব এটা সম্পূর্ণ অনির্দ্দিষ্ট কথা; কাজেই এ চুক্তি পালনের জন্য কেহ দায়ী নহে। দশরথ, কৃত উপকারের জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন বলিয়া, চুক্তির আরম্ভটুকু বজায় রাখা যাইতে পারিলেও পারিত। রাম, স্থাবর পদার্থের মত যে কোন ভাবে কর্ত্তার দ্বারা নিয়োজিত হইতে পারেন, একথা মানিয়া লইলেও এ চুক্তি রাজদ্বারে টিকিত না। হয়ত দশরথের উকীল ইহাও বলিতে পারিতেন যে রুগ্ন শয্যায়, দায়ে পড়িয়া যুবতী রমণীর কাছে যে অঙ্গীকার, তাহাতে একটুখানি অযথা আধিপত্যের চাপ আছে। যাহা বলাগেল তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই যে, একালে আইন সঙ্গত চুক্তি হইতে গেলে তাহাতে গোটাকত বিষয় থাকা চাই। স্বচ্ছন্দচিত্তে, অপ্রতারিত ভাবে, প্রতিশ্রুতির বিষয় সম্বন্ধে সন্দেহ, বা দ্বিধা ভাব না থাকিয়া, কোনও কৃত উপকারের জন্য,

অথবা কোন উপকারের প্রত্যাশায়, অথবা অন্য কোন উপযুক্ত পণ প্রাপ্ত হওয়া গেলে, যদি কোন বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোন কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞা করেন, এবং সেই কার্য্য কোনপ্রকার সামাজিক বা নৈতিক রীতি বা ব্যবহারের বিরোধী না হয়; তবেই, আইনসঙ্গত চুক্তি হইতে পারে। সত্য পালনের মধ্যে ইহার একটিও নাই। দায়ে পড়িয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ কর, ক্ষতি নাই, কিন্তু প্রতিজ্ঞাপালন করিতে হইবে; কি প্রকারে প্রতিজ্ঞাপালন করিতে হইবে, তাহা জান না, নাই বা জানিলে,—সত্যপালন করিতে হইবে। দৃষ্টান্ত দশরথের এবং দাতাকর্ণের প্রতিজ্ঞা।

সত্য পালন করিতে হইবে, যাহা মুখ হইতে বাহির হইয়াছে তাহাই করিতে হইবে, এই প্রকার আদর্শ হইতে একটা উল্টা রকমের জিনিষেরও সৃষ্টি হইয়াছিল। আমি কি অর্থে কোন কথা ব্যবহার করিলাম, কি ভাবিয়া কি বলিলাম, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, সেই কথাটার উপরেই যত দৃষ্টি। যাহা বলিয়াছ তাহা করিতে হইবে। ইহাতে ভাবশূন্য স্নুধু কথার একটা মর্য্যাদা বাড়িয়া গিয়াছিল। মনে ঈশ্বরের প্রতি কোন ভক্তি বা ভাব নাই, কেবল হয়ত মুখে দৈবাৎ একটা শব্দ উচ্চারণ করিতে গিয়া, ঈশ্বরের নাম উচ্চারিত হইয়া গেল; অমনি অশেষ পুণ্য লাভ হইল। পরিশ্রান্ত ব্যাধ রাত্রে বেল গাছে শুইয়াছিল, তাহার হস্ত সঞ্চালনে বেলের পাতা শিবের মাথায় পড়িয়াছিল বলিয়া শিব সেই ব্যাধকে মুক্তিদান করিলেন। কু হইতে অনেক সময় সুফল প্রসূত হয়। সত্যপালনের নামে যখন কথায় আদর বাড়িয়া উঠিল; তখন অনেকে বাক্‌চাতুরীর বলে কঠোর সত্যপালন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে লাগিলেন। প্রবাদ আছে যে কঙ্কণাধিপতি, কোন কবির শ্লোকে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন যে তুমি যাহা চাও তাহাই দিব। কবি সুযোগ পাইয়া বলিলেন, মহারাজ সত্যপালন করুন, আমাকে এই রাজ্য দান করিতে হইবে। প্রার্থনা শুনিয়া রাজার মাথা ঘুরিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে রাণীর বুদ্ধিসহায়তায় এক গাছি কঙ্কণ আনিয়া বলিলেন, তুমি কঙ্কণ চাহিয়াছিলে, এই কঙ্কণ লইয়া বিদায় হও। ভারতবর্ষেও হয়ত অনেক শাইলকের মাংস কাটিয়া লইবার প্রস্তাব, রক্তপাতের তর্কে উড়িয়া গিয়াছিল। এইপ্রকার বাক্‌চাতুরিতে লোকে অসন্তুষ্ট হইত না; কারণ তাহারা দেখিত যে, ইহা দ্বারা অনেক অন্যায় এবং কঠোর প্রতিজ্ঞা পাশ

হইতে উদ্ধার লাভ করা যাইতে পারিত। যাহা হউক "গো শব্দের নানা অর্থ" করিয়া অনেক সুন্দর, বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন।

যখন সত্যপালন জিনিসটি কথার ফাঁদে বাঁধা পড়িল, তখন লোকে অঙ্গীকারটা একটু বাঁধাবাঁধি করিয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বাঁধাবাঁধি করিবার প্রয়াস পাইলে উভয় পক্ষেই সতর্কতা উপস্থিত হয়; তখন আর প্রতিজ্ঞায় ততটা হটকারিতা প্রকাশ পায় না। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিলে সত্যরক্ষা করিতেই হইবে। কোন বিশেষ কারণে তাহা প্রতিপাল্য নয় বলিয়া, প্রদর্শন করিবার চেষ্টা, ইংরাজ অধিকারের পূর্ব্বপর্য্যন্তও বিশেষ প্রস্ফুট হয় নাই। কতকটা হইয়াছিল; তাহা পরে দেখাইব।

একালের চুক্তির মধ্যে একটা বিশেষ কথা এই যে, একটা পণ না থাকিলে চুক্তি সিদ্ধ হয় না। তুমি আমার জন্য কিছু করিয়াছ বা করিবে অথবা কিছু মূল্য দিবে, এমন একটা থাকা চাই। এ সমগ্র জিনিসটির নাম পণ। পণ না থাকিলে চুক্তি অসিদ্ধ এ কথা হিন্দুর আইনে ছিল না। তবে চুক্তিতে ধীরে ধীরে পণের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই পণ কি প্রকারে উপস্থিত হইল, ইহা হইতেও চুক্তির ইতিহাসের এক অংশ বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

পণ অর্থ প্রতিজ্ঞা, পণ অর্থ মূল্য। এই দুই অর্থেই চুক্তির পণ ব্যবহৃত। কিন্তু পণ শব্দের আর একটি আদিম অর্থ আছে। সেটা পণের এবং চুক্তির উৎপত্তির ইতিহাসে বিশেষ প্রয়োজনীয়। অমরকোষকার বলেন; "দুরোদরো দ্যূতকারে পণে দ্যূতে দুরোদরং।" এখানে দেখাযায় যে পণ কথাটি জুয়াখেলার মূল্য অর্থে ব্যবহৃত হইত। আমার বিবেচনায় প্রতিজ্ঞায় পণ বা মূল্য জুয়াখেলায় আরম্ভ। তুমি যদি হারিয়া যাও এত দিতে হইবে একথা জুয়া খেলায় আরম্ভ। জুয়া খেলায় ধর্ম্মার্থতা নাই; যে যাহার চাতুরী লইয়া ভাগ্য পরীক্ষা করে। কাজেই এস্থানে "মূল্য" অধর্ম্ম বলিয়া মনে উদয় হয় না। কিন্তু খাঁটি রকমের সত্য পালন ধর্ম্ম ভাবের সহিত গাঁথা। বিক্রয় বন্ধকাদিও চুক্তি; কিন্তু আমি সেই বিশেষ চুক্তির কথা উল্লেখ করিতেছি না। মৌলিক চুক্তির ভাবে প্রথমতঃ জুয়া খেলা হইতে পণ উপস্থিত হইয়াছে। জুয়াখেলা দূষণীয় বলিয়া আমাদের শাস্ত্রে অবশ্যই আছে কিন্তু wagering Contract সম্পূর্ণ অসিদ্ধ, একথা নাই। বিলাতেও বড় ছিল না; কোন কোন বিষয়ে এখনও নাই। একটা

প্রতিজ্ঞার মূলে যখন ইহা নির্দ্দিষ্ট হইল যে হারিয়া গেলে জেতাকে পণ দিতে হইবে; এবং জেতা যখন পণ লওয়া অধর্ম্ম মনে করিলেন না, তখন ধীরে ধীরে অন্য প্রতিজ্ঞায়ও পণ সহজে স্থান লাভ করিতে পারিয়াছিল। পণযুক্ত প্রতিজ্ঞা প্রথমতঃ সত্য পালনের গৌরব লাঘবকারী বলিয়া হেয় ছিল।

বিনা কারণে, বিনা উদ্দেশ্যে দান করিলে, অন্ততঃ অস্থায়ী সম্পত্তির বিষয়ে দাতার উত্তরাধিকারীগণ বাধ্য হইতেন না; এবং পরবর্ত্তী সময়ে এই প্রকার সম্পত্তি নষ্ট করার বিরুদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্যাদি শাস্ত্রকারগণ অনেক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এই সকল গুলি যখন এক সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল, তখনই প্রতিজ্ঞায় 'পণ' সম্পূর্ণ রূপে দেখা দিয়াছিল। কিন্তু কখনও পণের অভাব বা স্বল্পতা চুক্তির বাধ্য বাধকতা নষ্ট করে নাই। পণ হীন চুক্তি ইংরাজের আইনেই এদেশে অসিদ্ধ হইয়াছে।

এই ইতিহাসে সে চুক্তির উৎপত্তি বিষয়ে রোমীয় প্রথার অন্য প্রকার অবস্থাই দৃষ্টিগোচর হইল।

বিশেষ বিশেষ ভাবে চুক্তির ভিন্ন ভাব ধারণ এবং চুক্তিতে নানা প্রকার শাখা পল্লবের বিকাশের কথা পরে বলিব।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

সীতা।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—শ্রুতকীর্ত্তির পিত্রালয়। কাল—প্রভাত।

শত্রুঘ্ন ও শ্রুতকীর্ত্তি।

শত্রুঘ্ন। শ্রুতকীর্ত্তি! শ্রুতকীর্ত্তি!

[শ্রুতকীর্ত্তি প্রবেশ করিয়া]

শ্রুতকীর্ত্তি। চীৎকার করে কে সে
গাধার মত এ সময়ে আমার ঘরে এসে?

শত্রুঘ্ন। শ্রুতকীর্ত্তি! বলতে কি আজ বেড়িইছি ভোরে
তোমায় আমি পাড়ায় পাড়ায় গরুখোঁজা করে—
শ্রুতকীর্ত্তি। ব্যাখ্যা কর।
শত্রুঘ্ন। কথা আছে। কর্ব্বো নাকি ব্যক্ত?
শ্রুতকীর্ত্তি। সে কি কথা?
শত্রুঘ্ন। বুঝতে পার্ব্বে?
শ্রুতকীর্ত্তি। এমনি কি শক্ত?
শত্রুঘ্ন। ভারি বিলাপজনক কথা। কল্য যাচ্ছি দূরে
বহু দূরে যাচ্ছি প্রিয়ে—
শ্রুতকীর্ত্তি। কোথায়?
শত্রুঘ্ন। মধুপুরে!
শ্রুতকীর্ত্তি। হাওয়াতে নাকি?
শত্রুঘ্ন। না না, পিশাচ ম্লেচ্ছ যবন
পরাক্রান্ত মহাদৈত্য—নামটা হচ্ছে লবণ
তারি সঙ্গে রামের বিবাদ—তারি সঙ্গে যুদ্ধ
স্থাপন কর্ত্তে হবে রাজ্য—
শ্রুতকীর্ত্তি। যাব আমি শুদ্ধ।
শত্রুঘ্ন। তুমি ত সে যাবেই পরে। রাজা হব আমি,
তুমি প্রিয়ে রাণী হয়ে বস্‌বে আমার বামে।
শ্রুতকীর্ত্তি দেখ দেখি—আঃ সর্ব্বব মাটি!
শ্রুতকীর্ত্তি। কিসে?
শত্রুঘ্ন। অনেক বলবার ছিল প্রেমের কথা খাঁটি,
তোমার নামটি কিন্তু এমনি বিষম রকম লম্বা,
ডাক্‌তে গিয়ে বক্তব্যটা ভুলে গেলেন শর্ম্মা।—
শ্রুতকীর্ত্তি তোমার পিতা অনেক বুঝে সুঝে,
অনেক বিচার তর্ক করে', অনেক পুঁথি খুজে,
ও নাম রেখেছিলেন বুঝি?—আচ্ছা প্রিয়তমে
অদ্য যদি অনেক যত্নে, অনেক পরিশ্রমে,

ডেকেছি তোমাকে তোমার পিতৃদত্ত নামে,—
শ্রুতকীর্ত্তি—তবে এবার দাঁড়াও দেখি বামে,
দেখি তুমি রাণী হলে' মানায় কি না মানায়।

শ্রুতকীর্ত্তি। [পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়া]
দেখ দেখি—

শত্রুঘ্ন। মরি মরি—সেত ছিল জানাই;
বিনা শ্রুতকীর্ত্তি কেউ কি শত্রুঘ্নকে দেখে?

শ্রুতকীর্ত্তি। হাঁ হাঁ, যেন কি রকম তা' বাধো বাধো ঠেকে।

শত্রুঘ্ন। শীঘ্র যাত্রা কর। রাজ্য কিম্বিধ না জানি
শত্রুঘ্ন যার হবে রাজা শ্রুতকীর্ত্তি রাণী!
—বলছিলাম কি—লবণ দৈত্য পরাক্রান্ত বড়
যুদ্ধে যদি মারাই পড়ি।

শ্রুতকীর্ত্তি। মারাই যদি পড়,
যথারীতি শ্রাদ্ধ কর্ব্বে,—বিনিশ্চিন্ত থাক—
ত্রুটি হবে নাক—কোন ত্রুটি হবে নাক।
বাজ্না, কাঙ্গাল বিদায়, ফলার—নানা খাদ্য বস্তর
আয়োজন আর নিমন্ত্রণ—আর—অর্থাৎ যা যা দস্তুর
কিছুর ত্রুটি হবে নাক—পরে "হুলু" ধ্বনি—

শত্রুঘ্ন। 'হুলু' কেন?

শ্রুতকীর্ত্তি। সেটা "পরে"। তুমি যাদুমণি
যদিই নিষ্ঠুরভাবে মর—তোমার নেইক ভাবনা
শত্রুঘ্নের শত্রুতাসাধন কর্ত্তে আমি যাব না,
খর্চ্চার জন্য নালিশ কর্ত্তে।

শত্রুঘ্ন। বটে! বল কি হে,

শ্রুতকীর্ত্তি। আমি একটা যেমনি হ'ক না দেখে নেব গিয়ে।

শত্রুঘ্ন। বাঃ কি স্বচ্ছ জলের মত প্রিয়ে তোমার যুক্তি

শ্রুতকীর্ত্তি। চল তবে।

শত্রুঘ্ন। এমনি বটে নারীজাতির স্বভাব
আহা যাহার এমন পত্নী তাহার কিসের অভাব।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—উর্ম্মিলার কক্ষ। কাল—রাত্রি।

লক্ষ্মণ ও উর্ম্মিলা।

উর্ম্মিলা। কে কহিল?
লক্ষ্মণ। আপনি রাঘব।
উর্ম্মিলা। এ প্রলাপবাণী—অসম্ভব—
লক্ষ্মণ। উর্ম্মিলা এ অতি সত্য বাণী।
উর্ম্মিলা। সত্য?
লক্ষ্মণ। সত্য?
উর্ম্মিলা। কেন?
লক্ষ্মণ। নাহি জানি
কেন? জানি এই মাত্র স্থির
প্রজাগণ চাহে জানকীর
নির্ব্বাসন দণ্ড।
উর্ম্মিলা। [দীর্ঘ নিশ্বাস সহ]
অভাগিনী!
সীতা মোর! প্রাণের ভগিনি!
—অটল প্রতিজ্ঞ তিনি তবে?
লক্ষ্মণ। অস্থির প্রতিজ্ঞ রাম কবে?
উর্ম্মিলা। কোথা তিনি?
লক্ষ্মণ। রুদ্ধ স্বীয় কক্ষে
নীরব আনত শুষ্ক চক্ষে
ধূলাসনে। রাজ পরিবার
ভিন্ন তিনি অগম্য সবার।

—ঊর্ম্মিলা! একটি কথা আছে,
এই বার্ত্তা মহিষীর কাছে
তোমার কহিতে হবে।

ঊর্ম্মিলা। [চমকিয়া] আমি!

লক্ষ্মণ। প্রিয়তমে! অযোধ্যার স্বামী
দিয়াছেন এ হস্তে আমার.
তার চেয়ে গুরুতর ভার
সীতা নির্ব্বাসন দণ্ড। গিয়া
সঙ্গে তাঁর আমারি রাখিয়া
আসিতে হইবে প্রিয়তমে,
মহিষীকে, বাল্মীকি আশ্রমে।

ঊর্ম্মিলা। প্রাণনাথ তবে তব কাছে
আমার একটি ভিক্ষা আছে।

লক্ষ্মণ। কি ভিক্ষা?

ঊর্ম্মিলা। অপর কিছু নাই
কেবল এইটি ভিক্ষা চাই
প্রিয়তম, এই নির্ব্বাসনে
আমি তাঁর সঙ্গে যাব বনে!

লক্ষ্মণ। ঊর্ম্মিলা!—এ নিষ্ঠুর বচন
কহিও না! এই সম্মিলন
চৌদ্দবর্ষ পরে—এই ভাবে
বাতাসে কি মিলাইয়া যাবে?

ঊর্ম্মিলা। আমি না যাইলে বল আর
কে যাইবে?—রহিব সীতার
সঙ্গিনী সতত আমি বনে,
—যেরূপ রামের নির্ব্বাসনে
প্রিয় অগ্রজের অনুগামী
তুমি হয়ে ছিলে নাথ, আমি

সেইরূপ হব প্রাণাধিকা
রাঘবের পত্নীর সেবিকা।
তাঁর ভগ্নী আমি, পত্নী তব—
ইচ্ছা তব যোগ্য পত্নী হব।
কর আজ্ঞা—প্রাণেশ্বর! পতি!
কর আজ্ঞা, কর অনুমতি।
[পদতলে পতন

লক্ষ্মণ। তাই হোক্। ধন্য হও, অয়ি
সুমঙ্গল মুগ্ধে পুণ্যময়ি।
তুমি সঙ্গে রহিও সীতার,
ছায়ার মতন সদা—আর
সেবা করি সীতারে নিয়ত
পূর্ণ কর তব পুণ্যব্রত।

উর্ম্মিলা। তবে যাই সীতা সন্নিধানে

লক্ষ্মণ। উর্ম্মিলা! অতীব সাবধানে
অতি সন্তর্পণে, অতি ধীরে
কহিও এ বার্ত্তা মহিষীরে

উর্ম্মিলা। নাহি জানি, কি কহিবে সীতা!
—সদা শঙ্কাকুলা, সদা ভীতা
পাছে সে হারায় নাথে; হায়
কি জানি ঝরিয়া বুঝি যায়
শুভ্র নম্র যূথিকার মত;
নিদাঘ মধ্যাহ্ন।—

লক্ষ্মণ। তীব্রক্ষত
মুছাও তাহায় ধীরে প্রিয়ে
তোমার অসীম স্নেহ দিয়ে। [নিষ্ক্রান্ত]

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

আমরা কি সাহেব হইতেছি?

বিগত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের বসুমতী লিখিতেছেন :—"শ্রীমতী এনি বেসান্ত সাধনমার্গে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহার বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ভিন্ন সকলেই এ কথা স্বীকার করিবেন। সংপ্রতি তিনি লাহোরে একটি বক্তৃতা দান করিয়াছেন, তাহাতে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, "পাশ্চাত্য জগতের যাহা কিছু উত্তম তাহা আয়ত্বীভূত করার উপর ভারতের উন্নতি নির্ভর করিতেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ভারতবাসিগণের সাহেব হইলে চলিবে না; কোন জাতি জাতীয় বিশেষত্ব পরিহার করিয়া সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণ কবিতে পারে না।"—শ্রীমতী বেসান্তের এই কথা সম্পূর্ণ সত্য হইলেও তাঁহার উপদেশে এ অধঃপতিত দেশে যে শীঘ্র সুফল ফলিবে সে সম্ভাবনা অল্প। কারণ অতিরিক্ত বিলাতী আলোকে আমরা অন্ধ হইয়া শয়নে স্বপনে সাহেবিয়ানার ক্রীতদাস হইয়া পরিতেছি। সেদিন কোন বন্ধুর বিবাহ উপলক্ষে আমরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম, বিবাহ সভায় গিয়া দেখিলাম কয়েকজন বরযাত্রী হ্যাটকোট কলার নেকটাই ভুষিত হইয়া হিন্দুসন্তানের বিবাহে ক্লার খাইতে আসিয়াছেন! কি বিড়ম্বনা!—এই বঙ্গসন্তান কয়টি কালাপানি পার হইয়া শ্বেতদ্বীপ দর্শনের আশা চরিতার্থ করিতে পারিয়াছেন কিনা জানিনা, কিন্তু তাঁহারা সাহেবিয়ানায় যে ভাবে আচ্ছন্ন, তাহাতে বোধ করি বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে তাঁহাদের লজ্জা বোধ হয়! লেখাপড়া শিখিয়াও যাহারা এতখানি অনুকরণ প্রিয় ও অসারগ্রাহী হইয়াছে, উপদেশে তাহাদের চৈতন্য সঞ্চার হইবার কোন আশা নাই। এই মূর্খতা নিবারণ করিবার জন্য উপদেশ ছাড়িয়া অন্য ঔষধি প্রয়োগ করা আবশ্যক।"

পোষাকে সাহেবিয়ানা দেখিয়া অনেকেই চটিয়া থাকেন, কিন্তু অলক্ষিত ভাবে আমরা যে ভিতর হইতে ইউরোপীয় ভাবাপন্ন হইতেছি সে দিকে বড় কাহারও দৃষ্টি দেখা যায় না। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরাদি কালে আমাদের কিরূপ পরিচ্ছদ ছিল, ইতিহাস সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ব্যাখ্যা করেন না। দিল্লী প্রভৃতি কতিপয় স্থানে সংগৃহীত কয়েকটী খোদিত প্রস্তর মূর্ত্তির প্রমাণে প্রত্নতত্ত্ববিৎ ৺রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন যে মুসলমান সাম্রাজ্যের পূর্ব্বেও

সাধারণে শেলাই করা কাপড় ব্যবহার করিত। যাহা হউক আপাতত যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে সাহসের সহিত বলিলে কেহ দোষ দিতে পারেন না, যে মুসলমানী পোষাকই এখন ভারতে প্রচলিত। মুসলমান রাজার অনুকরণেই আমরা আবা, কাবা, চাপকান, চোগা, আমামা প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। ইহা যেন স্বাভাবিক নিয়ম বলিয়া বোধ হয় যে এ বিষয়ে রাজজাতির পদানুসরণ করিতে মানুষ বাধ্য। হ্যাটকোট পরিধান আজকাল একটু কেমন কেমন বোধ হইতে পারে, কারণ অল্পসংখ্যক মাত্র উহা ব্যবহার করিতেছেন, পরন্ত শত্রুর মুখে ছাই দিয়া ইংরাজ যদি সহস্র বৎসর এদেশে রাজত্ব করেন আর এক শতাব্দীপরে যখন ভদ্রলোক মাত্রেই সাহেবী পোষাক পরিবেন তখন উহা আর বিসদৃশ বোধ হইবে না ; বরং অন্যরূপ পোষাক ব্যবহার করিলে তাহা আজকালকার হ্যাট-কোটের মত খাপ্‌ছাড়া দেখাইবে।

এখন দেখিতে হইবে হ্যাট-কোট চালাইতে গেলে তাহার আনুষঙ্গিক আর কি কি চাই। হ্যাট-কোট-পেণ্টুলেন-বুট জুতার সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার টেবিল অনিবার্য্য. মছলন্দ, শতরঞ্চি মাদুরে আর চলিবে না। আমাদের মজ্‌লিসের ব্যবস্থা কোন প্রকার ঢালাও বিছানা, যাহাতে বিশ জনের স্থানে পঁচিশ জনকেও বসান যায়। পাশ্চাত্য সভ্যতা স্বার্থপর। আমরা তাহাতে অনভ্যস্ত হইলেও ক্রমে শিখিতেছি। সুতরাং তাহার ব্যবস্থাও তদ্রূপ। দশখানা চেয়ারে এগার জনের সংকুলান অসম্ভব। আমরা প্রাচ্য, আমরা এতকাল সব জিনিস পাঁচজনে মিলিয়া ভোগ করিতে শিখিয়াছি :—একখানা শতরঞ্চিতে দশজন বসিয়া আছি, আর তিন জন আইলেন ; অমনি সবাই একটু একটু সরিয়া আগন্তুকের স্থান করিয়া দিলেন। পাঁচজনের জন্য কষ্ট স্বীকার করাই সভ্যতা ও ধর্ম্ম মনে করি ; অন্ততঃ এতকাল করিয়া আসিয়াছি। অধুনা বিলক্ষণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই। ঘেঁসাঘেঁসি ঠেসাঠেসি বসা আজকালকার হিসাবে ভয়ানক অসভ্যতা, কারণ রাজার জাতি ইংরাজ এরূপ ভাবে বসা ভাল বাসেন না, বসিতে পারেন না। তাই বলিতেছিলাম, সুধু হ্যাট কোটে তত ক্ষতি নাই, কিন্তু উহার আনুষঙ্গিকে মারা যাইতে হইবে।

দুঃখের কাহিনী আরম্ভ করিলে অনেক কথা মনে আইসে, সকল শোক উথলিয়া উঠে। পাঠক ক্ষমা করিবেন। সহস্র চেষ্টাতেও আমরা বাহ্যিক সাহেব

হইতে পারি না, কৃষ্ণবর্ণ শ্বেত করিবার কোন প্রকার প্রক্রিয়া আজও হয় নাই ; কিন্তু ভিতর হইতে সকল প্রকারে "সাহেবিয়ানা" বিলক্ষণ তেজের সহিত বিকাশ পাইতেছে। বৃথা হ্যাট কোট বেচারীর উপর রাগ কেন ? বাহিরের পরিচ্ছদ পরিহার করা অতি সহজ, কিন্তু ভিতরে যে সকল ভাব বদ্ধমূল হইতেছে উহাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া বড়ই কঠিন। বি, এল্, এ,—ব্রের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল বিপ্লবকারী ভাব গলাধঃকরণ হইতেছে সে গুলির ধাক্কা সাম্‌লাইতে পারা এই নির্জ্জীব সমাজের কাজ নয়। ইংরাজী সভ্যতার প্রথম উপদেশ :—"First duty of a man is to himself, second is to his wife and children, third is to his countrymen" অর্থাৎ মানুষের প্রথম কর্ত্তব্য নিজের প্রতি, দ্বিতীয় স্ত্রীপুত্রের প্রতি, তৃতীয় দেশের লোকের প্রতি। এক প্রকারে ভালই কথা, নিজের প্রতি কর্ত্তব্য সাধিত না হইলে স্ত্রীপুত্রের সেবা কি প্রকারে সম্ভব, এবং পরিবার প্রতিপালন না করিয়া দেশের লোকের দিকে দেখিবার অবকাশ কোথায় ? কিন্তু কাজে দাঁড়াইয়াছে এইরূপ :—নিজের সুখ পুর্ণ মাত্রায় হইয়া ফাজিল দাঁড়াইলে বিবাহ করিয়া স্ত্রী পুত্রকে তাহার ভাগী করিবে ; তার পর সপরিবারে প্রচুর পরিমাণে সুখ স্বচ্ছন্দ ভোগ করিয়া ভবিষ্যতের আরামের জন্য বিলক্ষণ সঞ্চয় রাখিয়া যাহা কিছু বেশী থাকে তাহা দ্বারা অপরকে সাহায্য করিবে। আর আমাদের সভ্যতার আদেশ ছিল :—নিজে খারাপ খাইয়া পরিয়া গরিব দুঃখীকে এক মুষ্টি খাইতে দিও, স্ত্রীকে শাঁখা মাত্র পরাইয়া নগ্নকে বস্ত্র দান করিও। সুধু মুখের কথা নয়, ঠিক তদ্রূপ কাজ হইতেছিল। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও এ প্রকার দেখা গিয়াছে। কোম্পানির আমলের সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা সামাজিক বিল্পবও দেশের উপর দিয়া চলিয়া গেল। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসরের কথা, কৃষ্ণনগরের জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্রাহ্মণ উকীল একদিন বাস্তবিক নিজের পরিহিত বস্ত্র দান করিয়া লেপ আবরণে শয্যাশায়ী ছিলেন। কাছারির সমস্তদিনের রোজগার হয়ত দান করিয়া আসিলেন, অথচ ঘরে চাউল নাই। এই শ্রেণীর উৎকট দানের ঔচিত্যানুচিত্য সম্বন্ধে বিচার এস্থলে অনাবশুক, কেবল ইহাই বক্তব্য যে আর্য্যসভ্যতা ও হিন্দুশিক্ষার ফল উক্ত উকীল মহাত্মাতে এতদূর পর্য্যন্ত প্রকাশ পাইয়াছিল।

বিদেশে যিনি দশ-টাকা রোজগার করিতেছেন তাঁহার বাসায় স্বদেশীয় বিদে-

পীর বহুলোক গ্রাসাচ্ছাদন পাইতেছে; তিনি বৎসরে একবার দেশে আসিয়া দুর্গোৎসব উপলক্ষে বিস্তর ব্যয় করতঃ গ্রামস্থ যাবতীয় লোককে তিন দিন চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ সামগ্রী দ্বারা পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইতেছেন; এবম্প্রকারের দৃশ্য আজকাল নিতান্ত বিরল, কিন্তু চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও সচরাচর ইঁহা দৃষ্ট হইত। এমন কি কলিকাতাতেও অনেক চাকুরিয়া ওরূপ অন্ন দান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। রাজধানীতে এবং মফস্বলে বিস্তর মধ্যবিৎ লোক বাঙ্গালা ও ইংরাজী স্কুলের দরিদ্র ছাত্রদিগকে বাসায় স্থান দিয়া ভরণপোষণ করিতেন। এখন যেমন কোম্পানির কাগজ ও স্ত্রীর অলঙ্কার দ্বারা লোকে নাম কিনিতে চেষ্টা পায়, তখন অকাতরে অন্ন বস্ত্র দান যশোলাভের একমাত্র উপায় ছিল। স্বার্থপর বিলাতী সভ্যতা ও পরার্থপর ভারতীয় সভ্যতাতে এই প্রভেদ। অপরকে দুঃখী দেখিয়া তুলনায় সমালোচনা দ্বারা এখন আমরা নিজেদের সম্পদ অনুভব করিয়া আনন্দ উপভোগ করি, তখন দুঃখীকে অভাবমুক্ত করিয়া লোকে সুখানুভব করত কৃতার্থ বোধ করিত।

উপরোক্ত হিসাবে হ্যাট-কোটের উপর রাগ করিবার প্রধান কারণ এই দেখা যায় যে, উহা দ্বারা কস্মিনকালেও আর একজনের সাহায্য করিবার উপায় নাই। পথে কোন দুঃখীকে বস্ত্রহীন দেখিলে অনায়াসে নিজের ধুতির আধখানা ছিঁড়িয়া দিয়া তাহার লজ্জা নিবারণ করিতে পারা যায়, কোট পেন্টুলুনে তাহা অসম্ভব। তাই বলিতেছিলাম বিলাতী সকল ব্যবস্থা ঠিকঠাক নিজের জন্য; কিছুতেই অপর একজনকেও তাহার কিঞ্চিৎ অংশ দিয়া সাহায্য করিতে পারা যায় না। বিলাতী পোষাকে জাতীয় বিশেষত্বের হানি হইতেছে, যাঁহাদের আশঙ্কা, তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে, আমাদের জাতীয় পরিচ্ছদ কি আছে, এবং যদি কিছু না থাকে, কালোপযোগী একটা খাড়া করা আবশ্যক কি না? ধুতি-চাদর অনেক প্রকারে সুবিধার জিনিস হইলেও রাজদরবার পর্য্যন্ত যখন চলে না, তখন উহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় কি প্রকারে? যাহা হউক, এ বিষয় আপাততঃ চাপা দিয়া জাতীয়তার অন্যান্য মর্ম্মস্থানে কি হইতেছে দেখা যাউক।

বিবি বেসান্ত ঠিক বলিয়াছেন,—"কোন জাতি জাতীয় বিশেষত্ব পরিহার করিয়া সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে পারে না।" এখন পাঠক বিবেচনা

করিয়া দেখুন জাতীয় বিশেষত্বের মধ্যে যেটা প্রধান—জাতীয় ভাষা ও জাতীয় সাহিত্য—তৎসম্বন্ধে আমাদের অবস্থা কি। রাজা বিদেশীয়, সুতরাং রাজকার্য্য সমুদয় বিদেশীয় ভাষায় সম্পাদিত ; কাজেই পেটের দায়ে আমাদিগকে মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া প্রাণপণে রাজভাষা শিক্ষা ও বিজাতীয় সাহিত্যের চর্চ্চা করিতে হয়। এতন্নিবন্ধন আমাদের জাতীয়তা কিরূপ খিচুড়ি-ভাবাপন্ন হইতেছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। মানুষের পোষাক কুকুরের গায়ে পরাইলে যেমন বিকট দৃশ্য হয় মাতঙ্গের পদ চতুষ্টয় অশ্বের দেহে সংলগ্ন করিলে যেরূপ শোভা পায়, প্রায় তদ্রূপ ঘটিতেছে। আমরা যে দেশের লোক, আমাদের চারিদিকের অবস্থা যেরূপ, তদনুরূপ আমাদের প্রকৃতি, এবং সেই ছাঁচে ঢালা আমাদের ভাষা ও সাহিত্য। ইংরাজ জাতির শীতপ্রধান দেশে বাস, তথাকার সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা তদনুযায়ী ; সেই হিসাবে উহাদের প্রকৃতির গঠন এবং তদুপযোগী ইংরাজীভাষা ও সাহিত্য। অনেক স্থানে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য ইংরাজীর সহিত, সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন। এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের ঘাড়ে জোর করিয়া বিলাতী সাহিত্যগত ভাবসমূহ চাপাইয়া আমাদের জাতিগত প্রকৃতির মূলচ্ছেদ করা হইতেছে কিনা সহৃদয় পাঠক একবার ভাবিয়াদেখুন।

অন্যান্য জাতীয় বিস্তর লোক বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করতঃ উহাতে বিশেষরূপে ব্যুৎপন্ন হইয়া থাকেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু মাতৃভাষা ও জাতীয় সাহিত্যে পারদর্শী পণ্ডিতগণকেই ওরূপ দেখা যায়। আমাদের মত মাতৃভাষায় জলাঞ্জলি দিয়া কাহাকেও বিজাতীয় ভাষা ও সাহিত্যে মনোনিবেশ করিতে হয় না।* জাতীয়

* বিলাতের লোকে বলেন যে এক মাতৃভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করাই মনুষ্যের পক্ষে যথেষ্ট আয়াসসাধ্য ব্যাপার ; অর্থাৎ দুই ভাষা শিক্ষা করা কঠিন। ঐ হিসাবে তাঁহারা আশ্চর্য্য হন, আমরা দুইটা ভাষা কি প্রকারে সমান ভাবে শিক্ষা করিতে পারি। তাঁহারা ত জানেন না যে আসলটা আমরা গঙ্গার জলে ভাসাইয়াছি বলিলেই চলে। ইউরোপীয় মহাদেশের লোক এমন কি প্রতিবেশী ফরাসী জাতি অপেক্ষা আমরা ভাল ইংরাজী শিখি ইহা অনেকের মুখে শুনিয়াছি। তাহার কারণ উহারা অনেক বিলম্বে বিদেশীয় ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। জাতীয় সাহিত্যে পরিপকতা লাভের পর বা বিশেষ কোন সাংসারিক প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া ভিন্ন ভাষার প্রতি তাঁহাদের মনোযোগ হইয়া থাকে। পাঠক মহোদয়ের আমোদার্থে ফরাসী ইংরাজীর একটা নমুনা দিয়ে দিলাম।

"In small time I can learn so many English as I think I will come at the America & go on to the scaffold to lecture"—ফরাসী ভদ্রলোক মার্কিন বন্ধুকে লিখিতেছেন।

ভাবে চরিত্র ও প্রকৃতি সুন্দররূপে গঠিত হওয়ার পর বিজাতীয় বিষয়াদিতে মন সংযোগ করিলে কোনই ক্ষতি হইবার কথা নয়, বরং বিশেষ লাভেরই সম্ভাবনা। পরন্তু কাঁচা মাথায় সম্পূর্ণ বিজাতীয় ভাষা ও তদন্তর্গত ভাব সমূহ জবরদস্তি স্থান পাইলে যে বিষম অনিষ্টের আশঙ্কা তাহা বোধ হয় বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিতে বাধ্য। উত্তপ্ত ভারতবর্ষে বসিয়া তুষারাবৃত ইংলণ্ডীয় ভাব সমূহ জীর্ণ করা কি যেমন তেমন মস্তিষ্কের কাজ। যত বড় ধীশক্তি সম্পন্ন বালকই হউন না কেন তাঁহার পক্ষে উহা নিশ্চয় বদহজমের কারণ হইয়া বিকট পীড়া উপস্থিত করিবে। তার পর, ইংরাজী নাটক নবেলাদি সাহিত্য মধ্যে বিস্তর কথা ও ভাবব্যক্ত যাহা ইংলণ্ডদেশ এবং তত্রত্য সমাজ সম্বন্ধীয় ঘনিষ্ট জ্ঞান ভিন্ন আদৌ বুঝিবার যো নাই; অভিধানগত বিদ্যা দ্বারা কোনই ফল হয় না। সেগুলি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা প্রায়ই ভ্রান্ত; তদ্ধেতু যে কি ক্ষতি হয় বলা যায় না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে দেশকালানুযায়ী জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ। যে দেশের যেরূপ জল বায়ু, যেরূপ প্রাকৃতিক অবস্থা, যেরূপ চারি-দিকের কাণ্ডকারখানা সেইরূপ তথাকার লোকের স্বভাব ও তদনুরূপ তাহাদের সমাজ, ভাষা ও সাহিত্য না হইয়া যায় না। দৈনিক প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে যখন ভাষা গঠিত তখন শীত প্রধান বা চিরতুষারাবৃত বা চিরবসন্তবিরাজিত দেশের লোক ঠিকঠাক কিরূপে বুঝিতে পারে? অনেকেই জানেন, সেকালের জনৈক প্রাচ্য সম্রাট কোন ইউরোপীয় পরিব্রাজকের মুখে জল জমিয়া প্রস্তরের ন্যায় কঠিন বরফে পরিণত হওয়ার কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন—"তোমার বিবৃত অন্যান্য বিষয় বিশ্বাস করিয়াছিলাম কিন্তু এই ভয়ানক অপ্রাকৃতিক অসম্ভব কথা শুনিয়া বুঝিতেছি যে তুমি নিতান্ত মিথ্যাবাদী, তোমার সকল কথাই সম্পূর্ণ অলীক।" ইহাতেই বুঝা যায় যে আমরা যদি পূর্ব্বে কখন বরফ না দেখিতাম, ইংরাজী "আইস্" শব্দের অর্থ হৃদ্বোধ করা আমাদের পক্ষে কি প্রকার কঠিন হইত; এবং বরফ সংক্রান্ত সকল বর্ণনা সম্বন্ধে আমাদের মনে কিরূপ বিকট ভ্রান্ত ধারণা থাকিত। নরওয়ে প্রভৃতি ইউরোপের উত্তরাংশে প্রচলিত "মধ্যরাত্রির সূর্য্য" কথাটা সে দেশে অতি সহজবোধ্য, কিন্তু আমাদের দেশের লোককে এক রাশি বাক্যব্যয়েও উহা সম্যক্ বুঝাইতে পারা সুকঠিন;—উক্ত ব্যাপার সম্বন্ধে

অনেকে আমাকে প্রশ্ন করিয়াছেন, আমিও বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়াছি, কিন্তু দশ বিশ কথায় কাহারও মনে ছাপ বসাইতে পারি নাই। এই প্রকার ইউরোপ খণ্ডের কত বিষয় আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না।

যাহা হউক উক্তপ্রকারে বাল্যকালাবধি যখন আমরা অতি দূর দেশের সম্পূর্ণ বিজাতীয় গ্রন্থকারদের সহিত সর্ব্বদা উঠিতে বসিতে বাধ্য হইতেছি তখন গাত্রাবরণ যেরূপই হউক না কেন, আমাদের অন্তররাজ্যে যে একটা বিষম বিপর্য্যয় ঘটিয়া আমাদিগকে না দেশী না বিলাতী মাঝামাঝি এক শ্রেণীর কিম্ভূত কিমাকার করিয়া তুলিতেছে সে বিষয়ে দুই মত হইবার কোন কারণ দেখি না। এখানে একটী গল্প মনে পড়িল।—কোন পূর্ব্ব দেশীয় লোক নৌকাযোগে প্রথম কলিকাতা আসিতেছিলেন। পথ হইতেই রাজধানীর ভাষা কতক কতক অভ্যাস করিয়া যাওয়া আবশ্যক বিবেচনায় জনৈক সহযাত্রীর নিকট জানিলেন, কলিকাতায় লোকে চুক্যা অর্থাৎ অম্বলকে টক্ বলে; মুখস্থ করিতে করিতে উভয় শব্দ বিস্মৃত হইয়া কলিকাতার বাসাতে আহারের শেষে অম্ল চাহিতে "টুক্যা" বলিয়া হাস্যাস্পদ হইলেন। আমাদেরও কি ঠিক তদ্রূপ ঘটে নাই। মাতৃক্রোড় হইতে বাহির হইয়াই ইংরাজীভাষা শিক্ষা, বিলাতী ভাব চিন্তা দ্বারা এবং পাশ্চাত্য দাপটের পেষণে আমরা জাতীয় ভাব সমূহ বিস্মৃত হইয়া অর্দ্ধ ইউরোপীয় চেহারায় এক আজব দৃশ্য দেখাইতেছি। ভিতর হইতে আজগুবি জানোয়ার সাজিতেছি, বাহিরের পরিচ্ছদ কাজেই তদনুরূপ হইতেছে।

বেসান্ত বলিয়াছেন, "পাশ্চাত্য জগতের যাহা কিছু উত্তম তাহা আয়ত্ত করার উপর ভারতের উন্নতি নির্ভর করিতেছে।" ইহাও অতি সুন্দর কথা। কিন্তু দেখা যাউক ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের এত কাল সেবা করিয়া ও বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি এবং হইতে পারি। ইংরাজী কথার মানে আবৃত্তি করিতেছি, সাহিত্য ইতিহাস পড়িতেছি, ইংলণ্ডের মহাজীবগণের জীবনচরিত ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী সতারিখ গলাধঃকরণ করিতেছি, কিন্তু তাহাতে কি কোন সুফল ফলিতেছে, ইংরাজের সদ্‌গুণ কি কিছু আয়ত্ত করিতে শিখিতেছি ? হরি ! হরি ! তাহা কোথায় ! বাস্তবিক ইংরাজদের মত হইতে গেলে তাহাদের মত শারীরিক মানসিক অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া চাই। এ দিকে উদরান্নের সংস্থান নাই ওদিকে বেকন্ মিল্ অধ্যয়ন। শুধু মিল্টন, সেক্সপীর কণ্ঠস্থ করিলে ত পেট

ভরে না, পেট না ভরিলে শরীরে বল পাওয়া যায় না, শরীরে বল না থাকিলে বীরজাতির সাহিত্য পাঠে কি ফল ? ফিন্‌ফিনে চাদরমাত্র অঙ্গাবরণ, পেটযোড়া প্লীহা যকৃৎ, শাকচচ্চড়িমাত্র আহার, অথচ ক্রম্‌ওয়েলের জীবনচরিত মুখস্থ করা হইতেছে বীরভাষা ইংরাজীতে ;—এ অবস্থায় যে প্রকারের বীরত্ব লাভ সম্ভব তাহা চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে কাঁসারীপাড়াতেই শোভা পায়।

তাই আবার বলি, বর্ত্তমান অভাবক্লিষ্ট অবস্থায় আমরা উদরান্নের জন্য যে ভাবে দিবারাত্রি হাহাকার করিতেছি তাহাতে সাহেব হইতে যাওয়া বামনের চাঁদে হাত দিবার চেষ্টা মাত্র। সাহেব সাজিতে পারি, কিন্তু বহুরূপীর সঙের ন্যায় সাহেব সাজিলে কি হইবে ? ভিতরে যে ফাঁপা—ভিতরে তালপাতার সিপাহী, বাহিরে জন্‌বুলের পোষাক ; ফল এক চড়েই সাষ্টাঙ্গে পতন। ইংরাজের বল বীর্য্য, সাহস উদ্যম প্রভৃতি আয়ত্ত করিতে গেলে সকলে মিলিয়া পেট ভরিয়া যাহাতে খাইতে পাই তাহার চেষ্টা প্রথম কর্ত্তব্য ; তার পরেই জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি আবশ্যক। সাহিত্যের দ্বারাই দেশের পরিচয়, জাতির পরিচয়। জাতীয় সাহিত্য ব্যতীত কখন কোন দেশের মঙ্গল হয় নাই। জাতীয় সাহিত্য ভিন্ন জাতীয় বিশেষত্ব আর কি প্রকারে রক্ষা পায় জানি না। ইতিহাস বারম্বার সাক্ষ্য দিয়াছে, উন্নত জাতি সাহিত্যের দ্বারা আরও উন্নত পদবীতে আরোহণ করিয়াছে, অবনত জাতি সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে হীনাবস্থা হইতে উত্তোলন করিতে সক্ষম হইয়াছে। জাতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে বেসান্ত কি উপদেশ দেন শুনিতে আমরা বিশেষ উৎসুক। মহামতি রাস্কিন বলিয়াছেন ;—

A nation cannot last as a money-making mob—it cannot —with impunity :—it cannot—with existence—go on despising literature"

অর্থাৎ শুধু অর্থ সংগ্রহ দ্বারা কোন জাতি অধিক দিন তিষ্ঠিতে পারে না। সাহিত্যকে অবহেলা করিলে জাতীয় জীবন রক্ষা পায় না। সুতরাং জাতীয় বিশেষত্ব রক্ষা করিতে গেলে আগে জাতীয় সাহিত্যকে সজীব ও সতেজ রাখা চাই।

দুই দিক হইতে আমাদের জাতীয় বিশেষত্বের গোড়ায় কোপ পড়িতেছে, দেখিতেছি রক্ষা নাই। প্রথম উদরান্নের অসংস্থান, দ্বিতীয় মাতৃভাষা ও জাতীয়

সাহিত্যের দুরবস্থা। কথায় বলে, "যাহার ভাত নাই তাহার জাত নাই।" পেটে না খাইতে পাইলে জাতীয়তা রাখি কি প্রকারে? ওদিকে ইংরাজী প্লাবনে মাতৃভাষা ভাসিয়া যাইতে বসিয়াছে, সুতরাং জাতীয় সাহিত্য ডুবু ডুবু। যে জাতির এই দুইটী প্রধান উপকরণের অভাব তাহার সংসার হইতে গা ঢাকা দেওয়াই উচিত।—হ্যাট-কোট শোভিত হইয়া শ্মশানযাত্রা কর বা কৌপীনমাত্র আবরণসহ গমন কর, একই কথা, চিতানল সর্ব্ব প্রকার পরিচ্ছদকে সমান ভাবে ভস্ম করিয়া থাকে।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

সমালোচনা।

শিক্ষা।

প্রবাসী—১ম ভা, ২য় সং। "শিক্ষার উন্নতি ও তন্নিমিত্ত দান"। এই প্রবন্ধের মূল কথা,—

১। এখন যুদ্ধের অর্থ মারামারি কাটাকাটি, ভবিষ্যতে ইহা শিল্পবাণিজ্যে ঘোরতর প্রতিযোগিতায় পরিণত হইবে। সুতরাং উচ্চ বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে শিল্পশিক্ষার অঙ্গীভূত না করিলে বর্ত্তমানকালে কোন জাতিই শিল্পযুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না। সাধারণ শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা, শিল্প শিক্ষা তিনই আবশ্যক।

২। ভাল শিক্ষার জন্য আবশ্যক (১)—ভাল শিক্ষক। ভাল শিক্ষক প্রস্তুত করার উপায়; শিক্ষককে শিক্ষালাভের জন্য বিদেশে পাঠান, অধিক বেতন দেওয়া, শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি করা, প্রাত্যহিক অধ্যাপনার সময় কমান, ভাল পুস্তকালয় সংস্থাপন করা, (২) ভাল স্কুলগৃহ, উপযোগী বেঞ্চ ডেস্ক, উত্তম ব্যায়ামক্ষেত্র ও ক্রীড়াক্ষেত্র, সাক্ষাৎ জ্ঞানের জন্য যন্ত্রাদি, কৌতুকাগার, ছাত্রাবাস এবং ঐতিহাসিক তীর্থযাত্রা। এক কথায়, বহু ব্যয় না করিলে ভাল শিক্ষা হয় না।

৩। (১) কঞ্জিভেরাম নগরের পাচেয়াপ্পা মুদিলিয়ার, (২) পার্সি জাতী জামসেদজী জীজী ভাই, (৩) মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ গঙ্গাধর শাস্ত্রী, (৪) শ্রীযুক্ত প্রসন্ন-

কুমার ঠাকুর, (৫) হাজী মহম্মদ মহসীন, (৬) বোম্বাইয়ের সর মঙ্গলদাস নাথুভাই, (৭) হিন্দুস্থানী কায়স্থ মুন্সী কালী প্রসাদ, (৮) শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ, (৯) স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়, (১০) বাবু গুরুপ্রসন্ন ঘোষ—এই মহানুভবগণ শিক্ষার জন্য প্রভূত অর্থদান করিয়াছেন এবং ধনী ব্যক্তিদিগের এইরূপ দান করা কর্ত্তব্য।

এক্ষণে এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, এই প্রবন্ধ রচনার্থ লেখক শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে জ্ঞাতব্য বিষয় আছে এবং ইহা সুখপাঠ্য। আর, শিক্ষা সম্বন্ধে যতই অর্থ দান করা হইবে তাহার সদ্ব্যবহার হইলে দেশের ততই মঙ্গল।

তবে ইহাও স্বীকার্য্য লেখক যে মত গুলি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আজি কালি সচরাচর ইংরাজি রচনাতে পাঠ করা যায়। আমাদিগের দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময় যাহা আশু ও প্রধানতঃ আলোচ্য তৎপ্রতি দৃষ্টি করিলে অধিকতর উপকার হয়। আপাততঃ বহুব্যয়সাধ্য আয়োজনের প্রতীক্ষা না করিয়া, যাহাতে লব্ধ সামগ্রী ও উপাদান লইয়া শিক্ষার উন্নতি হয় তাহার জন্য কর্ম্মীদিগের চিন্তা ও কার্য্য বিশেষ আগ্রহের সহিত প্রয়োগ করা আবশ্যক হইয়াছে। যে উন্নতি এক্ষণে প্রধানতঃ আবশ্যক তাহা আভ্যন্তরীণ, তাহা হৃদয়গত, তাহা বহুব্যয় সাধ্য নহে।

১। ব্যয়বৃদ্ধি অপেক্ষা না করিয়াই, শিক্ষকগণের কর্ত্তব্য জ্ঞানের বৃদ্ধি করার জন্য চেষ্টা হইতে পারে। অধিকাংশ শিক্ষকই, তাঁহাদিগের হস্তে যে গুরুতর ভার ন্যস্ত আছে, দেশের ভাবী মঙ্গল যে তাঁহাদিগেরই উপর নির্ভর করে, তাঁহারা যে নৈতিক ও মানসিক বলনির্ম্মাণের কারিগর, তাহা তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ীর ন্যায় শিক্ষকের দ্বারা কত উপকার হইতে পারে! সেরূপ সতত-ছাত্র-মঙ্গল-চিন্তামগ্ন, ছাত্রবৎসল, পবিত্রাত্মা শিক্ষক এক্ষণে দেখিতে পাই না, নামও শুনিতে পাই না। সমাজের অধিকাংশ লোকের মধ্যে যে স্বার্থপরতা, দুর্নীতি, হৃদয়হীনতা প্রভৃতি মারাত্মক দোষ প্রবেশ করিয়াছে, অধিকাংশ শিক্ষকদিগের মধ্যে তাহা সংক্রামিত হইয়াছে। অধ্যাপনা এক্ষণে একটা নিতান্ত পেশাদারি কার্য্য হইয়াছে।

২। ছাত্রগণ এক্ষণে কোন মতে যোসো করিয়া পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইবার

জন্য প্রয়াসী, প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা তাহাদিগের নাই। "পাশ" করিবার অতিরিক্ত বিদ্যা তাহাদিগকে দিতে চাহিলে তাহারা তাহা লন না, অধ্যাপক সেরূপ অতিরিক্ত জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিলে, হয়ত তাহারা "ক্লাশ রুমে" থাকিবেন না, না হয় তাহা শুনিবেন না। কেননা যে বিদ্যা পরীক্ষা 'পাশে' লাগে না, সে বিদ্যা উপার্জ্জন করা অধিকাংশ ছাত্র সময়ের অপব্যয় বিবেচনা করেন। ছাত্রগণ কেবল এরূপ সংক্ষিপ্ত মন্তব্য বা ব্যাখ্যা চাহেন, এরূপ "নোট" চাহেন, যাহা সহজে মুখস্থ করিয়া তাঁহারা অনায়াসে অর্থকরী ডিগ্রী লাভ করিতে পারেন। এমন কি, অনেক ছাত্র কোন কোনও বিষয় মূল গ্রন্থ না পড়িয়া অধ্যাপক প্রদত্ত চুম্বক পাঠ করিয়া কার্য্য উদ্ধার করেন। একটী অধ্যাপক নূতন নিযুক্ত হইয়া "ক্লাশে" ইতিহাস সম্বন্ধে সাগ্রহে বিস্তৃত বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। ছাত্রগণ কয়েকদিবস অবাক্ হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিলেন। তৎপরে একদিন মুখ ফুটিয়া বলিলেন যে "মহাশয়, এরূপ বক্তৃতায় আমাদিগের কোন উপকার হইবে না"। অধ্যাপক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করিলে উপকার হয়?" উত্তর—"নোট দিলে"। অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরূপ নোট চাহ?" ছাত্রগণ বলিলেন—"পুস্তকের সার ভাগের চুম্বক"! অধ্যাপক বলিলেন, "মূলগ্রন্থ পাঠ করিয়া আমার ব্যাখ্যা শুনিয়া, তোমরা নিজেই ত চুম্বক লিখিতে পারিবে"। ছাত্রগণ—"মহাশয় আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ছাত্রের এরূপ হীন অবস্থা যে, সমুদয় মূল গ্রন্থ ক্রয় করিবার সামর্থ্য নাই। আলোচ্য মূল গ্রন্থ না থাকায়, আপনার প্রদত্ত চুম্বক পাঠ করিয়া পরীক্ষাতে "পাশ" হইবার আশা করি।" অধ্যাপক করেন কি, সমুদয় গ্রন্থ খানির চুম্বক লিখিয়া দিলেন। ছাত্রগণ হর্ষে তাহা মুখস্থ করিয়া ডিগ্রী পাইয়া অধ্যাপককে ধন্যবাদ দিলেন। এ অবস্থায় লেখকের প্রস্তাবিত "শিলালিপি প্রাচীন মুদ্রা, তাম্রফলক প্রভৃতির সাহায্যে ছাত্রদিগকে ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিরূপণ" সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার কথা বিড়ম্বনা মাত্র নহে কি? যে সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ভাবিত হইয়াছে, যখন তাহাই ছাত্রগণ শিক্ষা করিতে চাহেন না, তখন তাঁহাদিগকে নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবন করিতে শিখান কতদূর সম্ভব তাহা বুঝি না।

৩। পরীক্ষা পাশ করান জন্য অধ্যাপকের যে বিদ্যা আবশ্যক, তাহা অধিক

নহে। অধ্যাপকের পক্ষে কয়েকখানি Reference Book হইলেই কাজ চলিয়া যায়। তাহার অতিরিক্ত বিদ্যা ছাত্রগণ চাহেন না। সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায় অধ্যাপকের বৃহৎ পুস্তকাগার ব্যবহার করিবার প্রয়োজন বড় কমই হয়।

৪। স্কুল ও কালেজে ব্যয়সাধ্য ব্যায়াম যন্ত্রাদির আয়োজন না হইলেও ছাত্রগণ হাডু ডুডু চামচু প্রভৃতি জাতীয়-ক্রীড়া করিয়া আনন্দ ও উপকার লাভ করিতে পারে।

৫। এক্ষণে যে সময় বিদ্যালয় শিক্ষা দেওয়া হয় (বেলা ১০টা হইতে ৪টার মধ্যে) তাহা আমাদের উষ্ণদেশে পাঠের উপযোগী নহে। চতুষ্পাঠীতে প্রাতে ও অপরাহ্নে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। স্কুল ও কালেজে তাহার বিপর্য্যয় হওয়ায় ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। এই প্রকার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ার অপেক্ষা কেবল মাত্র প্রাতে বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া ভাল। বিনা ব্যয়ে এ বিষয় প্রতিকার হইতে পারে।

৬। লেখক বলেন ঐতিহাসিক তীর্থযাত্রা আবশ্যক। অর্থাৎ ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রধান প্রধান স্থান দুর্গ প্রাসাদ, গিরিসঙ্কট, স্তম্ভ, খোদিত অনুশাসনপূর্ণ পর্ব্বত ছাত্রগণকে দেখান উচিত।" ঐতিহাসিক তীর্থযাত্রার কথা দূরে থাকুক। শিক্ষক অপরাহ্নে ছাত্রগণকে সঙ্গে লইয়া নগরের সন্নিহিত নদীতটে বা শ্যামল ক্ষেত্রে বিনাব্যয়ে নির্ম্মল বায়ু সেবন করিতে করিতে ছাত্রগণকে নানা সদুপদেশ দিতে পারেন, তাহাদিগের সহিত সদালাপ করিতে পারেন। কিন্তু কয়জন শিক্ষক এরূপ করিয়া থাকেন? শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে যে ঔদাস্য ও অপ্রীতির ব্যবধান রহিয়াছে, সর্ব্বাগ্রে যাহাতে তাহা নষ্ট হয়, তাহাই কর্ত্তব্য। যাহাতে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অনুরাগ হয়, যাহাতে শিক্ষক অন্তরের সহিত ছাত্রকে স্নেহ করেন, ছাত্র অন্তরের সহিত শিক্ষককে ভক্তি করেন, শিক্ষার উন্নতির জন্য, তাহারই প্রথমে বিশেষ চেষ্টা হওয়া উচিত।— শারদীয়া রজনী। আকাশে পূর্ণশশীর পূর্ণশোভা। কলনাদিনী স্রোতস্বতী জ্যোৎস্নাদীপ্ত বীচিমালায় পরিশোভিত হইয়া তরতর চলিয়া যাইতেছে, পাপিয়ার স্বরলহরীতে বায়ু মধুর-কম্পিত হইতেছে—আসুন না, শিক্ষক, এই মধুর সুখ যামিনীতে ছাত্রবৃন্দ লইয়া নদী বক্ষে তরণী ভাসাইয়া কয়েক ঘণ্টার জন্য আনন্দ ভ্রমণে নূতনতীর্থযাত্রা করুন। ছাত্রদিগকে লইয়া এই মাধুরী উচ্ছ্বসিত প্রকৃ-

তির স্তব করুন, প্রীতির প্রস্রবণ খুলিয়া দিয়া, পবিত্র ব্রহ্মসঙ্গীতোচ্ছ্বাসে হৃদয়ে হৃদয়ে মধুর তানে সম্মিলিত হউন।—পবিত্র তীর্থযাত্রা। প্রকৃতি মন্দিরে প্রেম চক্ষুতে ভগবানের সাক্ষাৎ ইহার ফল। সৌন্দর্য্য ইহার পাণ্ডা। শিক্ষক এই পূজার পুরোহিত।—আবার শরৎ গেল, হেমন্তও অতীত, শীত ঘনীভূত হইল। ধরাতল পীতক্ষীণ রবিকিরণে রঞ্জিত হইয়া দিবসে বিশেষরূপে উপভোগক্ষম হইল। এক্ষণে মাঠে ছুটিতে ইচ্ছা করে, এক্ষণে বনবিহার রমণীয়। বাহিরে আসুন, শিক্ষক, পুস্তক রাখিয়া দিন। চলুন, নগর প্রান্তে—ঐ বনে। আমরা ছাত্রগণ নিজ হস্তে রন্ধন করিব—আপনাকে খাওয়াইব, আমরা খাইব। আপনি সুশিক্ষিত ছাত্রানুরাগী দুই একটী বন্ধু লইয়া আসিবেন। খাইতে খাইতে আপনাদিগের কত জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিব। আমরা খেলিব। আপনি আমাদিগের সহিত যোগ দিবেন। আমরা মাঠে হৈমন্তিক ধান্যের কনকশোভা দেখিব। আপনি ধানের বিষয়, কৃষিকার্য্য ও কৃষকের বিষয়, আমাদিগকে উপদেশ দিবেন। দেশে, কত জমিতে কত ধান্য হয় দেশে কত থাকে বিদেশে কত যায়, কেন যায়, কৃষকের অবস্থা কিসে ভাল হইতে পারে, ভদ্রলোকে কৃষিকার্য্য করিতে পারে কি না ইত্যাদি উপস্থিত বিষয় উপদেশ দিবেন"।—এও কি একরূপ তীর্থযাত্রা নহে? ইহা ঐতিহাসিক তীর্থযাত্রা নহে বটে, কিন্তু ইহার মূল্য ও উপকারিতা কম নহে। আর ইহা বিনা ব্যয়ে সাধ্য।

তাই বলি, বহুব্যয় আপাততঃ আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, যে সকল উপাদান আছে, প্রথমতঃ তাহারই সুব্যবহার করা কর্ত্তব্য। গরিব দেশে গরিবানা ভাবে কতদূর ভাল শিক্ষা হইতে পারে তাহাই বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমি, উপরে প্রধানতঃ ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে বহুব্যয় ব্যতীত অনেক বিষয় এদেশে শিক্ষার উন্নতি হইতে পারে। এবং শিক্ষা বিষয়ে বর্ত্তমান কালে যে সকল সাংঘাতিক দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, ব্যয়ের দ্বারা তাহার প্রতীকারের সম্ভাবনা নাই। কেন না সে সকল দোষ হৃদয়গত ও আধ্যাত্মিক। সুতরাং কর্ম্মী ও চিন্তাশীল লেখকদিগের তৎসম্বন্ধে এক্ষণে প্রধানতঃ আলোচনা ও আন্দোলন করা কর্ত্তব্য।

শ্রীরামমোহন চক্রবর্ত্তী।

পতিহারা।

প্রগাঢ় দুঃখের, গভীর কালিমা
বদনে জড়িত তার,
নিবিড় আলায়, নয়ন দুইটি,
জ্বলিতেছে অনিবার।

কেহ যেন তার, নাহি আপনার
বুঝিতে মরম ব্যথা,
তাইতে বালিকা, সদাই নীরব
নাহি কহে কোন কথা।

উপহাস ভরা জগত হইতে
নিরালয়ে গিয়া বালা,
চল-দল মূলে পাতিয়া আঁচল,
জুড়ায় প্রাণের। জ্বালা।

বাতাস হোথায়, খেলিয়া বেড়ায়
করুণা মাখিয়া গায়,
পর দুঃখে যেন, হইয়া কাতর,
পাপিয়া মধুরে গায়।

বনদেবী শুধু, নীরব বালার
বেদনা লইতে হরি,
চারি ধারে তার হরিত লহরী
ছড়াইছে প্রাণ ভরি।

তরু লতা চায় বেদনার ভাগ
মালতী মাধবী ছুয়ে,

মলিন কুসুম বুকেতে ধরিয়া,
পড়েছে বিষাদে মুয়ে।

অদূরে তটিনী, ছুটিছে কাঁদিয়া
ঘুঘু ঘোষে ঘন ঘোর ;
বালিকার দুঃখে, প্রকৃতি তুলেছে
পরবেদনার রোর !

আকাশেতে ধায় সাদা ভাঙ্গা মেঘ
রবির কিরণে ভাসি,
সে যেন বালায়, "আয়" "আয়" বলি
ডাকিয়া যাইছে হাসি।

অমনি বালিকা ভাবে মনে মনে
মরণ হইত যদি,
মনের আনন্দে, শ্যামল সাগরে
ভাসিতাম নিরবধি।

যেতাম ছুটিয়া যে পথে আমার—
গিয়াছে প্রাণের প্রাণ,
বুঝিবা হোথায় ভাসিতে পারিলে
শুনা যায় তাঁর গান।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

অনুরোধ।

(পতিপত্নীর)

আমার প্রাণের প্রেমের আগারে
প্রীতি-দীপ-শিখা জ্বালিও ;
আমার সরম সরম করিয়া
মাধুরী মধু যে ঢালিও ;
আমার বাসনা সফল করিতে
ব্যথায় বেদনা লইও ;
আমার হরষ সার্থক হবে
তুমি যে বিহ্বল হইও ;
আমার ভুবন আলোকিত করি
হাস্য জ্যোছনা বিলায়ে,
রাখিও চরণে পরাণ গাঁথিয়া
নয়নে নয়ন মিলায়ে ;
আমার শরীর-শোণিত-মাঝারে
প্রবাহ-রূপে বহিও,
তৃষিত অধরে কপোল পরশ
মাঝে মাঝে দেখ' সহিও ;
আমার নয়ন-নীলিম-নীরদে
বিদ্যুত সম খেলিও,
আমার আবেশ যতনে রাখিতে
কোমল উরস মেলিও ;
আমার হইয়া রহিতে ভুবনে,
আমারে সকল সঁপিও,—
প্রণয়ে, সোহাগে, প্রেমে, সকলেতে
আমারি সে নাম জপিও ॥

—গিরিজাকুমার—

মধুরিমা।

(উপন্যাস)

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

গ্রীষ্মকাল শেষ রাত্রে সরস্বতীপুর গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তে নদীতীরে কালিকা মন্দিরের সম্মুখে একখানি নৌকাতে দুইজন হিন্দুস্থানী বসিয়া আছে—এক ব্যক্তি বৃদ্ধ, অপর ব্যক্তি যুবা। যুবার নাম রামা। রামা নদীর দিকে তাকাইয়া আছে—সহসা স্রোতের মধ্যে আলুলায়িত কেশগুচ্ছ দেখিতে পাইয়া সে জলে ঝাপাইয়া পড়িল এবং কিছুক্ষণ পরে একটা রমণীর অর্দ্ধ মৃত দেহ টানিয়া নৌকার নিকট আনিয়া বৃদ্ধকে বলিল "বাবাজি একটু আদমি ডুব গিয়া থা হাম উঠায়া হায়। আপ নাও পর উঠাইয়ে"। বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া রমণীর দেহ নৌকায় তুলিল, রমাও উঠিয়া পড়িল। বৃদ্ধ ও রমার শুশ্রূষায় ক্রমে রমণীর জ্ঞান হইল। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বশতঃ আবার অজ্ঞান হইলেন। রামাকে ডাকিয়া বৃদ্ধ বলিলেন—দেখ্ নৌকা ছাড় এখন ত সকাল হইয়াছে, গাম্‌কা কাছে, চলত তবে বুঝা যাইবে। বৃদ্ধের কথা হইতে না হইতে রমণীর অল্প জ্ঞান সঞ্চার হইল। 'নৌকা ছাড়" এই কথাটি শুনিয়া রমণীর হৃৎকম্প উপস্থিত হইল; মনে হইল 'আমি ডাকাতের হাতে পড়িয়াছি' ভয়ে রমণী অস্পষ্ট চিৎকার করিয়া উঠিলেন, বৃদ্ধ তাড়া তাড়ি নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল "মা, তোর কি হইয়াছে?"

রমণী—কে তোমরা?' আমি কোথায়? তোমরা কি ডাকাইত!

বৃদ্ধ—না মা আমরা ডাকাইত না আছে। আমি—বিদেশী লোক আছে, এ নৌকা আমার আছে, ভয় কি মা।

রমণী—ভয় আবার কি, আমি ত অকূলে ভাসিয়াছি।

বৃদ্ধ—মা, তোমার নাম কি মা। তুই কার বেটী মা? এখানে তোর শ্বশুর থাকে কি বাপ থাকে মা?

রমণী—এখানে আমার মা নাই, বাপও নাই আমি জন্মদুঃখিনী, মাকেও জানি না, বাপকেও মনে পড়েনা। আমি অনাথা, এখানে আমার কেউ নাই।

বৃদ্ধা—তবে মা এখানে তুই কেমন করিয়া আসিলি মা, কার বাড়ীতে ছিলি মা, কোন লোক তোকে এমন কষ্ট দিল যে এই বয়সে তু জলে ঝাপ দিলি মা।

রমণী—বাবা! আমি এদেশের মেয়ে নয়। আমার দাই আমাকে মাঘি-পূর্ণিমার মেলা দেখিতে লইয়া আসিয়া হারাইয়া যায়, সেই থেকে আমি এখানেই জমিদার বাটীতে ছিলাম।

বৃদ্ধ—তোর নাম কি মা?

রমণী—তুমি কেন নাম জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমার নাম শুনিয়া তোমার কি হইবে।

বৃদ্ধ—মা, আমার একটী নাতনি দেখতে তোরই মতন এইখানে হারায়েছিল। বল না মা তোর নাম কি।

রমণী—আমার নাম মধুরিমা।

বৃদ্ধ—মা, আর তোর কোন নাম আছে কি?

রমণী—হাঁ, ছোটবেলায় নাম ছিল ইনা।

এইবার বৃদ্ধ বসিয়াছিল উঠিয়া নিজের বুক চাপড়াইয়া চিৎকার করিয়া বলিল—ওরে রামা! ইনা আমার মিলিয়াছে রে, আর দেরি করিস্ নারে নৌকা ছাড়্ ছাড়্ জলদি ছাড়্। রামা অতি আনন্দে নৌকা খুলিয়া মাজিদের সহিত উৎসাহে দাঁড় ক্ষেপিয়া চলিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পনর দিন চলিয়া গিয়াছে, মধুরিমা নিরুদ্দেশ। পীতাম্বর বাবু এবং শচীন্দ্র নাথ অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন কিন্তু আজও তাহাকে পাওয়া যায় নাই। পাড়ার বুদ্ধিমান্ ও বুদ্ধিমতীগণ সিদ্ধান্ত করিলেন মধুরিমা ভ্রষ্টা। কেবল নীলিমা তাহা ভাবিল না, আর ভাবিলেন না শচীন্দ্রনাথ। একে একে সকলেই মধুরিমার কথা ভুলিয়াছে। কিন্তু শচীন্দ্র ও নীলিমা ভুলিতে পারেন নাই। নীলিমার তাই নয়নাশ্রু আজও শুখায় নাই, শচীন্দ্রনাথও সদাই বিষণ্ণ।

বেলা ৪টা। শচীন্দ্রনাথ মধুরিমার কথা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় চাকর আসিয়া সংবাদ দিল বাহিরে কে বাবু ডাকিতেছেন। শচীন্দ্রনাথ শুনিবামাত্রই বাহিরে আসিলেন, দেখিলেন বন্ধু প্রমোদকুমার আসিয়াছেন, তিনি অতি আনন্দের সহিত তাহাকে বাহিরের ঘরে বসাইলেন।

প্রমোদকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন—শচীবাবু, আমাকে যে কি কথা বলিবেন বলিয়াছিলেন?

শচী—সে কথাটাত আপনাকে অনেকবার বলিয়াছি।

প্রমোদ—ও সেই কথা, আচ্ছা আমি আজই পিতাম্বর বাবুর ওখানে যাইব এবং আজই বলিয়া যাইব কি হইল।

শচী—আচ্ছা যাইবেন পরে। এক্ষণে একটু চা পান করিবেন কি ?

প্রমোদ—তা আর হইবে না ? একথা কি আর জিজ্ঞাসা করিতে হয়।

যথাকালে চা পান হইলে প্রমোদকুমার চলিয়া গেলেন। দেখিতে দেখিতে রাত্রি ৮টা বাজিল। শচীন্দ্র বাটীতে বসিয়া আছেন এমন সময় প্রমোদকুমার ফিরিয়া আসিলে, প্রমোদের মুখে শচীন্দ্র শুনিলেন যে যোগেশ বাবুর পুত্র ভিন্ন আর কেহ পীতাম্বর বাবুর জামতা হইতে পারে না।

শচীন্দ্রনাথের মস্তক ঘূর্ণিত হইল। তিনি ধীরে ধীরে শয্যায় বসিয়া পড়িলেন। প্রমোদকুমার বেড়াইবার ছুতা করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। শচীন্দ্রনাথ খানিক পরে চাহিয়া দেখিলেন, প্রমোদ নাই, ভাবিলেন "ভাল হইয়াছে, আর এখন মানুষকে ভাল লাগে না"। তিনি ভাবিতে লাগিলেন— "উঃ কি করিলাম ! নিজের মস্তকে নিজে কুঠারাঘাত করিলাম, প্রথমে ভুল বুঝিয়া কেন মধুরিমাকে মনের কথা বলিলাম। তা না হলেত হতভাগিনী মরিত না, আমি স্ত্রীহত্যার পাতকে লিপ্ত হইলাম। এত হইল তবু আমার মন নীলিমাময়, আমি কি পাগল হইব।" ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে স্থির করিলেন যে মধুরিমার পিতার দেশ খুঁজিয়া বাহির করিব, তাহার পিতাকে খুঁজিয়া বাহির করিব, তাঁহার চরণে পড়িয়া বলিব "সাধু, আমায় ভস্ম কর আমি তোমার দুহিতার প্রাণহন্তা"। এই স্থির করিয়া ভগিনীকে পত্র লিখিলেন এবং পত্র লেখা সমাপ্ত হইলে যদি নিদ্রায় যাতনা কিছু উপশম হয় তাই দ্বার বন্ধ করিয়া শয়ন করিলেন।

* * * *

১০ই আষাঢ় শুক্রবারে, যোগেশ বাবুর পুত্র শ্রীমান পূর্ণচন্দ্রের সহিত শ্রীমতী নীলিমার শুভবিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গেল। শচীন্দ্রনাথের আশা প্রদীপ এইবার নিবিল। এক্ষণে স্বরস্বতীপুরে বাস তাহার পক্ষে অসহ্য। তিনি আলমারি হইতে বহুকালের পুরাতন কাগজপত্র যাহা প্রয়োজনীয় বাহির করিয়া একটা পুলিন্দা প্রস্তুত করিলেন, ভগিনী ও ভগিনীপতিকে দুইখানা চিঠি

লিখিয়া তাহাদের নিকট পাঠাইলেন এবং নিজেও সেই রাত্রে বাহির হইয়া গেলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সাঁওতাল পরগণার মধ্যে বংশী নামক স্থানে 'মন্দার পর্ব্বত'। মন্দার পর্ব্বতের নিম্ন দিকে একটা অনতিবিস্তৃত পথ গিয়াছে, সেই পথ দিয়া দুইজন লোক যাইতেছে, একজন স্ত্রীলোক ও অপর জন পুরুষ। উভয়েই হিন্দুস্থানী। স্ত্রীলোকটী দেখিয়া বোধ হইতেছে, কোনও ধনীর পরিচারিকা। উভয়েই যাইতে যাইতে স্ত্রীলোকটী জিজ্ঞাসা করিল,—আরে ঘুষনা, হাম তো না চলে পারি রে, কাঁহা, দেবীপুর; মে দেওয়ান কী মোকাম কাঁহা!

পুরুষ,—আরে ওহি তো মোকাম বা, জলদি চলনা?

স্ত্রীলোক,—আরে ভইয়া, বাবুজী কাঁহাসে ঘুরল, ঘুরল আইল।

ঘুষণা,—সে তো হাম না জানি।

বলিতে বলিতে উভয়ে কিছু দূরে দেখিতে পাইল একটা সাদা রং দেওয়া বাড়ী, তাহার সম্মুখে অনেক লোক জমিয়াছে, দেখিয়া তাহারা দ্রুতপদে চলিতে লাগিল।

মন্দার পর্ব্বতের দক্ষিণে দেবীপুর। একখানি ছোট গ্রাম; নবীন মিশির নামে একজন হিন্দুস্থানীর দ্বারায় সে গ্রাম বসিয়াছে। নবীন মিশির দেওয়ান, মাথায় টাকপড়া, মাথায় লম্বমান টিকি দোদুল্যমান, একটা পাগড়ী মাথায় দিয়া, দীর্ঘ চাপকান পড়িয়া বাহিরের ঘরে একখান, নেহাত মেড়ুয়া ধরণের চেয়ারে বসিয়া আছেন। ঘরের সম্মুখে একটা সরু বারান্দা পরে বিস্তৃত মাঠ; সে মাঠে ফুলগাছ বা কোন ফলের গাছ নাই; তবে মাঠের মাঝে মাঝে দুই একটা বটগাছ, অশ্বত্থ গাছ আছে। সেই মাঠের মাঝখানে প্রায় দুই শত লোক সারি সারি পাতা পাড়িয়া বসিয়াছে; একজন প্রত্যেকের পাতে চিড়ে দিতেছে ও অন্যজন দধি ঢালিয়া গেল, পরে খানিকটা ভাঁড়ে করিয়া জল দিয়া যাইলে, সকলে অতি আনন্দের সহিত আহার করিতে লাগিল। আহারাদি হইয়া গেলে সকলে হাত ধুইয়া দেওয়ানজীর গৃহের সামনে সারি দিয়া দাঁড়াইলে, একজন বৃদ্ধ এক হস্তে একটী রমণীর হস্ত ধরিয়া অপর হস্তে একখানা কাগজ

লইয়া, দণ্ডায়মান লোকদিগের মধ্যভাগে আসিয়া দাঁড়াইল, সকলে অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল, ভাবিল এ আবার কি ব্যপার! বৃদ্ধ সকলকে ডাকিয়া বলিল "শুনো ভাই সব এই জেনানা তুমলোকা কো, চৌধুরাণী (হিন্দুস্থানীগণ জমীদারীর স্ত্রীলোক অধিকারিণী হইলে 'চৌধুরাণী' কহিয়া থাকে।) হোয়েঙ্গে, এ হুকুম মহারাজজী (জমীদার) দিহিঁন হ্যাঁয়, হামারা বাত সমঝা?

বৃদ্ধের কথায় প্রজাগণ বলিল 'হাঁ' হাঁ।

বৃদ্ধ,—তুমলোক কো কুছ উজুর হায়?

তখন সমবেত প্রজামণ্ডলী সমস্বরে কহিল "নেহি।"

বৃদ্ধ পুনরায় বলিল,—ইন্‌কো তুম সব গোড় লাগে (প্রণাম করো)। তখন প্রত্যেক জন প্রণাম করিয়া, একে একে কাগজে নাম সহি করিয়া আনন্দ কোলাহল করিয়া চলিয়া গেল; সে শব্দ দূর দূরান্তর প্রতিধ্বনিত হইল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

শ্রাবণমাসের কৃষ্ণাচতুর্থী, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মধ্যে মধ্যে দুই এক পসলা বৃষ্টি হইয়া যাইতেছে, সৌদামিনী থাকিয়া থাকিয়া চমকিত হইতেছে, অশনি ভীষণ নিনাদে কড় কড় করিয়া দিগ্ দিগন্ত কাঁপাইতেছে। এই ঘোরা আঁধার যামিনীতে জনশূন্য পথে কে ওই পথিক! পথিক যুবক, একখানা থান ধুতির আধখানা পরনে, আধখানা গায়ে, সর্ব্বাঙ্গ বৃষ্টিতে ভিজিয়া গিয়াছে, বর্ষার প্রবল বাতাসে এক একবার যুবার সুকোমল দেহ থর থর করিয়া কাঁপাইয়া দিতেছে, তবু ভ্রুক্ষেপ নাই, যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া চলিয়াছেন। আর সহিল না, প্রবল ঝটিকার বেগ যুবকের আর সহিলনা, তিনি কর্দ্দমময় পথে বসিয়া পড়িলেন। যেখানে যুবক বসিয়া পড়িলেন, সেখান দিয়া আর একজন মহাত্মা যাইতেছিলেন, তাঁহার ধরণ ধারণ অনেকটা সন্ন্যাসীর মত, কিন্তু কোনরূপ বাহ্যাড়ম্বর নাই। যুবকের অবস্থা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইলেন; যুবকের অবস্থা তখনও উঠিবার মত হয় নাই, তিনি নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে?"

যুবক একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, কিন্তু কথা বলিলেন না, পথিক সন্ন্যাসীর সন্দেহ আরও বাড়িল। তিনি খুব নিকটে আসিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস তুমি কে?"

অতি ক্ষীণস্বরে উত্তর পাইলেন 'আমি অতি হতভাগ্য'। যুবকের কথা শেষ না হইতে হইতে চপলা চমকিত হইল, সন্ন্যাসী দেখিলেন, মুমূর্ষ প্রায় এক যুবক, শরীর অতি দুর্ব্বল হওয়াতে, বৃষ্টি ও ঝটিকার বেগে শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; বোধ হইল যুবক পদব্রজে বহুদূর হইতে আসিয়াছেন। সন্ন্যাসী ভাবিয়া দেখিলেন আর বিলম্ব করিলে ইহার আরও শোচনীয় অবস্থা হইবে, তখন তিনি নিকটস্থ এক চটী হইতে দুইজন লোক ডাকিয়া আনিলেন, তিন জনে ধরাধরি করিয়া যুবাকে একটা ক্ষুদ্র দোকান ঘরে লইয়া গেলেন।

দোকানের মধ্যে যাইয়া সন্ন্যাসী অনেক সেবা করিতে করিতে যুবকের জ্ঞান হইল। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস এখন কেমন আছ?"

যুবক ভাবিতেছিলেন—যে আমি কোথায়? সন্ন্যাসীর সম্বোধনে তাঁহার জ্ঞান হইল, উত্তর দিলেন—আমি এখন ভাল আছি।

সন্ন্যাসী,—তুমি অদ্য আহারাদি করিয়াছিলে কি?

যুবক,—না, আমি দুই দিন আহার করি নাই।

সন্ন্যাসী দোকানদারকে ডাকিলেন। 'ফুলুকু হাজী!' ফুলুকু আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

সন্ন্যাসী কহিলেন—ফুলুকু, তোম গাইকা দুধ থোড়া হামকো দেনে সকোগে?

ফুলুকু—হাঁ হজুর সকেঙ্গে বলিয়া ফুলুকু দুগ্ধ আনিতে গেল। ফুলুকু গৃহস্থ দোকানের কিছু দূরেই তাহার খোলার বাড়ী, ফুলুকুর উঠানে প্রায় দশটা গরু বাঁধাছিল; সে অবিলম্বে খানিকটা গরম দুগ্ধ লইয়া আসিল। সন্ন্যাসী যুবককে দুগ্ধ পান করাইতে গেলেন, যুবক লজ্জিত ভাবে কহিলেন, "মহাশয় আমার প্রতি আপনি যে এত অনুগ্রহ করিতেছেন, ইহার প্রতিদান আমি কি দিতে পারিব?"

সন্ন্যাসী। আমি সন্ন্যাসী আমার জীবনের ব্রত পরের উপকার করা; আজ তোমাকে এই কষ্ট হইতে উদ্ধার করিয়া আমার পরম আনন্দ হইল এমন বুঝি আর কখনও হয় নাই।

যুবক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে সন্ন্যাসীকে নমস্কার করিলেন।

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন—বৎস তোমার নাম কি?

যুবক—আমার নাম শচীন্দ্র।

স—তুমি এপ্রকার অবস্থায় কেন বাহির হইলে ?

যুবক লজ্জায় দুঃখে মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন, পুনরায় সন্ন্যাসী বলিলেন—বৎস, তোমার বলিতে আপত্তি থাকে তবে বলিয়া কাজ নাই, তুমি কত দূর হইতে আসিয়াছ ?

যুবক—আমি বোধ হয় ৩০ ক্রোশ পথ অনাহারে চলিয়া আসিয়াছি, এখানকার নাম কি ?

স—এখানকার নাম 'রঞ্জন'।

যুবক—এ পথ দিয়া কি মধুসূদনের পাহাড়ে যাওয়া যায় ?

স—হাঁ এইতো সেই পথ।

যুবক—আপনিও কি সেখানে যাইতেছেন ?

স—হাঁ আমি সেইখানেই থাকি, মন্দার পর্ব্বতেই আমার আশ্রম।

যুবক—প্রভু আপনার নাম কি, অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি ?

স—আমার পূর্ব্বের নাম আমি কাহাকেই বলি না, তবে এখনকার নাম জীবনানন্দ স্বামী।

যুবক—প্রভু, আমাকেও আপনার শিষ্য করিয়া লইলে কৃতার্থ হই।

স—অনেক দিন সাধু সঙ্গ হইলে, সন্ন্যাসাশ্রমে বৈরাগ্য শিক্ষা করিলে তবে সাধু হওয়া যায়। তুমি আমার আশ্রমে চল, পরে তোমাকে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করিব, আপাততঃ তোমাকে নবীনানন্দ নামে অভিহিত করিলাম।

পরিচয় লওয়া শেষ হইলে নবীনানন্দ ও জীবনানন্দ উভয়ে সেখানে আহারাদি করিয়া পথ চলিলেন।

শ্রীমোহিনী দেবী।

বুয়র জাতীর ইতিহাস।

(দ্বিতীয় অধ্যায়।)

অসিতাঙ্গের প্রতি শ্বেতাঙ্গের অত্যাচার।

উপনিবেশবাসীরা নিগ্রো দাস ক্রয় বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। পক্ষান্তরে ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মলক্কা জাবা এবং স্পাইস্ দ্বীপপুঞ্জ হইতে

বিবিধ জাতীয় লোক এই নূতন উপনিবেশে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। কোম্পানীর প্রেরিত এই সকল লোকের মধ্যে বহু সংখ্যক বিচারাদিষ্ট কারাবাসী ছিল। অর্থাৎ বটেভিয়ার বিচার আদালত কর্ত্তৃক যাহারা অপরাধী প্রমাণিত হইত, কিম্বা যাহারা রাজবিদ্রোহী বলিয়া দণ্ডিত হইত, কোম্পানি তাহাদিগকে এই সকল স্থানে প্রেরণ করিতেন। ১৬৮২ সালে সেক জোসেফ নামক জাবা দ্বীপের জনৈক সম্ভ্রান্ত মুসলমান ডাচ্‌দিগের বিদ্রোহী বলিয়া সপরিবারে ঐ স্থানে নির্ব্বাসিত হইয়া ছিলেন, ফলস্ উপসাগরের কূলে জোসেফের সমাধি ক্ষেত্র এখনও বর্ত্তমান আছে, এবং অদ্যাবধিও আধুনিক মুসলমানগণ তাঁহার সমাধি ক্ষেত্র পবিত্র তীর্থ স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

এই প্রকারে দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তরীপ প্রদেশে ডাচ্‌দিগের উপনিবেশ স্থাপনের অব্যবহিত পরেই ইহা বিবিধ জাতীয় জনসমূহের আবাস ভূমি হইল। ডাচ্ জর্ম্মান নিগ্রো ভিন্ন এই স্থানের আদিম অধিবাসীগণ সাধারণতঃ বুসম্যান, হটেণ্টট ও বাণ্টু এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। ইংরাজ ইতিহাস লেখকেরা এই আদিম অধিবাসীদিগকে সম্পূর্ণ অসভ্য ও বন্য পশু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু বাস্তব পক্ষে স্বভাবতঃ ইহারা বন্য পশু সদৃশ ন্যায়ান্যায় জ্ঞানশূন্য ছিল না। ডাচ্‌দিগের উপনিবেশ স্থাপনের বহুকাল পূর্ব্বে পর্ত্তুগিজেরা উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া ভারতবর্ষে গমনাগমন কালে বিবিধ ঘটনা উপলক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার বুসম্যান এবং হটেণ্টটদিগের আচার ব্যবহার বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তাহাদিগের উল্লিখিত বিবরণ পাঠ করিলে এই আদিম অধিবাসীগণ যে নীতিপরায়ণ নির্ভীক ও শিষ্টাচারী ছিল সে বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের ইংরাজ ইতিহাস লেখকেরা স্বজাতীয়ের নৃশংস ও ঘৃণিত আচরণ গোপন পূর্ব্বক এই হতভাগ্য বুসম্যান, হটেণ্টট ও বাণ্টু দিগকে চোর মিথ্যাবাদী অলস বিশ্বাসঘাতক ইত্যাদি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহারা সত্যের অপলাপ করিয়া প্রকৃত অবস্থা গোপন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই। ইহাদিগকে চোর এবং বন্য পশু সদৃশ প্রমাণ করিতে না পারিলে উক্ত ইতিহাস লেখকেরা শ্বেতাঙ্গগণ ইহাদিগের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিয়াছেন তাহা আর কোন ক্রমেই সমর্থন করিতে পারিতেন না।

অনেক দার্শনিক বলিয়াছেন যে মনুষ্য বন্যজন্তুর ন্যায় ব্যবহৃত হইলে কালে

নিশ্চয়ই বন্য পশু হইয়া পড়িবে, বস্তুতঃ ডাচ ও ইংরাজদিগের নিষ্ঠুরাচরণে বুসম্যান ও হটেণ্টটেরা সত্য সত্যই বন্য পশু হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথমতঃ ডাচ দিগের আশ্রম আবাস স্থাপনের পর আশ্রম-আবাসের গবর্ণর তাঁহার অসাক্ষাতে অধীনস্থ লোকদিগকে হটেণ্টট কি বুসম্যানদিগের সহিত ক্রয় বিক্রয় করিতে দিতেন না। যখন বুসম্যান এবং হটেণ্টটরা ধাতু নির্ম্মিত বস্তুর বিনিময়ে বিশ্রাম আবাসবাসিদিগের নিকট গো মেষ ইত্যাদি বিক্রয় করিত তখন গবর্ণর স্বয়ং সেই স্থনে উপস্থিত থাকিতেন। তিনি সর্ব্বদাই এইরূপ আশঙ্কা করিতেন যে তাহার অধীনস্থ লোকেরা ছলে কৌশলে বুসম্যান কিম্বা হটেণ্টটদিগের গো মেষ ইত্যাদি অপহরণ করিলে তাহারা আর কখনও বিশ্রাম আবাসে পশ্বাদি বিক্রয় করিতে আসিবে না। কিন্তু উপনিবেশ স্থাপনের পর ডাচ্‌গণ গবর্ণরের অসাক্ষাতে বুসম্যান ও হটেণ্টটদিগের নিকট হইতে পশ্বাদি ক্রয় বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। ঈদৃশ ক্রয় বিক্রয় উপলক্ষে কখনও কখনও তাহাদিগের পশ্বাদির বা দ্রব্যের মূল্য প্রদান না করিয়া বলপূর্ব্বক তৎসমুদয় আত্মসাৎ করিতেন। সুতরাং বারম্বার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া কি বুসম্যান কি হটেণ্টট কেহই ডাচ্‌দিগের উপনিবেশে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে আসিত না। এই সময়ে বুস-ম্যান ও হটেণ্টটগণ ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া আপন আপন দলপতির শাসনে পৃথক পৃথক গ্রামে বাস করিত, ডাচ্ বুয়রগণ ইহাদিগের গো মেষ ক্রয় করিতে না পারিয়া ইহাদিগের গ্রামে প্রবেশ পূর্ব্বক পশ্বাদি বল পূর্ব্বক অপহরণ করিতে আরম্ভ করিলেন; অধিকন্তু ঈদৃশ দস্যুবৃত্তি দ্বারা উপনিবেশ বাসীগণ বিলক্ষণ সম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। এতৎ সময়ে কনবেন্ নামক একজন ডাচ্ হলাণ্ডর এই উপনিবেশ বাসীদিগের অতুল ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধির বর্ণন করিয়া এক খানি পুস্তক প্রকাশ করেন। কনবেনের প্রকাশিত পুস্তক পাঠ করিয়া হলণ্ড এবং জর্ম্মনী হইতে বহুসংখ্যক লোক ধনোপার্জ্জনের আশায় এই উপনিবেশে আসিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের আগমনে উপনিবেশ বাসীদিগের নূতন ভূমি অধিকারের ও দাস দাসী সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন হইল।

নূতন ভূমি অধিকার পূর্ব্বক রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধির নিমিত্ত ডাচ্‌গণের মধ্যে 'কমেণ্ডো' প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল। এক একটি সৈন্যদল এক একটি বুসম্যান অথবা হটেণ্টট দলপতির গ্রামে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাদিগের পশ্বাদি অপহরণ

করিয়া পুরুষদিগের প্রাণবধ করিতেন। স্ত্রীলোক ও বালকদিগকে বন্দী করিয়া আনিয়া দাসত্বে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে আপনাদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইতেন। এই উপায় অবলম্বন করাতে তাহাদের কৃষি কার্য্যের সাহায্যার্থ দাস দাসীরও অভাব হইত না।

হটেণ্টট দল ডাচ্ কমেণ্ডোর আগমন সংবাদ পূর্ব্বে জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ আপন আপন গৃহ এবং দ্রব্যাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর্ব্বত গহ্বরে পলায়ন করিত। ডাচেরা নির্ব্বিবাদে তাহাদের ভূমি অধিকার করিয়া তাহাদিগের পশ্বাদি লাভ করিতেন। পরন্তু হতভাগ্য বুসম্যান ও হটেণ্টটগণ দীর্ঘ কাল পর্ব্বত গহ্বরে লুকাইয়া থাকিতে সমর্থ হইত না, স্ত্রী পুত্রের অনাহার কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা দলে দলে বাহির হইয়া তাহাদিগের অপহৃত পশ্বাদি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিত।

ইহারা দুই একজন ডাচ বার্গারের আবাসে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের অপহৃত গো মেষ ইত্যাদি গোপনে লইয়া যাইত। সময়ে সময়ে অনাহার কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া অপর কোনও হটেণ্টট দলের গো মেষ অপহরণ করিত। ইংরাজ ইতিহাসলেখকেরা ঈদৃশ ঘটনা অবলম্বন করিয়াই ইহাদিগকে চোর বিশ্বাসঘাতক ইত্যাদি নামে অভিহিত করেন। কিন্তু এই সকল সুবিজ্ঞ লেখকেরা ভ্রমেও চিন্তা করেন না যে শ্বেতাঙ্গ দিগের ঘোরতর নিষ্ঠুরাচরণই ইহাদিগকে চৌর্য্য বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য করিয়াছিল। ইংরাজ ইতিহাস লেখকেরা বলেন যে ইহাদিগের মধ্যে মনুষ্যত্ব নাই। কিন্তু যে সকল লোকের স্ত্রী পুত্র অপহৃত হইয়া অন্যের দাসত্বে নিযুক্ত হইয়াছে তাহাদের কি কখনও মনুষ্যত্ব থাকিতে পারে? নিগ্রোদাস ক্রয় বিক্রয় প্রথা অপেক্ষাও ঈদৃশ নিষ্ঠুরাচরণ মানবাত্মাকে সমধিক নিস্তেজ ও ঘৃণিত করে।

কেপকলনী প্রদেশে ডাচ্ দিগের রাজত্ব বিলোপের পর ইংরাজদিগের আধিপত্য স্থাপিত হইলে আফ্রিকার খৃষ্টিয় ধর্ম্ম প্রচারকেরা আশা করিয়াছিলেন যে বুসম্যান এবং হটেণ্টট জাতির দুরবস্থা দূর হইবে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের অবস্থা সমুন্নত করিবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু তাঁহাদের সে আশা সফল হয় নাই।

ডাচেরা কেবল বাহুবলে আদিম নিবাসীদিগের উপর নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছিল।

ইংরাজ রাজত্বকালে আইনের কৌশল এবং বাহুবল এই দুইটি জাতির অপেক্ষাকৃত অধিকতর অধঃপতনের পথ প্রস্তুত করিতে লাগিল। ইংরাজদিগের রাজ্য বৃদ্ধির লোভ দেশমধ্যে ঘোরতর অশান্তি আনয়ন করিল। এই সম্বন্ধে সমুদয় অবস্থা ও ঘটনা জানিবার ইচ্ছা হইলে পাঠকগণ খৃষ্টিয় ধর্ম্ম প্রচারক মহাত্মা রেভারেণ্ড জন ফিলিপ সাহেবের লিখিত দক্ষিণ আফ্রিকার বিবরণ পাঠ করিবেন। হটেণ্টট এবং বুসম্যানগণ যে ভীরু ছিল তাহা নহে। তাহাদিগের তীর ভিন্ন দ্বিতীয় অস্ত্র ছিল না। ইউরোপীয়দিগের বারুদ ও বন্দুকই প্রধান সহায়। এইরূপ অবস্থায় ইউরোপীয় জাতির সহিত যুদ্ধে সহজেই তাহারা পরাজিত হইত। ডাচদিগের উপনিবেশ স্থাপনের পর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে হটেণ্টটদিগকে কেহ তস্কর বা মিথ্যাবাদী বলিয়া অভিহিত করে নাই। ডাচ গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয়ের (office) প্রথম পঞ্চাশ বৎসরের কাগজ পত্রে হটেণ্টটগণ অতিশয় বিশ্বস্ত, শিষ্টাচারী এবং সত্যবাদী বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। সকল শ্রেণীস্থ হটেণ্টটগণ উত্তম লোক অর্থাৎ "good man" নামে অভিহিত হইয়াছে। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে জনৈক ডাচ ভদ্রলোকের একটি ওয়েষ্ট কোট (waist coat) অপহৃত হয়। জনৈক হটেণ্টটের কুটীরে সেই কোটটী দেখিতে পাইয়া তাহাদিগের দলপতি ও সমুদয় দলস্থ লোকেরা প্রাগুক্ত হটেণ্টটকে চোর বলিয়া ধৃত করিলেন এবং উপযুক্ত শাস্তি বিধানের নিমিত্ত যাঁহার কোট অপহৃত হইয়াছিল তাঁহার নিকট অপরাধীকে উপস্থিত করিলেন। কিন্তু পরে অনুসন্ধানে প্রকাশ হয় যে জনৈক নিগ্রো দাস সেই কোট অপহরণ করিয়াছিল। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তৎকালের হটেণ্টট দিগের হৃদয় দয়া মায়া এবং এবং কৃতজ্ঞতা পরিশূন্য ছিল না। তাহাদের কেহ উপকার করিলে তাহারা প্রাণপণে প্রত্যুপকারের চেষ্টা করিত।

বুসম্যানদিগের সৎগুণের বিষয়ও পরিব্রাজকেরা স্বীয় স্বীয় পুস্তকে অনেকানেক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন।

বাণ্টু জাতীয় লোকেরা অনেক শ্রেণীতে বিভক্ত। জুলু কোসার বা লেডি ফিঙ্গো গ্রিনি ইত্যাদি এই সমুদয় জাতির সাধারণ নাম বাণ্টু। কিন্তু বাণ্টু শব্দ পণ্ডিতেরাই ব্যবহার করেন। বাণ্ট জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ লোক কাফির নামে পরিচিত।

ইংরাজেরা জুলু, সিজি, মাতাবিনি সকলকেই কাকের নামে অভিহিত করেন। ইহাদের প্রত্যেক জাতিরই এক একজন দলপতি থাকে, তিনিই আপন দলস্থ লোকদিকের রাজা নেতা এবং সৈন্যাধ্যক্ষের কার্য্য করেন। ডাচ্ এবং ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ কাফিরদিগের অনেকবার যুদ্ধ হইয়াছে।

ডাচ্ এবং ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধাবসানে অনেক কাফির দলপতির রাজ্য আত্মসাৎ করিয়াছেন। এই সকল কাফির যুদ্ধের বিবরণ যথা স্থানে পরবর্ত্তী অধ্যায় সমূহে বিবৃত হইবে। উপরি উক্ত বিবিধ শ্রেণী হটেণ্টট ভিন্ন গ্রিকোয়া জাতিও হটেণ্টটের এক শাখা বলিয়া পরিগণিত হয়। গ্রিকোয়া হটেণ্টটগণ শ্বেতাঙ্গদিগের ঔরসে হটেণ্টট রমণীর গর্ভজাত সন্তান। ডাচ এবং ইংরাজগণ ইহাদিগকেও অতিশয় ঘৃণা করেন। ইহাদিগের বিষয়ও যথাস্থানে বিশেষরূপে উল্লিখিত হইবে।

ডাচ এবং ইংরাজদিগের এই প্রদেশে আগমনের পূর্ব্বে দক্ষিণ আফ্রিকার বুসম্যান, হটেণ্টট এবং কাফিরগণ সুখ ও স্বচ্ছন্দতা সহকারে বাস করিতে ছিল। ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা ভিন্ন ভিন্ন দলের মধ্যে সর্ব্বদা বিবাদ বা যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা ছিল না; তাহাদিগের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ব্যবহার ভদ্রোচিত ও ক্ষমাশীল ছিল, তাহাদিগের প্রকৃতি নম্র এবং শান্ত ছিল। তাহাদিগের নৈতিক জীবনও অপেক্ষাকৃত পবিত্র ছিল। কিন্তু ইউরোপীয় স্বার্থপর লোকেরা হটেণ্টট ও বুসম্যানদিগের দাসত্বে নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগের আত্মোন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। ইউরোপীয়দিগের সংস্পর্শে তাহারা বিবিধ পাপাচার শিক্ষা করিয়াছে। ডাচ্ এবং ইংরেজেরা বলেন যে হটেণ্টট প্রভৃতি জাতিগণ দাসত্ব অবস্থায় স্বাধীনাবস্থা অপেক্ষা অধিক সুখে কালযাপন করিয়াছেন; কিন্তু ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে প্রমাণ করিতেছে যে, সহানুভূতিপরিশূন্য প্রবল জাতির শাসনে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল জাতির সর্ব্বদাই অবনতি হয়।

তৃতীয় অধ্যায়।

ডাচ্ গবর্ণমেণ্টের অত্যাচার।

১৬৬২ খ্রীঃ অব্দে জান্ ভান্ রিবেক উপনিবেশের অধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু তাঁহার সময়ে পর্য্যন্ত ডাচ্‌দিগের অধিকারে যে পরিমাণ ভূমি

ছিল তৎসমুদয়ই বাহুবলে অধিকার করিয়াছিলেন। উপনিবেশ সংস্থাপনের বিংশতি বৎসর পরে বটেবিয়ার হাইকোর্টের জজ আরনুট ভান্ ওবারবিক্ (Arnout Van Overbeke) বটেবিয়া হইতে হল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তনকালে এই নূতন উপনিবেশ পরিদর্শন করিলেন। দেশীয় আদিম অধিবাসিদিগের ভূমি বাহুবলে অধিকার করা তিনি অত্যন্ত ন্যায় বিরুদ্ধ মনে করিয়া নিকটস্থিত হটেণ্টট দলপতিদিগের নিকট ভূমি ক্রয় করিবার প্রস্তাব করেন। হটেণ্টট দলপতিগণ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলে, তিনি নয় কি দশ পাউণ্ড মূল্যের ধাতু নির্ম্মিত দ্রব্যের ১৬০০ পাউণ্ড মূল্য ধরিয়া তাহার বিনিময়ে সানডান্হা উপসাগর হইতে ফলস্ উপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূমি ক্রয় করিলেন। প্রাগুক্ত হটেণ্টট দলপতিগণ বিলক্ষণ জানিতেন যে এই সুপ্রশস্থ ভূমিখণ্ড তাহারা বিক্রয় না করিলেও ডাচ্‌গণ নিশ্চয়ই বাহুবলে অধিকার করিবেন। সুতরাং ডাচেরা যে সামান্য মূল্য প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহাই গ্রহণ পূর্ব্বক কেপ কলোনি প্রদেশ তাহাদিগকে প্রদান করিলেন।

অধ্যক্ষ জান ভান্ রিবেকের পদত্যাগের পর ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী উপযুক্ত লোকের অভাবে তাহাদিগের পুরাতন কর্ম্মচারীদিগের মধ্য হইতে অত্যন্ত অনুপযুক্ত এবং অর্থলোভী লোকদিগকে ক্রমান্বয়ে উপনিবেশে অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন।

১৬৭২ খ্রী অব্দে ইসব্রাণ্ড গস্ক (Isbrand Goske) গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হইলেন। এই সময় ইংলণ্ডের সহিত হল্যাণ্ডের যুদ্ধারম্ভ হইলে নূতন গবর্ণর ইংলণ্ডের আক্রমণ হইতে উপনিবেশ রক্ষার্থ বিবিধ আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বে ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও হলণ্ডের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল, উপনিবেশে আর কোনও আয়োজনের প্রয়োজন রহিল না। তৎপরে ১৬৭৯ সনে সাইমন ভান ডার্ ষ্টেল (Simcon Van Dar Stell) কেপ কলোনির উপনিবেশের গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হন। ডাচ্ গবর্ণরদিগের মধ্যে ইনি একজন কার্য্যাধ্যক্ষ কর্ম্মচারী ছিলেন, ইহাঁর শাসনকালে ডাচ্‌গণ কেপ কলোনীর উত্তর প্রান্তস্থ অধিকাংশ ভূমি অধিকার করেন।

১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে ফরাসিদেশের অধিপতি চতুর্দ্দশ লুই ন্যান্স এর (Edict of Nantes) রাজাজ্ঞা রহিত করিলেন। উক্ত রাজাজ্ঞা অনুসারে ফরাশি রাজ্যে

প্রোটেষ্টান্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগের যে সকল অধিকার ছিল তাহা বিলোপ হইল। সুতরাং Huguenot নামে পরিচিত ফরাশি দেশের প্রোটেষ্টান্ট ধর্ম্মাবলম্বীগণ স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেপ কলোনিতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ট্রান্সভাল রাজ্যের বুয়ারদিগের সেনাপতি জুবেয়ার (Joubert) এই ফরাসী উপনিবেশবাসীদিগের বংশোদ্ভুত ছিলেন। নবাগত ফরাসিগণ অনতিবিলম্বে ডাচ্‌দিগের সহিত মিশ্রিত হইলেন। সাইমন ভান্ ডার ষ্টেলের পর তাঁহার পুত্র আড্রিয়ান ভান্ ডার্ ষ্টেল ১৭০১ খৃষ্টাব্দে গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হয়েন। ইনি যে কেবল আদিম অধিবাসীগণের উপর নিষ্ঠুরাচরণ করিতেন ও উৎকোচ গ্রহণ করিতেন তাহা নহে, উপনিবেশবাসী ডাচ্‌গণের প্রতিও অত্যাচার করিতে কিছু মাত্র ত্রুটি করেন নাই।

১৭০৫ খৃষ্টাব্দে জোহানিস্ ষ্টেয়ারবার্গ কুপ্ট (Johannes Sterreburg Kupt) নামে একজন লাণ্ডড্রাষ্ট (ম্যাজিষ্ট্রেট) ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে গাভী ক্রয় করিবার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন হটেণ্টট এবং বুসম্যানদিগের গ্রামে গমন করেন। তাঁহার দৈনিক পুস্তকে দেশের তৎকালের অবস্থা উল্লিখিত হইয়াছে। ডাচ্‌দিগের অত্যাচর ও নিষ্ঠুর ব্যবহারে যে হটেণ্টট এবং বুসম্যানগণ অতি দূরে দূরে বাস করিতেছিল এবং ডাচদিগকে যে তাহারা অত্যন্ত অবিশ্বাস করিত তাহা কুপ্‌টের লিখিত বিবরণ বিলক্ষণ সপ্রমাণ করে। বলা বাহুল্য যে এই নিমিত্তই কুপ্‌ট বহুক্লেশ স্বীকার করিয়াও অধিক গাভী ক্রয় করিতে সমর্থ হয়েন নাই। বস্তুতঃ উইলহেম আড্রিয়ান ভান ডার ষ্টেলের সময়ই আদিম অধিবাসী-দিগের উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। স্বার্থপর ডাচ-গণ এই সময়ে হলণ্ডের গবর্ণমেণ্টকে লিখিলেন যে দস্যুবৃত্তি অবলম্বী হটেণ্টট বুসম্যান এবং কাফিরগণ সর্ব্বদাই তাহাদের গো মেষ অপহরণ করে।

হলণ্ডের গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ের সত্যাসত্য অনুসন্ধান না করিয়াই সমগ্র কাফির হটেণ্টট এবং বুসম্যানদিগকে একেবারে বিনাশ করিবার আদেশ প্রেরণ করিলেন। দলে দলে ডাচ্ কমেণ্ডো (সৈন্য দল) এক এক প্রদেশে প্রবেশ করিয়া হটেণ্টট এবং বুসম্যানদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। স্ত্রীলোক এবং বালকদিগকে অধিকাংশ স্থলেই বিনাশ না করিয়া দাসত্বে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে বন্দী করিয়া লইয়া আসিতেন। কিন্তু কোন কোন গ্রামের স্ত্রীলোক

এবং বালক বালকদিগেরও প্রাণ বধ করিতেন। যে সৈন্যদল যে গ্রাম লুণ্ঠন করিতেন সেই গ্রামের ভূমি তাহাদিগের মধ্যে বিভক্ত হইত, এবং ঐ সৈন্যদলের মধ্যে যে ব্যক্তি যত অধিক লোকের প্রাণবধ করিতেন শৌর্য্য প্রকাশার্থে তিনি তাহার এক একটি তালিকা গবর্ণমেণ্ট আফিসে প্রেরণ করিতেন। ডাচ্ গবর্ণর উইলহেম আড্রিয়ান অত্যন্ত অর্থলোভী ছিলেন, এমন কি ডাচ্গণও তাঁহার আচরণে বিরক্ত হইয়া হলণ্ড গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, এই অভিযোগ অনুসন্ধানের পর উইল হেম আড্রিয়ান ভান ডার পদচ্যুত হইলেন।

তাঁহার পদচ্যুতির দীর্ঘকাল পরে ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে রিকটালবাঘ (Ryk Tulbagh.) গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হইলেন। ইঁহার শাসন কালে পূর্ব্বদিকে নিটন্ফিস নদী এবং উত্তরে অরেঞ্জ নদীর শাখা পর্য্যন্ত উপনিবেশবাসিগণ অধিকার করিলেন। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে রিকটাল বাঘের মৃত্যু হইলে মেস্তর জোয়াকিম ভান প্লেটেনবার্গ গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হয়েন। তাঁহার শাসন কালে উত্তর প্রদেশের বুসম্যানদিগের সঙ্গে প্রথমে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে পাঁচশত তিনজন বুসম্যান হত হইয়াছিল। এই ঘটনার পর পূর্ব্ব প্রদেশের কোসা নামে অভিহিত কাফিরদিগের সহিত বিবাদারম্ভ হয়। বিংশ পঞ্চবিংশ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল হটেণ্টট বালক ডাচদিগের দাসত্বে নিযুক্ত হইয়াছিল এবং ডাসদিগের ঔরসে হটেণ্টট রমণীদিগের গর্ভে যে সকল হটেণ্টট জন্মিয়াছিল বর্ত্তমান প্রথম কাফির যুদ্ধের সময় তাহারা ডাচদিগের সৈনিক দল ভুক্ত হইয়া সংগ্রামে কাফিরগণকে বারম্বার পরাজিত করে। এই সময়ে উপনিবেশবাসী শ্বেতাঙ্গগণ হটেণ্টটদিগের সাহায্যেই কাফিরদিগকে পরাভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সহিত নেথার লেণ্ডের পুনরায় যুদ্ধারম্ভ হয়। কেপ কলোনি প্রদেশ হস্তগত করিবার অভিলাষ ইংরাজদিগের পূর্ব্ব হইতেই ছিল; এই সুযোগে তাঁহারা কমডোর জনাষ্টান নামক যুদ্ধ জাহাজ কেপকলোনিতে প্রেরণ করিলেন কিন্তু ফরাসিদিগের সাহায্যে ইংরাজ আক্রমণ হইতে ডাচ উপনিবেশ এবার সংরক্ষিত হইল।

ডাচগণ প্লিটেনবর্গের বিরুদ্ধেও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট অভিযোগ করিয়াছিলেন। কোম্পানী এই সময় ঋণদায়গ্রস্ত হইয়াছিলেন বলিয়া অভি-

যোগের বিশেষ অনুসন্ধান করিলেন না। কেপকলোনির উপর ইংরাজদিগের স্থির দৃষ্টি রহিয়াছে দেখিয়া কেন তাহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত পুনরায় ঋণ করিয়া দুর্গ নির্ম্মাণের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন, এবং ডাচ্ ষ্টেট জেনারেলের সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক কর্ণেলিস্ জেকব ভান ডি গ্রাফকে (Cornelis Jacob Van de Groff) গবর্ণরের পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার সহিত একদল জর্ম্মান ও সুইস সৈন্য উপনিবেশে প্রেরণ করিলেন। নূতন গবর্ণর ভান ডি গ্রাফ কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের অসদাচরণ নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। কর্ম্মচারীগণ মনে করিতেন যে উপনিবেশ সংরক্ষণের আর উপায় নাই, সত্বরই ইহা অন্যের হস্তগত হইবে অতএব এই অবসরে যে প্রকারে হয় যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিতেই হইবে। গবর্ণরও স্বয়ং কোম্পানীর অর্থ যথেচ্ছা ব্যয় করিতে লাগিলেন এবং অত্যন্ত সমারোহ সহকারে বাস করিতেন। কাজে কাজেই কোম্পানী ইতিপূর্ব্বে যে ঋণ করিয়াছিলেন তাহা নিঃশেষিত হইয়া গেল এবং দুর্গ নির্ম্মাণ ও যুদ্ধের অপরাপর আয়োজন স্থগিত রাখিবার প্রয়োজন হইল।

ইহার কিছুকলে পরে ডাচ্ ষ্টেট্ জেনারেল কোম্পানির আর্থিক অবস্থা পরীক্ষা করিবার উদ্দেশে কমিশন নিযুক্ত করিলেন। কমিশনারদ্বয় টাক্স বৃদ্ধি করিয়া কোম্পানীর অর্থাভাব কিঞ্চিৎ মোচন করিলেন, এবং পূর্ব্ব প্রচলিত শাসন প্রণালী অক্ষুন্ন রাখিয়া উপনিবেশবাসীদিগের উল্লিখিত অত্যাচার সমূহ অপনোদন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময় পুনর্ব্বার কাফিরদিগের সহিত যুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল।

জনৈক কোসা দলপতির মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র এবং একমাত্র উত্তরাধিকারী গেকা (Gaika) অত্যন্ত শিশু ছিল। গেকার খুল্লতাত লাম্বি তাহার অভিভাবক হইয়া দলপতিরূপে নির্ব্বাচিত হইল, কিন্তু কোসাদিগের মধ্যে দুই একদল লোক লাম্বিকে (Ndlambe) দলপতি স্বীকার করিতে অসম্মত হইল। ইতিপূর্ব্বে তাহাদিগের বাস ভূমি ডাচ্গণ কেপ কলোনি ভুক্ত করিয়াছিলেন এই নিমিত্ত এক্ষণে তাহারা লাম্বী অধিকৃত প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া কিস্ নদী পার হইয়া পুনর্ব্বার কেপ কলোনিতে প্রবেশ পূর্ব্বক কয়েকজন ডাচ্কে তাহাদের বাস স্থান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। অতঃপর গ্রাফরিণেট ডিষ্ট্রিক্টের ল্যাণ্ডড্রাষ্ট

বার্গারদিগকে সংগ্রামার্থ একত্রিত করিতে লাগিলেন, এবং কেপ টাউন হইতে তাহাদিগের সাহায্যার্থ একশত সৈনিক পুরুষ প্রেরণের জন্য আবেদন করিলেন। কিন্তু কেপ টাউনের গবর্ণমেণ্ট লিখিলেন যে কোসাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে; যে প্রকারে হউক তাহাদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতেই হইবে। পরন্তু গবর্ণমেণ্টের এই আদেশ প্রাপ্তির পূর্ব্বেই গ্রাফিরি নেটের বার্গার গণ কোসাদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগকে কিস্ নদীর অপর পার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য যে বার্গরগণ গবর্ণমেণ্টের এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত অনিচ্ছা ও বিরক্তির সহিত বিবাদ মীমাংসার জন্য কোসাদিগের নিকট দুই জন দূত প্রেরণ করিলেন। এই দূতদ্বয় কোসাদিগকে বিবিধ দ্রব্যাদি উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান পূর্ব্বক তাহাদিগকে ফিস্ নদীর দক্ষিণ ও পশ্চিম পার্শ্বের ভূমি পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোসাগণ তাহাতে কোন ক্রমেই সম্মত হইল না। অগত্যা দূতদ্বয় কোন প্রকার উপদ্রব না করিলে কোসাদিগকে কাউই নদী ও ফিস্ নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান সমূহে বাস করিতে দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

এই ঘটনার চারি বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে কোসা এবং অন্যান্য কাফির দলের সহিত ডাচ্ বার্গারদিগের পুনরায় যুদ্ধারম্ভের উপক্রম হয়। কিন্তু এই যুদ্ধ উপলক্ষে ডাচ্ গবর্ণমেণ্ট যাহাকে সেনাপতি পদে বরণ করিয়া ছিলেন তিনি অন্যান্য ডাচ্‌দিগের ন্যায় স্বার্থপর ও ন্যায় অন্যায় জ্ঞান শূন্য ছিলেন না।

ক্রমশঃ—

দৈনিক-ঘটনা-সংগ্রহ।

শ্রাবণ।

৩১ শ্রাবণ, ২০শে জুলাই। ঢোলপুরাধিপতি নিউমোনিয়া রোগে পরলোক গমন করেন। ঐ দিনেই তাঁহার মহিষীও গতায়ু হন। প্রবাদ, স্বামী শোক মহারাণীর মৃত্যুর কারণ। এই রূপ ঘটনা এই কলিকালে বিরল। ক্রুগার-পত্নীও আজ পরলোক গমন করেন।

মিসেস্ ক্রুগার একজন সামান্য কৃষকের দুহিতা। তাঁহার মন অতি উচ্চছিল; প্রেসিডেণ্ট

পত্নী হইয়াও তাঁহার অন্তঃকরণের সরলভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। তিনি রাজ সভার আড়ম্বর পূর্ণ আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তে সাধারণ চলিত আচার ব্যবহারগুলি ভালবাসিতেন সাধারণ লোকের সহিত মিশিতেন এবং স্বদেশের যাহাতে ইষ্ট হয় তাহার জন্য সচেষ্টিত ছিলেন তিনি একজন আদর্শ রমণী। তিনি ক্রুগারের সকল কার্য্যে সহায়তা করিতেন, তাঁহার ও ক্রুগারের মধ্যে কখন মনোমালিন্য হয় নাই।

৫ ই শ্রাবণ, ২১শে জুলাই। সিলিয়ারের সৈন্য ক্রুনষ্টাডের নিকট সহসা আক্রান্ত হইয়া পাইন কফিন সৈন্য কর্তৃক পরাজিত হইয়া কর্ণেল লিউকিন কণ্টিনে লাটিগ নকে পরাজিত করেন।

৯ ই শ্রাবণ, ২৫ শে জুলাই। এই প্রকার শুনিতে পাওয়া যায় মানচুরিয়া নগরের বিদ্রোহী সৈন্য কর্তৃক রুসিয়ান ও চীনগণ পরাজিত হয়।

বিকানীরের মহারাজা কে, সি, আই, ই, উপাধিতে ভূষিত হন। গোয়ালিয়রের মহারাজা ভারতেশ্বরের এ-ডি-কং নিযুক্ত হন। চীন যুদ্ধে সহায়তা করার দরুণ ইহাঁদের এই সম্মান লাভ হয়।

১২ই শ্রাবণ, ২৮ শে জুলাই। ডুন নদীর নিকট বুয়ার সৈন্য কর্তৃক ইংরাজ সৈন্য পরাজিত হয়।

১৩ই শ্রাবণ ২৯শে জুলাই। বিদ্যাসাগর স্মৃতি-সভা অনেক স্থলে আহুত হয়।

১৫ ই শ্রাবণ, ৩১ শে জুলাই। কেনথর্ণ (লর্ড লেমিংটন?) সিলোনের গভর্ণর নিযুক্ত হন।

১৭ ই শ্রাবণ, ২ রা আগষ্ট। সিমলা শৈলে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হয়।

১৯ শে শ্রাবণ, ৪ ঠা আগষ্ট। দুইজন বুয়ার অরেঞ্জ রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট ষ্টীনের পত্র লইয়া ক্রুনষ্টাডে পৌঁছায়।

বঙ্গেশ্বর সিমলা-শৈলে যাত্রা করেন।

২০ শে শ্রাবণ, ৫ ই আগষ্ট। স্বর্গীয়া ভারতেশ্বরীর জ্যেষ্ঠ কন্যা—স্বর্গগত জর্ম্মন সম্রাট তৃতীয় ফ্রেডরিকের পত্নী—বর্ত্তমান জর্ম্মন সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়মের জননী মহারাণী ফ্রেডরিক পরলোক গমন করেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে জন্ম-গ্রহণ করেন, ১৮৫৬ সালে বিবাহ হয়, ১৮৮৮ সালে বিধবা হন।

২১ শে শ্রাবণ, ৬ই আগষ্ট। বঙ্গদেশের অনেক স্থলে ভূমিকম্প হয়।

২২ শে শ্রাবণ, ৭ ই আগষ্ট। লর্ড-কিচ্‌নার ঘোষণা করেন যে সকল বুয়ার ১৫ ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে আত্মসমর্পণ না করিবে, তাহারা চির-নির্ব্বাসিত হইবে।

২৩ শে শ্রাবণ ৮ ই আগষ্ট। সেবি নদীর নিকট ষ্টিনাকারের ২৫ জন অশ্বারোহী সৈন্য বুয়ার কর্তৃক ধৃত হয়।

২৪ শে শ্রাবণ, ৯ ই আগষ্ট। প্রিন্স হেনরী অব অরলিন্স এর মৃত্যু হয়।

২৬শে শ্রাবণ, ১১ই আগষ্ট ইটালীর রাজ-নীতিজ্ঞ ক্রীস্পির মৃত্যু হয়। ১৮১৯ সালে ইহার জন্ম হয়।

৩০শে শ্রাবণ, ১৫ই আগষ্ট। ল্যাণ্ড হোল্ডার এসোসিয়েশন নামক নূতন জমিদার সভার গঠন হয়।

কলিকাতা, ২৫।১নং স্কট্‌স্ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত ও ভবানিপুর, ১৬, চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযোগেন্দ্রলাল রায় কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম খণ্ড। আশ্বিন, ১৩০৮। অষ্টম সংখ্যা।



শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম, এ, বি, এ ও
শ্রীহরেন্দ্রলাল রায় বি, এল সম্পাদিত।

লেখকগণের নাম।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম, এ (ভূতপূর্ব্ব-আর্য্যদর্শন সম্পাদক
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বি, এ ; শ্রীচন্দ্রশেখর সেন, Bar-at-law ; পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ বেদান্ত সাংখ্যতীর্থ ;
শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় এম, এ ; শ্রীবিজয়চন্দ্র
মজুমদার বি, এল ; শ্রীবিশ্বেশ্বর
দাস বি, এ।

সূচী।

	বিষয়।	পৃষ্ঠা		বিষয়	পৃষ্ঠা।
১।	আহার ...	৩৮৩	৫।	সাধকের প্রথম অবস্থা	৪০৪
২।	হায়রে সেকাল (কবিতা)	৩৯২	৬।	হিন্দু সমাজ ও হিন্দুধর্ম্ম	৪১৩
৩।	অদ্বৈতবাদ ...	৩৯৪	৭।	আমাদের দুঃখ কাহিনী	৪১৮
৪।	কর্ম্মবাদ, পুনর্জ্জন্ম ও থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায়	৩৯৯	৮।	সীতা (নাটক)	৪২৪
			৯।	দৈনিক ঘটনা সংগ্রহ	৪৩৭

নবপ্রভা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

১ম খণ্ড। } কলিকাতা, আশ্বিন, ১৩০৮ সাল। { ৮ম সংখ্যা।

আহার।

অনেক ভাবিয়া স্থির করিয়াছি যে আহার করা এবং ভূতের ব্যাগার খাটা উভয়ই সমান। আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, কেন?

অবশ্য আপনি এবিষয় ভাল করিয়া জ্ঞাত নহেন, এবং আংশিকরূপে জানিলেও গভীর চিন্তাপূর্ব্বক তাহার মূলতত্ত্ব অনুসন্ধান করেন নাই। বোধ হয় আপনার যথেষ্ট সময় নাই এবং থাকিলেও অন্যান্য সাংসারিক চিন্তায় সময় কাটিয়া যায়। অতএব আপনাকে আপ্যায়িত করিবার অভিপ্রায়ে কতকগুলি কথা বলা আমার বিশেষ কর্ত্তব্য।

আমাদিগের দেহের মধ্যে একটী রন্ধনশালা আছে। এ কথা বোধ হয় আপনি জানেন। গৃহিণী কিম্বা পাঁড়ে ঠাকুর মৎসা, মাংস প্রভৃতি উপাদেয় সামগ্রী অন্নের সহিত একত্র করিয়া আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিলে অবশ্যই আমরা পরম আপ্যায়িত হই। যথারীতি চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয় প্রভৃতি নানাজাতীয় খাদ্য জীবশরীরস্থ গহ্বরে ইন্দ্রিয়গণের (কর্ম্মেন্দ্রিয়) সাহায্যে প্রবিষ্ট হইলে ইন্দ্রিয়গণ (জ্ঞানেন্দ্রিয়) পরিতুষ্ট হন। অথচ ইন্দ্রিয়গণ প্রথমতঃ তাহার কোন অংশই পান না। এ স্থলে আপনি আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন যদি ইন্দ্রিয়গণ প্রথমতঃ ভুক্ত সামগ্রীর কোন অংশ পান না তবে মুখ দিয়া জল পড়ে কেন? অতএব নিশ্চয়ই অন্নব্যঞ্জনের সূক্ষ্মভাগ কোন প্রকারে আকর্ষণ করিয়া ইন্দ্রিয়গণ চরিতার্থ হন।

আমি বলি তাহা সত্য বটে, কিন্তু মনে করুন যদি জিহ্বার অগ্রভাগে রোহিত মৎস্যের ঝোল কিম্বা নাসিকার অগ্রভাগে আনারসের চাটনি স্পর্শমাত্র করিয়া আমরা উক্ত পদার্থকে সরাইয়া লই তাহা হইলে ইন্দ্রিয়গণ চরিতার্থ হইতে পারেন, কিন্তু কেবল ঐরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে ইন্দ্রিয়বর্গের দেহ কয়দিন বাঁচে? রক্ত, মাংস, অস্থি মজ্জা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের দেহ অথবা ভিত্তি, তাহার পরিপুষ্টি না হইলে ইন্দ্রিয় তিষ্ঠিবেন কি উপায়ে?

আপনি ইহার উত্তরে বলিতে পারেন যে ইন্দ্রিয়গণ প্রথমতঃ খাদ্য সামগ্রী কিম্বা অন্ন প্রভৃতি approve (অনুমোদন) না করিলে তাহারা গহ্বরে যাইতে দিবে কেন? অবশ্য কথাটা সার বটে। তর্কে আপনিই জয়ী হইলেন।

এখন দেখা যাইতেছে যে ইন্দ্রিয়গণ অনুমোদন না করিলে "আমি" কোন প্রকার অন্ন গ্রহণ করিতে স্বীকার করি না। অতএব ইন্দ্রিয়রূপী পঞ্চভূত কিম্বা পঞ্চ দেবতাকে অন্নের সূক্ষ্মাংশের আস্বাদন প্রথমে প্রদান করিয়া এবং তাহাদিগের সম্মতি গ্রহণ করিয়া দেহাভ্যন্তরস্থ রন্ধনশালায় অন্নব্যঞ্জন প্রভৃতি আমরা লইয়া যাই।

কিন্তু এখানেই বিচারের শেষ হইল না। কুতার্কিকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন "যদি ইন্দ্রিয় দ্বারাই তুমি পরিচালিত হইলে তাহা হইলে তুমি ত পশু", মানুষের সহিত পশুর প্রভেদ এই যে মানুষ অনেক স্থলে ইন্দ্রিয়ের সম্মতির উপেক্ষা করিয়া অনেক খামখেয়ালী কর্ম্ম করে। যদি ইন্দ্রিয় রোহিত মৎস্যের ঝোল অনুমোদন করে এবং আমি জোর করিয়া কাঁচকলা সিদ্ধ উদরে পূরি তবে কি হয়?

কথাটা জোরের কথা এবং রাগের কথাও বটে, কিন্তু এরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে তাহার উত্তর মীমাংসা কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ দেখা উচিত ইন্দ্রিয় স্বয়ং কাহার দ্বারা পরিচালিত হয়। বিজ্ঞান বলেন তোমার দেহসংরক্ষণোপযোগী খাদ্য দেহই কিংবা প্রকৃতি বাছিয়া লয় এবং ইন্দ্রিয়গণ দেহাধিষ্ঠিত কীটাণু কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া তাহারই অনুমোদন করে। অর্থাৎ কীটাণুর সহিত ইন্দ্রিয়ের একটী conspiracy (ষড়যন্ত্র) আছে। যখন পশু ছিলাম সেই ঐতিহাসিক সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমানের আবর্ত্তিত অবস্থা পর্য্যন্ত এই ষড়যন্ত্র চলিয়া আসিতেছে। ইহার ফলে ইন্দ্রিয়বর্গের কতক-

গুলি সংস্কার কিংবা habit দাঁড়াইয়া গিয়াছে। পিতারূপ আবরণ হইতে পুত্র, পুত্ররূপ আবরণ হইতে পৌত্রে কিংবা প্রপৌত্রে সেই সংস্কারগুলি বদ্ধমূল হইয়া ইন্দ্রিয়গণ একটি সাধারণ তন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছে, আমি-বেচারা তাহার মধ্যে নিরুপায় নিঃসহায়।

আমি বলি ঈশ্বরের রাজ্যে এরূপ সাধারণতন্ত্রের বাড়াবাড়ি ভাল নয়। আমি মানুষ, দেহের রাজা। ইন্দ্রিয়গণ আমার অধীন। আমি কেন এরূপ পাশবিক প্রথাকে প্রশ্রয় দিব?

এ কথাটাও জোরের এবং রাগের কথা নিশ্চয়। কিন্তু মনে কর যদি শ্যাম সনাতন প্রথা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক মদ খাইতে আরম্ভ করেন, এবং রাম কেবল কাঁচকলার উপর নির্ভর করেন তবে সম্ভাবিত রাষ্ট্রবিপ্লব সামলায় কে?

ইহার দুইটী উত্তর শুনিতে পাই। ১। ধীরে ধীরে কীটাণু এবং ইন্দ্রিয়বর্গকে বশীভূত করিয়া আনিলে রাষ্ট্রবিপ্লব ক্রমে ক্রমে নিবৃত্তি লাভ করিয়া তুমিই দেহের রাজারূপে অধিষ্ঠিত হইবে। ২। স্বীয় উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া মদ্য কিংবা কাঁচকলা যাহা হয় একটা স্থির করিয়া ফেল।

এইরূপ তর্কস্থলে পড়িয়া স্বতঃই মনে হইতে পারে যে উদ্দেশ্যানুসারে আহার সামগ্রী বাছিয়া নূতন একটী জীবনের সূত্রপাত করি কিংবা আহারের নানাবিধ পরিবর্ত্তন দ্বারা Experiment (পরীক্ষা) করিয়া দেখি যে তাহা দ্বারা কোন নূতন জীবনের সূত্রপাত হইতে পারে কি না?

ইহার মূলে দর্শন এবং বিজ্ঞান উভয়ই আসিয়া পড়ে। শেষোক্ত experimentটা অনেক দিন করিয়াছি। প্রথমতঃ উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া আতপান্ন, গোদুগ্ধ, গোধূম, এবং কাঁচকলা প্রভৃতি যথারীতি সংগ্রহ পূর্ব্বক উদর পূরণ করিয়া এবং তাহাতে জীবনের অন্য কোন স্তরে পৌছান যায় কি না তাহারই উপর লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। অবশ্যই যখন চুপ করিয়া বসিয়া থাকি তখন পাশবিক বলের যে হ্রাস হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারি।

কিন্তু কাঁচকলা খাইয়া যে একটা কৃষ্ণ বিষ্ণুর মত লোক আমি নহি তাহাও বুঝিতে পারি। ছয়টা রিপুর প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাই যে কেবল মাত্র তৃণ ভোজন করিয়াও পশুগণের কামেচ্ছা যথেষ্ট বলবতী থাকে। লোভ আমারও যেমন গাঢ়, শ্রীমান্ অমুকেরও তথৈবচ, মোহ প্রভৃতি আমারই অধিক। অহঙ্কারের

ত কথাই নাই, প্রথমে যত ছিল, তদপেক্ষা এখন নিরামিষ খাই এই অহঙ্কারেই অস্থির, ক্রোধটা এক দিকে কমিয়াছে বটে কিন্তু যথা সময়ে মাখন, ঘৃত, দুগ্ধাদি না পাইলে গৃহ, সমাজ, এবং জগৎকে অভিশপ্ত করিয়া উগ্রতেজে নিজেই কম্পায়মান হই। ক্রমে বুঝিতে পারিলাম যে আহারের তারতম্যে পশু হইতে মানুষ হওয়া যায় না। Statistics লইয়া দেখিলাম যে নিরামিষাশী পশুগণই প্রায় চোর হয়—যথা, ছাগল, গরু, মূষিক, প্রভৃতি—প্রতিষেধ (Exceptions) গর্দ্দভ, এবং হস্তী—উভয়ই ঘোর মূর্খ অতএব আমি আপনাদিগকে মিথ্যা কথা কহিতেছি না। বিশ্বাস না হয় স্বয়ং পরীক্ষা Experiment করিয়া দেখুন। অন্ন প্রভৃতির সূক্ষ্মাংশ হইতে শুনিতে পাই প্রাকৃতিক মনের ক্ষেত্র সংগঠন হয়। হইতে পারে যে নিরামিষ হইতে ভূত Element সংগ্রহ করিয়া মনোময় দেহ রচিত হয় এবং সেই দেহ ধর্ম্মাত্মা পুরুষের চৈতন্যময় লীলাস্থানের বিশেষ উপযোগী। সে কথা পরে বক্তব্য। এবং হইতে পারে যে ক্রমোন্নতির স্তরে যখন বানর নিরামিষ ভোজী তখন মানবেরও সেই দৃষ্টান্তানুসারে নিরামিষ ভোজী হওয়া উচিত। (কিন্তু আমি একথা মানি না, কেননা অসভ্য মানুষ ঠিক বানরের উপর হইলে তাহারা মাংস পোড়া খায় কেন?) কিন্তু এ কথা নিশ্চয় যে, যেমন উচ্চ প্রবৃত্তি সকল যথা ভক্তি, করুণা অনুতাপ প্রভৃতি অন্ন হইতে সৃষ্ট নহে, তেমনি নীচ প্রবৃত্তি সকলও নহে, এবং যে নিরামিষ ভোজীর অদৃষ্টেই ঈশ্বরের করুণা সর্ব্ব প্রথমে বিকাশ হয় তাহাও নহে। উদাহরণে দেখাইতে পারা যায় যে সদাশিবের Eldest son শ্রীযুক্ত গণেশদেব অতি প্রশান্তচিত্ত ধীর এবং ধর্ম্ম-ভীরু হইলেও, তাঁহারই উপর সর্ব্বপ্রথমে শনির দৃষ্টি হইয়াছিল। (গণেশদেব যাঁহাদিগের উপর সদয় অবশ্য তাঁহারা নিরামিষ ভোজী হইলেও গৃহে মূষিকের দৌরাত্ম্য হইয়া থাকে।)

আপনি বলিবেন যে উচ্চ জগতের গুণ ঈশ্বর কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। আমিও তাহাই বলি। খাদ্য হইতে আস্বাদন সংস্কারের সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মসংস্কারে কিংবা মনের কোন বৃত্তির সৃষ্টি হইতে পারে না। খাদ্য হইতে কর্ম্ম, এবং কর্ম্ম হইতে সংস্কার নহে, বরঞ্চ সংস্কার হইতে কর্ম্ম এবং কর্ম্মানুযায়ী খাদ্যপ্রবৃত্তি হয়। বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখুন, First Function, then the organ and food। আমার একই কথা।

জড় হইয়া কোন সংস্কার হইতে পারে না। কিংবা সংস্কার জড়ের গুণের উপর নির্ভর করে না। আমার অর্থ হয়ত আপনাকে বুঝাইতে পারি নাই। রাজসিকবৃত্তিশালী পুরুষ কিংবা নারী হয়ত কাঁচা তেঁতুল ভাল বাসেন এবং তামসিক পুরুষ পান্তাভাত লবণ দিয়া খান, কিন্তু পান্তাভাত এবং কাঁচা তেঁতুল তাঁহাদিগের রাজসিক এবং তামসিক বৃত্তির সৃষ্টিকর্ত্তা নহে। সংস্কার (Potential tendency) না থাকিলে, কোন খাদ্য বিশেষ সেই সংস্কারের সৃষ্টি করিতে পারে না, তবে ইহাই বলিতে পারেন যে অন্তর্নিহিত সংস্কার খাদ্যরূপী ক্ষেত্র পাইলে পুনর্জীবিত হইয়া উঠে। যথা ম্যালেরিয়া একটী প্রাকৃতিক সংস্কার, এবং বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি সুক্ষেত্র পাইয়া সেইখানেই চৈতন্যরূপী Bacilli কিংবা কীটাণুরূপে বিচরণ করে। ইহা হইতে গৌণ উদাহরণ যথা :— আমার পিতামহ মদ্য পান করিতেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পিতা করেন নাই, কিন্তু আমি করিতেছি। Germ plasm theory অনুসারে পিতা, পিতামহ, এবং আমি একই, কিন্তু পিতার মুখে মদ্য ঢালিয়া দিলেও তিনি বাহির করিয়া ফেলিতেন, ইহার কারণে দুই দিক হইতে দুইটী theory উত্থাপিত হয়।

১। বৈজ্ঞানিক। পিতার দেহাবরণ কিংবা ক্ষেত্র Outward Circumstances অনুসারে এরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে অন্তর্নিহিত সংস্কার মোটেই চাগিয়া উঠে না, কিংবা সেই সংস্কারটুকু ভ্রাতা বিমলানন্দের Germ-plasmএ চলিয়া গিয়াছে, কিংবা সংস্কার কোন অভূতপূর্ব্ব কারণ বশতঃ এমন কোন সময়ে Stopped হইয়া গিয়াছে যাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

২। দার্শনিক। পিতার সংস্কারের সহিত পিতামহের কোন সম্বন্ধ নাই তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন জীব উড়িয়া আসিয়া দেহরূপী অশ্বত্থবৃক্ষের ডালে বসিয়াছেন, সেই দেহের কর্ত্তা পিতা এবং মাতা।

এই সব গুরুত্বশালী 'থিয়রি' পুনর্জ্জন্মতত্ত্বরূপী ভাঙ্গা অট্টালিকার কতকগুলি থাম। ইহাদের লইয়া নাড়াচাড়া করিলে অট্টালিকাটী পড়িয়া যাইতে পারে। ইহার উপর শুনিতে পাই যে খাদ্য বিশেষের পরমাণুর সঙ্গে চৈতন্য থাকে তাহা fahrenheit 140° উত্তাপে বিকৃত হয় না, এবং ভাজা মৎস্যের সহিত মানব শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া বরুণ প্রভৃতি দেবতার রাজ্যে আমাদিগকে ফেলিয়া দেয়। না জানি কেমন চৈতন্য মৎস্যের এবং পাঁঠার যে ১৪০° ডিগ্রীর উত্তাপে সে বিকৃত

হয় না এবং না জানি তাহারা কতই মূর্খ যে ভাজিবার পূর্ব্বে রন্ধনশালা হইতে উড়িয়া পলায় না কেন। যাহাই হউক পশু মাত্রেই মূর্খ এবং কীটাণুর জিঘাংসা স্বভাবসিদ্ধ এবং মোটের মাথায় আমাদিগের সমস্তই কর্ম্মফল। অতএব এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা প্রয়োজনীয় নহে।

তবে একথা মানি যে যেমন কেরাণী প্রভৃতি সংস্কার বশতঃ কানে কলম গুঁজিয়া নিজের আপিষ চিনিয়া লন, সেইরূপ সত্ত্ব, রজঃ, তম প্রভৃতি গুণশালী জীবগণ বিধাতার সৃষ্টির উপযোগী নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিতে গিয়া নিজ নিজ ক্ষেত্র চিনিয়া লন। তবে কোন কেরাণী আপিষে ইস্তফা দিয়া যদি বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করেন, তবে দিন কতক হয়ত পূর্ব্বসংস্কারানুসারে কানে কলম গুঁজিয়া ভ্রমবশতঃ লালদিঘীর ধার দিয়া আহিরীটোলার ঘাটে যাইতে পারেন। এরূপ ভ্রম স্বতঃই মার্জ্জনীয়, কিন্তু আমি কি করিয়া স্বীকার করি যে বেঙ্গল আপিষ কিংবা আহিরীটোলার ঘাট তাঁহার কেরাণীগিরি কিংবা বাণিজ্য সংস্কারের সৃষ্টিকর্ত্তা।

অতএব তর্কদ্বারা ইহাই স্থির করিতে পারেন যে কোন অলক্ষ্য শক্তি দ্বারা কর্ম্মে প্রেরিত হইয়া জীব সংস্কার বিশিষ্ট হয়, ঘাস খাইয়া ছাগলও গরু হয় না, এবং গরুও ছাগল হয় না, কিংবা ছাগল ও গরুর সংস্কার হয় না। কিন্তু বোধ হয় এই শ্রেণীর পশুগণ জগতের কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিয়া আবর্ত্তনের উদ্দেশ্য বজায় রাখে, অতএব তাহাদিগের ঘাস খাইতে হয়। এবং ইহাও দেখিতে পাই যে পশুশ্রেষ্ঠ বানর পর্য্যন্ত নিজে রন্ধন করিয়া খায় না (অবশ্য আপনি শিখাইয়া লইলে শিখিতে পারে কিন্তু তাহা তাহাদিগের স্বাভাবিক নহে, এরূপ কর্ম্ম আপনার করা উচিত নয়) অতএব ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে এই নিঃসহায় বিস্তীর্ণ প্রাণিজগতের রন্ধনশালা তাহাদিগের উদরেই বর্ত্তমান এবং প্রকৃতিই তাহার পাচিকাঠাকুরাণী।

কিন্তু মানুষে আসিয়া তাহার পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। পশুদিগের সংস্কার Simple। তাহারা প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ বশীভূত অতএব নির্দ্দিষ্ট জীবন যাপন করিয়া আপন আপন কর্ম্ম করিয়া যায়, এবং সেই অনুসারে খাদ্যসংগ্রহ করে। তাহাদিগের সংস্কার বদ্ধমূল। তাহারা অন্ধ এবং কোন মহাশক্তি দ্বারা পরিচালিত। মানুষও তাহাই অথচ মানুষের একটু স্বাধীনতা আছে।

অর্থাৎ তাহাদের প্রাকৃতিক সংস্কার থাকিলেও নিজের মনের মতন তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া অসংখ্য সংস্কার এবং ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। এই মনের মতন পরিবর্ত্তনের মূলে Free will কিংবা অদৃষ্টে আছে, তাহার বিচার এখন দূরে রাখিয়া সামান্য বিবেচনা করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, এইরূপ অসংখ্য কর্ম্ম এবং সংস্কারের নূতন সৃষ্টির অবশ্যই কোন উদ্দেশ্য আছে এবং সেই উদ্দেশ্য মানুষ যখন বিচার করিতে সক্ষম হয় তখন সে আপনার কর্ম্মের এবং তদুপযোগী খাদ্যের বাছনি নিজেই করিয়া লয়।

এখন দেখা যাউক যে আমাদিগের first issue অর্থাৎ "জীবনের উদ্দেশ্য এবং তাহার উপযোগী কর্ম্ম এবং খাদ্য কি" ইহার মূলে আহারতত্ত্বের দৌড় কতদূর। কেহ কেহ বলিতে পারেন আমার জীবনের কোন উদ্দেশ্য নাই কেবল ভাল খাওয়াই উদ্দেশ্য, যেমন এক একজন জমীদার। অবশ্য এবম্বিধ পুরুষ কিংবা নারীকে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার কিংবা প্রতাপ বাবুর হস্তে সমর্পণ করাই উচিত, আমরা তাঁহাদিগের কথা বলিতে আসি নাই।

অন্য পক্ষে অর্থাৎ মানবের উদ্দেশ্য এবং তদুপযোগী কর্ম্ম বিচার করিতে গেলে অনেক কথা আসিয়া পড়ে। মোটামুটী জীবন বা প্রাণটা কি? কেবল আহার করিয়া এবং কর্ম্ম না করিয়া জীবন ধারণ হয় কি না? কর্ম্মের স্তর এবং তারতম্যানুসারে জীবনের কত ক্ষতি বৃদ্ধি হয়? কর্ম্মানুসারে দেহাবরণের পরিবর্ত্তন এবং তাহার পরিপুষ্টির নিমিত্ত কোন প্রকার খাদ্য প্রয়োজনীয়? ইত্যাদি কতকগুলি প্রশ্ন এবং তাহার শাখা-প্রশাখা আসিয়া পড়ে।

বেশ করিয়া দেখুন। প্রাণটা নিশ্চয়ই কোন বস্তু আহার করে না। এবং বস্তু বিশেষ আহার করিলেই যে প্রাণটা চিরকাল আমার নিকট এই দেহে থাকিবে তাহাও নহে। আপনি বলিতে পারেন প্রাণ কিংবা শক্তি একটী উপাদান অথবা ক্ষেত্র না পাইলে কর্ম্মশীল হইবে কি প্রকারে? অগ্নি ত সর্ব্বত্রই আছে অথচ চকমকি ও কাষ্ঠ খড় প্রভৃতি না হইলে জ্বলে না, অতএব শক্তিরূপী দেবতাকে প্রকাশ করিতে হইলে প্রথমতঃ তাহার আহার যোগান উচিত। যদি এতদূরে উঠেন, তবে আমিও বলিতে বাধ্য যে প্রাণ অতি সূক্ষ্ম উপাদানেই নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে যেমন কেবল জল অথবা বায়ু এমন কি আকাশ পর্য্যন্ত। কিন্তু এতদূর সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত হইতে আপনার ইচ্ছা না হইতে পারে। আমার

Suggestion আপনি ফড়িং হন, কিন্তু তাহাও আপনি স্বীকার করিবেন না। কেন না আপনার ইচ্ছা যে আপনি একটু করিয়া ঈশ্বরোপাসনা, একটু করিয়া চিন্তা, একটু করিয়া জ্ঞান সঞ্চয়, একটু করিয়া ইডনগার্ডেনে ভ্রমণ, পুত্রকন্যার বিবাহ এবং ভবিষ্যতের অন্নসংস্থান, এবং তাহারই মধ্যে একটু সময় মত গান বাজনা ইয়ারর্কি প্রভৃতি সকল বিষয়েরই রস আস্বাদন করিয়া অবশেষে বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক তারকব্রহ্মযোগারূঢ় হন। অতএব দেখা উচিত আপনার প্রাণটার দৌড় কতদূর।

১। উপাসনা এবং ভক্তি

২। জ্ঞান

৩। সঙ্গীত প্রভৃতি আনন্দ

৪। বিষয় বুদ্ধি সঞ্চয় (3rd Generation পর্য্যন্ত লক্ষ্য রাখিয়া)

৫। বিষয় বৈরাগ্য সঞ্চার

৬। তারকব্রহ্মযোগ অবলম্বন।

অবশ্য আকাশ, বায়ু, অগ্নি এবং ফড়িং এর এতদূর দৌড় নাই। মানুষের প্রাণটা একটু বেতর রকমের, জগতের নানা বিভাগে সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক অনন্ত-জ্ঞান সঞ্চয় করিবার নিমিত্ত তাহার প্রাণ বহু শাখা বিশিষ্ট। পুরাকালে ঈশ্বরোপাসনা এবং ইডনগার্ডেনে ইয়ার্কি একসঙ্গে একটী জীবের হওয়া অসম্ভব ছিল। কারণ Division of labor নামক প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক ঋষিগণ বর্ণাশ্রম এবং গৃহাশ্রম প্রভৃতি নানাবিধ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। অধুনা তাহা সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিরোধী অনুমিত হওয়াতে প্রত্যেক মনুষ্যেরই ইয়ার্কি এবং ঈশ্বরোপাসনা একই দেহের এবং একই আশ্রমের বিধান।

প্রাণের দৌড় এইরূপ বাড়িয়া যাওয়াতে, অর্থাৎ উদরের আয়তন বৃদ্ধি হওয়াতে খাদ্যের অভাব স্বতঃই হওয়া সম্ভব। যেমন মধ্য ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ প্রায়ই হয়, সেইরূপ প্রাণের মধ্যদেশে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ হওয়াতে প্রাণটা দুই দিক মোটা মধ্যখানে সরু হইয়া পড়িয়াছে। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে মস্তিষ্কের দিকে যেমন চটাচটি ও বকাবকি, হস্ত পদাদির দিকে তেমনি হাঁটাহাঁটি এবং মারামারি, কিন্তু হৃদয়ের কতকগুলি সনাতন বৃত্তি আছে সেগুলি আহার না পাইলে ফলে এই দাঁড়ায় যে জীবনের শোণিত স্রোত (যাহা হৃদয় হইতে উৎপন্ন)

উৎসহীন হইয়া দুই পার্শ্বের কুক্ষিতে প্লীহা এবং যকৃৎ বৃদ্ধি করে। কাজেই বার্দ্ধক্যে উপনীত হইবার পূর্ব্বে মানুষটা ছড়িভঙ্গ হইয়া পড়ে যথা :—

এরূপ প্রাণ জীবিত থাকিলেও নয়নের গোচর হয় না। খাড়া এবং সোজা হইয়া স্থির না হইলে প্রাণরূপী শক্তির সাধ্য কি যে শতবর্ষ কিংবা ততোধিক এই দেহক্ষেত্রগুলি সামলাইয়া জীবের আয়ুর একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট করে। এই জন্যে কথায় বলে কর্ম্মই প্রাণ। তৈল সলিতা আবহমান কাল যোগাইলে প্রদীপটা সহস্র বৎসর কিংবা অনন্তকাল জ্বলিতে পারে কিন্তু অগ্নির কেবল দহনই কর্ম্ম। মানুষ নিজে নিজে জ্বলে পুড়ে, অন্যকে জ্বালায়, এবং নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য করে সুতরাং এক দিন কিংবা শতবৎসর তাহার পরমায়ু তাহা নির্ণয়করা দেহতত্ত্ববিদ্‌গণের অসাধ্য। প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক আশা, প্রত্যেক নিরাশা, প্রত্যেক উদ্যম এবং শোকদুঃখ এই অগ্নিরূপী প্রাণের বিরুদ্ধে বায়ুরূপী নিশ্বাস প্রশ্বাসের একটা ঝটিকা খাড়া করিয়া মহাদ্বন্দ্বপূর্ব্বক প্রাণটাকে দেহের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে লইয়া যায়। ইহার ফলে উদ্দেশ্যের ঠিক থাকে না, কর্ম্মের ঠিক থাকে না এবং জীবনেরও ঠিক থাকে না। বেদান্ত বলেন মানবের Plasm পঞ্চকোষ বিশিষ্ট এবং Theosophy তাহাকেই সপ্তদেহরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কোষের সংখ্যা যতই হউক না কেন প্রথমে কাঠামটা ঠিক করিতে পারিলে (Equilibrium) যাহা হউক একটা কোষ লইয়াও যদি সংসারের কোন কাজে লাগি তাহা হইলেও জীবনটা সার্থক হয় এবং তাহারই অনুসারে একটা আহারের সুবন্দোবস্ত করি। কিন্তু এক সঙ্গে পঞ্চকোষের চালনা এবং প্রত্যেক ভূমি কর্ষণ করিয়া তাহার আহার সংগ্রহ একা মানুষের কিরূপে সম্ভব। এই জন্যই প্রাণটা অস্থির হইয়া নবদ্বারের কোন একটা দ্বার দিয়া পালাইয়া যায়। কিন্তু ইহাতেও নাকি নিস্তার নাই! যেমন ব্যাঘ্রের পশ্চাতে ফেউ তেমনি প্রাণের পশ্চাতে কর্ম্ম সংস্কার এক দিন না এক দিন ধূমকেতুরূপে আবার তিনি আসিয়া মানবজগতে অবতীর্ণ হন এইরূপ শুনিতে পাই; ইহা যদি সত্য হয় তবে জ্যোতির্ব্বেত্তাগণের দৃষ্টান্ত অনুসরণপূর্ব্বক সকলেরই কর্ত্তব্য যে ধূমকেতুটার কাল ও স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করিয়া একটা বিধিবন্দোবস্ত করিয়া দেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

হায়রে সেকাল!

(১)

হায়রে সেকাল! ওরে ভুঁদো, ঠাণ্ডা হয়ে দাঁড়া—
রাত দিনই ছুটোছুটি—হাঁরে লক্ষ্মীছাড়া?
ঐ দেখ্, পা নড়্‌ছে! হাত নাড়্‌ছিস্ ফের?
ঘাড় নড়্‌ছে! মাথায় হাত? পাওনি বুঝি টের
আমি কেমন শক্ত লোক? আম্‌রা ছেলেবেলা
থাক্‌তাম সুধু চুপ্‌কোরে—জান্‌তাম নাকো খেলা।
ছ'বছরের ধেড়ে ছেলে—হায়রে কলিকাল,
শিখ্‌লিনিকো শিষ্টাচার—ভাল চলন্ চাল?

(২)

হায়রে সেকাল! লজ্জা সরম নেইকো কলিকালে;
ইচ্ছা করে থাবড়া মারি মেধো ছোঁড়ার গালে।
বৌটি নিয়ে বিদেশ যাবে! এ কি রকম প্রথা?
সবে বয়স পঁচিশ তিরিশ—ছিছি লাজের কথা!
আমরা—ও তার—মুখ দেখিনি চুল্ পাক্‌বার আগে,
সারা জন্ম কইনি কথা; তাইত জ্বলি রাগে।
জামাই বেটার পানের ডিবেয় মেয়ে রাখে পান
দিন দুপুরে! হায়রে কলি কাট্‌লি সবার কাণ?

(৩)

হায়রে সেকাল! ওরে মোনা, ও কি পড়্‌ছিস্ ছাই?
এ কালে কি সেকেলে সব ভাল গ্রন্থ নাই?
ধুত্তোরি তোর মাইকেল, মার্কো বেজায় চড়—
ফেলেদে তোর বঙ্কিম—ভারতচন্দ্রে পড়।
কোথায় গেল দাতাকর্ণ, সত্যপীরের গান!
খোনার বচন শুন্তে এখন কেউ না পাতে কাণ?

তুলোট কাগজ, খাঁকের কলম, উঠে গেল যদি—
এ কালেতে বিদ্যা সাধ্যি হবেই হবে রদি।

(৪)

হায়রে সেকাল! এখন কি কেউ আইন কানুন জানে,
বুঝলে নাকো মোনা সেদিন 'কার্য্যানঞ্চ' মানে।
জেলায় ছিল রাম মোক্তার, হাকিম স্বরূপ চাকী ;—
তেম্‌নিটি কি আর হবে গো? এখন সবি ফাঁকি।
ফোঁড়া কাটত বাঞ্ছা নাপিত, এবং দেখত নাড়ী ;—
কেউ কখনো পড়ে নিক ডাক্তারি ফাক্তারি।
নাড়ী টিপে বলে দিত কে মর্ব্বে কবে ;
এখন্ সবি ওলট পালট,—তেমন্‌টি কি হবে?

(৫)

হায়রে সেকাল! কবি ঝুমুর গেল উড়ে পুড়ে—
কোথায় গেল দাশুরায় কোথায় গোপাল উড়ে!
ঢোল কাঁশির পাইনে দেখা ; মরি অতি লাজে—
এখন কিনা ঘরের ভিতর হার্ম্মোনিয়ম্ বাজে!
কোথেকে আজগুবি রকম এলো থিয়েটার,
দেশের দফা কর্ল্লে রফা কল্কি অবতার।

(৬)

হায়রে সেকাল! কি বল গো রমাকান্ত খুড়ো?
কি আর বলি—আছি যদিন আমরা দুটি বুড়ো—
হায়রে সেকাল! হায়রে সেকাল! বুঝবে কথা কে?—
(স্বগত) সেকালেই বা কি করেছি তাওত জানিনে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

অদ্বৈতবাদ।

শঙ্করাচার্য্য বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ প্রচার করেন; এবং তাহা দৃঢ়তর করিবার অভিপ্রায়ে বেদান্তের প্রস্থানত্রয় (১) সুগভীর ভাষ্য-ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন; সেই সকল ভাষ্যে তিনি স্বমতের অনুকূলে নানাবিধ যুক্তি, তর্ক, উদাহরণ এবং নানাবিধ প্রমাণাদি সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এবং তাঁহার অভিমত তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারী হইবার জন্য যেসকল নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়, সেই সকল নিয়ম চিত্তশুদ্ধির সাধন-সামগ্রী, সাধন রহস্য, উপাসনাতত্ত্ব, কর্ম্ম ও উপাসনালভ্য ফলের তারতম্য, মুক্তির স্বরূপ, জীবন্মুক্তি, ক্রমমুক্তি, ও বিদেহমুক্তি প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সকল অতি সাবধানে অথচ বিস্তৃতরূপে নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হইবার পূর্ব্বে এইরূপ বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদের কোনও সম্প্রদায় বিশেষ ছিল কি না, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। যদিও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বৌধায়ন ও উপবর্ষাচার্য্য বেদান্ত সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না; সুতরাং তাঁহাদের সুস্পষ্ট মত কিছুই প্রকাশ করা যাইতে পারে না। কেবল লোকপ্রবাদানুসারে এবং রামানুজাচার্য্যের ভাষ্যাংশ দৃষ্টে অনুমান হয় যে, তাঁহারা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন। শঙ্করাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হইবার পূর্ব্বে 'বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ' কোন সম্প্রদায় বিশেষকে আশ্রয় না করিলেও নিজে যে অস্তিত্ব লাভ করে নাই অথবা একেবারেই স্বাধিকার চ্যুত ছিল, তাহা বলিবার যো নাই; কারণ, কলিযুগেরও বহুকাল পূর্ব্বে যে বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ ছিল, তাহা যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ আর্ষগ্রন্থ দেখিলেই নিঃসংশয়রূপে স্থির করা যায়। কেন না, তাহার প্রত্যেক প্রকরণে ও প্রত্যেক সর্গে ভূয়োভূয়ঃ এই কথাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, একমাত্র ব্রহ্ম পদার্থ সত্য, দৃশ্যমান সমস্ত জগৎই মায়াময়—অসত্য, জীব ও ব্রহ্ম এক। ইহার প্রমাণস্বরূপ একটীমাত্র শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল (২)। মনুও বহুবার সর্ব্বভূতে আত্মদর্শনের ভূয়সী

(১) বেদান্ত শাস্ত্র সাধারণতঃ প্রস্থানত্রয়ে অর্থাৎ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত :—(১) উপনিষৎ প্রস্থান, (২) সূত্র প্রস্থান এবং (৩) গীতাপ্রস্থান। সনৎসুজাতীয় সংবাদ প্রভৃতিও এই তৃতীয় প্রস্থানের অন্তর্গত।

(২) "যে কেচন জগদ্ভাবা স্তান্ বিদ্যাময়ান্ বিদুঃ। কথং তেষু কিলাস্থত্ত্বাত্তা বিদ্যো- নিমজ্জতি।" যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন (১), সুতরাং তাহা হইতেও অদ্বৈতবাদের প্রাচীনতা অনেকাংশে সমর্থিত ও প্রমাণিত হয়। মহাভারতেও প্রথমে "বহবঃ পুরুষা-রাজন্ তাহো এক এব বা" এইপ্রকার তর্ক বিতর্ক করিয়া অবশেষে সিদ্ধান্ত করিলেন যে—

"মমান্তরাত্মা তব চ যে চান্যে দেহ সংস্থিতাঃ। সর্ব্বেষাং সাক্ষিভূতোঽসৌন গ্রাহ্যঃ কেনচিৎ ক্বচিৎ"। এবং "বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বভুজঃ" ইত্যাদি বাক্য প্রপঞ্চ ও অদ্বৈতবাদেরই পক্ষাবলম্বী। অধিক কি, সমস্ত স্মৃতি, সমস্ত পুরাণ, সমস্ত ইতিহাস এবং সমস্ত তন্ত্রশাস্ত্রও কেবল এই অদ্বৈতবাদেই পরিপূর্ণ, তাহাদেরও উদ্দেশ্য অদ্বৈততত্ত্ব প্রতিপাদন করা; কিন্তু উদ্দেশ্য এক হইলেও তাহাতে বাক্য বিন্যাসের বিশেষ তারতম্য দৃষ্ট হয়; এই তারতম্য আছে বলিয়াই আপাততঃ সেই গূঢ় অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতে পারে না, এবং এই নিমিত্তই অনেক সময়ে শাস্ত্র তাৎপর্য্য অতি বিপরীত ভাবও ধারণ করে। পুরাণাদি শাস্ত্র সুহৃৎসম্মিত শাস্ত্র তাহারা প্রভুর আজ্ঞার ন্যায় আজ্ঞা প্রদানেই নিশ্চিন্ত থাকে না। উপদিষ্ট বিষয়টী বুঝাইবার অভিপ্রায়ে পূর্ব্ব ও অপূর্ব্ব বিবিধ আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়া থাকেন; সেই সকল আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য অতি মহৎ, চিত্ত আকর্ষণ করা। সর্ব্বদা বাহ্য বিষয়াসক্ত জীবগণকে যদি প্রথমে অদ্বৈত পথের পথিক করিতে চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, পরন্তু লোক সকলও বিবিধ অনর্থ-জালে জড়িত হইবে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া পুরাণাদি শাস্ত্রেতে লোকের হিতচিকীর্ষায় সোপান ক্রমে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্ম-তম তত্ত্ব সকল অতিবিশদ রূপে নির্ণীত হইয়াছে, এবং অতি দুর্ব্বোধ বিষয় সকলও আখ্যায়িকা ক্রমে উক্ত হইলে লোকের বুদ্ধিগম্য হইতে পারে; এইজন্য তর্কাংশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল তত্ত্বাংশ মাত্র সেই আখ্যায়িকাচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র। অন্য প্রমাণের আবশ্যক নাই, সামান্যতঃ এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পুরাণাদি শাস্ত্রের উদ্দেশ্য যদি অদ্বৈত তত্ত্ব না হয়, তাহা হইলে পৌরা-ণিক দেব দেবীগণের উপর ঘোরতর মিথ্যাবাদিত্ব আরোপিত করা হয়। কেননা

(১) সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি॥
মনুসংহিতা।

এরূপ কোনও পুরাণ বা তন্ত্রাদি দৃষ্টিগোচর হয় না, যাহাতে কোন এক দেব-দেবীকে সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বর বলিয়া প্রতিপাদন করা হয় নাই। দেখুন, কোন স্থানে বিষ্ণু বলিলেন যে, "অহং সর্ব্বাণি ভূতানি; মত্তঃ সর্ব্বং প্রসূয়তে"। (গীতা) কোথাও বা ভগবতীকে বলা হইয়াছে যে, "বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবিভেদাঃ স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎ সু"। ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ (মার্কণ্ডেয় পুরাণ)। কোথাও বা শিবকেই ব্রহ্ম স্বরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে; "অতীতঃ পন্থানং তব চ মহিমা বাঙ্মনসয়ো রতদ্ব্যাবৃত্ত্যা যং চকিতমভিধত্তে শ্রুতিরপি" (মহিম্নঃ স্তোত্র)। মহাশিব পুরাণেও শিবকে বলা হইয়াছে যে "অনন্তশ্চৈব সর্ব্বাত্মা সর্ব্বকারণকারণম্। ত্বমাদি দেব দেবেশ! কি মন্তং তে পরং বিভো!"॥ এই প্রকার অন্যান্য পুরাণেও বিস্তর কথা আছে, যাহাতে ব্রহ্মা, গণপতি, ইন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত দেবতাকেই স্থান বিশেষে সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; কিন্তু সেই সকল শাস্ত্রের উদ্দেশ্য যদি একত্ব বা অদ্বৈততত্ত্ব না হয়, তাহা হইলে কাহার কথাই বা শুনিব এবং কাহার পথেই বা চলিব? পরন্তু, একজনের কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেই যে অপরের কথাকে মিথ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, ইহাও বিবেচনা করা আবশ্যক। এখন কাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব এবং কাহাকেই বা মিথ্যা বলিয়া উপেক্ষা করিব? এদিকে সকলেই কিন্তু "আমি সর্ব্বময়, সর্ব্বাত্মক, আমা ভিন্ন কিছুই নাই" ইত্যাদি বাক্য বিন্যাসে ক্রটী করেন নাই; অথচ শাস্ত্র প্রণেতা সকলেই আর্ষবিজ্ঞানে আলোকিত, সুতরাং কাহাকে ভাল এবং কাহাকেই বা মন্দ বলিব? বিশেষতঃ আর্ষবিজ্ঞান প্রাপ্ত মুনিবর এক বেদব্যাসই যখন অষ্টাদশ পুরাণ মহাভারত ও ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থের সৃষ্টিকর্ত্তা, এ অবস্থায় তিনি যদি জানিয়া শুনিয়াও ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে পরস্পর বিরোধি বিভিন্ন মতের অবতারণা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, বেদব্যাস একজন অপরিমার্জ্জিতবুদ্ধি, বিপথপ্রবর্ত্তক, লোকপ্রতারক, ধূর্ত্তচূড়ামণি ছিলেন, একথাও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং তাঁহার কোন্ কথা সত্য, আর কোন্ কথা মিথ্যা, ইহা নির্ণয় করাও বড় কঠিন সমস্যার বিষয়। অতএব সমস্ত শাস্ত্রের বিরোধ পরিহার করিতে হইলে এবং শাস্ত্রকারগণের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে এই পথই অবলম্বন করা উচিত যে পুরাণাদি শাস্ত্রেরও অদ্বৈতভাব

প্রতিপাদন করাই মুখ্য উদ্দেশ্য, কেবল অধিকারিভেদে অভিপ্রায়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ধারণ করিয়াছে মাত্র। এই ভাবে দেখা যায় যে, বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই আর্য্য হৃদয়ে অদ্বৈত ভাব বিকাশ পাইতেছিল; বিশেষ এই যে, কখনও বা গাঢ় ভাবে, আর কখনও বা অল্প ভাবে। এবং তাহা বিশুদ্ধ কি অশুদ্ধ তাহাও বড় সুস্পষ্ট ছিল না; পূজ্যপাদ আচার্য্য শঙ্কর স্বামী তাহাই পরিশোধিত করিয়া (দ্বৈতবাদের অসারতা প্রতিপাদন করিয়া) বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ নামে প্রচারিত করিয়াছেন মাত্র। (১)

তাহার পর রামানুজ স্বামী। তিনিও অদ্বৈতবাদী, কিন্তু তাঁহার নিকট নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদ স্থান পায় নাই; বরং প্রত্যাখ্যাতই হইয়াছে। তিনি বলেন যে, মূলতত্ত্ব এক এবং তাহার সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ নাই সত্য, কিন্তু স্বগত ভেদ আছে। যেমন বৃক্ষ এক বটে, কিন্তু তাহার শাখা প্রশাখা, পত্র, পুষ্প, ফল ইত্যাদি নানাবিধ ভেদ আছে, সেই শাখা প্রশাখা সকল বৃক্ষ হইতে অতিরিক্ত নহে, অথচ পরস্পর ভিন্ন, সেইরূপ ব্রহ্ম এক হইলেও তাহার নানারূপ ভেদ আছে। জীব ও জীবভোগ্য জগৎ তাঁহার প্রভেদ অথচ তাঁহা হইতে অতিরিক্ত নহে। তিনি উপাস্য, জীবগণ তাঁহার উপাসক, এবং জড়জগৎ জীবের ভোগ্য; এই কথাটী আরও কিছু পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। রামানুজের মতে প্রধান তত্ত্ব তিনটী :—চিৎ, অচিৎ (জড়) ও ঈশ্বর (২)। জীব সকল চিৎ, দৃশ্যজগৎ অচিৎ বা জড় এবং পরমাত্মাই ঈশ্বর। এই তিনই ভগবান্ হরির স্বরূপ; জীব ভোক্তা, জড় জগৎ তাহার ভোগ্য, এবং ঈশ্বর সেই সমুদয়ের নিয়ামক। দৃশ্য জগৎ আবার ভোগ্য, ভোগোপকরণ এবং ভোগায়তন, এই তিন ভাগে বিভক্ত। ঈশ্বর এই ত্রিবিধ জগতের কর্ত্তা ও উপাদান কারণ (৩)। হরি, বাসুদেব, বিষ্ণু প্রভৃতি তাঁহার নামান্তর মাত্র। তিনি করুণাময় ভক্তবৎসল; তাঁহাকে যাহারা

---

(১) অনাদি উপনিষদ্ গ্রন্থে যে অদ্বৈতবাদের পুনঃ পুনঃ প্রস্তাবনা ও সিদ্ধান্ত আছে, তাহা সকলেরই শিরোধার্য্য বলিয়া সম্প্রদায় স্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না।

(২) "ঈশ্বর শ্চিদচিচ্চেতি পদার্থ ত্রিতয়ং হরিঃ। ঈশ্বরশ্চিত ইত্যুক্তো জীবো দৃশ্য মচিৎ পুনঃ॥" (সর্ব্ব দর্শন সংগ্রহে মাধবাচার্য্যঃ)

(৩) বাসুদেবঃ পরং ব্রহ্ম কল্যাণ গুণ সংযুতঃ। ভুবনা মুপাদানং কর্ত্তা জীবনিয়ামকঃ॥ (সর্ব্ব দর্শন সংগ্রহে মাধবাচার্য্য)।

উপাসনা করে, তিনি তাঁহাদিগকে উপাসনার অনুরূপ ফল প্রদান করেন। তিনি লীলা বিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া অর্চ্চা, বিভব, ব্যূহ, সূক্ষ্ম ও অন্তর্যামী প্রভৃতি নামে অভিহিত হন। তাঁহার সেবকগণ ক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মূর্ত্তির সেবাদ্বারা পর পর মূর্ত্তির অনুগ্রহ লাভ করিয়া অবশেষে চরম সোপানে যাইয়া কৃতার্থ হন অর্থাৎ সেবক জীব পূর্ব্ব পূর্ব্ব উপাসনা দ্বারা ভগবৎ প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক পাপরাশি বিধ্বস্ত করিয়া পর পর সেবার অধিকারী হন। তাহার মতে অর্চ্চা দেবমূর্ত্তি প্রভৃতি; বিভব অবতার সমূহ; ব্যূহ চতুর্ব্বিধ—সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। তন্মধ্যে, বাসুদেব ষড়্‌গুণসম্পন্ন। এই বাসুদেবই বেদান্তাদি শাস্ত্রে (১) পরব্রহ্ম শব্দে উক্ত হইয়াছেন। সূক্ষ্ম ও অন্তর্যামী জীবস্থ ও জীবপ্রেরক বলিয়া কথিত হইয়াছে।

এইমতে উপাসনা পঞ্চপ্রকার; সেই পঞ্চপ্রকার উপাসনা দ্বারা ক্রমে ভক্তির উদ্রেক হয়, এবং অহঙ্কারাদি দোষ সমুদয় বিলুপ্ত হইয়া যায়। সেই অবস্থায় ভক্তবৎসল ভগবান্ বাসুদেব তাহাকে নিজের অক্ষয় পরমানন্দধাম প্রদান করেন; এমতে ইহাই মোক্ষ ভগবত্তত্ত্ব সাক্ষাৎকার লাভের প্রধান উপায় ধ্যান সহকৃত ভক্তিযোগ, কিন্তু 'তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্য শ্রবণ নহে।

ভগবত্তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের প্রধান উপায় যে ভক্তি তাহা কি? না তাহা জ্ঞান বিশেষ বা জ্ঞানের ফল বলিয়া বুঝিতে হইবে। এক ভগবান্ ভিন্ন যে কিছু পদার্থ আছে, তৎসমস্তই তুচ্ছ—হেয়, এইরূপ জ্ঞান বা বৈরাগ্যবীজ প্রস্ফুটিত হইলে পর যে, ভগবানের দিকে স্থির, অকৃত্রিম ভক্তি উপস্থিত হয়, সেই ভক্তিই এখানে 'ভক্তি'। তাদৃশ ভক্তি উপস্থিত হইলে ভোগতৃষ্ণাসকল আমূলতঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তাদৃশ ভক্তি লাভের নিমিত্ত চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতির আবশ্যকতা আছে।

রামানুজ স্বামীর মতে,—জীব, জগৎ ও ঈশ্বর ভেদ অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং থাকিবেও অনন্তকাল; জীব সেবক হইয়া আসিয়াছে, চিরদিনই সেবা করিবে, কখনও ঈশ্বরত্ব লাভ করিবে না। এমতে 'তত্ত্বমসি' বাক্যের অর্থ=তাঁহার (ঈশ্বরের) সম্বন্ধী তুমি; কিন্তু তিনি ও তুমি এক

(১) "তাদেব বাসুদেবাখ্যং পরং ব্রহ্ম নিগদ্যতে। অন্তর্যামী জীবসংস্থোজীবপ্রেরক ঈরিতঃ।" (সর্ব্বদর্শনধৃত)।

নহে। (১) 'একমেবাদ্বিতীয়ং', এখানেও এক, তাহা ছাড়া দ্বিতীয় নাই। 'অদ্বিতীয়' অর্থ তাঁহার সমান জাতীয় দ্বিতীয় নাই, কিন্তু তদ্ভিন্ন কিছু নাই এরূপ নহে। 'নির্গুণ' অর্থ—অপকৃষ্ট গুণ রহিত ইত্যাদি। এই মতে জীবের পরিমাণ অণু এবং নিত্যত্বাদি ধর্ম্ম সকলও প্রায় পূর্ব্বেরই মত।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর মধ্যে রামানুজ স্বামীই প্রধান, সুতরাং তাঁহার মত বলা হইলেই অন্যান্যের মতও বলা হইয়া যায়; এজন্য আর কাহারও মত পৃথক্‌রূপে সংগৃহীত হইল না। ফলকথা,—বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এতদুভয়ের মধ্যে কোনটি ভাল বা কোনটী মন্দ, তাহা স্থির করা বড় কঠিন কথা; তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, জ্ঞানীর পক্ষে বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ কল্পতরু, এবং ভক্ত বা উপাসকের পক্ষে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও কামধেনু, ভক্তের সর্ব্বার্থ প্রসবকারিণী; কামধেনু এক এক প্রকার লোকের পক্ষে এক এক মত উপযোগী। অতএব তত্ত্বজিজ্ঞাসুর পক্ষে কোনটাই উপেক্ষণীয় নহে, পরন্তু দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির পক্ষে জ্ঞানই একমাত্র সাধন, সুতরাং তদনুসারে বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অপেক্ষা অতি উচ্চ অঙ্গের বস্তু, তাহা নিশ্চয়! এই বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদের প্রভাবেই প্রবল বৌদ্ধবিপ্লব হইতে আর্য্য-ধর্ম্ম রক্ষা পাইয়াছিল। এই নিমিত্তই ইহার এত আদর এবং এত প্রশংসা।

শ্রীদুর্গাচরণ শর্ম্মা।

কর্ম্মবাদ, পুনর্জ্জন্ম এবং থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায়।

সম্প্রতি "নবপ্রভায়" চন্দ্রশেখর বাবু কর্ম্মবাদ সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমাদিগেরও কর্ম্মবাদ সম্বন্ধে অনেক জিজ্ঞাস্য বিষয় আছে। কর্ম্মবাদ, পুনর্জ্জন্ম প্রভৃতি বিষয় এত জটিল এবং তৎসম্বন্ধে মতামতের এতই প্রভেদ যে সহসা কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিতে আমাদিগের সাহস হয় না। একদিকে দর্শন শাস্ত্রের মহত্তত্ত্ব এবং পঞ্চভূত এবং অন্যদিকে বিজ্ঞানের অনন্ত

(১) এমতে "তত্ত্বমসি" বাক্যটী কেবল প্রশংসা সূচনার্থ "অগ্নির্মানবকঃ" ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় গৌণার্থক।

প্রবাহমাণ কীটাণু এবং তাহার আবরণ, উভয়ের ঘোরতর দ্বন্দ্বে প্রায়ই আমাদিগের নিদ্রা হয় না। কেহ কেহ আমাদিগকে বলিয়া থাকেন যে জন্মতত্ত্ব প্রভৃতি নারীদেহান্তর্গত গুহ্য বিষয়, তাহার উপর পুরুষের হস্তক্ষেপ করা ঘোর অশ্লীলতা মাত্র, অতএব এ সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপন করা কর্ত্তব্য নহে। প্রকৃতি কিংবা নারীতত্ত্ব স্ত্রীলোকেরই আলোচ্য, চৈতন্য কিম্বা পুরুষতত্ত্ব—পুরুষের আলোচ্য বিষয়। যোগশাস্ত্রের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে পুরাকালে স্ত্রীলোক যোগের অধিকারিণী ছিলেন না, তবে দুই একটী দৃষ্টান্ত ইহার বিরোধে পাওয়া গেলেও তাহা সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত বলিয়াই আমাদিগের বিশ্বাস। কিন্তু যখন দেখা যায় যে ধর্ম্মবীরগণ এ নিয়ম লঙ্ঘন করিতে বদ্ধপরিকর তখন আমাদিগেরও সেই পথ অনুসরণ করিতে স্বতঃই প্রবৃত্তি হইতে পারে। এই জন্য চন্দ্রশেখর বাবুর প্রশ্ন মার্জ্জনীয়।

আমরাও থিয়সফিষ্টদিগের প্রচারিত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি এবং তাঁহাদেরই মধ্যে আবার পরস্পরের মতভেদ দেখিতে পাইয়াছি। শ্রীমতী Blavatsky তাঁহার Secret Doctrine নামক গ্রন্থে বিশ্বের সৃষ্টিপ্রকরণ সম্বন্ধে বৌদ্ধগুরুগণের মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং সেই মতের সহিত আদিমকালের Mysteries এবং হিন্দুদিগের দর্শন এবং পুরাণ প্রভৃতি মতামতের তুলনা করিয়াছেন। যখন Secret Doctrine মুদ্রিত হয় তখন বিবি বেসান্ত ঘোর নাস্তিক এবং জড়বাদী ছিলেন। পরে ব্লাভাট্স্কীর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার মতের অসাধারণ পরিবর্ত্তন ঘটে। তাহারই কিছু পূর্ব্বে Theosophical Society কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে ভারতবর্ষে থিয়সফির প্রচার হইবার পূর্ব্বে Spiritualism এর প্রতিই থিয়সফির বিশেষ লক্ষ্য ছিল এবং এই সম্বন্ধে অভূতপূর্ব্ব মতামত প্রচার হওয়ায় প্রথমতঃ আমেরিকাবাসিগণের থিয়সফিসমিতির প্রতি দৃষ্টি পতিত হয়। এই আন্দোলনের ফলে Mr. Judge নামক একটী সভ্য অপমানিত হইয়া সমিতি হইতে বিতাড়িত হন। সিনেট্, লেড্বিটার প্রভৃতি গ্রন্থে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির লেশ মাত্র নাই। অতঃপর কর্ণেল অল্কট Esoteric Buddhism প্রচারে প্রবৃত্ত হন এবং মানবের সপ্তদেহ, তাড়িৎ এবং magnetism প্রভৃতি শক্তির ক্রিয়া সম্বন্ধে অনেক মতামত প্রচার করেন। এই

সময়ে দাক্ষিণাত্য প্রদেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ মনস্বী এবং যোগী T. Subba Row থিয়সফি-সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া রাজযোগ সম্বন্ধে অনেক উপদেশ প্রদান করেন এবং তাঁহার প্রচারিত মতের সহিত ব্লাভাট্‌স্কীর মতের অনৈক্য হওয়ায়, মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। সুব্বা রাও তাঁহার Lectures on Bhagabat Gita নামক গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্যের মত, এবং যোগশাস্ত্রের সামঞ্জস্য করিয়া বৈজ্ঞানিকরূপে বিশ্বপ্রকরণের সুন্দর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন। ভক্ত পণ্ডিত ভবানীশঙ্কর প্রথমে সুব্বা রাওয়ের নিকট যোগ সম্বন্ধে উপদেশ পান।

যতদিন এই সকল মতামত প্রচারিত হয়, বিবি বেসান্ত তাঁহার পূর্ব্বার্জ্জিত বৈজ্ঞানিক সংস্কারগুলি তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিয়া তাহাদিগের মধ্যে ধর্ম্মের মহান্ সত্য দেখিতে পাইলেন। তাঁহার পূর্ব্বেকার লেখনীপ্রসূত গ্রন্থের মধ্যে করুণা, ক্ষমা প্রভৃতি দৈবীপ্রকৃতির গুণসকলের আলোচনা আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে ইহাই বোধ হয় যে তখন তাঁহার কেবল প্রচারিত ধর্ম্মগুলির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগের সামঞ্জস্য কিসে হয় তাহারই উপর লক্ষ্য ছিল। বেসান্তের মহৎগুণ এই যে সিনেট, লেড্‌বিটার প্রভৃতি সভ্যগণের ন্যায় তিনি মানববুদ্ধির অগম্য এবং সন্দেহস্থল Spiritualism প্রভৃতি বিষয়ের অনর্থক চর্চ্চা করিয়া সময় নষ্ট করেন নাই। যখন বেসান্ত তাঁহার চিন্তাপ্রসূত Synopsis প্রচার করিতে আরম্ভ করেন তখন বিজ্ঞানের ঢেউ বহুদূর প্রসারিত হইয়া ভারতবর্ষ প্লাবিত করিতেছিল। লুপ্তধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের একই উপায় সেই বিজ্ঞান, তাহাও বেসান্ত বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

বৌদ্ধ এবং হিন্দুশাস্ত্রসম্মত লোকলোকান্তর এবং মানবের সপ্তদেহাধিষ্ঠিত চৈতন্যের ক্রিয়া এবং গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার কোন বৈজ্ঞানিক অর্থ হইতে পারে কি না ইহাই সর্ব্বসাধারণের নিকট সংক্ষিপ্ত ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করায় Death and After, Re-incarnation প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থের সৃষ্টি হয়। তৎপরে Karma, Ancient Wisdom প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার ধর্ম্ম তত্ত্বালোচনা বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। অবশ্য আমরা Eastern School of theosophy সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না, এই মাত্র জানি ইহার অন্য নাম Inner Section এবং প্রায় একশত সভ্য এই সভার স্থানে স্থানে একত্রিত হইয়া

রাজযোগ এবং থিয়সফির অন্যান্য বিষয় চর্চ্চা করেন। আমরা Master সম্বন্ধেও কিছু জানি না, এবং থিয়সফির আভ্যন্তরিক গতিবিধি আলোচনা করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। থিয়সফির গ্রন্থ প্রভৃতি পাঠ করিয়া যতদুর মনে আছে তাহাই উপরে বলিয়াছি। যতদুর দেখিতে পাই তাহাতে শ্রীমতী আনি বেসান্তকে হৃদয়শূন্য প্রতারক বলিয়া বোধ হয় না। পারলৌকিক সংবাদ সম্বন্ধে বিবি বেসান্তের নিজের কোন Experience আছে এমত কথা বোধ হয় কোথায়ও বলেন নাই; তবে তাঁহার এ সম্বন্ধে বিশ্বাস যে নিন্দনীয় তাহা কি করিয়া বলা যায়? তিনি বহুদেশের ধর্ম্মগ্রন্থ একত্রিত করিয়া তাহার সত্যতা সম্বন্ধে এমন কোন আদর্শ পাইয়াছেন যাহার বলে তিনি স্বীয় বিশ্বাস জগতে প্রচার করিতে সাহসী হইয়াছেন। এ কথাও আমরা বলিতে বাধ্য যে ঈশ্বরের করুণা, ক্ষমা এবং জীবের অনুতাপ প্রভৃতি তিনি কোথাও অস্বীকার করেন নাই। Path of Discipleship নামক গ্রন্থে তিনি দেখাইয়াছেন যে জীবের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অনুতাপ, দয়া, মৈত্রী, সখ্যতা প্রভৃতি বৃত্তিগুলি প্রস্ফুটিত না হইলে যোগমার্গে প্রবৃত্ত হওয়া বৃথা। Compassion কিংবা করুণা অথবা জীবে দয়া প্রকাশই গুরু এবং শিষ্যের জীবনের মূল মন্ত্র, ইহার কথা থিয়সফির বিস্তর গ্রন্থে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য যে এইগুলি বাদ দিলে বৌদ্ধধর্ম্মের গৌরব কিছুই থাকে না

থিয়সফি-সমিতির বহু শাখাপ্রশাখা হইয়া পড়িয়াছে এবং এই সমিতির কতকগুলি ভাগ স্বাধীন ভাবে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান চর্চ্চা করিতেছেন। ইহাও সত্য যে বেসান্ত প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর সভ্যগণ কোন নূতন মত প্রচার করেন নাই। অতএব এই বিস্তীর্ণ সমিতির উপর রোষদৃষ্টি নিক্ষেপ করা আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে।

ক্ষমা, দয়া প্রভৃতি গুণের বৈজ্ঞানিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেই বিশ্বপ্রক্রিয়া একটি কলের মত দাঁড়ায় সত্য, কিন্তু তাহাই বলিয়া কথাটা উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। উপাসনা, অনুতাপ প্রভৃতি সদ্বৃত্তি অবশ্যই জীবের সুকর্ম্ম এবং তদনুযায়ী ফল যে সে পাইবে না ইহা বোধ হয় থিয়সফিষ্টগণ বলেন না। উপাসনা, অনুতাপ প্রভৃতি সুকর্ম্মের ফল ঈশ্বরের করুণা এবং ক্ষমার বিকাশ। Evolution of Emotions যে মানবের বিশেষ প্রয়োজনীয় তাহা বেসান্ত অনেক দিন হইতে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন। আগ্রহ, ব্যাকুলতা এবং অনু-

তাপের মাত্রার তারতম্যানুসারেই বোধ হয় ঈশ্বরের করুণা প্রক্ষিপ্ত হয়; তাহা না হইলে একবার করযোড়ে ঈশ্বরকে ডাকিলেই যে জীবের প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ করুণা কটাক্ষ হইবে এবং তাহাতেই জীব মুক্ত হইয়া যাইবে ইহা আমরা আশা করিতে পারি না।

লোকলোকান্তর সম্বন্ধে Secret Doctrine এবং অন্যান্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইহা বোধ হয় যে উহা চৈতন্যের বহুবিধ স্তর মাত্র। ব্লাভাট্‌স্কী এবং বেসান্ত অনেক বার বলিয়াছেন "All the Seven planes are here"। চৈতন্যের লীলাক্ষেত্র যে দৃশ্যমান বিশ্বের উর্দ্ধে কিংবা মধ্যে কিংবা অধোভাগে পরিবর্ত্তিত হয় এমত মত সংস্থাপিত করিতে বোধ হয় কোন থিয়সফিষ্ট চেষ্টা পান নাই।

কর্ম্মের ফল অনিবার্য্য অর্থাৎ অন্য কোন কর্ম্ম করিলে তাহার অঙ্কিত ফল যে মুছিয়া যায় না এমন কথাও কোথায়ও দেখিতে পাইলাম না। এবং জন্মান্তরেই যে প্রত্যেক কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হইবে এবং ইহজন্মে যে করিতে হইবে না তাহারইবা মূল (text) কোথায়? অন্যের প্রতি কুব্যবহার করিয়া আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিলে যদি তাঁহার করুণাসঞ্চার হয় তবে ত গোল চুকিয়া গেল, আর যদি না হয় তবে ইহাই বুঝিতে হইবে যে তাঁহার হৃদয়ে করুণাবৃত্তি মোটেই প্রবাহিত হয় নাই। ঈশ্বর করুণাময় তিনি কখনই শাসন করেন না, দণ্ডও দেন না। যতটুকু আমরা তাঁহাতে যুক্ত হইতে পারি তদনুসারে আমরা তাঁহার করুণার অধিকারী, অবশিষ্ট কেবল জড় প্রকৃতির কঠিন নিয়মের অন্তর্গত সন্দেহ নাই। কর্ম্মফলের শাসন দৈবী প্রকৃতির অন্তর্গত মোটেই না। গীতায় পাঠ করিয়াছি কর্ম্ম প্রকৃতির, শাসনও প্রকৃতির। কিন্তু দেখা উচিত এমন কোন্ কর্ম্ম আছে কি না যাহা প্রকৃতির নহে এবং তাহার পুরস্কার প্রকৃতির আয়ত্তাধীন নহে। ইহারই নাম কর্ম্মযোগের বিষয়। কর্ম্মযোগ এবং পুনর্জন্মবাদ প্রভৃতি শাস্ত্রের অন্তর্গত। অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে বিজ্ঞানানুমোদিত মতের সহিত তাহার পার্থক্য দেখাইলে কোন হানি নাই। বারান্তরে তাহার ইচ্ছা রহিল।

একজন সেবক।

[চন্দ্রশেখর বাবুর "কর্ম্মবাদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা?" প্রশ্নের উত্তরে আরও কয়েকটী প্রবন্ধ আসিয়াছে, স্থানাভাবে এবার প্রকাশিত হইল না। নঃ, সঃ]

সাধকের প্রথম অবস্থা।

(প্রবাসীর প্রাণের কথা)

"কতি নাম সুতা ন লালিতাঃ কতি নাম বধূর ভুক্তিহি।
ক মু তে, ক চ তাঃ, ক্বা বয়ম্ ভবসঙ্গঃ খলু পান্থ সঙ্গমঃ॥"

আমার স্বদেশ অনেক দূরে। কত দূরে বলিতে পারিব না। সে দেশের আমার আর এখন কিছুই মনে নাই। কেবল একটু অস্ফুট স্মৃতিমাত্র হৃদয়ের কোন নিভৃত স্থানে লুকাইয়া আছে। প্রাচীন প্রবীণ লোকেরা বলেন তেমন দেশ ব্রহ্মাণ্ডে আর কুত্রাপি নাই। সেখানে নাকি চক্ষু না থাকিলেও দেখিতে পাওয়া যায়, কর্ণ না থাকিলেও শ্রবণ করা যায়, হস্ত না থাকিলেও গ্রহণ করা যায়, চরণ না থাকিলেও গমন করা যায়। সে দেশ নাকি নিকটে থাকিয়াও, অতিদূরে, দৃশ্য হইয়াও সর্ব্বদা অদৃশ্য। সে দেশে নাকি চন্দ্র নাই, সূর্য্য নাই, অগ্নি নাই। সে দেশ নাকি স্বকীয় স্বাভাবিক আলোকে আলোকময়। সে দেশে নাকি জন্ম নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই। সে দেশে নাকি স্ত্রী নাই, পুরুষ নাই, নপুংসক নাই। সে দেশে নাকি ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, নিদ্রা নাই, সে দেশে নাকি শোক নাই, দুঃখ নাই, আপদ নাই, বিপদ নাই। সে দেশে নাকি হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, বিবাদ নাই। সে দেশে নাকি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ। সেই চিদানন্দময় দেশে আমার বাস। সচ্চিদানন্দময় পুরুষ নাকি সেই দেশের অধিস্বামী। মানব মাত্রেই নাকি এক দিন সেই সুখময় রাজ্যে বাস করিতেন। মানব মাত্রেই নাকি এক দিন সেই পুণ্যময় লোকে স্থান প্রাপ্ত হইবেন। কি জানি, কি কর্ম্ম বিপাকে আমি সেই দেশ ছাড়িয়া আসিয়াছি। কত দিন সে দেশ ছাড়িয়াছি মনে নাই। স্বদেশ ছাড়িয়া জন্মভূমি ছাড়িয়া, এখন আমি এই বিদেশে, প্রবাসে পড়িয়া আছি। এখানে আসিয়া কত নূতন দৃশ্য দর্শন করিয়াছি, কত নূতন লোকের সহিত মিশিয়াছি, কত নূতন ভাবে পূর্ণ হইয়া হাস্য ও ক্রন্দন করিয়াছি, কত নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। এই বিদেশে আসিয়া, মনে হয়, কিছু দিন পরেই, বিদেশের মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, ক্রমে স্বদেশের কথা ভুলিতে লাগিলাম, প্রবাসের প্রারম্ভে যেমন স্বদেশের কথা সতত স্মরণ হইত, শয়নে স্বপনে যেমন জন্মভূমির

মধুর স্মৃতি হৃদয়ে অনুক্ষণ জাগরূক থাকিত, সুখে দুঃখে, হর্ষে বিষাদে, সকল অবস্থায় যেমন স্বগৃহের জন্য প্রাণ কাঁদিত, প্রবাস বাস অভ্যস্ত হইয়া গেলে আর সেরূপ হইল না। ক্রমে আত্মার পরিচিত জনগণকে ভুলিতে লাগিলাম। স্বদেশে যাঁহাদের স্নেহ ও প্রেমে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম, যাঁহাদের অমৃতময় সহবাসে হৃদয় মনকে পরিতৃপ্ত জ্ঞান করিয়াছিলাম, যাঁহাদের সুধামাখা বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলাম, এখনও এই বিদেশবাসের ঘোর কষ্ট সমূহের মধ্যে যাঁহাদের অপার্থিব গুণ এবং দিব্যরূপ স্মৃতিপথে উদিত হইয়া প্রাণকে আকুল করিয়া থাকে, আত্মার সেই প্রকৃত বন্ধু সকল ক্রমে একে একে চিত্তপট হইতে অপসৃত হইতে লাগিলেন। সত্যই তাঁহারা আমার আত্মার বন্ধু ছিলেন। তাঁহাদের সহিত আমার আত্মার নিগূঢ় সম্বন্ধ ছিল, এখন আমি সেই পরমাত্মীয়গণকে ভুলিয়া নূতন দেশে কতকগুলি নূতন লোকের সহিত মিলিত হইয়াছি। এই নূতন বন্ধুগণের সহিত আমি স্নেহ বা প্রণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছি বটে, কিন্তু সকলকে ত আত্মীয় বলিতে পারিতেছি না। এই নূতন দেশে কেহ জনক, কেহ জননী, কেহ ভ্রাতা, কেহ ভগ্নী, কেহ মিত্র, কেহ কলত্র, কেহ পুত্র, কেহ কন্যা, কেহ গুরু, কেহ শিষ্য এবম্বিধ বিবিধ নামে বিবিধ আকারে আমার সহিত সম্বন্ধ হইয়াছেন কিন্তু কৈ সকল সময়ে ত আমার তাঁহাদিগকে আত্মীয় বলিয়া জ্ঞান হইতেছে না। তাঁহাদের যত্নে ও আদরে, তাঁহাদের কার্য্যে ও ব্যবহারে, তাঁহাদের দীক্ষা ও শিক্ষায় কৈ আমার আত্মা ত চরিতার্থতা লাভ করে না। তাঁহাদের সহবাস ত্যাগ করিয়া আমার প্রাণ সহসা অন্য রাজ্যে ছুটিয়া যাইতে চাহে কেন? আমার নূতন বন্ধুগণ পরিবৃত থাকিয়াও তাঁহাদের আনন্দ উল্লাস পরিপূর্ণ হাস্যময় মুখশ্রী সতত দর্শন করিয়াও আমি অনুদিন প্রবাসের যন্ত্রণা ভোগ করি কেন? কাহাদিগকে ফেলিয়া আসিয়াছি, কাহাদিগের নিকট যাইতে হইবে, কাহাদিগকে না পাইলে প্রাণ পরিতৃপ্ত হইবে না, সংসারের আনন্দ উৎসবের মধ্যেও এই চিন্তা আসিয়া আমার চিত্তকে চঞ্চল করে কেন? আমার আত্মীয় স্বজন এখানে নাই। আমার আত্মীয় মধ্যে অদৃশ্য জগতে অদৃশ্য ভাবে বিশ্বপতির সেবা ও দাসত্ব করিতেছেন, এই কথা ভুলিয়াও আমি ভুলি না কেন? আমার আত্মার সহিত যাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সংসারের মলিন হাসির

ছায়া তাঁহাদের মুখমণ্ডলে কখন পতিত হয় না,—তাঁহাদের দৃষ্টি কখন স্বার্থের কালরঙ্গে কলুষিত হয় না,—তাঁহাদের রসনা কখন অসত্য ও কপটতার ক্রীড়াভূমি হয় না, তাঁহাদের হৃদয় কখন নির্দ্দয়তা ও অপ্রেমকে আশ্রয় দেয় না, তাঁহাদের প্রাণ পরদ্বেষ ও পরহিংসা কি পদার্থ কখন জানে না, তাঁহাদের নিকট আপন পর নাই, ছোট বড় নাই, ভাল মন্দ নাই; সকলেই তাঁহাদের সমান স্নেহের পাত্র, সকলেই তাঁহাদের সমান ভালবাসার অধিকারী, সর্ব্বত্রই তাঁহাদের সমদৃষ্টি, সর্ব্বভূতে তাঁহাদের প্রেম ও মৈত্রী। আমার আত্মীয় স্বজনেরা উদাসীন হইয়াও গৃহী, লোভ ও স্বার্থহীন হইয়াও সর্ব্বদা কর্ম্মশীল, মায়ামুক্ত ও সর্ব্বত্যাগী হইয়াও জীব দুঃখ দূরীকরণার্থে দয়া ও প্রেম পরিপ্লুত হৃদয়। অখিল ব্রহ্মাণ্ড স্বামী তাহাদের প্রভু, বিধাতার আদেশ বাণী তাঁহাদের বেদ বাক্য, সমগ্র বিশ্ব তাঁহাদের গৃহ, চরাচরস্থ প্রাণিসমূহ তাঁহাদের প্রতি-পাল্য, জগতের সেবা ও মুক্তিই তাঁহাদের মহাব্রত। তাঁহারা অজর অমর, অক্ষুব্ধ, সমুদ্রবৎ প্রশান্ত, স্থির, ধীর। মহাশক্তির সমীপে আত্ম-বলিদান করিয়া তাঁহারা আত্ম-জ্ঞানে বলী হইয়াছেন, অহং বুদ্ধি ও মমত্ব বিসর্জ্জন করিয়া তাঁহারা চরাচরের অধিস্বামিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইন্দ্রিয় সুখ ত্যাগ করিয়া তাঁহারা ব্রহ্মানন্দের অধিকারী হইয়াছেন, নশ্বর দেহ ও অনিত্য জীবনের মায়া বর্জ্জন করিয়া তাঁহারা অমর দেহ ও অনন্ত জীবন লাভ করিয়াছেন। বিশ্বপ্রাণ বিশ্বা-ত্মার চিরানুগত ভক্তসেবক এবং প্রাণিমণ্ডলীর হিতব্রতধারী আমার সেই পরমা-ত্মীয়গণ কোথায়? আমি কি অপরাধে কোন্ লোকে কোথায় তাঁহাদের ফেলিয়া আসিলাম? একদিন চিন্ময় জগতে যে মহাত্মাগণের কার্য্যের সহযোগী ছিলাম, যাঁহাদের চরণে আমার মন প্রাণ বাঁধা ছিল, যাঁহাদের নিত্যসহবাসে আমার আত্মা উৎসব ও আনন্দময় ছিল, আজ কোন্ পাপে তাঁহাদের বরণীয় সঙ্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইলাম? সহস্রসূর্য্যের প্রভান্বিত, নির্ম্মল জ্ঞানালোকপ্রদীপ্ত স্বর্গীয় রাজ্য ত্যাগ করিয়া আমি যে এই পাপতমসাচ্ছন্ন সংসারে আসিয়া কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। এই সংসার শ্বাপদসঙ্কুল ঘনান্ধকারসমাচ্ছন্ন নিবিড় বন, কি অপরাধিবর্গের নিমিত্ত কল্পিত অশেষ দুঃখ যন্ত্রণাপূর্ণ ক্রন্দন কোলাহলময় কারা-গার, আমি যে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। যাহাদের সহিত এখানে আমি নিত্য বাস করিতেছি,—যাহাদিগকে স্ত্রী পুত্র, ভাই বন্ধু প্রভৃতি প্রিয়

সম্ভাষণে বিভূষিত করিতেছি, যাঁহাদিগকে আপন জ্ঞান করিয়া যাঁহাদের পরিতুষ্টি জন্য আমি সর্ব্বদা ছুটাছুটি করিতেছি, তাঁহারা আমার আপন কি পর, মিত্র কি শত্রু আমি যে কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। এখানে কে সাধু, কে অসাধু, কে বিষয়ী, কে উদাসীন, কে গুরু কে শিষ্য, কে মহৎ কে ক্ষুদ্র, কে পণ্ডিত কে মূর্খ, কে ধনী কে নির্দ্ধন, কে বুদ্ধিমান্ কে নির্ব্বোধ, আমি যে কিছুই অবধারণ করিতে পারিতেছি না। অন্যের কথা দূরে থাকুক যাঁহাদের নিকট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমি এই দেহ লাভ করিয়াছি স্নেহের আধার পরমারাধ্য সেই জনক এবং স্নেহময়ী পরম পূজনীয়া সেই জননীকেও যে আমি আপন কি পর কি বলিব কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা। আমি নাকি জন্মে জন্মে কত জনক জননীর স্নেহ ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়াছি, কত পতিপ্রাণা প্রণয়িণীরই প্রেমরসে অভিসিঞ্চিত হইয়াছি, কত পুত্র কন্যাকেই বাৎসল্যভাবে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি, কত বন্ধু বান্ধবেরই সহৃদয়তা ও প্রেমে পরিতুষ্ট হইয়াছি। কৈ তাঁহাদের সহিত আমার আত্মার কোন বন্ধন ত আমি অনুভব করিতে পারিতেছিনা। এই সংসারে কাহারও কাহারও সহিত হৃদয় মনের সম্বন্ধ ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু আত্মার সহিত কাহারও যোগ ত উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। আত্মার রাজ্যে স্ত্রী পুত্র, ভাই বন্ধু, কৈ কাহার ত অস্তিত্ব দেখিতে পাইতেছি না। সেই অতীন্দ্রিয়, অপার্থিব জগতে আমি সংসারের বন্ধু বান্ধবগণকে ত চিনিতে পারিতেছি না। এখনকার আত্মীয় স্বজনাদির সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ তাহা কেবল রক্ত-মাংশের সম্বন্ধ,—রূপরসাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ সমূহের সম্বন্ধ স্বার্থের সম্বন্ধ, লাভ ক্ষতির সম্বন্ধ, আদান প্রদানের সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধ বালুকানির্ম্মিত সেতুর ন্যায় ক্ষণবিধ্বংসি ও বিনশ্বর। নিত্য পুরুষের নিত্য লোকে এ সম্বন্ধ তিষ্ঠিতে পারে না—সেই প্রেমময়ের সনাতন পুণ্যধামে এ সম্বন্ধে আবদ্ধ বন্ধুবান্ধবের দাঁড়াইবার স্থান নাই। তবে সংসারের ভাই বন্ধুরা আমার আত্মীয় হইলেন কিরূপে? আত্মা যাঁহাদিগকে আপন বলিয়া চিনিতে পারে না, যাঁহাদের পরস্পর মিলন সুদুর্লভ, শুধু দেহ মনে সৌসাদৃশ্য হেতু কি তাঁহারা আত্মীয় বলিয়া পরিগণিত হইবেন? না, তাহা হইতে পারে না। যাঁহারা আত্মা কি পদার্থ জানিয়াছেন, আত্মার ধর্ম্ম ও পরিণাম কি জানিয়াছেন, তাঁহারা স্ত্রীপুত্রাদিকে কখন আত্মীয় বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। এ সংসারকেও তাঁহারা আত্মার বিরাম-ক্ষেত্র মনে করিতে

পারেন না। বস্তুতঃ স্ত্রীপুত্রগণ আমাদের প্রকৃত আত্মীয় নহেন, কিন্তু আমাদিগকে অধ্যাত্ম-জগতের উপযোগী করিবার, বিশুদ্ধ প্রেমলাভের অধিকারী করিবার সহায় ও অবলম্বন মাত্র! এ সংসারও আমাদের আত্মার বিশ্রামভূমি নহে, কিন্তু আমাদের আত্মশুদ্ধি ও আত্মজ্ঞানের বিদ্যালয় মাত্র। ইহা সুখের আগার নহে, সত্যসত্যই কারাগার! আমরা কতকগুলি অপরাধী জীব পরস্পরে কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া এই ভবকারাগারে কর্ম্মক্ষয় করিতে আসিয়াছি। যদি জন্মান্তরীণ অপরাধের কথা স্মরণ রাখিতে পারিতাম, তবে এই কারাগারস্থ আবদ্ধ জীবগণকে অনেক পরিমাণে চিনিতে পারিতাম। পরস্পরে নিজ নিজ পাপ কাহিনী বিবৃত করিয়া মুক্তকণ্ঠে কাঁদিতে পারিতাম। পূর্ব্বাপরাধ স্মরণ করিয়া বর্ত্তমান ও ভবিষ্য জীবনের জন্য সাবধান হইতে পারিতাম! কিন্তু আমাদের পাপ বিকার এতই অধিক, আমাদের অধঃপতন এতই শোচনীয়, যে এই ভবকারাগারে বাস করিয়াও আমাদের নিজ নিজ দুর্দ্দশা অনুভব করিবার শক্তি নাই। অজ্ঞানবশে—আমরা স্বদেশ ভুলিয়াই, স্বদেশস্থ আত্মীয়গণকে ভুলিয়াছি, এক্ষণে এই কারা-প্রাচীরের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে বাস করিয়াই আমরা আপনাদিগকে সুখী ও কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিতেছি। কি বিষম মায়ার আবরণে যে আমরা আচ্ছন্ন হইয়াছি, আমাদের হিতাহিত জ্ঞান, মঙ্গলামঙ্গল বোধ এককালে লুপ্ত হইয়াছে। এই কারাগারস্বামী, জরামৃত্যু, বিপদ আপদ, দুঃখ দারিদ্র্য প্রভৃতি বিবিধ জ্বালা যন্ত্রণার ব্যবস্থা করিয়া অনিত্যতা ও অশান্তির চিত্রপট নিয়ত আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ধারণ করিতেছেন—মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য অশেষ প্রকার বিধান ও কৌশল দ্বারা আমাদিগকে সতত উদ্বোধিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন—সম্পদের পার্শ্বে বিপদ, সুখের পার্শ্বে দুঃখ, অমৃতের পার্শ্বে গরল, দয়ার পার্শ্বে নিষ্ঠুরতা, প্রেমের পার্শ্বে অপ্রেম, মৈত্রীর পার্শ্বে হিংসা, রূপের পার্শ্বে রোগ, বিদ্যার পার্শ্বে মূর্খতা, ধনের পার্শ্বে দরিদ্রতা, সতীর পার্শ্বে কুলটা, দেবীর পার্শ্বে দানবী, সাধুর পার্শ্বে নরঘাতককে উপস্থিত করিয়া আমাদিগকে প্রতিনিয়ত বস্তুতত্ত্ব পরিজ্ঞানে সাহায্য করিতেছেন, তথাপি কি মহামোহে আমরা সমাক্রান্ত হইয়াছি, আমরা সমস্ত দেখিয়াও কিছু দেখিতেছি না, সমস্ত জানিয়াও কিছু জানিতেছি না, সমস্ত স্বীকার করিয়াও কিছুই স্বীকার করিতেছি না, সমস্ত বুঝিয়া এবং বুঝাইয়াও কিছুই বুঝিতেছি না। কতদিনে আমাদের এই মোহ অপ-

নীত হইবে? কতদিনে আমরা আমাদের প্রকৃত আত্মীয়গণকে চিনিতে পারিব? কতদিনে আমাদের পুত্রদারাদি স্বজনগণ প্রকৃত আত্মীয় নামে অভিহিত, হইবার যোগ্য হইবেন? কতদিনে আমাদের এই দুঃখের কারাগার সুখাগারে পরিণত হইবে? কতদিনে মনুষ্যগণ স্বার্থ ভুলিয়া, আত্মসুখে বিসর্জ্জন দিয়া, ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে জলাঞ্জলি দিয়া পরার্থের জন্য, পরহিতের জন্য, আত্মার কল্যাণের জন্য মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করিবে? কতদিনে পরস্পরকে স্বদেশের কথা, জন্মভূমির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া সেই পুণ্যভূমি দর্শনের সাধ পরস্পরের হৃদয়ে জাগাইয়া তুলিবে? কতদিনে এই মর্ত্ত্যধাম আমাদের সকলের সমবেত চেষ্টায় স্বর্গধামে পরিণত হইবে?

জীবমুক্ত সাধুভক্তগণের কথা বলিতেছি না, অনাসক্ত, নিষ্পাপ যোগী, সন্ন্যাসীর কথা বলিতেছি না, আমাদের ন্যায় বিষয়ান্ধ, স্বার্থসর্ব্বস্ব, মূঢ়বুদ্ধি, মায়াচ্ছন্ন জীবদের কথাই বলিতেছি. এই প্রবাস বাসে আমাদের কিছুই লাভ হইল না। আমরা সারা জীবনই বৃথা ব্যয় করিলাম। বৃথা কার্য্যে ও বৃথা চিন্তায় আমাদের সমস্ত পরমায়ু শেষ হইতে চলিল। জীবনের অবশিষ্ট কালটা যে ভগবানের কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারিব এমন আশাও ত দেখিতেছি না। স্বদেশের জন্য, পরহিতের জন্য পরিশ্রম, সে ত আমাদের বাক্য মাত্র। আত্মার কল্যাণ কামনা, জীবগণের মঙ্গল সাধনা সে ত আমাদের কল্পনা মাত্র। কতদিন আর এই কল্পনার রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইব? কতদিন আর আত্মবঞ্চনা ও আত্ম-প্রতারণায় কাল কাটাইব? আপনার জ্ঞান-গৌরব প্রচার করিবার নিমিত্ত, আত্মোন্নতি ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত আমরা এত দিন অনেক পরিশ্রম করিয়াছি। কপর্দ্দক মাত্র ব্যয় না করিয়াও, এবং বিন্দুমাত্র ত্যাগ স্বীকার না করিয়াও, সহজ ও সুলভ উপায়ে আমরা কতদিন স্বদেশ প্রেমিক সাজিয়াছি। নিজেদের মূর্খতা অজ্ঞতা গোপন করিয়া, লোকসমাজে কতদিন বিদ্যার ডালি ধারণ করিয়াছি। ধনগর্ব্বে ও পদগৌরবে, পাণ্ডিত্যাভিমানে অন্ধবৎ হইয়া মনুষ্যকে মনুষ্য জ্ঞান করি নাই, ধরাকে সরাজ্ঞান করিয়াছি। কখন নিজেদের নীচতা, ক্ষুদ্রতা, অনুভব করিয়া ঈর্ষাভরে, ক্রোধভরে উন্নতচরিত্র মহাত্মগণের কতই নিন্দাবাদ করিয়াছি। স্বাধীন চিন্তার আশ্রয় লইয়া কতই অলীক স্বপ্ন দেখিয়াছি, বিশ্ব-কারণ, বিশ্বেশ্বরকে পর্য্যন্ত এই বিশ্ব হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছি। রাজদণ্ড ও যথাসম্ভব লোকনিন্দা এড়াইয়া যে কিছু অপকর্ম্ম করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত, তাহা

সকলি অম্লান বদনে সম্পন্ন করিয়াছি। ধর্ম্মহীন নীতি এবং কর্ম্মহীন জ্ঞানের অসারতা অনুভব করা দূরে থাকুক, বরং তদ্রূপ নীতি ও জ্ঞানের যথেষ্ট পোষকতা করিয়াছি। করিয়াছি সবই, কিছুই বাকি নাই, সংসারের ভোগাবস্তু সকলও ভোগ করিতে আমরা কোন ক্রমে যত্ন ও পরিশ্রমের ক্রটি করি নাই; নূতনকে পুরাতন, পুরাতনকে নূতন করিয়া, বিবিধ আকারে, বিবিধ প্রকারে আমরা কতই ভোগ উপভোগ করিলাম। কিন্তু ভোগের ক্ষুধা ত মিটিল না? জীবন থাকিতে কি এ ভোগের ক্ষুধার শান্তি হইবে না? ভোগের পর অতিভোগ, পরে কতই বিরক্তি ও আত্মগ্লানি, তথাপি ত ভোগলালসা যাইতেছে না? ভোগ্য বস্তুর উপভোগে দেহ অস্থিচর্ম্মসারমাত্র হইয়া পড়িল, পরমায়ু শেষ হইয়া আসিল, এই কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট দেহেও আবার ভোগ বাসনা? মোহের ঘুম কি আমাদের ভাঙ্গিবে না? দৈবের উপর বিশ্বাস আনিতে পারিতেছি না, পুরুষকার প্রয়োগের শক্তিও আর নাই। তবে এ দুর্দ্দিনে, অমানিশার ঘোর অন্ধকারে, সংসারার্ণবে পড়িয়া আমার এই ক্ষুদ্র জীবনতরিখানিকে কোন্ পথে চালাইব? এক দিকে রিপুকুলের উত্তেজনা, অপর দিকে কর্ত্তব্য বুদ্ধির তাড়না, তুল্য বলবিশিষ্ট এই উভয় আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়া আমি যে জড় পদার্থবৎ নীরব, নিস্পন্দ নিশ্চল হইয়া পড়িলাম। কি করিব, কোথায় যাইব, কাহার নিকট প্রকৃত তত্ত্ব লাভ করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। কি জন্য জন্মলাভ করিয়াছি, এ জীবন লইয়া কি করিলাম, এ জীবনের কি পরিণাম হইবে, এই চিন্তায় যে আমি আকুল হইলাম। কোন্‌টি আমার স্বদেশ, কোন্‌টি আমার প্রবাস, মানবাত্মার কোথায় গতি, কোথায় স্থিতি, এ সমস্যা যে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। প্রাণ এক একবার পরোপকার প্রয়াসী হয় সত্য। কিন্তু যত দিন আপন ও পর এই ভেদজ্ঞান লুপ্ত না হইতেছে তত দিন কি প্রকৃত পরোপকার সম্ভব? আমি যে পরসেবা করিতে যাইয়া নিজসেবা করিয়া বসি! পরোপকার করিতে যাইয়া যে আত্ম প্রতিষ্ঠা খুঁজিয়া বেড়াই। বুঝিলাম আক্ষেপ ও রোদন করিতেই এ জীবন শেষ হইয়া যাইবে। আর প্রকৃত ক্রন্দন প্রকৃত নির্ব্বেদই বা কোথায়? প্রকৃত পাপবোধ প্রকৃত অভাব জ্ঞান যে সুদূরপরাহত। ক্রন্দনের মধ্যেও যে মনে হয় আড়ম্বর রহিয়াছে, "লোক দেখানো" ভাব লুক্কায়িত রহিয়াছে। নতুবা বাস্তবিক অভাব জ্ঞান জন্মিলে, আত্ম জ্ঞান লাভের কি আর

বিলম্ব থাকে? এ বিড়ম্বনা আর সহে না। জীবন সত্য সত্যই ভার বোধ হইতেছে। এ ঘোর বিপদে, কে প্রবুদ্ধ আছেন, কে সত্যনিষ্ঠ আছেন, কে কর্ত্তব্য-পরায়ণ আছেন, অনুগ্রহ করিয়া এ হতভাগ্যকে দেখা দিউন। দেখা দিয়া এই ঘোর বিপন্ন, পথভ্রান্ত, মোহান্ধ মানবের, আর আমার সমদুর্দ্দশাগ্রস্ত অন্যান্য ভাই ভগ্নীর উদ্ধার সাধন করুন, ভোগাশা কিসে নির্ব্বাণ হয়, আমাদিগকে সেই শিক্ষা দিয়া কৃতার্থ করুন। আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি, জরাগ্রস্ত হইয়াছি, তবু যে ভোগ লালসা ত্যাগ করিতে পারি না। আমাদের ভোগ বিলাসের দিন, সুখ সমাদরের দিন, আনন্দ উল্লাসের দিন এ জন্মের মত চলিয়া গিয়াছে, তবু ত ভোগেচ্ছা বিসর্জ্জন দিতে পারিতেছি না। সব ফুরাইয়া গিয়াছে, তবু ত পূর্ব্ব সুখ বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না। পূর্ব্ব সুখ স্মরণ করিয়া এখনও হৃদয় বিহ্বল হয় কেন? জীবনগ্রন্থের পূর্ব্ব পৃষ্ঠা উলটাইয়া, হৃদয়ে অতীত সুখস্মৃতি জাগাইয়া কেন এখন পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি? কেন পুনঃ পুনঃ হা হুতাশ করি? শিশুদের অবিশ্রান্ত আনন্দ দেখিয়া কেন আবার আমাদের শিশু হইতে সাধ হয়? কেন আবার আকুল প্রাণে বলি—

"Ah, happy years! once more who would not be a child?"

পিতা মাতার কত যত্নের ধন, কত আদরের সামগ্রী, নববিবাহিত পুত্র পুত্রবধূর নবপ্রেম স্মরণ করিয়া কেন আবার লালসাময় হৃদয়ে বলি—

"জীবৎসু তাতপাদেষু নবে দার পরিগ্রহে।
মাতৃভিশ্চিন্ত্যমানানাং তে হি নো দিবসা গতাঃ॥"

সংসার হইতে বিদায় লইতে বসিয়াছি, ভবসমুদ্রের পরপারে যাত্রা করিতেছি, এখন প্রণয়লুব্ধ রাজা দুষ্মন্তের মত, সংসারের পানে তাকাইয়া কেন আবার কাঁদিতে কাঁদিতে বলি—

"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য॥"

বুঝিলাম, ভোগের মধ্যে থাকিয়াই আমরা লালিত পালিত হইয়াছি, হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছি, ভোগ-বাসনা তাই বুঝি আমাদের কখন যাইবে না। কিন্তু ভোগাশা থাকিতে, বিষয়-বাসনা থাকিতে ত কিছু হইবেও না। তাই বলিতেছি বিষয়-মুক্ত, কামনা-রহিত, জিতেন্দ্রিয় সাধু মহাপুরুষগণ কোথায় আছেন একবার

দেখা দিউন। আমরা জাগিতে ইচ্ছা করিয়াও জাগিতে পারিতেছি না, উঠিবার ইচ্ছা করিয়াও উঠিতে শক্তি পাইতেছি না, ছাড়িতে ইচ্ছা করিয়াও কিছুই ছাড়িতে পারিতেছি না। আমরা সংসার ছাড়িতে চাহি না, কিন্তু বিষয়-বাসনা ছাড়িতে চাহি. আমরা হৃদয়হীন নিশ্চেষ্টতা বা কর্ম্মশূন্যতা অবলম্বন করিতে চাহি না, কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্ম ও সপ্রেম ধর্ম্ম আচরণ করিতে চাহি। আমরা প্রণয়-বন্ধন ছিন্ন করিতে চাহি না, কিন্তু অপ্রেম ও কলহ বর্জ্জন করিতে চাহি। আমরা প্রেম ও পুণ্য ত্যাগ করিতে চাহি না, কিন্তু কাম ও কলুষ বিসর্জ্জন দিতে চাহি! আমরা পরার্থ ও পরহিত ভুলিতে চাহি না, কিন্তু স্বার্থ ও আত্ম-প্রতিষ্ঠা বিস্মৃত হইতে চাহি। আমরা নির্গুণ, নির্ব্বিকল্প, নিরাকার ব্রহ্মস্বারূপ্য লাভ করিতে চাহি না, কিন্তু প্রেমময়, করুণাময়, মঙ্গলময় পরমেশ্বরের দাসত্ব অবলম্বন করিতে চাহি। আমরা এ জগতের প্রভু হইতে আকাঙ্ক্ষা করি না, কিন্তু বিশ্ববাসী জীবসমূহের সেবাব্রত আশ্রয় করিতে চাহি। আমাদের পাপ তাপ, অভাব অভিযোগ, আশা ভরসা সকলি প্রাণ খুলিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে প্রকাশ করিলাম। দুঃখীর বন্ধু, পাপীর পরিত্রাতা, তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণের আর প্রচ্ছন্ন থাকিবার সময় নাই। আমাদের ন্যায় দীন হীন, পতিত মানব-গণের উদ্ধারার্থে তাঁহারা অচিরে জগত সমক্ষে প্রকাশিত হউন। আর সরল, সুমিষ্ট, স্নেহময় বাক্য ও ব্যবহারে আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে আমাদিগকে মানবাত্মার গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দিউন। ইতিমধ্যে আমরা সর্ব্বমঙ্গলনিলয় সর্ব্বাভীষ্টপ্রদাতা বিভুচরণে প্রণিপাত করিয়া কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি—

"অপরাধ সহস্রাণি ক্রিয়ন্তে হর্নিশং ময়া।
দাসোয়মিতি মাং মত্বা ক্ষমস্ব মধুসূদন॥"
"অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাৎ অশুভং যন্ময়াকৃতং।
ক্ষন্তুমর্হসি তৎসর্ব্বং দাস্যেনৈব গৃহাণ মাং॥"
"স্থিতিঃ সেবা গতির্যাত্রা স্মৃতিশ্চিন্তাস্তুতির্ব্বচঃ।
ভূয়াৎ সর্ব্বাত্মনা বিষ্ণো মদীয়ং ত্বয়ি চেষ্টিতং॥"
"নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং।
তেষু তেষ্বচ্যুতাভক্তি রচ্যুতাস্তু সদাত্বয়ি॥"

শ্রীবিঃ।

ওঁ তৎসৎ

হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম্ম।

ঐ যে সম্মুখে বিশাল শ্মশানক্ষেত্র দেখিতেছ—যাহার চতুর্দ্দিকে অগণ্য মৃত দেহ পড়িয়া আছে, উহাই বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ। আর ঐ যে শতসূর্য্যসম দীপ্তিপুঞ্জময় আপার্থিব পদার্থ হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গের গহ্বর হইতে কিরণজাল বিকীরিত করিতেছে—উহাই আর্য্যধর্ম্ম উক্ত হিন্দুসমাজের আত্মা। দেহ হইতে আত্মা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। মাটীর দেহ মাটীর উপর পড়িয়া রহিয়াছে, আর অতি ভৌতিক আত্মা—আর্য্যধর্ম্ম—যাহা স্বর্গরাজ্য হইতে নামিয়াছিল, আবার সেই স্বর্গরাজ্যে গিয়া অবস্থান করিতেছে। এই আর্য্যধর্ম্মের বিরহে আজ ভারত—জগতের গৌরবেরস্থল ভারত—শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। তবে কি হিন্দুসমাজ সত্যসত্যই মরিয়াছে? না মরে নাই—ধর্ম্ম-চৈতন্য-বিহীন হওয়ায় মৃতবৎ পড়িয়া আছে। তাই বোধ হইতেছে যেন চতুর্দ্দিকে হিন্দুর শব পতিত রহিয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ ওসকল শব নহে। ক্ষণ-চৈতন্য-বিহীন দেহ, মৃত দেহ নহে। ধর্ম্ম-চৈতন্যের সহিত, এই সকল দেহের পুনর্যোগ হইলেই ইহার আবার অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিবে ইহাদের ভাস্বরতায় আবার দিঙ্মণ্ডল আলোকিত হইবে। হিন্দুসমাজও আছে—আর্য্যধর্ম্মও আছে—সুতরাং আমাদের আশাও আছে। এই দুই কেবল মিশ খাইতেছে না বলিয়াই আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা। যদি কোন মহাপুরুষ বা অবতার, এই দুইকে আবার মিশ খাওয়াইতে পারেন তবেই ভারত আবার উঠিবে। আবার শতসূর্য্যের কিরণ-পুঞ্জে ভারতগগণ উদ্ভাসিত হইবে। শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় বিশাল-হৃদয় বিশ্বপ্রেমিকের ভারতক্ষেত্রে আবার আবির্ভাব একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। যখন প্রয়োজন হইয়াছে, তখন শঙ্করের পুনরাবির্ভাব অতি দূরবর্ত্তী নহে। আশা আমাদের অন্তরে যেন নৃত্য করিতেছে! জানি না ইহা মায়ার ছলনা—কি সত্যের অনুসূচনা!

শঙ্কর কি করিয়াছিলেন—কেহ কেহ হয়ত এরূপ প্রশ্নও করিতে পারেন। তদুত্তরে এই মাত্র বক্তব্য যে শঙ্কর আর্য্য ধর্ম্মের জন্মদাতা না হউন্, ইহার রক্ষাকর্ত্তা বটেন। বৌদ্ধধর্ম্মের মহতী বিশ্বপ্রেমিকতায় ও জ্ঞানময়তায়, যখন

হিন্দুধর্ম্ম ভারত হইতে বিতাড়িত হয় হয় হইয়াছিল, সেই সঙ্কট-সময়ে শঙ্কর মহতীতর মহাপ্রাণতায় ও গভীরতর জ্ঞানময়তায়, বৌদ্ধধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের কুক্ষিগত করিয়াছিলেন। অদ্বৈতবাদের মূলভিত্তি উপনিষদ, বেদান্তসূত্র ও গীতাদির অপূর্ব্বভাষাসকল বিরচিত করিয়া তিনি আর্য্যধর্ম্মকে অত্যুজ্জ্বল করিয়া তুলিলেন। তদ্ব্যাখ্যাত আর্য্যধর্ম্মের অতি মহান্ অদ্বৈতভাবের অভ্যন্তরে ভারতের আর সমস্ত ধর্ম্ম একেবারে বিলীন হইয়া গেল। হিমালয় হইতে কুমারিকা এবং সিন্ধু হইতে সুদূর প্রাচ্য দেশ পর্য্যন্ত শঙ্কর গাইয়া বেড়াইয়াছিলেন —"ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।" পর্ব্বতকন্দরে, তটিনী-নীরে, ঘোর অরণ্যে, বিশাল প্রান্তরে, নর্ত্তিত সাগরবক্ষে—প্রতিধ্বনি উঠিয়াছিল—"ওঁং একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

শঙ্কর জ্ঞানচক্ষুতে দেখিলেন যে, জগতের সর্ব্ববিধ ভেদবুদ্ধি অবিদ্যাকল্পিত। যেমন অরুণোদয়ে রজনীতিমির পলায়ন করে, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে সর্ব্ববিধ মায়াবিজৃম্ভিত ভেদবুদ্ধিও তিরোহিত হয়। সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া তিনি ভারতবাসিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ভ্রাতৃগণ! কেন তোমরা ভেদবুদ্ধির দাস হইয়া আত্মবঞ্চিত হইতেছ? এই যে প্রত্যক্ষপরিদৃশ্যমান জগৎ দেখিতেছ—ইহার বাস্তব অস্তিত্ব নাই; ইহা বিনাশি ও বিবর্ত্তনশীল। "ইদং জগৎ ব্রহ্মময়ম্"—এই জগতে ব্রহ্ম বই আর কোন সত্ত্বা নাই। নিত্য-বিদ্যমান—অপরিবর্ত্তনশীল—চৈতন্যময় ব্রহ্মই এই জগতের একমাত্র সমবায়িকারণ। তোমরা যেসকল ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখিতেছ, ভিন্ন ভিন্ন স্বর শুনিতেছ, ভিন্ন ভিন্ন আস্বাদন করিতেছ, ভিন্ন ভিন্ন স্পর্শ অনুভব করিতেছ, এবং ভিন্ন গন্ধ আঘ্রাণ করিতেছ—ঐ সমস্তই মায়ার কার্য্য। ইহাদের বাস্তব সত্ত্বা নাই। মায়াই অঘটন-ঘটনকারিণী কুহকিনী মায়াই আমাদিগের অন্তরে এইরূপ অলীক ভেদবুদ্ধি উৎপাদন করিয়া, আমাদিগকে কখন সুখের কখনবা দুঃখের দাস করিয়া তুলিতেছে। তোমরা আর কতদিন মায়ার ছলনায় এরূপ বিড়ম্বিত হইবে?

"আইস ভাই! তোমরা আমার সহিত সর্ব্বময় ব্রহ্মের চরণে সর্ব্বপ্রকার ভেদবুদ্ধি উৎসর্গ কর—আপনার ব্যক্তিত্ব সেই অনন্ত ব্রহ্মসাগরে ডুবাইয়া দেও! তখন অপরিসীম আনন্দ ও অপরিচ্ছিন্ন শান্তির অধিকারী হইবে। তখন ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালে এবং বিষ্ঠা ও চন্দনে তোমার আর ভেদবুদ্ধি থাকিবে না। সর্ব্বত্র ব্রহ্ম স্ফূরণ হইবে। তখন যাহা দেখিবে—যাহা শুনিবে—যাহা স্পর্শ করিবে—যাহা

আস্বাদন করিবে—যাহা ঘ্রাণ করিবে—সকলই ব্রহ্মপদার্থ বলিয়া উপলব্ধি করিবে। যে ঘ্রাণ করিবে সেও ব্রহ্ম, যাহা ঘ্রাণ করিবে তাহাও ব্রহ্ম। সেই রূপ সকল বিষয়েই—বিষয় ও বিষয়ীর ভোক্তা ও ভোগ্যের—ভেদ একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। তখন কাহারও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিবে না—সুতরাং কে কাহাকে ঘৃণা করিবে? ব্রাহ্মণে যখন জানিতে পারিবেন যে তাঁহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই স্বাতন্ত্র্য-জ্ঞান কেবল অজ্ঞান-জনিত, তখন আর চণ্ডালকে ঘৃণা করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি থাকিবে না। তাই বলিতেছি ভাই! আইস একবার সর্ব্বপ্রকার ভেদবুদ্ধি ভুলিয়া আমরা ভারতবাসী আর্য্যসন্তানগণ আজ পরস্পরকে ও অনার্য্য ভ্রাতৃগণকে প্রাণভরিয়া আলিঙ্গন করি। এই প্রাণের আলিঙ্গনে আমাদিগের অতীত বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়া যাউক! এস আমরা জাতি-নির্ব্বিশেষে সমস্ত ভারতসন্তান এই গাঢ় প্রেমালিঙ্গনে একটী ঘনীভূত অখণ্ড চৈতন্য-পুঞ্জে পরিণত হই! যেন একই দেহ এবং একই প্রাণ!"

শঙ্করের এই আহ্বানে সমস্ত ভারত প্রথমে স্তম্ভিত হইল! স্বার্থান্ধ ব্রাহ্মণ যাজক-মণ্ডলীর শাস্ত্র-ব্যাখ্যায় আর্য্যধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অনেকেই বুঝিতে পারিতেন না বলিয়াই বৌদ্ধধর্ম্মের শান্তিদায়িনী ছায়ায় অনেকে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কেহ কেহ বা তদ্ধর্ম্ম গ্রহণোদ্যত হইয়াছিলেন। প্রবৃত্তিমূলক ভেদময় বৈদিক ধর্ম্মের আড়ম্বর পূর্ণ আনুষ্ঠানিকতায়, নিবৃত্তিমূলক ভেদনিরাশক জ্ঞানাত্মক বৈদিকধর্ম্ম বিলীন হইতে বসিয়াছিল। আজ শঙ্করমুখে তাহার প্রকৃত ব্যাখ্যা অদ্বৈতজ্ঞানাত্মক মীমাংসা শ্রবণ করিয়া ভেদপীড়িত ব্রাহ্মণেতর বর্ণ সকল আবার যেন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে 'যদি অভেদজ্ঞান আর্য্যধর্ম্মের সার মর্ম্ম হয়, তবে সে ধর্ম্ম ছাড়িয়া অন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করার প্রয়োজন কি? যদি যে ধর্ম্মে রহিয়াছি সেই ধর্ম্মেই সুখশান্তি পাই তবে একটা নূতন ধর্ম্ম অবলম্বন করি কেন?' আর যাহারা বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল তাহারাও ভাবিতে লাগিল যে—'যখন আমাদের পিতৃপিতামহ হিন্দুধর্ম্মে অনন্ত সুখ-শান্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে তখন এই নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায়ে থাকিয়া আর প্রয়োজন কি? এইরূপে যাহারা বৌদ্ধ হইয়াছিল বা বৌদ্ধ হইতে উদ্যত হইয়াছিল, সকলেই নবীন উৎসাহের সহিত হিন্দুধর্ম্মের ক্রোড়ে পুনরাশ্রয় গ্রহণ করিল বা রহিয়া গেল। এই প্রাকৃতিক স্থিতিশীলতার বশীভূত হইয়া

হিন্দুসমাজ সর্ব্বগ্রাসোম্মুখ বৌদ্ধবিপ্লব হইতে রক্ষা পাইল। শুদ্ধ যে যাঁহারা হিন্দু ছিলেন কেবল বৌদ্ধভাবাপন্ন হইয়াছিলেন তাঁহারা হিন্দু রহিয়া গেলেন আর হিন্দুধর্ম্ম ছাড়িয়া যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা হিন্দু সমাজে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এরূপ নহে—শঙ্করের অদ্বৈতবাদের মোহিনীশক্তিতে অসভ্য পার্ব্বতীয় জাতি সকলও হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। এইরূপে হিন্দুসমাজের পরিসর অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। ভারতে বিশ্বব্যাপিনী শান্তি বিরাজিত হইল। হিন্দুসমাজেও হিন্দুধর্ম্মের মহিমা জগতের সর্ব্বত্র উদ্‌ঘোষিত হইল!

এইরূপে আচার্য্যচূড়ামণি শঙ্কর আর্য্যসমাজে ও আর্য্যধর্ম্মে যে বৈদ্যুতিক বেগ সংক্রামিত করিয়া গিয়াছিলেন তাহার প্রভাবে আর্য্যসমাজ ও আর্য্যধর্ম্ম বহুদিন মহামহিমান্বিত হইয়াছিল। কিন্তু কালের গতিতে সে বৈদ্যুতিক বেগ তিরোহিত হইয়াছে। শঙ্কর প্রক্ষিপ্ত যে বিদ্যুৎ আর্য্যসমাজ ও আর্য্যধর্ম্মকে অনুপ্রাণিত করিয়া পম্পরের সহিত পরস্পরকে ঘনসম্বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল সে বিদ্যুৎ ছুটিয়া গিয়াছে। সুতরাং আর্য্যসমাজ ও আর্য্যধর্ম্ম পরস্পরবিচ্ছিন্ন হওয়ায়, আর্য্যসমাজ সামঞ্জস্য-বিহীন হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া আছে। আবার বৈদ্যুতিক তারে উভয়কে গ্রথিত করিয়া, মৃতপ্রায় আর্য্যসমাজকে অনুপ্রাণিত ও পূর্ব্বগৌরবে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইবে। তাই আমি ভক্তি গদগদ ভাবে শঙ্করের পুনরাবির্ভাবের জন্য প্রার্থনা করিতেছি। তাদৃশ মহাপুরুষের আবির্ভাব ভিন্ন আর্য্যসমাজের আর রক্ষা নাই। তাই আজ আমি প্রাণভরি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি—তিনি আবার শঙ্করকে অথবা অন্য কোন অবতারকে ভারতে পাঠাইয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভেদবুদ্ধি নিপীড়িত হিন্দু সমাজকে অনুপ্রাণিত ঘনসন্নিবিষ্ট ও পরস্পর প্রেমাকৃষ্ট করুন। এরূপ ধর্ম্মবিপ্লব ও সমাজবিপ্লবের সময় ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষার জন্য ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন—সুতরাং ভারত ধর্ম্মভূমি ভারতের পুনরুদ্ধারের জন্য ভগবানেরই পুনরায় অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব। নতুবা এ সঙ্কটে ভারতের উদ্ধারের আর আশা নাই। অগণ্য হিন্দুসন্তানের উৎকট বাসনায়—ও প্রাণময়ী প্রার্থনায় ভগবানের আসন নিশ্চয় টলিবে। তিনি বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া আবার ভারতে অবতীর্ণ হইয়া দুষ্কৃতের বিনাশ-সাধন ও ধর্ম্ম-সংস্থাপন করিবেন। আবার ভারতে বিশ্বপ্রেমের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা-

পিত হইবে। ইহা কি স্বপ্ন—না মায়া ? না—স্বপ্ন বা মায়া কখন নহে। ভগবানের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হইতে পারে না।

এস ভাই! আমরা সমস্ত ভারতবাসী মিলিয়া ভগবানের আগমনী গাই আমাদের প্রেমময় ঐকতানিক স্বরে তাঁহার প্রেমময় হৃদয় অবশ্যই গলিত হইবে। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া ভারতের রক্ষার জন্য শীঘ্র অবতীর্ণ হইবেন এই আশায় আমরা প্রাণধারণ করিয়া রহিলাম।

হে প্রাণনাথ! হে বৈকুণ্ঠনাথ! হে গোলোকনাথ! তুমি বৈকুণ্ঠ বা গোলোকের অনন্ত সুখ ছাড়িয়া আর একবার তোমার লীলাভূমি ভারতে অবতীর্ণ হও। তোমার বড় সাধের ভারত ছারখার হইয়া যাইতেছে—তুমি কি বলিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছ? তোমার অলৌকিক প্রেমের লীলা আবার দেখাইয়া ভারতবাসীর শুষ্ক প্রাণে আবার রস সঞ্চার কর। হে গোব্রাহ্মণপালক! তোমার গোব্রাহ্মণ ভারত হইতে বিলুপ্ত হইতে চলিল—আর তুমি সুখশয্যায় নিশ্চিন্ত হইয়া আছ? উঠ দেব! উঠ—তোমার মৃতসঞ্জীবনী মুরলীধ্বনিতে মৃতপ্রায় ভারতকে পুনঃ সঞ্জীবিত কর। আবার নিজ মুখে নবগীতা শুনাইয়া হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টান্, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি পরস্পর বিসম্বাদী ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে পূর্ণ অদ্বৈতবাদে দীক্ষিত করিয়া ভারতে জাতিসাম্য ও ধর্ম্মসমন্বয় প্রতিষ্ঠাপিত কর। হে প্রাণনাথ! তুমি ভারতবাসীর প্রাণের ভিতর আবির্ভূত হইয়া তাহাদিগকে আশ্বস্ত কর।

দ্রৌপদী তোমায় দ্বারকানাথ বলিয়া ডাকিয়াছিলেন বলিয়া তুমি দুঃশাসন কর্ত্তৃক তাঁহার বস্ত্রহরণের সময় কুরুরাজসভায়, এবং দুর্ব্বসার শাপভয়ে বিহ্বলা হইয়া যখন দ্রৌপদী আবার তোমায় দ্বারকানাথ বলিয়া ডাকিয়াছিলেন—তখন দ্বৈতবনে পাণ্ডবগণকুটীরে, যাইতে বিলম্ব করিয়াছিলে, তাই হে দীনবন্ধো! তোমায় আজ আমরা—দীন ভারতসন্তানগণ 'প্রাণনাথ এস হে!' বলিয়া ডাকিতেছি, তুমি ত্রিশ কোটী ভারতবাসীর প্রাণের ভিতর দ্রুত অবতীর্ণ হইয়া অভয়বাণী দেও, কবে তুমি আমাদের—এই দারিদ্র্য—দাস্য—মহামারি দুর্ভিক্ষাদি প্রপীড়িত ভারতসন্তানগণের উদ্ধারের জন্য ভারতে পুনরবতীর্ণ হইবে। নাথ! প্রাণেশ্বর! আশা দিয়ে মরণোন্মুখ ভারতবাসীর প্রাণ রাখ! আর বিলম্ব করিও না। ওঁ স্বস্তি !!

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

যশোহর ১৪ই ভাদ্র।

আমাদের দুঃখ কাহিনী।

ভারতবর্ষ মানে যে সুদ্ধ কলিকাতা সহর টুকু নয়, কিম্বা কেবল বাঙ্গালা প্রদেশের কয়েকটী জেলা মাত্র নয় ইহা যেন আমাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির বোধ নাই। দেশের অনেক শিক্ষিত যুবককে "দেশহিতৈষণার" দারুণ আবেগে "ভারত মাতা" "ভারত মাতা" বলিয়া সজোরে চীৎকার করিতে শুনা যায়; কিন্তু ভারত মাতার শরীরটা যে কিরূপ বিশাল, এবং তাঁহার অগণ্য সন্তানগণ যে কে কোথায় কি অবস্থায় আছেন সে সকল বিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞান কতটুকু, তাহা ঠিক করা কঠিন। আবার এমনও কেহ কেহ আছেন যাঁহাদের চক্ষে বাঙ্গালার কয়েকটী ভদ্র পরিবার লইয়াই ভারতবর্ষ! ইঁহারা নিজেদের সঙ্কীর্ণ অভিজ্ঞতা-সুযোগী সমগ্র ভারতবাসী সম্বন্ধে অবাধে এক-সাপ্টা মতামত প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবং আপনাদিগকে "ভারতোদ্ধার" ব্রতে ব্রতী মনে করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয়েন না। চারিদিকে ঘুরিয়া সমস্ত নিজে না দেখিলে যে মানুষের চক্ষু ফুটে না, সহস্র পুস্তক পাঠ বা লোক মুখে শ্রবণ দ্বারা যে দূর দেশ সম্বন্ধে প্রকৃত অভিজ্ঞতা লাভ অসম্ভব, বিদেশ সম্বন্ধে আসল তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য চক্ষু কর্ণ উন্মুক্ত রাখিয়া* পর্য্যটন যে একমাত্র উপায় তাহা কোন কোন শ্রেণীর লোক বুঝিয়াও বুঝিতে চাহেন না। একদা কোন প্রকাশ্য সভায় কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জনৈক সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারী "দেশ হিতৈষী" যুবককে সগৌরবে

---

* কলের মত দেশ বিদেশ ঘুরিলে কোনই ফল হয় না। অনেক জাহাজের খালাসী বহুবার ইউরোপ আমেরিকাদি পাশ্চাত্য জগৎ যাতায়াত করিয়াও যে জান বাজারের খালাসী ঠিক সেই জান বাজারের খালাসীই রহিয়া গিয়াছে, কোন বিষয়ে তিলমাত্রও পরিবর্ত্তন হয় নাই। সুতরাং পর্য্যটনে বাহির হইবার পূর্ব্বে যিনি সারগ্রাহিতা শিক্ষা করিয়াছেন কেবল তিনিই দেশাটন দ্বারা সম্যক্ জ্ঞান লাভ করতঃ উন্নত হইয়া থাকেন; এবং অপরকে সেই জ্ঞানের অংশ দিতে সক্ষম হয়েন। কালেজের লেখা পড়া শেষ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে কিছুদিনের জন্য দেশ বিদেশ ভ্রমণ দ্বারা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ইউরোপীয় বিদ্যার্থীদিগের একটা প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে। এতদ্ব্যতীত শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না এ কথা সকলেই জানেন। আমরা বুঝি কোন প্রকারে তিন চারিটী পাশ করা ছেলে হইলেই সে ধনুর্দ্ধর হইল। বিদ্যাকে কেবল অর্থকরী উপায়রূপে দেখিলে এবম্প্রকার অবস্থাই দাঁড়াইয়া থাকে। আমাদের কপালের দোষেই এ সকল ঘটিতেছে।

একথা প্রকাশ করিতে শুনা যায় যে তিনি বর্দ্ধমানের ওদিকে কখন যান নাই। এরূপ স্পর্দ্ধা জাহির করিবার উদ্দেশ্য এই যে পর্য্যটন সম্বন্ধে তাঁহার পুঁজি এত অল্প হওয়া সত্ত্বেও তিনি একজন গভীর জ্ঞানী ও বহুদর্শী, এবং কেবলমাত্র পুস্তকগত বিদ্যা দ্বারা পৃথিবীর অন্যান্য অংশের সহিত ভারতবর্ষের সকল অবস্থার তুলনা বিষয়ে এ পরিমাণে পটুতা লাভ করিয়াছেন যে তাঁহার মতামত অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে সবাই বাধ্য। কালেজীয় ছাত্রপূর্ণ উক্ত সভাতে বক্তা মহাশয় বিলক্ষণ বাহাবাও পাইয়াছিলেন, উপযুক্ত মর্ম্মগ্রাহী শ্রোতৃবর্গ ব্যতীত ওরূপ প্রলাপ বাক্যের মর্য্যাদা কে করে! হস্ত পদ নাড়িতে হইবে না, প্রাণপ্রিয় বাস্তুভিটার বাহিরে এক পাও যাইবার দরকার নাই, ঘরের কোণে প্রেয়সীর সুকোমল সুশীতল অঞ্চল-ছায়ায় সুখে তাকিয়া ঠেসান্ দিয়া শয়ন করত চৌষট্টী কলা বিদ্যাতে দখল জন্মিবে, কলিকাতার গ্যাসালোকে বসিয়া দুনিয়া-জাহানের সকল স্থানের প্রকৃতি ছবি সমূহ সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া অনায়াস সাধ্য;— এমন সুমিষ্ট উপাদেয় সমাচার অপেক্ষা উদ্যমহীন অলস বাঙ্গালী বাবুদের পক্ষে মনমুগ্ধকর আর কি হইতে পারে? যেখানে অঙ্গ সঞ্চালনের প্রয়োজনাভাব সেখানে আমরা প্রফুল্ল চিত্তে সর্ব্বাগ্রে হাজির, কারণ অঙ্গুলিটী পর্য্যন্ত হেলাইতে আমাদের ক্লেশ হয়। সুতরাং দূরদেশ ভ্রমণ প্রবাস কষ্ট প্রভৃতি বিড়ম্বনার বিপক্ষে যে মহাত্মা দুকথা বলেন তিনি নিশ্চয়ই আমাদের নিকট বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। এরূপ ব্যাধি কেবল আমাদের এই হতভাগা দেশেই দেখা যায়, এবং উক্ত প্রকারের প্রলাপ-বাক্য আধুনিক ভারতেই শোভা পাইয়া থাকে।

পুরাণাদিতে ভারতবর্ষের নাম উল্লিখিত আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ও সাদিয়া হইতে আটক পর্য্যন্ত এখন যে দেশ "ইণ্ডিয়া' নামে পরিচিত তাহা ঐতিহাসিক কালে যে কখন এক রাজার শাসনে ছিল ইহার প্রমাণাভাব। ইংরাজ বাহাদুর ভারতে রাজ্য স্থাপন করতঃ মান্দ্রাজী, পাঞ্জাবী, আসামী গুজরাটী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতিকে এক ছত্রের অধীনে আনিয়া এই বিশাল ভূখণ্ডকে যেরূপ একটা ভৌগলিক ও রাজনৈতিক * সত্তা দিয়াছেন সেরূপ আর কেহ পারেন নাই। এখন যেমন পূর্ব্বেকার পরস্পর-বিরোধী জাতিগণ এক সূত্রে বদ্ধ থাকিয়া একের সুখ দুঃখে অপরে সুখ দুঃখ অনুভব করিতেছেন, তেমন

---

* Geographical and Political existence.

কস্মিনকালেও ঘটে নাই; এমন কি হিন্দু মুসলমানের ন্যায় দুই ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী চির শত্রু জাতীও এখন সমস্ত প্রাচীন বিদ্বেষ বিস্মৃত হইয়া উভয়ের মধ্যে পরম আত্মীয়তা সংস্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছেন;—বৃটনের কল্যাণে আমরা সকলে মিলিয়া একটা বিরাট জাতি হইতে শিক্ষা করিতেছি, ফলে কি দাঁড়াইবে ভগবানই জানেন। ভারতবর্ষে শতাধিক নানা মূর্ত্তির বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত; সুতরাং সভ্যাসভ্য ততোধিক ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকের এদেশে বাস। তারপর উচ্চতম সুসভ্য হইতে প্রাথমিক অবস্থার নিতান্ত অসভ্য বর্ব্বর পর্য্যন্ত সকল সোপানের জীব এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতা মান্দ্রাজ বোম্বাই নাগা প্রভৃতি বড় বড় সহরের নওরোজী জামশেটজী, বানার্জি, চটর্জী হইতে নগ্ন নাগা লাম্‌পুং পর্য্যন্ত যে কত স্তরের জীব ভারতবাসী পদবাচ্য তাহা ঠিক করা কঠিন। কাহার সাধ্য যে কলিকাতার ব্যারিষ্টর শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজমহলের সাঁওতাল সুদ্দু মাঝির মত সম্পূর্ণ বিপরীত আকৃতি প্রকৃতি, হাব ভাব, আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম নীতি বিশিষ্ট দুই ব্যক্তিকে এক দেশের লোক বলিতে পারে? * উল্লিখিত অধিবাসীগণ ব্যতীত আরব, পারস্য, তাতার কাবুল প্রভৃতি দূর দেশ হইতে কত শ্রেণীর কত রকমের সুসভ্য বহু সংখ্যক মুসলমান ভারতে আসিয়া দেশীয় স্বধর্ম্মীদিগের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন। মুসলমানগণ হিন্দুস্থানবাসী এই অর্থে হিন্দু নাম গ্রহণ না করিলেও এবং ধর্ম্মাদি সম্বন্ধে তুরস্কের সুলতান ও আরব দেশের সহিত ঘনিষ্টতা রাখিলেও তাঁহারা আমাদের ন্যায় ষোল আনা ভারতবর্ষেরই "নেটিব আদমী"। সুতরাং আর্য্যানার্য্য, হিন্দু অহিন্দু, ককেশীয় মোঙ্গলীয়† উত্তর বঙ্গের কোচ পোলী প্রভৃতি এবং আসামের অনেক গুলি জাতি খাঁটী মোঙ্গলীয় প্রভৃতি নানাবিধ চেহারার ছোট বড় সবাই আমরা ভারতবাসী। এই উচ্চনীচ বিভিন্ন অবস্থাপন্ন বিপুল সংখ্যক জীব দেশের কোন্ অংশে কি প্রকারে দিন যাপন করিতেছেন, তাহা নির্ণয় করতঃ তাঁহাদের সম্বন্ধে কোনরূপ মতামত প্রকাশ করা বা সমীকীর্ণ উপায় নির্দ্ধারণ করতঃ তাঁহাদের সম-

* লণ্ডন ডকে কয়েকজন চাটগেঁয়ে জাহাজের খালাসীকে দেখিয়া আসিয়া জনৈক ইংরাজ আপনাদের বন্ধু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বিশেষ কৌতুহলের সহিত আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "উহারা কি স্বদেশী? এ কথা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে ভয়ানক কঠিন।"

† উত্তর বঙ্গের কোচ্‌পোলী প্রভৃতি এবং আসামের অনেকগুলি জাতি খাঁটী মোঙ্গলীয়।

ষ্টির কল্যাণোদ্দেশে চেষ্টা পাওয়া সহজ ব্যাপার নহে। কার্য্য দূরে থাকুক, কল্পনায়ও সব কথা ভাবিতেও মাথা ঘুরিয়া যায়। এরূপ স্থলে "ভারতের উন্নতি" "ভারতের উন্নতি" বলিয়া ফাঁকা চীৎকার না করিয়া যদি নিজের গ্রাম বা প্রদেশের হিতকল্পে চেষ্টা পাই তাহা হইলে আশু ফলের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এই প্রকারে প্রত্যেকে আপনাপন বিভাগের কল্যাণ চিন্তায় রত থাকিলে অচিরাৎ সমগ্র দেশের মঙ্গল আশা করা যাইতে পারে। সুতরাং তাহাই আমাদের আপাততঃ কর্ত্তব্য।

যাহাই হউক বর্ত্তমান সময়ে আমরা যে নানারূপে বিষম দুর্দ্দশাগ্রস্ত তাহা, যে ভাবেই হউক, আজকাল অনেকে ভাবিতেছেন দেখিয়া ভারতমাতা তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। বেশ স্মরণ হয়, চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে সমগ্র দেশের কল্যাণ অকল্যাণ, উন্নতি অবনতি, সম্বন্ধে চিন্তা করা অনেকে তত প্রয়োজন বোধ করিতেন না, অথবা সে ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল না। নিজাম রাজ্য হায়দ্রাবাদ যে ভারতবর্ষের অন্তর্গত, সেখানকার লোকের সহিত যে আমাদের সম্বন্ধ সহানুভূতি আছে, এ কথা জানিবার বুঝিবার উপযোগী শিক্ষা কয়জন পাইয়াছিলেন? কাজেই অধিকাংশ লোকের নিজের গ্রামটুকুর বাহিরে দৃষ্টি যাইত না। কিসে আমাদের ভাল হয়, কোন্ কোন উপায়ে আমরা পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যজাতিসমূহের সঙ্গে একাসনে স্থান পাইবার যোগ্য হইতে পারি; পুনরায় ভারতের নাম সংসারে সম্মানার্হ হইতে পারে কি না; কি কি বিষয়ে আমাদের ত্রুটি দুর্ব্বলতা দৃষ্ট হয়, সেগুলি সংশোধন করিতে গেলে কোন্ পথ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, আমাদের প্রাচীন আর্য্য শিক্ষা তজ্জন্য ঠিক, কি পাশ্চাত্য ব্যবস্থাসমূহ উপযোগী; দেশোদ্ধার হেতু পুরাতনের সংস্কার আবশ্যক, না সেকালের প্রথা সমূহ আদৃত পুনরবলম্বনীয়; ইত্যাদি গভীর কথাবার্ত্তা আজকাল বক্তৃতায় লেখায় সর্ব্বত্র আলোচিত হইতেছে। নিজের নিজের জ্ঞান বিশ্বাস অনুসারে যিনি যেরূপ মতামত প্রচার করুন না কেন, এ আন্দোলনের একটা শুভ ফল নিশ্চয়ই হইবে। ভাবনা, চিন্তা, কথা, লেখা কিছুই বৃথা নষ্ট হইবার জিনিস নয়, সমস্তই অনন্তকাল অবস্থিতি করিয়া শক্তি ও অবস্থানুসারে কার্য্য করিতে থাকিবে, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। সহসা কার্য্যে কিছু করিতে পারি আর নাই পারি, সরল মনে প্রাণের ব্যাকুলতার সহিত সুদ্ধ ভাল কথা ভাবিয়া গেলে সে

সচ্চিন্তার ফল এক দিন ফলিবেই ফলিবে ; রাতারাতি কোন বিষয়েই সফল হওয়া যায় না। বীজ রোপিত হইবামাত্র বৃক্ষে পরিণত হইয়া ফল প্রদান করে না, নারিকেল, তাল প্রভৃতি অনেক বৃক্ষের ফল ভোগ বীজ বপনকারীর ভাগ্যে ঘটে না, পুত্র পৌত্র ফল ভোজন করতঃ পিতা পিতামহকে ধন্যবাদ দিয়া থাকেন। আমার সকল কাজের ফল যে আমাকেই ভোগ করিতে হইবে, এরূপ ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা মানুষের শোভা পায় না। অধুনা আমরা সবে বাহিবে যেরূপ কুগ্রহ সমূহ দ্বারা আক্রান্ত তাহাতে কেবল মাত্র সদুপায় চিন্তা করিয়া চলিয়া যাওয়া ভিন্ন আমাদের অন্য উপায় দেখি না ; এই ঘোর দুর্ব্বিপাকে ভাল কাজ করিতে পারা এক প্রকার অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে যাঁহারা গভীর সহানুভূতি সহ আমাদের দুঃখ বিপদের কথা ভাবিয়া যাইতে পারেন তাঁহারাই ধন্য। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আপাততঃ এই ব্যবস্থা।

আমাদের মধ্যে কেহ কেহ ভারতের দুর্দ্দশার কারণ সমূহ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া প্রকৃত কথার সঙ্গে সঙ্গে বারম্বার রাজার প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকেন। পরের ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপাইতে পারিলে মন্দ হয় না। কাহার দোষ? যেখানে অনুসন্ধানের বিষয় দোষীকে দণ্ড দিবার জন্য সেখানে সত্যের অনুরোধেই হউক আর প্রাণের ভয়েই হউক "যত কিছু পাপঃ নরোত্তমে চাপং" করিতে পারিলে নিষ্কৃতি পাওয়া যইেতে পারে ; কিন্তু এখানে ত আমাদের বিচার হেতু কেহ কৈফিয়ত চাহিতেছে না যে তজ্জন্য কতকগুলি যুক্তিতর্কের দ্বারা অপরের স্কন্ধে সমস্ত ঝাড়িয়া দিয়া মুক্তিলাভ করতঃ নিশ্চিন্ত হইব। এখানে আসল কথা দেখিতে হইবে,—যাহার দোষেই হউক, দুঃখে পড়িয়াছি আমরা, দুঃখ ভোগ করিতে হইবে আমাদিগকে প্রকৃষ্ট উপায়ে দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাইবার আমাদের কর্ত্তব্য। সুতরাং এ স্থলে পরের ছিদ্রানুসন্ধানে নিযুক্ত না থাকিয়া নীরবে ক্রটী সমূহ নির্দ্দেশ করতঃ যথাসাধ্য সংশোধন চেষ্টাই সর্ব্বতোভাবে সমীচীন।

"রাজার পাপে রাজ্য নাশ" যে পুরাতন প্রচলিত কথা আছে তাহা এখন আর আমাদের পক্ষে খাটে না, যেরূপ রাজা স্বতন্ত্র সামগ্রী। সেকালে রাজা যখন সর্ব্বদা ভোগ বিলাসে মত্ত থাকিয়া রাজকার্য্য সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিতেন, নীচাশয় অমাত্যবর্গ সুযোগ পাইয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির হেতু প্রজার প্রতি

নানারূপ অত্যাচার উৎপীড়ন দ্বারা রাজ্যমধ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলা ঘটাইতেন, তখন কাজে কাজেই প্রকৃতিবর্গ শ্রীভ্রষ্ট হইয়া দারুণ দুঃখ বিপদাচ্ছন্ন রাজ্য নষ্ট হইত। পাশ্চাত্য প্রথানুযায়ী সেরূপ সম্ভাবনা কোথায়? এখন দেখা যাউক আমাদের রাজা কে? ঈশ্বর-নিয়োজিত তাঁহার অংশাবতার স্বরূপ দেবোপমপ্রকৃতি নর-পাল বলিয়া আমরা দুঃখ অভাবের নিরাকরণ প্রার্থনায় কাহার সম্মুখে কাঙ্গালীর বেশে দাঁড়াইতে পারি? এমন ভূপতি কৈ, যিনি অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত? এখন যে ব্যক্তি নাম মাত্র আমাদের সম্রাট তাঁহাকে পঙ্গু পরাধীন বলিলেও কোন দোষ হয় না! ওরূপ নৃপতির পাপও নাই, পুণ্যও নাই, অর্থাৎ তাঁহার মনোযোগ অমনযোগে প্রজার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হইতে পারে না। তবে কাহার অধীনে থাকিয়া আমরা কাহার দ্বারা শাসিত। প্রকৃত প্রস্তাবে যাঁহার ধমনীতে বিন্দুমাত্রও বৃটীশ রক্ত প্রবাহিত হইতেছে এরূপ শ্বেতকায় নর নারী মাত্রেই আমাদের রাজা ও শাসক। উঁহাদের বহু পুণ্যও আছে, বহু পাপও আছে, এবং তাহার ফলে আমাদের সুখ দুঃখও অবশ্যম্ভাবী, এ কথা প্রত্যহ রগে রগে অনুভব করিতেছি। কিন্তু বিচার্য্য এই যে তাঁহাদের মুখাপেক্ষা ব্যতীত কি আমাদের কোন প্রকার দুঃখ দূর হইবার নহে, এবং সকল দুঃখের মূলীভূত কারণ কি তাঁহাদের পাপ।

স্বার্থান্ধতা বশতঃ উল্লিখিত অগণ্য শ্রেণীর অসংখ্য রাজাদের ত্রুটি অমনো-যোগ হেতু আমাদিগের অনেক দুঃখ অভাব ঘটিয়াছে, সত্য; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া শৈত্য প্রধান স্বাস্থ্যকর দেশ হইতে দারুণ গ্রীষ্মাতিশয্য ভোগ করিতে এই রোগ ব্যাধিসমাকুল যে সাত গোষ্ঠী আসিয়া পড়িয়া আছেন, ইহা কি শুদ্ধ রথ দেখিবার জন্য, না কলা বেচাও উদ্দেশ্য আছে? সহজেই বুঝা যায়, কদলী বিক্রয়ই প্রধান ও প্রথম উদ্দেশ্য, রথ দর্শন যত হউক আর নাই হউক। মুখে যাহাই বলুন না কেন, ভারতবাসীর হিতের জন্যই ভারত শাসন।—কাজে কি তাহাই হইতেছে? সন্ন্যাসী চোর?—না, দ্রব্যে ঘটায়। আসলে যাহা দেখা যাইতেছে তাহাতে নিজেদের স্বার্থ সাধনই প্রধান লক্ষ্য বলিয়া বোধ হয়, এবং কেনই বা তাহা না হইবে? খৃষ্টান নাম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া ত সবাই খৃষ্ট হইতে পারেন না; উঁহারা আমাদের মতে স্বার্থপর জীব, পেটের দায়ে স্বার্থের অনুরোধে যেন তেন প্রকারেণ অর্থ সংগ্রহ হেতু বিদ্যুতের ন্যায় পৃথিবীময় ছুটাছুটি করিতেছেন কে না জানে? আমাদের রাজাদিগের টাকার বড়ই দরকার, গরিব বলিয়া নয়,—গরিবের টাকার প্রয়োজন নাই, গরিব দুঃখীরা গরিব হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আজীবন গরিব হইয়া থাকিতে এবং গরিবাবস্থায় মরিতে বাধ্য,—ধনী বলিয়া, নিরানব্বইয়ের ধাক্কা। সাংসারিক সম্পদের অসারতা বোধ, প্রকৃত ভগবানের ভয় বা পার-লৌকিক চিন্তা অতি অল্প লোকেরই দৃষ্ট হয়, প্রায় সবাই ইহজগতের সুখ

সমৃদ্ধি, ভোগবিলাস, লম্বাই চৌড়াই লইয়াই দিবারাত্রি ব্যস্ত, কাজেই টাকা টাকা করিয়া এরূপ দৌড়াদৌড়ি মারামারি। বিপুল ধন সংগ্রহ করা নিতান্ত আবশ্যক; কতক খরচ হইবে, কতক সঞ্চিত থাকিবে, বার্দ্ধক্যে নিজের জন্য, অবর্ত্তমানে বংশাবলির জন্য। ইহা আবাল বৃদ্ধবনিতার বীজমন্ত্র, প্রত্যেকের অস্থি মজ্জাগত প্রবৃত্তি। আমরা দরিদ্র হইলেও আমাদের জীবনযাত্রার জন্য সংসারিক প্রয়োজন কম উঁহারা ধনী হইলেও উঁহাদের বাবুগিরির-মাত্রা এত বেশী, এবং ক্রমে এরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে যে আরও অধিক আরও অধিক টাকা আবশ্যক, নতুবা মান সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া চলা ভার। ঐ ঢেউ যে আমাদিগ-কেও না লাগিয়াছে এমন নয়; বিলাসিতা ও সঞ্চয় উভয়বিধ মোহের নেশা ক্রমে আমাদিগকেও আচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে।* (ক্রমশঃ)

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

সীতা।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—রাজসভা। কাল—প্রভাত।

সভাভঙ্গান্তে সিংহাসনারূঢ় একাকী রাম।

রাম। এইত রাজত্ব;—এ সোণালি করা
লোহের শৃঙ্খল; কালকূট ভরা
স্বর্ণ পাত্র; এই অন্তঃসার শূন্য
গৌরব; এ পাপ—পরি শুধু পুণ্য

---

* একজন সবজজ ছিলেন, অল্পদিন হইল মারা গিয়াছেন। তিনি যখন ৮০০, টাকা বেতন পাইতেন তখনকার কথা বলিতেছি। তাঁহার সদাসর্ব্বদা নালিশ ছিল, ৮০০, টাকায় কুলায় না। একদিন সকলে মিলিয়া ধরা হইল, মাসিক ৮০০, টাকায় চলে না; এ কেমন কথা; তিনি তখন হিসাব দিতে আরম্ভ করিলেন;—"ভদ্রলোকের প্রতি মাসে একখানি ৫০০, টাকার কোম্পানির কাগজ না করিলে নেহাত খারাপ দেখায়; বাকী ৩০০, টাকা হইতে ২০০, টাকায় সোণা কি মাসে যদি গৃহিণীর জন্য খরিদ না হয়, তিনিই বা কি বলেন?. বাকি রহিল ১০০, মাত্র, তাহা হইতে ৫০, টাকা কলিকাতায় পাঠাইতে হয়, দুইটী পুত্র কালেজে পড়ে। অবশিষ্ট ৫০, টাকা বাসাখরচ কুলাইয়া উঠিতে পারে না"।

বলা বাহুল্য, তিনি কখন ভিখারীকে এক মুষ্টি ভিক্ষা দিতেন না, চিরকাল অশৌচের দোহাই দিয়া দ্বারস্থ ভিক্ষুককে ফিরাইয়া দিতেন। সেদিন একটা বন্ধু লিখিয়াছেন, ৬৯০, টাকা মাসিক বেতনে তাঁহার কুলায় না, তিনি ঋণগ্রস্ত। ইঁহার বোধ হয় কিছু লম্বাই চৌড়াই থাকিবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কোন ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, ৫০, টাকা মাসিক বেতনে তাঁহার কিছুতেই চলে না। তদুত্তরে উক্ত মহাত্মা বলেন, "একেবারে চলে না, অমন কথা কেন বল? বল যে ৫০, টাকায় চলে, তবে গড়্ গড়্ করিয়া চলে না।" প্রয়োজন যত কমাইতে পারা যায় ততই সুখ সন্তোষ লাভের কথা, ইহা অতি প্রাচীন বাক্য।

ছদ্মবেশ ; স্বর্ণ পিঞ্জরেতে বাস
বিহঙ্গের ; এই কদর্য্য বিলাস।
এই পদলাভ করিতে নিয়ত
হত্যা মিথ্যা দ্বন্দ্ব প্রতারণা শত,
করিছে মনুষ্য বিশ্বময় নিত্য,
হইবারে শুধু অপরের ভৃত্য।
পরাতে ভরতে এ দৃঢ় শৃঙ্খল
বিমাতা কৈকয়ী কত না কৌশল
খেলিলা হায়রে।—শুধু দূর হতে
দেখে সবে, হিংসে, উত্তুঙ্গ পর্ব্বতে ;
কিন্তু দেখে নাক কেহ হায় তার
নিঃসঙ্গিতা ; শুষ্ক পাষাণের ভার—
নিদাঘ উত্তপ্ত, হিমাবৃত শীতে ;
শুনে না তাহার অন্তরে নিভৃতে
পাষাণ ফাটিয়া উঠিছে কি কথা।
তথাপি সে শুষ্ক অন্তরের ব্যথা
অন্তরে মিলায়।

ক্লেশ চিন্তা শ্রান্তি
ভরা এ জীবন। অনন্ত অশান্তি।
বিসর্জ্জিতে হবে দয়া মায়া স্নেহ ;
আমরণ শুদ্ধ আশঙ্কা সন্দেহ।
সদা ভয়, শুদ্ধ কোথা কোন ছিদ্র
দিয়া পশে মন্দ। অতীব দরিদ্র,
নীচাদপি নীচ প্রজা এর চেয়ে
সুখী। নিত্য শ্রম করে, পুষ্টদেহে
শ্রমলব্ধ অন্নে। ফিরে নিজ ধামে ;
শ্রমলব্ধ তার বিশ্রব্ধ বিশ্রামে,
কাটায় রজনী নিশ্চিন্ত হৃদয়,
ক্লান্তি সুকোমল প্রেমপুষ্পময়
অনাবৃত ভূমে। শুধায় না কেহ
যোগ্যপাত্র ন্যস্ত কি না তার স্নেহ।
অহো কি বাঞ্ছিত সেই স্বাধীনতা!
অহো কি নির্ম্মল সুপবিত্র কথা

দীনতম কৃষকের ইতিহাস !
দুর্গন্ধময় এ গ্লানির নিঃশ্বাস
পশে না তাহার ক্ষুদ্র অন্তঃপুরে,
হৃদয় হইতে ছিঁড়ে লয়ে, দূরে
ফেলে দিতে নাহি চায় কেহ তার
প্রাণ হতে প্রিয় প্রেমপূত হার।
অহো কি কঠিন !---কি অভাগা রাম
হায় রাজ্য ছাড়ি, যদি পারিতাম
কোন দূর বনে গিয়া, শান্তিময়
পবিত্র অতুল, অনন্ত অক্ষয়—
বিশ্রাম বিভবে কাটাইতে দিন !
নৃপতির কাজ অহো কি কঠিন।

[ভরতের প্রবেশ]

ভরত। এ কি শুনি মহারাজ।
রাম। কি এ কথা
ইতিমধ্যে রাষ্ট্র নগরে সর্ব্বথা ?
ভরত। না ভূপতি, শুদ্ধ প্রাসাদ ভিতর,
তবে ইহা সত্য ?
রাম। সত্য প্রিয়বর।
ভরত। করিয়াছ স্থির ?
রাম। করিয়াছি স্থির।
ভরত। অসম্ভব ইহা। তুমি রঘুবীর !
ধর্ম্মনিষ্ঠ, ন্যায়পর, বুদ্ধিমান,
এ নিষ্ঠুরতা কি তোমার বিধান ?
ইহা অসম্ভব।
রাম। নহে অসম্ভব !
কি বলিব বৎস ! তুমি জানো সব ;
জানো, সীতাত্যাগ আজি চাহে সবে
অযোধ্যার প্রজা।
ভরত। মহারাজ ! তবে
তারা যাহা চাহে তাই দিতে হবে ?
অযোধ্যার প্রজা আজি যদি চাহে
করিতে নিরুদ্ধ সরযূ প্রবাহে ;

ছিঁড়িয়া আনিতে কৈলাস শিখরে ;
ফেলে দিতে পঙ্কে টানি মহেশ্বরে ;
কিম্বা ইচ্ছা যদি অযোধ্যাবাসীর
বিচূর্ণ করিতে প্রাসাদ, মন্দির,
হর্ম্ম্য, দেবালয়, নগরে নগরে ;
জ্বালাইতে পল্লী ; বিশ্ব চরাচরে
খুলে দিতে অরাজক হাহাকার ;
বিশৃঙ্খলা নীতি করিতে প্রচার
রাজ্যময় ; তারা চায় যদি শির
বন্ধু মন্ত্রী ভ্রাতা জায়া জননীর
তাও দিতে হবে ?—আজি এই রীতি !
অযোধ্যার রাজ্যে এই রাজ নীতি !

রাম। কি বলিব প্রাণাধিক ! অন্যপথ
বাছিবার নাহি। শুনিবে ভরত ?
—ইহা কুলগুরু বশিষ্ঠ আদেশ।

ভরত। বুঝিয়াছি তবে।—সেই শুক্ল কেশ,
দীর্ঘ শ্মশ্রু, রুক্ষ, শীর্ণ, কৃশকায়
শুষ্ক প্রেমস্নেহ দীর্ঘ তপস্যায়,
বশিষ্ঠের এই আদেশ কঠিন।
কি বুঝিবে সেই দয়ামায়া হীন,
নির্লিপ্ত সে বিপ্র চিন্তাকূপে অন্ধ,
—সংসারে প্রেমের পবিত্র সম্বন্ধ ?
রমণীর প্রেম কি সান্ত্বনাময়,
সতীর গভীর কোমল হৃদয় ?
সে বিপ্র বশিষ্ঠআদেশে অযত্নে
ছুড়ে ফেলে দিবে এ অমূল্য রত্নে
দূরপঙ্কে ? যদি ভূপতি তোমার
সতী সাধ্বী প্রতি এই ব্যবহার
কে করিবে আর নারীর সম্মান ?
দুর্ব্বল সহিষ্ণু রমণীর প্রাণ
হবে তাহা হলে পুরুষের ক্রীড়া
বিশ্বে ঘরে ঘরে। তার মনঃপীড়া
হইবে পতির উপহাস দ্রব্য ;
শিথিল হবে পতির কর্ত্তব্য

অবলার প্রতি, প্রতি ঘরে ঘরে,
দেশ দেশ জুড়ি ভারত ভিতরে।
রাম। ভরত এ সব বৃথা যুক্তি আর—
অটল স্থির এ সংকল্প আমার।
ভরত। [ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া]
যদি এই স্থির, তবে অযোধ্যার
অতীব দুর্দ্দিন।—কি কহিব আর।
যদি এই স্থির, অযোধ্যাপতির
সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা—তবে এও স্থির
আমি রহিব না এ অযোধ্যাধামে,
যাব কোন দূর পুণ্য বনগ্রামে,
যেখানে নাহি এ নিষ্ঠুর বিধান—
সতীর সাধ্বীর এই অপমান।
ন্যায়ের নীতির এ বিপ্লব, আর
এ অরাজকতা এই ব্যভিচার
ছেড়ে যাব এই রাজ্য—এই পুর—
রাম। ভরত ভরত তুমিও নিষ্ঠুর!

[মাণ্ডবীর প্রবেশ]

মাণ্ডবী। মহারাজ ক্ষমা কর এ আমার
প্রবেশ এস্থানে, এ অনধিকার
চর্চ্চা রমণার। কিন্তু যেই কথা
শুনিতেছি আমি, মনে বড় ব্যথা
পাইয়াছি, তাই ছাড়ি অন্তঃপুর
রমণীর লজ্জাভয় করি দূর
এসেছি এখানে। ক্ষম মহারাজ!
কিন্তু অন্তঃপুরে একি শুনি আজ?
একি সত্য?
রাম। সত্য।
মাণ্ডবী। সত্য এ বারতা?
কি আশ্চর্য্য! আর্য্য কহিতে এ কথা
বিকম্পিত হইল না কণ্ঠস্বর
আসিল না অশ্রু নেত্রে রঘুবর?

রাম। শুনিবে মাণ্ডবী! সীতা নির্ব্বাসন
রাজ্য রক্ষা হেতু আজি প্রয়োজন।

মাণ্ডবী। রাজ্যরক্ষা তরে সীতা বনবাস!
—একি ব্যঙ্গ আর্য্য? একি উপহাস?
সীতা নির্ব্বাসন শান্তিরক্ষা তরে
কে বলিল? কে ও শ্রবণ কুহরে
ঢালিল এ বিষ? তব বাম পাশে
কারে বসাইতে গুপ্ত অভিলাষে
করিল মন্ত্রণা? একি প্রহেলিকা?
মহারাজ্ঞী রাজ্য অশান্তির শিখা?
তবে বুঝি সীতা দূরাদপি দূরে
নিভৃতে বসিয়া রাজ অন্তঃপুরে
ষড়যন্ত্র করি তবে বিদ্রোহ কি
গোপনে পালন করিছে জানকী?
বল বল প্রভু আমি মূর্খ নারী
রাজ-নীতি বড় বুঝিতে না পারি।

রাম। ছাড়ো ব্যঙ্গ। শুন, প্রজা অযোধ্যার,
আজি একবাক্যে চাহিছে সীতার—
নির্ব্বাসন দণ্ড।

মাণ্ডবী। এই মাত্র? তাই?
কোন্ অপরাধে শুনিতে কি পাই?

রাম। জানি না মাণ্ডবি আমি কোন মুখে
উচ্চারিব তাহা তোমার সম্মুখে।

ভরত। মাণ্ডবি দিওনা গঞ্জনা রাঘবে;
কি বলে অযোধ্যা-পুরবাসী সবে
সেই কুৎসাবাণী অশ্রাব্য তোমার।

মাণ্ডবী। তথাপি শুনিব—কি দোষ সীতার
দেখিল তাহারা ধরি কোন্ সূত্র
পশিল এ পাপ—বল আর্য্যপুত্র!
নতজানু হয়ে এই ভিক্ষা মাগি
শুনে তাহা আমি কলঙ্কের ভাগী
হই হব।—বল, করি এ মিনতি!

ভরত। বলিছে প্রজারা জানকী অসতী,

মাণ্ডবী। জানকী অসতী!!! আর্য্যপুত্র, সত্য!
বলিছে তাহারা?—বাতুল!—উন্মত্ত!
—রটাইল কোন্ সুনিপুণ গুণী?
—জানি না হাসিব কি কাঁদিব শুনি'
এই কথা প্রভু! ক্ষমা কর মোরে
একি পরিহাস? একি ঘুম ঘোরে
কোন দুঃস্বপন দেখিতেছি না কি?
জানকী অসতী? আরো কিছু বাকি
আছে বলিবার? শুনিয়াছি ঠিক?
বল তবে সূর্য্য বুঝি পূর্ব্বদিক
অস্ত যায়, উঠে পশ্চিমে; তড়িৎ
জন্মে ভূমিতলে; কমল কুৎসিৎ;
দাহময় চন্দ্র; স্নিগ্ধ হুতাশন;—
বলে যাও তবে—স্থির সমীরণ;
চঞ্চল পর্ব্বত; কঠিন সলিল;
বলে যাও শুভ্র শুভ্র নহে; নীল
তবে নীল নহে।—সতীত্বেরই নাম
সীতা,—আর্য্যপুত্র!—আমি জানিতাম।
নির্ম্মল প্রভাত যূথিকার মত,
নক্ষত্রের মত পবিত্র; নিয়ত
পতি মাত্র ধ্যান—সে সীতা অসতী!!!
জানি না কি ভ্রমে তুমি রঘুপতি
পড়িয়াছ আজি। এই কুৎসাবাণী
করেছ বিশ্বাস?—প্রভু আমি জানি,
ধর্ম্ম রাজ-নীতি নহে রমণীর।
প্রশ্ন করা তর্ক করা নহে।—ধীর
নীরব সহিষ্ণু সম বসুন্ধরা
রমণীর কার্য্য শুদ্ধ সহ্য করা।
মিথ্যা গ্লানি নিত্য বিপক্ষে তাহার
এই বিশ্বময় হতেছে প্রচার;
তার কার্য্য নহে তাহে কর্ণপাত;
তাহার কর্ত্তব্য বিপক্ষ আঘাত
বক্ষ পেতে লওয়া। সে শুধু করিবে
সেবা স্নেহ ভক্তি। অকাতরে দিবে—

পায় কিম্বা নাহি পায় প্রতিদান
লক্ষ্য নহে তার। রমণীর প্রাণ
অনেক সহিতে পারে বটে, তবু
তারো সীমা আছে, শেষ আছে প্রভু।
যদি পায় পদে উৎসর্গিয়া প্রাণে
বক্ষে পদাঘাত, প্রেম প্রতিদানে
নির্ব্বাসন, দয়া প্রতিদানে পৃষ্ঠে
ছুরিকা আঘাত তাহার অদৃষ্টে,
সারল্যের বিনিময়ে কপটতা,
বিশ্বাসের বিনিময়ে কৃতঘ্নতা ;
তাহাও সহিতে হইবে নীরবে
নিত্য বিশ্বময় মহীপতি !—তবে
এই দণ্ডে নারীজাতি এ জগতে
লুপ্ত হয়ে যাক বিশ্বপৃষ্ঠ হতে।
—ছাড় এ সংকল্প নরপতি

রাম। চাহি
ছাড়িতে মাণ্ডবি কিন্তু শক্তি নাহি।

মাণ্ডবী। শক্তি নাহি ? তবে বুঝিব কি হায়
আতঙ্ক বিহ্বল প্রভু নিরুপায় ?
শক্তি নাহি ? প্রভু একি উপহাস ?
শক্তি নাহি ! তাই করিব বিশ্বাস ?
করো না বঞ্চনা ;—মনে রেখো আর
রাজলক্ষ্মী সীতা মহিষী তোমার
দিবে নির্ব্বাসন রাজমহিষীরে
প্রজার কথায় ? পবিত্র মন্দিরে
কোথা সীতা দেবী কোথায় কুকুর
অযোধ্যার প্রজা ! কোথায় সুদূর
নীলাকাশে শুভ্র নক্ষত্রের ভাতি,
কোথায় কর্দ্দমে ঘৃণ্য কীটজাতি !
নাহি হোক সীতা মহিষী, অন্ততঃ
সীতা তব পত্নী ন্যায় ধর্ম্মমত।
স্বামীর কর্ত্তব্য তাহারে সম্মান,
প্রেম ও আশ্রয় ও অভয় দান,
অপমান হতে রক্ষা করা—

রাম। চাহি
দিতে তা মাণ্ডবি! কিন্তু শক্তি নাহি।
মাণ্ডবী। তাহা যদি দিতে না আছে শকতি
তবে কোন সূত্রে তুমি নরপতি
করেছিলে বল বিবাহ তাহারে?
শুধু কি সম্ভোগ? পান করিবারে সুরা,
পরে দূরে ছুড়ে ফেলে দিতে পাত্র?
পত্নী কি স্বামীর ধন রত্ন মাত্র?
যে যখন ইচ্ছা রাখিবে, যখন
ইচ্ছা ত্যাগ করি আনিবে নূতন?
হায় আর্য্য! তবে শুন শাস্ত্র নব
অজ্ঞাত অথবা অবজ্ঞাত তব;
যে তোমারি মত বক্ষের ভিতরে
তাহারো হৃদয় অনুভব করে।
তারো ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ আছে; তার
প্রতি নির্ম্মমতা রূঢ় অবিচার
তারো প্রাণে বাজে।
আর তারো প্রতি
কর্ত্তব্য তোমার আছে মহীপতি!
পতির কর্ত্তব্য সাধো দেব!
রাম। চাহি
সাধিতে মাণ্ডবি! কিন্তু শক্তি নাহি।
মাণ্ডবী। শক্তি নাহি? প্রভু সাধিতে স্বামীর
কর্ত্তব্য ভার্য্যার প্রতি রঘুবীর?
রাবণ বিজয়ী তুমি বিশ্বপতি
নাহি স্ত্রীকে রক্ষা করিতে শকতি?
—সীতা যে মহিষী—সীতা যে তোমার
পত্নী ভুলে যাও। শুধু সে বিচার
মাগে তোমা কাছে দীন দীনতমা
নিঃসহায়া ভিখারিণী প্রজাসমা।
সেও প্রজা তব। বিপক্ষে তাহার
উঠুক সমস্ত প্রজা অযোধ্যার,
তুমি মহীপতি, তব প্রজা সীতা,
তোমার নিকটে বিশ্ব প্রতাড়িত

চাহে না কৃপাও,—শুধু সুবিচার।
দিতে অস্বীকৃত তাও অযোধ্যার
পতি?

রাম। অস্বীকৃত নহি, অপারগ।

মাণ্ডবী। অপারগ! তুমি! তুমি বিচারক
তুমি বিশ্বপতি, রাজসিংহাসনে
বসিয়া নিঃশঙ্কে অম্লানবদনে
কহিলে এ কথা? শুদ্ধ সুবিচার
দিতে অপারগ? তবে কেন আর
সিংহাসনে? কেন রাজদণ্ড? শিরে
কেন ও মুকুট? কেন এ বাহিরে
বিচারের ভাণ? নেমে এস। যাও,
রাজ্য ছেড়ে। রাজদণ্ড ফেলে দাও
দূর কর শীর্ষ। অক্ষম ললাটে
মুছে ফেল টীকা। কেন রাজপাটে
পঙ্গু সম বসে দীনতার ছবি
বনে চলে যাও।

ভরত। ভর্ৎসনাস্বরে মাণ্ডবি! মাণ্ডবি!

[কৌশল্যার প্রবেশ]

কৌশল্যা। বাছা রাম!

রাম। মা মা তুমি যে এখানে?

কৌশল্যা। যে দারুণ কথা শুনিলাম কাণে
কেমনে রহিব স্থির অন্তঃপুরে
প্রাণাধিক। তুই কি রাজবধূরে
রাজ্যের লক্ষ্মীরে দিবি বনবাস
এ কি সত্য বাছা?

রাম। সত্য মা

কৌশল্যা। বিশ্বাস
করিব এ কথা? তুই ন্যায়বান
সে যে তোরে জানি আপনার প্রাণ
হতে ভালবাসে। রাজার দুহিতা,
রাজার গৃহিণী, অভাগিনী সীতা,

মোর ঘরে এসে পায় নাই সুখ ;
তার প্রতি শেষে তুইও বিমুখ ?
বাছা রাম, সত্য ?

রাম। জননি তুমিও— ?

কৌশল্যা। রাম কথা রাখ, প্রাণাধিক প্রিয়
বৎস, কথা রাখ্। নহিস্ অবোধ,
ছাড়্ এ সংকল্প রাখ্ অনুরোধ।

রাম। তুমিও করোনা অনুনয় মাতা
পারিব না তাহা রাখিতে।

কৌশল্যা। বিধাতা
সাক্ষী, আমি ইহা করিতে দিব না
জীবিত রহিতে।

রাম। হায় বিড়ম্বনা !

কৌশল্যা। তুই ন্যায়বান তুই ধর্ম্মনিষ্ঠ—

রাম। জানোনা মা ইহা মহর্ষি বশিষ্ঠ-
আদেশ—

কৌশল্যা। হউক বশিষ্ঠ আদেশ
ইহার পালনে নাহি ধর্ম্মলেশ
এ নহে উত্তম, ন্যায়পর কাজ।
এ কার্য্য হইতে দিব নাক আজ।

রাম। সত্য করিয়াছি—

কৌশল্যা। আমিও কি সত্য
করি নাই, তোরে এ পাপ উন্মত্ত
আত্মঘাতী কাজ করিতে দিব না ?

রাম। মা মা স্থির হও কর বিবেচনা।

কৌশল্যা। করিয়াছি। ইহা দিব না করিতে
মাতৃ আজ্ঞা চেয়ে তোর কি নীতিতে
গুরু-আজ্ঞা বড় ?—কে তোরে জঠরে
ধরেছিল রাম ? কে তোর অধরে
দিয়াছিল কথা ? স্নেহে বক্ষে ধরি
কে পালিয়াছিল দিবস শর্ব্বরী ?
গুরু না জননী ?—একবার তবে
গুরুর আজ্ঞাটি উল্লঙ্ঘিতে হবে

মায়ের আজ্ঞায়। প্রথম ও শেষ
এ আমার ভিক্ষা—গুরুর আদেশ
এর চেয়ে বড় ?—দেখ্ সীতা লাগি
বৃদ্ধা মাতা তোর আজ ভিক্ষা মাগে

[সিংহাসন তলে জানু পাতিয়া পতন

দিবিনে ?

রাম। মা মা মা কি করিলে তুমি?
অহো তুমি পড়ে' পদতলে ভূমি-
বিলুণ্ঠিত, আর আমি সিংহাসনে ?
হারায়েছি জ্ঞান ?—সজল নয়নে
তুমি ভিক্ষা মাগ আমি দিব না তা ?
ইচ্ছা পূর্ণ হোক্ তোর আজি মাতা।
উঠ মা উঠ মা, তুমি পদতলে,
মলিন, ধূসর, নয়নের জলে,
ভিক্ষা মাগো, আমি উচ্চে বসি, আর
বলিব দিব না ?—উঠ মা আমার
সত্য ভঙ্গ হোক, ভস্ম হোক রাম ;
মা তোমার হোক পূর্ণ মনস্কাম।

কৌশল্যা। দীর্ঘজীবী হও প্রাণাধিক! আর
কি বলিব বৎস! বৃদ্ধ কৌশল্যার
এই আশীর্ব্বাদ—এ অমূল্য রত্নে
রাখিস হৃদয়ে চিরদিন যত্নে।

ভরত। মাণ্ডবি যাও এ শুভ সমাচার
অন্তঃপুরে লয়ে'। ঘুচিল সবার
সকল আশঙ্কা।

[মাণ্ডবীর প্রস্থান]

রাম। পূর্ণ মনস্কামে
চলে যাও সব ছেড়ে যাও রামে।

[সকলের প্রস্থান]

কি করেছি আমি দেখি বুঝে দেখি।
ভাঙ্গিয়াছি সত্য।—দেখি দেখি, একি!
করিয়াছি ভঙ্গ স্বীয় অঙ্গীকার।
অচিরে এ কথা জানিবে সংসার

'সত্য ভাঙ্গিয়াছে রাম নরপতি !'
দূর ভবিষ্যতে অজ্ঞাত সন্ততি
সূর্য্যবংশে—দিবে সহস্র ধিক্কার—
'ভেঙ্গে ছিল রাম সত্য আপনার ;'
যে সত্য রক্ষায় রাজা দশরথ
ত্যজিল জীবন। হাসিবে জগৎ।
স্বর্গে দেবগণ দেখি এই পণ্ড
লজ্জায় রক্তিম ফিরাইছে গণ্ড।
রক্ষা কর স্বর্গে দেবগণ সবে
সত্য ভঙ্গকারী দুর্ভাগ্য রাঘবে।
জানুপাতিয়া প্রার্থনা

[সীতার প্রবেশ]

সীতা। প্রাণেশ্বর !
রাম। প্রিয়তমে !
সীতা। একি ? তুমি !
পরিপাণ্ডু বিকম্পিত দেহ ভূমি-
বিলুণ্ঠিত প্রিয়তম উঠ।
রাম। সতি !
স্পর্শ করিও না। তুমি পুণ্যবতী,
আমি পাপী। নাহি এ পাপের সীমা।
আমি আনিয়াছি কলঙ্ক কালিমা
ইক্ষ্বাকুর বংশে। আমি সেই রাম
নিজ সত্য যার বিচূর্ণ ধূলায়
আজি পুষ্পাঘাতে গড়াগড়ি যায়।
সীতা। উঠ প্রাণেশ্বর ! শুনিয়াছি সব।
সব শুনিয়াছি। জীবন বল্লভ !
সর্ব্বস্ব আমার ! সম্ভব কি তাও ?
সীতার কারণে তুমি ব্যথা পাও
প্রাণাধিক ?—উঠ, তব যশ পুণ্য
রহিবে অটুট, রহিবে অক্ষুণ্ণ ;
পিতৃ সত্য তুমি রেখেছিলে প্রভু ;
আমিও রাখিব পতি সত্য। কভু
মলিন না হবে তব পুণ্য রশ্মি

সীতার কারণে। উঠ হে যশস্বী—
এই বক্ষ পাতি দিব হাসি মুখে
তুমি দলি তাহে চলে যাও সুখে
যশের মন্দিরে। তোমারে উদ্বিগ্ন
দেখিবে বসিয়া সীতা! সীতা বিঘ্ন
তোমার সুখের!— চিন্তা কর দূর
কাল ছেড়ে যাব এ অযোধ্যাপুর।

রাম। এখনো বাহির হয় নাই প্রাণ?
আমি কি পিশাচ? আমি কি পাষাণ?

সীতা। উঠ নাথ তবে তব হাসিমুখ
দেখে যাই—ইচ্ছা শুধু এই টুক।—

রাম। একি ঘোর বাত্যা?—নয়নের পাশে
একি অন্ধকার ঘনাইয়ে আসে।
কল্লোলে সমুদ্র বক্ষের ভিতর।
সীতা কোথা তুমি? সীতা!—

সীতা। [রামকে বক্ষে করিয়া] প্রাণেশ্বর!

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

দৈনিক ঘটনা সংগ্রহ।

ভাদ্র।

১লা ভাদ্র, ১৭ই আগষ্ট। বিচারপতি ষ্টানলী এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে আসীন হন।

নাটোরের ছোট তরফের রাজা যোগেন্দ্রনাথ রায় গতাসু হন।

পার্লমেণ্ট পুনরাহ্বান পর্য্যন্ত বন্ধ হয়।

২রা ভাদ্র, ১৮ই আগষ্ট। কর্ণেল গ্যারেট হনিও, স্প্রুটের নিকট একদল বুয়ার সৈন্যকে পরাজিত করেন।

৩রা ভাদ্র, ১৯শে আগষ্ট। ব্রন্সক্রষ্ট স্প্রুটের নিকট কর্ণেল মর্লির সৈনা বুয়ার কর্তৃক পরাজিত হয়।

বঙ্গেশ্বর শিমলা শৈল হইতে প্রত্যাগমন করেন।

৫ই ভাদ্র, ২১শে আগষ্ট। ফ্রান্স ও তুরস্কের মধ্যে কনষ্টাণ্টিনোপলের সমুদ্র তীরবর্ত্তী এক উত্তরণ স্থান (Quay) লইয়া অসদ্ভাবের সূত্রপাত হয়।

৬ই ভাদ্র, ২২শে আগষ্ট। একদল বুয়ার সৈন্য লেডি ব্রাণ্ডের নিকট তিনজন ইংরাজ সেনাধ্যক্ষ ও ৬৫ জন সৈন্যকে বন্দী করে।

কাপ্তেন নুরলাণ্ড আদমবা (Abamawa)র আমিরের (Emir) বিরুদ্ধে জোলা (Zola) নগরে যাত্রা করেন।

শিমলা শৈলে ভয়ানক বৃষ্টি পড়িতে থাকে, ইহাতে অনেক স্থান ধ্বসিয়া যায় এবং অনেক লোকের প্রাণ বিনষ্ট হয়।

৮ই ভাদ্র, ২৪শে আগষ্ট। বোম্বাই ব্যবস্থা-

পক সভায় রাজস্ব বিধি আইন বিধিবদ্ধ হয়। মিঃ মেটা আরও ছয় মাস এই আইন বিধিবদ্ধ করিতে বিলম্ব করিবার জন্য প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ায় মিঃ মেটা, মিঃ গোখেল, মিঃ পারেখ, মিঃ খারে, স্যর বাল কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি অনেকগুলি সভ্য ব্যবস্থাপক সভা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ভারতের ঐতিহাসিক জগতের এক নূতন দৃশ্য!

প্রকাশ পায়, দ্বারভাঙ্গার মহারাজা ধরম পুরের (পুর্ণিয়া) প্রজাদিগের দ্বারা নীল বুনিবার এবং তাহাদিগের রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার প্রয়াস করেন। ইহাতে উভয়পক্ষের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। প্রজাগণ ভাগলপুর বিভাগের কমিশনর নিকট তদন্তের জন্য আবেদন করে। তদন্তান্তে কমিশনর সাহেব রাজ পক্ষের দোষ বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে শাসন করিয়া দিয়াছেন। আবেদন কারীর মধ্যে কেরামত নামক একজন প্রজা অদ্য হত হয়। এরূপ সংবাদ বড় দুঃখ ও কলঙ্কের কথা। জমিদার ও প্রজাদিগের মধ্যে সদ্ভাব একান্ত বাঞ্ছনীয়, নতুবা দেশের উন্নতির আশা কম।

১০ই ভাদ্র, ২৬শে আগষ্ট। নিজাম রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী স্যর্ ভাইকার উল ওমরা পদচ্যুত হন, এবং সমর সচিব কৃষ্ণ প্রসাদ উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

১৫ই ভাদ্র, ৩১শে আগষ্ট। বুয়রগণ কর্ত্তৃক একখানি ট্রেণ আক্রান্ত হয়। আইরিশ গার্ডের মেজর ভাণ্ডালিয়ার হত হন।

১৭ই ভাদ্র, ২রা সেপ্টেম্বর। সিমলা শৈলে শিক্ষা সমিতির সূত্রপাত হয়। বড়লাট স্বয়ং ইহার উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করেন।

জোহান্‌স বর্গের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর ক্রাউস লণ্ডন নগরে চারিমাস হইল বাস করিতেছিলেন; বিপক্ষদিগকে যুদ্ধের সমস্ত গুপ্ত সমাচার প্রদান করিয়াছেন এই সন্দেহে ধৃত হন।

১৮ই ভাদ্র, ৩রা সেপ্টেম্বর। কশলার শাসক কর্ণেল কলিনসনের মৃত্যু হয়।

মিঃ জে- জে, ডি লাটুস উত্তর পশ্চিম প্রদেশের এবং মিঃ সি, এম. রিভাজ পাঞ্জাবের লেপ্টনাণ্ট গভর্ণর নিযুক্ত হইলেন। উত্তর পশ্চিমের বর্ত্তমান ছোটলাট স্যর আণ্টনি ম্যাক ডোনেল নভেম্বর মাসে এবং পঞ্জাবের স্যর ম্যাকওয়র্থে ইয়ং মার্চ্চ মাসে অবসর গ্রহণ করিবেন। ইবেটসন মধ্যপ্রদেশ চিফ কমিশনর রিভাজের স্থলে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য মনোনীত হইলেন।

আউট সর্গের নিকট ২৫জন ইংরাজ সৈন্য বুয়ার সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। তিনজন মৃত চারিজন আহত এবং ১৫ জন বন্দী হয়।

২১শে ভাদ্র, ৬ই সেপ্টেম্বর। জনৈক এনার্কিষ্টের গুলিতে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট মিঃ ম্যাক কিনলী আহত হন।

২৩শে ভাদ্র, ৮ই সেপ্টেম্বর লর্ড মেথুয়েন ডিলারিকে পরাজিত করেন।

২৭শে ভাদ্র, ১২ই সেপ্টেম্বর। সংবাদ আসে ক্রুগারের কনিষ্ঠ পুত্র আত্ম সমর্পণ করেন।

২৮শে ভাদ্র, ১৩ই সেপ্টেম্বর। মহীসুরের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান স্যর্ শেষাদ্রি আয়ার, কে, সি, এস, আই গতায়ু হন। ১৮৮৩ খৃঃ ইনি মহীসুরের দেওয়ান হন।

২৯শে ভাদ্র, ১৪ই সেপ্টেম্বর। প্রেসিডেণ্ট ম্যাক্‌কিনলী পরলোক গমন করেন। জন্ম—১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ।

কলিকাতা, ২৫।১নং স্কটস্ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানির দ্বারা মুদ্রিত।
ভবানীপুর ১৬নং চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট হইতে শ্রীর প্রেমলাল রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

নবপ্রভা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

১ম খণ্ড। | কলিকাতা, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ, ১৩০৮ সাল। | ৯ম ও ১০ম সংখ্যা

সংশয় ও বিশ্বাস।

দোদুল্যমান সংশয়ী।—

"A feeble unit in the middle of a threatening Infinitude, I seemed to have nothing given me but eyes whereby to discern my own wretchedness."

Teufelsdrokh.

হা ভগবান! আমার দশা এই করিলে! ভগবান বলিয়াই বা কাহাকে ডাকি? যদি এ জগতের কেহ দয়াময় স্রষ্টা থাকিতেন, তিনি অবশ্য আমাকে এত কষ্টে রাখিতেন না। অনেকে বলেন, আমারই দোষে আমি ক্লেশ পাই-তেছি; কিন্তু আমিত তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। গত জীবন পর্য্যালোচনা করতঃ যদিও অনেকটা জানিতে পারি, নিজের কতকগুলি ত্রুটি হেতু অবস্থা এত মন্দ হইয়াছে, কিন্তু আবার ইহাও বেশ দেখিতে পাই যে বহু কারণের এমন সমাবেশ ঘটিয়াছে যাহা আমি কিছুতেই এড়াইতে পারিতাম না, সেগুলির হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া আমার পক্ষে সম্পূর্ণ সাধ্যাতীত ছিল। যাউক আমার কথা, যখন দেখি, একটী সাত আট বৎসরের বালক পিতামাতার দোষে ঔপদংশিক ক্ষত রোগে ক্লেশ পাইতেছে তখন কি মীমাংসা করা উচিত? ঐ বালক জীবনে এমন কোন গুরুতর অপরাধ করে নাই যাহার জন্য তাহার ওরূপ দারুণ যন্ত্রণা

ভোগ। তবে কেন সে বেচারী ক্লেশ পাইতেছে? যদি বল, পূর্ব্বজন্মের পাপের ফল; তাহাই বা কি প্রকারে স্বীকার করি? এই বিংশ শতাব্দীর গ্যাস-বিদ্যুৎ-রণ্টেন কিরণে বাস করিয়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন সেকেলে লোকের মত অনুসরণ করি কিরূপে? বাস্তবিক যদি জন্ম জন্মান্তর থাকে অনেকটা গণ্ডগোল মিটিয়া যায় বটে, কিন্তু পূর্ব্বজন্ম পরজন্ম সম্বন্ধীয় মত ত আজও কেহ পরিষ্কার বৈজ্ঞানিক ভাবে বুঝাতে পারেন নাই। এ অবস্থায় আমাকে মুক্তকণ্ঠে বলিতে হইল, জগতের সর্ব্বশক্তিমান্ অথচ দয়াময় কর্ত্তা কেহ নাই, সংসার একটা সুবৃহৎ পাশাখেলার আড্ডা, এখানে যাহার পাশায় যেমন দান পড়িতেছে তাহার ঘুঁটি তেমনি চলিতেছে। ইহাই যদি সাব্যস্ত হইল, তবে "হা ভগবান" এ কথা মধ্যে মধ্যে, বিশেষ দুঃখ বিপদের সময়, আপনা আপনি মুখ হইতে বাহির হয় কেন? ওটা কথার কথা, আকাশকুসুমবৎ অলীক। কেন না যতবার প্রাণের পর্দ্দা ছিঁড়িয়া "হা ভগবান্" বলিয়া চীৎকার করিয়াছি, যদি প্রকৃত কোন পুরুষ সর্ব্বশক্তিমান "দয়াল পিতা"রূপে বিশ্বসাম্রাজ্যের সিংহাসনে বিরাজ করিতেন, তিনি অবশ্যই আমার সকল দুঃখ মোচন করতঃ আমাকে পরম সুখে রাখিতে ক্রটি করিতেন না।

কোন কোন পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছি, 'ইহ সংসারে সবাই সমানভাবে সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে। বড়লোকের যেমন বড় সুখ দেখিতে পাওয়া যায় তেমনি উহাদের বড় দায়িত্ব, বড় ভাবনা, বড় চিন্তা, কাজেই বড় দুঃখ; গরিবের যেমন অল্প সুখ তেমনি ভাবনা চিন্তা দুঃখ বিপদও কম। মনের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে হরেদরে সকলের অবস্থা সমান। বিজ্ঞব্যক্তিগণের ভুল ধরা আমার কাজ নয়, তত্রাচ একথা বুক ঠুকিয়া বলিতে পারি যে তাঁহাদের ওরূপ মতের সহিত আমার সম্পূর্ণ অনৈক্য। পৃথিবীতে ভাল খাইতে, ভাল পরিতে পাইলে যে খুব সুখ, এবং তদভাবে যে মহাদুঃখ, একথা হয় ত জন্ম-ধনীগণ আদৌ বুঝিতে পারেন না; গ্রাসাচ্ছাদনের অভাবে যে ব্যক্তি কখন কষ্ট ভোগ করে নাই তাহাকে উহা বুঝান কঠিন। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, একজন হতভাগা একমুষ্টি অন্ন ও একখানি ছোট বস্ত্রের জন্য লালায়িত, অপর সৌভাগ্যবান্ কত অন্ন ব্যঞ্জন সুখাদ্য দ্রব্য সামগ্রী এবং উত্তম উত্তম বসন ভূষণ নষ্ট করিতেছে, ফেলিয়া দিতেছে। এই উভয় ব্যক্তির সুখ দুঃখ সমান, ইহা

বিশ্বাস করিয়া যিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, তিনি নিশ্চয় আমা অপেক্ষা মোটা নজরের লোক। সংসারে সুখ দুঃখ যে ভাবে বিতরিত, এবং ধার্ম্মিকের যেরূপ কষ্ট ও পাপী অত্যাচারীর যে প্রকার উন্নতি, ইহা দেখিয়া আমার ত স্পষ্ট বোধ হয়, দীন্-দুনিয়ার সজ্ঞান মালিক বা বিচারক কেহ নাই;—গোলে-হরিবোল দিয়া অন্ধশক্তির দ্বারা সমস্ত পরিচালিত।

আবার ওদিকে জড়জগতের সুশৃঙ্খলার প্রতি যখন দৃষ্টি নিক্ষেপ করি:—যখন বিজ্ঞানের সাহায্যে জানিতে পারি যে ৩৮১ ১০ ৯০১ বর্গক্রোশব্যাপী প্রায় ১৮০০০০০১০০০০০০০০০০০০০০০০০ মণ ওজনের আমাদের আবাসভূমি এই মেদিনী পাহাড়-পর্ব্বত, হ্রদ-সমুদ্র প্রভৃতি বক্ষে ধারণ করতঃ রেল গতিকে ধিকার দিয়া ঘণ্টায় প্রায় ত্রিশ হাজার ক্রোশ হিসাবে নিয়ত ছুটিতেছে, একটুও বিশ্রাম করে না, একতিলও নিয়ম ভঙ্গ করে না;—বুধগ্রহ তদপেক্ষা দ্রুতবেগে ঘণ্টায় আটচল্লিশ হাজার ক্রোশেরও অধিক দৌড়িতেছে, কাহারও নিষেধ মানে না, কেহ বা বাধা দিতে পারে না;—আমাদের সূর্য্য, যাঁহার গর্ভে এই পৃথিবীর মত চৌদ্দ লক্ষটা গ্রহ অনায়াসে ধরিতে পারে, তিনিও স্থির নহেন, ঐ বিরাট অনলময় দেহখানি লইয়া কোন অজ্ঞাত বৃহত্তর তপনের চতুর্দ্দিকে ঘণ্টায় ২৩৫০০ ক্রোশ হিসাবে নিয়ত ছুটিতেছেন*;—

---

* পৃথিবী প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ গ্রহগণ যেমন মার্ত্তণ্ডের আকর্ষণে তাঁহার চতুর্দ্দিক ঘুরিতেছেন, উনিও তেমনি অধীনস্থ গ্রহাদি সহ কোন বিশালতর সূর্য্যের আকর্ষণে তাঁহাকে বেষ্টন করতঃ ধাবমান; আবার তিনিও তদপেক্ষা বৃহৎ কোন তপনকে ঐরূপে প্রদক্ষিণ করিতেছেন। এই প্রকারে চতুর্থ পঞ্চম প্রভৃতি পর পর সকলেই এক অঙ্ককে পরিক্রম করতঃ অনন্ত আকাশপথে উড্ডীয়মান; কাহারও বসিয়া খাইবার যো নাই। এবম্প কার বৃহৎ হইতে বৃহত্তর কত সংখ্যক সূর্য্য আছেন এবং এই পরিক্রমণের শেষ বা কোথায় তাহা সেই অনাদ্যনন্ত পুরুষ ভিন্ন আর কে বলিতে পারে? অল্প দিন হইল জনৈক ইংরাজ পণ্ডিত এইরূপ লিখিতেছেন:—

Professor Kapteyn, of Grovingen, who has been investigating for some years past, from a comparison of stellar proper motions, the movement of our own solar system through the heavens, has just now issued his results. He finds that the sun (along with our earth and the rest of his attendant planets) is flying through space at a speed of 47000 miles an hour, to a point in the constellation Hercules. Any one who wants to get a good idea of the whereabouts of this goal should find the places of two stars—Vega and Gamma Lyral—and draw an imaginary line to connect them. If an equilateral triangle be erected with this line as a base, its apex will be the point towards which the sun is moving.—S. Charlesworth.

এই সূর্য্য সৌরজগতের অধিপতি ও প্রাণ; কখন আমাদিগকে আলোক ও উত্তাপ দিতে কৃপণতা করেন না, ইনি একদিন চক্ষু মুদিলে জীবোদ্ভিদ্ সহ সমগ্র সৌরজগৎকে চক্ষু মুদিতে হয়; কতকাল এইভাবে বিরাজ করিতেছেন, আরও কতকাল এই ভাবে বিরাজ করিবেন মানুষ কিছুই জানে না; ইহার তেজ হয়ত ক্রমে হ্রাস হইতেছে, অথচ আমরা তাহার কিছুই টের পাই না;—জীবজগতের উদ্ভিদ্‌রাজ্যের ব্যাপার সমূহই বা কম কি? দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই, নিজ দেহের কলকারখানা গুলির বিষয় যখন ভাবি তখন জ্ঞানহারা হইতে হয়। আমি যে কি মহামন্ত্রবলে জীবিত আছি, কি সুন্দর নিয়মে আমার দেহ যন্ত্র চলিতেছে, একটু নিয়ম ভঙ্গ হইলে অসুস্থ হইয়া পড়ি আবার চিকিৎসা দ্বারা পুনরায় স্বাস্থ্য আনীত হয়।—ব্যবচ্ছেদ দ্বারা প্রত্যক্ষ করি, চক্ষুর আভ্যন্তরিক গঠনে কি আশ্চর্য্য কৌশল; মস্তিষ্কের নির্ম্মাণে কি অদ্ভুত কারুকার্য্যতা, কি সুন্দর উহার আকৃতি ব্যবস্থা; তাবৎ শরীরে রক্ত সঞ্চালন জন্য কি প্রণালীতে হৃৎপিণ্ড গঠিত এবং তাহার অধীনে শিরা ও ধমনী সমূহে কি প্রকার সুচারুরূপে কার্য্য করিতেছে, তাহারও শ্বাসের নালী দুইটী পাশাপাশি লম্বমান থাকিয়াও আপনাপন কর্ত্তব্য সম্পাদনে কোন প্রকার ব্যতিক্রম করে না,—একবিন্দু শোণিত শুক্র জরায়ু মধ্যে কি প্রকারে মানবশিশুর্ত্তে পরিণত হয়, এবং সর্ষপকণাপেক্ষাও ক্ষুদ্র অশ্বত্থ বটাদির বীজে বিশাল তরুরাজ ভাবী পত্র পুষ্প শাখা সহ কি ব্যবস্থায় বিদ্যমান থাকে এইরূপ নানাবিধ সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলার ব্যাপার প্রণিধান করিলে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে, কঠোর ব্যবস্থার অধীন এই সুবিশাল জড় জগতের একজন সুচতুর মহাজ্ঞানী নিয়ন্তা আছেন, এই বিশ্ব ভুবন প্রতিদিন যাঁহার জাজ্বল্যমান মহিমার সাক্ষ্য দিতেছে।

এই দুই সমস্যার মধ্যে মন দুলিতেছে; মীমাংসা আর হয় না। জ্ঞানী ভক্তেরা দেখিলেন, এই সংসার যাঁহার সৃষ্টি তাঁহার কৌশল অনির্ব্বচনীয়; অমনি সিদ্ধান্ত করিলেন তিনি করুণাময়। কিন্তু আমি তাঁহার করুণার পরিচয় কোথাও পাইলাম না। যিনি সর্ব্বশক্তিমান অথচ ইচ্ছাময় তিনি করুণাময় হইলে সংসারে দুঃখের মাত্রা এত অধিক কেন? কবি বায়রণ তাহার কেইনের মুখ দিয়া যে কথা কয়টী বাহির করিয়াছেন তাহাত কিছুতেই অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

Cain (solus)

—I was unborn :
I sought not to be born, nor love the state
To which that birth has brought me. * *
* * * * * * They have but
One answer to all question, 'Twas His will,
And He is good" How know I that ? Because
He is all-powerful, must all good too follow ?
I judge but by the fruits—and they are bitter
Which I must feed on for a fault not mine.

অর্থাৎ—

আমার অস্তিত্ব ছিল না, আমি জন্ম গ্রহণ করিতে চাহি নাই, এবং পৃথিবীতে যে অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি তাহা আমার প্রীতিপ্রদ নহে। এইরূপ সকল প্রশ্নের লোকে একই উত্তর দিয়া থাকে—ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা তিনি মঙ্গলময়—আমি উহা বুঝি না ; সর্ব্বশক্তিমান হইলেই কি মঙ্গলময় হইতে হয় ? আমি কেবল মাত্র ফলের দ্বারা বিচার করিব, ফল অতীব কটু এবং ঐ ফল বিনা দোষে আমাকে ভোগ করিতে হইতেছে।

যদি তাঁহার করুণা থাকে সর্ব্বজীবে সমান কখনই নয়, তিনি পক্ষপাতী। জগদ্বিখ্যাত মহাত্মা নিউটনের সমকালিক অঙ্কবিদ্যাবিশারদ অন্ধ পণ্ডিত বলিতেন "পরমেশ্বর আমার পরমেশ্বর নন, তিনি নিউটনের পরমেশ্বর। যে হেতুক আমাকে অন্ধ ও নিউটনকে চক্ষুষ্মান্ করিয়া তাঁহাকে আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবার শক্তি ও অবকাশ দিয়াছেন।" আমিও তাহাই বলি, যাহার প্রতি তাঁহার করুণা বর্ষিত তাহার সকল দিকে সমস্ত সুন্দর সুখকর, আর যাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টির অভাব তাহার সকলই কণ্টকময় ঘোর দুঃখ বিড়ম্বনার আকর। সেই হেতু আবার বলি, তাঁহার দয়া সকলের উপর সমান নয়। অনেকে হয় ত বলিবেন তাঁহার বিবেচনা বিচার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন প্রকার কৈফিয়ত তলব করিবার ক্ষমতা আমাদের মত কীটাণুকীটের সাজে না। তদুত্তরে বায়রণের সুরে ইহাই বক্তব্য যে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে সৃজন করিয়া এত কষ্ট যন্ত্রণায় ফেলিবার তাঁহার কি প্রয়োজন ? আমি বেশ জানি আমি নিজে ইচ্ছা করিয়া এখানে আসি নাই, এবং আগমন অবধি বিস্তর অনিবার্য্য ঘটনার দরুণ আমার অবস্থা এত

মন্দ হইয়াছে। ইহার দায় কে দেয়? যদি ইচ্ছাময় সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর থাকেন, তিনি ব্যতীত আর কাহার উপর এই সকল দায়িত্ব পড়িতে পারে? কাজেই স্বীকার করিতে হইবে উক্তরূপ ঘটনাবলী দ্বারা তিনি আমাকে ক্লেশে ফেলিয়া সুখবোধ করিয়াছেন এবং নিজের পক্ষপাতের পরিচয় দিয়াছেন।

ভক্ত বলেন, ঈশ্বর যাহা করেন সকলই তোমার মঙ্গলের জন্য ;—তোমার পুত্র জলে ডুবিয়া মরিল, তোমার মঙ্গলের জন্য ;—বজ্রাঘাতে তোমার স্ত্রীর মৃত্যু হইল, তোমার মঙ্গলের জন্য ;—বানের জলে তোমার গোরু বাছুর সমস্ত ভাসিয়া গেল, তোমার মঙ্গলের জন্য ;—তুমি নিজে মহাব্যাধিগ্রস্ত হইলে, তোমার মঙ্গলের জন্য,—কি না, ঈশ্বর দুঃখ বিপদ দ্বারা পরীক্ষা করতঃ তোমার কল্যাণ সাধন করিতেছেন। বেশ মজার ঈশ্বর, যিনি আমাকে ক্রমাগত ক্লেশ দিতেছেন, আমার পরীক্ষা হেতু ; অথচ তিনি বিলক্ষণ জানেন, আমি কিপ্রকার জীব, এবং পরীক্ষার ফল কি দাঁড়াইবে। যখন তিনি সর্ব্বজ্ঞ, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান তাঁহার নিকট সমানভাবে নখদর্পণের ন্যায় তখন আমার জন্মের পূর্ব্ব হইতে তিনি আমার জীবনের সমস্ত, ব্যাপার পুঙ্খাণুপুঙ্খরূপে অবগত। এরূপ অবস্থায় ওপ্রকারের পরীক্ষা কিরূপ দয়ার পরিচায়ক?

অন্ধ জরাজীর্ণ একব্যক্তি পথের ধারে বসিয়া চীৎকার করতঃ ভিক্ষা মাগিতেছে ; তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কি প্রকারে চক্ষুরত্ন হারাইলে?" সে অম্লানবদনে উত্তর করিল, "নারায়ণ কি মর্‌জি।" হে নারায়ণ! তোমার মর্‌জি বুঝা ভার, তোমার অন্ত পাওয়া অসাধ্য। পুরাকালে চার্ব্বাক দর্শন প্রণেতা তোমার কিনারা করিতে না পারিয়া তোমার অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অধুনা বুদ্ধি বিদ্যায় জগতের শীর্ষ স্থানীয় ইউরোপ খণ্ডের অনেক ধীমান্ ব্যক্তি তোমাকে মানেন না। কপিল, গৌতম, দার্ব্বীন, মীল, কোমৎ প্রভৃতি তোমাকে একথা হ-য-ব-র-ল করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু আমি বিস্তর দেখিয়া শুনিয়া বিচার করতঃ তোমাকে জড়দ্গব করিলাম। পঞ্চতন্ত্রের গৃধ্রাজের ন্যায় তুমি সমস্ত পক্ষী-শাবকের ভার লইয়া বসিয়া আছ, পরন্তু ধূর্ত্ত মার্জ্জার সর্ব্বদাই তোমার উপর কলম চালাইতেছে, আর তুমি পক্ষীগণের নিকট প্রত্যহ তিরস্কৃত হইতেছ। ওরূপ জড়দ্গব ভাবে থাকিতে ইচ্ছা কর, থাক, কিন্তু আমি তোমাকে ওরূপ ভাবে থাকিতে পরামর্শ দিই না। "an absentee

God sitting idle at the outside of his Universe, and seeing it go." এ ভাবে থাকা অপেক্ষা না থাকাই উচিত। সংসারের লোক নিজের কল্পনা মত তোমার এক একটা নাম করণ করিয়াছেন, আসলে তুমি যে কি তাহা তুমি ভিন্ন আর কাহারো জানিবার যো নাই। আবার কোন কোন পণ্ডিতের মতে তুমি সবই, তোমার অসংখ্য মূর্ত্তি, যে যে ভাবে দেখে তাহাকে সেই ভাবে দেখা দিয়া থাক। এরূপ ক্ষেত্রে আমি তোমাকে জড়ঙ্গব ভাবে দেখিলাম বলিয়া তুমি নারাজ হইতে পার না। জগতের আদি হইতে তোমার স্বরূপ নির্দ্ধারণের জন্য কত তর্কবিতর্ক, কত মারামারি কাটাকাটি, কত গ্রন্থ প্রচার হইল, তাহার সীমা নাই, কত ধীশক্তি সম্পন্ন জীব মস্তিষ্ক ক্ষয় করিয়া উন্নত হইলেন তাহার সংখ্যা নাই, অথচ মীমাংসা লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে যত দূরে ছিল আজও ঠিক ততই দূরে অবস্থিত। সুতরাং আমি আর কি বলিব? আমি এইমাত্র বলি যে যে সকল সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি সুখে স্বচ্ছন্দে আছেন তাঁহারা তজ্জন্য তোমাকে দয়ার সাগর মঙ্গলময় বলিয়া ঘোষণা করিতে থাকুন; আর আমরা দিবারাত্রি হাহা করতঃ তোমার বিচারে অবাক্ হইয়া থাকি।

জগতের বিচার নাই। যদি থাকে তাহা আমার বুদ্ধি বিবেচনার অতীত। হে ঈশ্বর! যদি তুমি থাক, আর যথার্থই যদি তুমি ন্যায়বান দয়াময় হও, আমি তোমার বিন্দু বিসর্গও বুঝিতে পারিলাম না। সেজন্য তুমি আমাকে দোষী করিতে পার না, কারণ তোমাকে উত্তমরূপে বুঝিবার ক্ষমতা আমি তোমা হইতে পাই নাই। যদি তুমি থাক, "তুমি নাই" বলাতে তোমার কিছু হানি হইল না; যদি তোমার দয়া যথার্থই অসীম হয় তোমাকে নিষ্ঠুর বলাতেও কোন ক্ষতি নাই। অনেক জ্ঞানী পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছি, তুমি অনন্ত, অসীম, ভূমা, মহান্; আমি ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতর, কীটাণুকীট সদৃশ। সুতরাং তুমি আছ কি নাই, এবং থাকিলে তোমার মহত্ত্বের পরিমাণ কত, এ সকল বিচার করিবার ক্ষমতা আমায় কিরূপে সম্ভবে? যদি পরকাল থাকে তথায় মীমাংসা হইবে, এখানে ত কিছু হইল না, হইবার যো নাই। পরকালেও যদি এইরূপ বেগার-ঠেলা বিচার হয়, তাহা হইলেই ত সর্ব্বনাশ। এখানে অন্ধকারে ঘুরিলাম, সেখানেও কি অন্ধকারে হাঁপাইয়া মরিব? তাই বারম্বার

প্রার্থনা করি, পরলোকে যেন আপন কর্ম্মফল বুঝিতে পারিয়া দণ্ড ভোগ করি, এবং তোমার স্বরূপের যৎকিঞ্চিৎ বুঝিতে সক্ষম হই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

চরিত্র।

যে বিশিষ্ট লক্ষণ দ্বারা কোন ব্যক্তির বা জাতির আভ্যন্তরীণ অবস্থা পরিব্যক্ত হয়, তাহাই তাহার চরিত্র। যে বিশিষ্ট লক্ষণ দ্বারা মানবজাতি পশুজাতি হইতে পৃথক্-ভূত ও শ্রেষ্ঠ—তাহাই মানবচরিত্র। মানব-প্রকৃতির চরম উৎকর্ষই আদর্শ মানব-চরিত্র। যে মানব মানবপ্রকৃতির চরম উৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন—তিনিই প্রকৃত চরিত্রবান্। এই মহাপুরুষেরাই নিজ নিজ বংশকে ও নিজ নিজ জাতিকে উত্তোলিত করিবার জন্যই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সাধুদিগের পরিত্রাণ ও ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য ভগবান্‌কেও সময়ে সময়ে পূর্ণভাবে অবতীর্ণ হইতে হয়। সেই পূর্ণাবতারই আদর্শ চরিত্র। শাস্ত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণাবতার বলিয়া খ্যাত। রামায়তগণ রামচন্দ্রকে ও বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ চৈতন্যকেও পূর্ণ-অবতার বলিয়া থাকেন। বুদ্ধদেব দশ অবতার-মধ্যে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন। অবস্থাবিশেষে ভগবান্ অংশতঃও অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। নানকপন্থীরা নানককে কবীরপন্থীরা কবীরকে, খৃষ্টানগণ খ্রীষ্টকে ও মহম্মদীয়েরা মহম্মদকে অংশাবতার বলিয়াই বোধ হয় মনে করিয়া থাকেন। কারণ তাঁহারা সকলেই দ্বৈতবাদী সুতরাং পূর্ণব্রহ্মে পূর্ণাবতারত্ব তাঁহারা স্বীকার করিতে পারিবেন না। এই সকল মহাপুরুষগণের অংশাবতারত্ব আমরাও স্বীকার করি। শঙ্করাদিও অংশাবতার।

যেমন সাগরের ছোট বড় তরঙ্গ—সকলই সাগরের অংশ, সেইরূপ শরীরিমাত্রই সেই পরমাত্মার অংশ। তবে উত্তাল তরঙ্গমালা যেমন সাগরের, এবং অত্যুঙ্গ শৃঙ্গাবলী যেমন গিরির মহিমা প্রচার করে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি সাগরের, ও নিম্ন শৃঙ্গগুলি গিরির সেরূপ মহিমা প্রচার করিতে পারে না। সেইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানব অংশাবতার হইলেও তাহারা ভগবানের মহিমা পূর্ণভাবে প্রচার

করিতে পারে না। ক্ষুদ্র খদ্যোতিকার ন্যায় তাহারা ক্ষীণ জ্যোতিঃতে জগতের অন্ধকার দেখাইয়া দেয় মাত্র—দূর করিতে পারে না।

যিনি পূর্ণাবতার—তিনি সূর্য্য-স্বরূপ। তাঁহার জ্যোতিঃতে জগৎ আলোকিত ও তাঁহার প্রভাবে প্রাণিজগৎ অনুপ্রাণিত। এই সূর্য্যের উদয়ে মৃতজাতি নব-জীবন প্রাপ্ত হয়, মরণোন্মুখ জাতি মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পায়, এবং পতিত মানবজাতি অভ্যুত্থিত হয়। এই সূর্য্যের অভ্যুদয়ে পাপপঙ্ক বিশুষ্ক হয়, আভ্যন্ত-রীণ মলিনতা বিশোধিত হয়, এবং ইহার করস্পর্শে মানব-আত্মা শাণশোধিত হীরক খণ্ডের জ্যোতিঃ ধারণ করে। সে সময়ে অসংখ্য পবিত্র-আত্মা সেই সূর্য্যের সঙ্গে অভ্যুদিত হইয়া নক্ষত্রমণ্ডলের ন্যায় তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকেন। সেই চিদ্ঘন মূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে ভ্রাম্যমান মানব-আত্মাগুলি যদিও তখন কেন্দ্রস্থ সূর্য্যের খরতর প্রভায় বিলীন হইয়া যান, তথাপি দৃষ্টিতে দেখিলে বোধ হইবে যেন কহিনুরের চতুর্দ্দিকে অগণ্য খণ্ডিত হীরক ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। সে অপূর্ব্ব শোভা যোগিজনমনোলোভা। সে দৃশ্য দেখিলে পাপীর পাপ, ও তাপীর তাপ হরণ হয়।

সকল অবতারের সময়েই এইরূপ অপূর্ব্ব চরিত্রলীলা হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা দেখিতে জানেন, তাঁহারাই এই দৃশ্যের মহিমা দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। আমরা মানসনেত্রে সেই চিত্র দেখিয়া এখনও কৃতকৃতার্থ হইতেছি। পূর্ণব্রহ্মের পূর্ণ ও নিত্যলীলা গগণে নিরন্তর হইতেছে। কেন্দ্রস্থ বিরজাপুরুষকে সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী নিয়ত প্রদক্ষিণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেছেন—ও জগৎকে কৃতকৃতার্থ করিতেছেন! সেই মহারাসলীলা মানবগণকে দেখাইবার জন্য সেই বিরাট পুরুষ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া ভবে মানবমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হন। আবার লীলা সাঙ্গ হইলে সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন। ভ্রান্ত মানব ইহা বুঝিতে না পারিয়া নানা ধান্দায় পতিত হন। কাহারও স্থূলে অবিশ্বাস—কাহারও বা সূক্ষ্মে অবিশ্বাস। কিন্তু যিনি সূক্ষ্মদর্শ তিনি জানেন যে ভগবান্ স্থূলও বটেন সূক্ষ্মও বটেন। সুতরাং স্থূলে সূক্ষ্মে—তাঁহার লীলা স্বাভাবিক। এই জন্য ভাবুক ভক্ত—কল্পনাবলে কখন স্থূলে কখন বা সূক্ষ্মে—তাঁহার মহারাসলীলা দেখিয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন। এস কল্পনে! তুমি বার বার আমায় সেই চিত্র দেখাইয়া কৃতকৃতার্থ কর। আমি

প্রাণভরিয়া বারম্বার ভগবানের সেই মহারাস-লীলা—সাঙ্গোপাঙ্গ সহ স্থূলে সূক্ষ্মে—পুরুষে পুরুষে—পুরুষে স্ত্রীতে সেই বিরাট প্রমোদ-নৃত্য দেখিয়া আমার মানব-জন্ম সার্থক করি। আহা! মরি মরি কি শোভা! কি মাধুরী! সে শোভাদর্শনে নয়ন ও মন অমৃতরসে আপ্লুত হয়।

শাস্ত্রে লিখিত আছে—দেবতারাও পূর্ণ অবতারগণের সাঙ্গোপাঙ্গরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। দেবতারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজবালকরূপে, লক্ষ্মী রাধারূপে, ও দেবকন্যারা ভক্তগোপিনীরূপে ব্রজে অবতীর্ণ হন। সেইরূপ রামচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার ভ্রাতৃরূপে, এবং চৈতন্যের সঙ্গে প্রভু নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাদিরূপে তাঁহারা ধরাধমে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অন্যান্য অবতারগণের সঙ্গেও দেবতা যক্ষ বা কিন্নরগণের অবতারণারও শাস্ত্রীয় প্রমাণ পাওয়া যায়।

ভারতীয় সন্ন্যাসীগণ দত্তাত্রেয়কেও বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বর্ণনা করেন। তাঁহারা দত্তাত্রেয়কে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে পূজা করিয়া থাকেন। যাঁহারা সাধনাবলে মানবপ্রকৃতির চরম উৎকর্ষ লাভ করেন, তাঁহাদিগকে ঋষি মহর্ষি রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, জীবন্মুক্ত বা বুদ্ধ ইত্যাদি উপাধিতে অলঙ্কৃত করা যাইতে পারে। অবতারগণের সহিত ইহাদিগের এই মাত্র পার্থক্য যে ইহাঁরা সাধনাবলে সিদ্ধি লাভ করেন আজন্ম সিদ্ধ নহেন। আর অবতারগণ আজন্ম সিদ্ধ ও পূর্ণ। শৈশব হইতেই তাহাদিগের প্রতিভা স্ফুরিত হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতেই তাঁহাদিগের চিদ্ঘন মূর্ত্তি হইতে পীত কিরণচ্ছটা বিকীরিত হয়। শৈশব হইতেই তাঁহারা অলৌকিক কার্য্যকলাপের প্রদর্শন দ্বারা আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবাসিগণকে বিমুগ্ধ করিতে থাকেন। তাঁহাদিগের দেহের সেই অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ ও তাঁহাদিগের অলৌকিক কার্য্যকলাপ দর্শন করিয়া লোকে তাঁহাদিগকে সহজেই অবতার বলিয়া চিনিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, চৈতন্য, শঙ্কর, যিশু প্রভৃতির জীবনী পাঠ করিলে পাঠকগণ আমার কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। যাঁহারা স্থূলদর্শী, তাঁহারা অবতারবাদ অস্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের নিকট আমরা অবতারগণকেও মহাপুরুষরূপে বর্ণনা করিব। তাহা হইলে আর কোন আপত্তি থাকিতে পারিবে না।

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা"—মহাপুরুষ বা মহাজন যে পথ দিয়া গমন-করেন, তাহাই প্রকৃত পথ (অর্থাৎ তাঁহারা যে চরিতাদর্শ রাখিয়া যান, তাহাই

সর্ব্বথা অনুকরণীয়, ছোট বড়—সাধু অসাধু—ধনী দীন—রাজা প্রজা—ব্যক্তি মাত্রেরই চরিত্র আছে। ভাল মন্দ বড় ছোট সকল চরিত্রই—স্থল-বিশেষে—ব্যক্তি-বিশেষের অনুকরণীয় হইতে পারে কিন্তু চরিত্রমাত্রই লোক সাধারণের অনুকরণীয় হইতে পারে না। দস্যু, তস্কর, লম্পট, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক প্রভৃতি অসাধুগণের চরিত্রের অনুকরণে বিপদ অপরিহার্য্য—সুতরাং তাহা কোন মতেই লোক সাধারণের অনুকরণীয় হইতে পারে না। কিন্তু মহাপুরুষগণ তাঁহাদিগের চরিত্রের যে উচ্চ আদর্শ রাখিয়া যান, যুগ যুগান্তরেও তাহার মহিমা বিলীন হয় না। সুতরাং সেই চরিত্রই সকলের আদর্শ ও অনুকরণীয়, যাহারা মহাপুরুষগণের সেই আদর্শ চরিত্রকে নিজ নিজ জীবনের আদর্শ করিয়া চলেন, তাঁহারা ক্রমশঃ সেই আদর্শের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকেন। এইজন্যই সাধুসঙ্গের এত প্রশংসা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

মধুরিমা।

(উপন্যাস)

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রাতঃকাল। অরুণময়ী উষা আধ ঘোমটা তুলিয়া নিশীথিনীকে বিদায় দিলেন। বিহঙ্গী নিজকুলায় হইতে ঝটফঠ্ করিয়া শব্দ করিতেছে। রমানাথ বাবুর সবেমাত্র নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। শ্যামাসুন্দরী রাত্রে বড় দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, স্বামীকে জাগরিত দেখিয়া বলিলেন—"দেখ, আজ আমি বড় একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি—শচী যেন দেশত্যাগী হইয়া যাইতেছে, আমি ও পিসিমা এত কাঁদিতেছি তবু তাহাকে বুঝাইতে পারিতেছি না। তুমি সত্বরে চোবেকে একবার পাঠাও, শচীনের খবর লইয়া যেন সে আজই ফিরিয়া আসে"।

রমানাথ বাবু শচীন্দ্রকে নিজের ভ্রাতার মত স্নেহ করিতেন, শ্যামাসুন্দরীর স্বপ্নের কথাটা শুনিয়া তাঁহার মনটা কেমন খারাপ হইয়া গেল, তিনি "আচ্ছা" বলিয়া বাহিরবাটীতে যাইলেন।

শ্যামাসুন্দরীর স্বপ্ন ফলিল। রমানাথ বাবু বাহিরে যাইবামাত্র দোবে (রমানাথ বাবুর শ্বশুরের দ্বারবান) আসিয়া তাহাকে সেলাম করিয়া পত্র ও কাগজ দিল। পত্র পাইয়া একটা অনিশ্চিত আশঙ্কা তাঁহার মনে উদয় হইল, তিনি কম্পিত হস্তে স্ত্রীর নামের পত্রখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন—

"শ্রীচরণকমলেষু।

দিদি, আমি চলিলাম। কোথায় যাইব জানি না, যদি কখনও ফিরিয়া আসি তবে তোমার শ্রীচরণ দর্শন করিব, নতুবা এই শেষ। তুমি অবিলম্বে এখানে আসিয়া বাড়ীতে থাকিও, পিসিমাকে আসিতে লিখিও, তোমারই সমস্ত রহিল, দেখিয়া শুনিয়া লইও। যাহা কিছু কাগজপত্র ছিল পাঠাইয়া দিলাম।

তোমার স্নেহের

হতভাগ্য শচী"

পত্র পাঠ করিয়া রমানাথ বাবু স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন; কি প্রকারে এ কথা স্ত্রীকে জানাইবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। অনেক চিন্তার পর রমানাথ বাবু পুত্রের নাম ধরিয়া ডাকিলেন, পুত্র সুরনাথ দৌড়াইতে দৌড়াইতে পিতার নিকট আসিল, পিতা পুত্রের হস্তে পত্র দিয়া বলিলেন—তোর মাকে এই পত্র দিয়া আয়।

সুরনাথ পত্র লইয়া মাতাকে দিল। শ্যামাসুন্দরী পত্র পড়িলেন, পড়িয়া তাঁহার মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল, নয়ন ফাটিয়া অশ্রুজল বাহির হইতে লাগিল, মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

এমন সময় শ্যামাসুন্দরীর শাশুড়িঠাকুরাণী সেই ঘরে আসিলেন এবং দেখিলেন শ্যামাসুন্দরী ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতেছেন, তাঁহার মাথার নিকটে একখানি পত্র পড়িয়া রহিয়াছে। পত্রখানি লইয়া পড়িলেন। তৎপরে পুত্রবধূকে ভূমি হইতে তুলিলেন এবং সস্নেহে বলিলেন,—"বউমা অত অধীর হওয়া তোমার উচিত নয়, তুমি রমানাথের সহিত সরস্বতীপুরে যাইয়া ভ্রাতার খোজ কর। ভয় কি শচীন্দ্রনাথ বালক নয়, শিক্ষিত পুরুষ, নিশ্চয় মনের অবস্থা ভাল হইলে ফিরিয়া আসিবেন।"

স্নেহময়ী শাশুড়ীর সান্ত্বনায় পুত্রবধূর মন অনেক স্থির হইল, তিনি স্বামীর সহিত সরস্বতীপুরে যাত্রা করিবেন স্থির করিলেন।

পরদিন বেলা দুই প্রহরের সময়ে রমানাথ বাবু মাতৃ-আদেশে স্বস্ত্রীক শ্বশুর বাড়ীতে যাত্রা করিলেন। প্রায় সন্ধ্যা হয়, এমন সময়ে শ্যামাসুন্দরীর পাল্কী আসিয়া দ্বারে পৌছিল, পিসিমা সংবাদ পাইয়া আঙ্গিনায় লুটাইয়া করুণস্বরে কান্দিতে লাগিলেন। শ্যামাসুন্দরী পিসিমার নিকট বসিয়া নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রমানাথ বাবু দুইটী পুত্রকে লইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া পিসিমা অপেক্ষাকৃত ধীরস্বরে কাঁদিয়া বলিলেন,—"বাবা আমার শচীন নাই আমার যে কেউ নাই, শচী বিনে যে ঘর অন্ধকার। আমার শচী কোথায় গেল।"

রমানাথ—"আপনার ভয় নাই, আমি আপনার শচীকে খুঁজিয়া আনিয়া দিব।"

জামাতার মধুর সান্ত্বনায় পিসিমার শোকবহ্নি অনেকটা নির্ব্বাপিত হইল। কিছুক্ষণ পরে রমানাথ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "পিসিমা আপনি কখন আসিলেন এবং আপনাকে শচীর নিরুদ্দেশের সংবাদ কে দিল" ?

পিসিমা বলিলেন।—"পীতাম্বর বাবু নিজের লোকের দ্বারা আমাকে সংবাদ দেন এবং সেই লোকের সঙ্গে আমি আজ সকালে এখানে আসিয়াছি।" এই বলিয়া পিসিমা জামাতাদির আহারাদির চেষ্টায় চলিয়া গেলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

আশ্বিন মাসের শেষে একদিন প্রভাতের মৃদু মধুর পবনান্দোলিত ধান্য ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া নবীনানন্দ গুরুর সঙ্গে চলিয়াছেন, ঊষার কিরণ অল্প বাহির হইয়াছে। কৃষক পত্নী সকল মাথায় মৃত্তিকার কলসী লইয়া ঝরনায় জল আনিতে চলিয়াছে। অদূরে মন্দারপর্ব্বত প্রভাত-নীলিম-আভায় শোভিত, বিহঙ্গ কুল নিনাদিত, পর্ব্বতের প্রান্তদেশে কিছু নিম্নে ঝরনা অবস্থিত। নিকটস্থ একটা চৌবাচ্চায় ঝরনার জল সঞ্চিত হইতেছে ; নবীনানন্দ সেই খানে আসিয়া হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করিয়া কিঞ্চিৎ জল পান করিলেন।

নবীনানন্দ ও জীবনানন্দ ঝরনার নিকট আসিয়া একটা প্রস্তরের উপর উপবেশন করিলেন, কয়েকজন কৃষক আসিয়া নমস্কার করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। একজন কৃষককে সম্বোধন করিয়া জীবনানন্দ বলিলেন 'দুলাল এই সাধুজীকো

হুঁসিয়ারিসে পাহাড় পর লেযাও, হাম পিছে মে আতেহেঁ।' দুলাল নবীনানন্দকে লইয়া পর্ব্বতের উপর উঠিতে লাগিল।

জীবনানন্দ স্বামী পর্ব্বতের নিম্নদেশে অবতরণ করিয়া দক্ষিণ দিকের একটা অতি সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া চলিলেন, ক্রমে যাইতে যাইতে একটা বড় বাড়ী দেখিতে পাইলেন, সেখানে অনেক নূতন লোক জন গোলমাল করিতেছে, সন্ন্যাসী জীবনানন্দ একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'এটা কাহার বাড়ী'? উত্তর পাইলেন 'চৌধুরাণীর।'

পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন,—বরাবরই চৌধুরাণী ছিলেন না পূর্ব্বে অন্য কেহ ছিল?

উত্তর পাইলেন—আমরা নূতন লোক জানি না।

সন্ন্যাসী আর বাক্য ব্যয় না করিয়া পুনরায় পর্ব্বতের দিকে ফিরিয়া যাইলেন, অন্য লোকেরা অবাক্ হইয়া বলাবলি করিতে লাগিল।

চৌধুরাণীর বাটীর বাহিরে বসিয়া যে সকল লোক বলাবলি করিতেছিল তাহাদিগের মধ্যে একজন যাইয়া অন্দরে সংবাদ দিল যে—"একজন বাবাজী আসিয়া ছিলেন, কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া গেলেন।"

চৌধুরাণী বসিয়াছিলেন—সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া—উঠিয়া দাঁড়াইলেন, নিকটস্থ একজন দাসীকে সম্বোধন করিয়া, বলিলেন—"মুন্নি উহাকে বল সন্ন্যাসীকে দেখিতে তিনি কতদুর গিয়াছেন, আর বুড়া ভাইয়াকে ডাক।"

মুন্নি কর্ত্রীর আদেশানুসারে যাইয়া একজন বৃদ্ধকে ডাকিতে চলিল, ও সংবাদ দাতাকে সন্ন্যাসীর পুনরায় খোঁজ করিতে বলিল।

চৌধুরাণীর বাটীর পশ্চিম দিকের একটা দালানে বৃদ্ধ রঘুনাথ দড়ির খাটিয়ায় শয়ন করিয়া "জপ মনো রাম নাম সদা" গীত গাহিতেছেন, মুন্নি মস্তকের নিকট যাইয়া ডাকিল 'বাবুজী! বৃদ্ধ থতমত খাইয়া উঠিয়া বসিল, ভাবিয়াছিল কেহ অপর লোক আসিয়াছে, চাহিয়া দেখিল মুন্নি, বলিল 'কাহে তো'? মুন্নি,—"আরে, ইনা বোলায়ছে"। রঘুনাথ ব্যস্ত হইয়া মুন্নির সহিত চৌধুরাণীর নিকট হাজির হইল।

চৌধুরাণী রঘুনাথকে বলিলেন—ভাইয়া একজন সন্ন্যাসী আমাদের বাড়ীর বাহিরে এসেছিলেন তুই জানিস?

রঘু,—"নারে রাণী হামি তো না জানি, হামি আভি চলিলো, হমার মহারাজ বুঝি আইলো রে? আরে মুন্নি হামার লাঠি পাগড়ী কাঁহারে, দেরে জলদি"। মুন্নি দ্রুত যাইয়া লাঠী ও পাগড়ী আনিয়া দিল। বৃদ্ধ রুদ্ধশ্বাসে পর্ব্বতের দিকে ধাবিত হইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

নবীনানন্দ পর্ব্বতের উপর যাইয়া গুরুর পূজার স্থান দেখিলেন, রাত্রিবাসের জন্য আশ্রমকুটীর সম্মুখে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড, ভস্মরাশি স্তূপাকার রহিয়াছে, সেখানে এক প্রস্তরবক্ষে নবীনানন্দ বসিলেন। দূরে গোয়ালিকা বৃক্ষমূলে পুষ্পশয্যা পাতিয়া রাখিয়াছে, শীঘ্রই বৃষ্টি হইয়া যাওয়াতে বৃক্ষ হইতে বারিবিন্দু ঝর ঝর টপ টপ শব্দে বৃক্ষতলে পড়িতেছে। এই সমস্ত দেখিয়া তাঁহার প্রাণ যেন সঙ্গীতময় হইয়া উঠিল, তিনি যেন সত্য সত্যই সিদ্ধাশ্রমে আসিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন এইরূপ মনে হইয়া, তাঁহার নয়নদ্বয় আপনি মুদিত হইয়া আসিল, ভক্তিরসে হৃদয় ভরিয়া উঠিল, তিনি গাহিলেন,—

এসো নাথ প্রভু এসো,
আমার প্রেম, ভক্তি, আশা, সকলি তোমার
কোথা আছ নাথ এসো।
তোমার প্রেম এত মধুময়, সরস করে বিরস হৃদয়
মম চিরজীবনের সুখ দুঃখহারী
চির স্নিগ্ধ শান্ত এসো,
সখে, তোমার আশায় বাসনা ছাড়িনু,
হৃদি সিংহাসনে বোসো।
এসো সখা প্রভু এসো॥

সুনীল আকাশতলে, পর্ব্বতশিখরদেশে বসিয়া নবীনানন্দ প্রেমে বিভোর হইয়া গান গাহিতেছিলেন জীবনানন্দ পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া গীত শুনিতে ছিলেন গীত সমাপ্ত হইলে উভয়েই বসনে চক্ষু মার্জ্জন করিলেন। নবীনানন্দ ফিরিয়া দেখিলেন গুরু সম্মুখে, উঠিয়া নমস্কার করিলেন, গুরু শিষ্যে পুনরায় সেখানে উপবেশন করিলেন, জীবনানন্দ কহিলেন,—

বৎস, তোমার ভগবদ্ভক্তি দেখিয়া বড় প্রীত হইলাম।

নবীন,—"ভগবান্, এ অধম অতি পাষণ্ড, এমন পাপীর প্রাণে ভগবদ্ভক্তি কোথা হইতে আসিবে ?"

জীব,—কেন তুমি আত্মাবমাননা করিতেছ ? তোমার মতন যার প্রাণ, সেকি এমন কর্ম্ম করিতে পারে, যাহা তাহাকে পাষণ্ড নামে অভিহিত করিবে ?

নবীন "হাঁ প্রভু, আমি এতই কঠিন কার্য্য করিয়াছি যাহাতে আমার ঘোর নরকস্থ হওয়া উচিত ;"

জীব,—"পাপীর প্রভু তিনি, তাঁহাকে ডাক, অনুতাপ কর, তিনি তোমায় ক্ষমা করিবেন।"

নবীন,—"না প্রভু এ ভীষণ পাপের ক্ষমা নাই ! আমি যাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়াছি তাঁহাকে একবার দর্শন করিয়া তাঁহার চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, সেই শোকাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যখন তিনি ক্ষমা করিবেন তখন আমার সুখে মৃত্যু হইবে, তাহা ভিন্ন আর কিছু আশা নাই !"

জীবনানন্দ নবীনানন্দের কাতরতা পূর্ণ আক্ষেপ শুনিতেছেন, এমন সময় বৃদ্ধ রঘুনাথ আসিয়া ভূমি লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিল। জীবনানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কাকা কেমন আছ" ?

রঘুনাথের চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, সে আনন্দে গদ্‌গদ হইয়া বলিল "মহারাজ হামি বড় ভাল আছিরে ? তুতো ভালো না থাকিলে বাবা ? তুঁ হামার যে সব তেয়াগী দিলি বাপ ?"

জীব,—তাতে দুঃখ কি কাকা ? আমি তো তোমার ছেলের উপযুক্ত কাজ করিতেছি।

রঘু,—হাঁ বেটা তুই হামার দেওতা হামাকো রাস্তা দেখাও বাবা, এত্তো মায়া বুঢ়ার কেনো থাকে বাবা !

জীব,—কাকা ইনার খোঁজ কিছু পেলে ? আমি কাছারী বাটীতে যাইয়া শুনিলাম যে 'চৌধুরাণার বাটী' সেকি রকম বুঝিলাম না, চৌধুরাণী কে ?

রঘু,—"চৌধুরাণী ভাড়া লইয়াছে, তু দেখিবি বাবা ? এ চৌধুরাণীর মুখ ঠিক ইনার মত ?"

জীব,—বিবাহ হইয়াছে ?

রঘু,—না বাপের জিমদারী পাইলো।

জীব,—ইনা কেমন করিয়া সে হবে, ইনার তো বাপ আমি, তবে সে কেমন করিয়া চৌধুরাণী হইল ?

রঘু,—"সে বলে হামি বাপকো জিমদারী পাইয়েছে।"

জীবনানন্দ ভাবিলেন—বুড়ো মানুষ ভ্রম হয়েছে ? পুনরায় কহিলেন, "কাকা, আমি একটা অজানা পরের মেয়েকে কি প্রকারে দেখিতে যাইব তুমি যদি বিগ্রহ দর্শনের জন্য তাঁহাকে এখানে আন তবে দেখিব।"

বৃদ্ধ রঘুনাথ পুনরায় চৌধুরাণীর বাটীতে চলিল।—চৌধুরাণী একটা থামের অন্তরালে লুকায়িত ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন বৃদ্ধ রঘুনাথ মুন্নি মুন্নি করিয়া ডাকিতে ডাকিতে সেখানে উপস্থিত হইল, মুন্নি গৃহের অভ্যন্তর হইতে উত্তর দিল যাই হো'। পুনরায় বৃদ্ধ কহিল 'ইনা কাঁহারে'? থামের আড়াল হইতে চৌধুরাণী বাহির হইয়া বলিলেন, 'কিরে ভাইয়া'?

রঘু,—তুতো ঠিক বুঝিলি মহারাজ তো আইলো ?

ইনা আনন্দাশ্রু পূরিত লোচনে বৃদ্ধের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন—"বুঢ়া ভাইয়া বাবা কোথায় আমায় শিগ্‌গির নিয়ে চল্"।

রঘু—"যাইবো যাইবো, থির রহ, হামি তোর পরিচয় এখুন না দিয়েছে,"

ইনা,—"কেন ভাইয়া তুই আমার বাবাকে দেখাবি না ? আমি মুন্নির সাথে যাব"

রঘু,—আরে থাম, থাম, তুই তো হামাদের পোরাণরে তোর একটা দুলা-হাভি বাবা আনিয়েছে রে।

ইনার আর বাক্য সরিল না, কি জানি কেন নয়নে জল দেখা দিল, ইনা দ্রুতপদে যাইয়া শয্যায় শয়ন করিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

চৌধুরাণী ইনা রাণীর আজ বাটী লোকে লোকারণ্য! বাটীর বহির্ভাগের প্রাঙ্গণে প্রায় তিনশত লোক সারি দিয়া বসিয়াছে, একটা থামওয়ালা বারান্দার সম্মুখ ভাগে দুইটী আসন রাখা হইয়াছে।

বৃদ্ধ রঘুনাথ আসনের সম্মুখে কাহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সকলেই নীরব। কিছুকাল পরে দেখা গেল সন্ন্যাসী জীবনানন্দ ও নবীনানন্দ আসিতেছেন তাঁহাদের দেখিয়া সেই সমাবেত জনমণ্ডলী 'জয় মহারাজ' বলিয়া সকলে অভি-

বাদন করিল, সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া জীবনানন্দ শিষ্য সঙ্গে আসন গ্রহণ করিলেন,—রঘুনাথ সম্মুখে আসিয়া বলিল।—

জীবনানন্দ রঘুনাথের কার্য্যে অবাক হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—কাকা, এরা যে আমার প্রজা, এরা এখানে কেন? চৌধুরাণী কোথায়?

রঘু,—চৌধুরাণী উঠিয়া গেল, হামি তোর বাটীতে রাইয়ত কে জমা করিয়েছি, এ্যতো দিন যে কাঁহা কাঁহা ছিলি বেটা হিসাব করবি না?

জী,—চৌধুরাণী কোথায় গেল? এবাটীর মধ্যে এত লোক কেন?

রঘু,—সে কথা এই ভুষণত তুষণা রামাকে পুছ কর বাবা।

জীবনানন্দকে কথাগুলি বলিয়া রঘুনাথ বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। জীবনানন্দ ভুষণা নামক একজন প্রজাকে ডাকিলেন সে আসিয়া নমস্কার করিল, জীবনানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,

চৌধুরাণী জী কোন হ্যায় রে?

ভু,—হাম তো না জানি, কোই কোই তো ইনা রাণী বোলত বা।

জীবনানন্দের সন্দেহে হৃদয় আন্দোলিত হইয়া উঠিল, তিনি ধীরে ধীরে অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

ইনা এতক্ষণ জানালার ফাঁক দিয়া নবীনানন্দকে দেখিতেছিলেন! একে? এ যেন চেনা মুখ! সে যদি হয়? তাহলে কি হবে?

ইনা ভাবিতেছেন, তবে আমি কি করিব? চিন্তা ভাল করিয়া মনে আনা হইল না জীবনানন্দ ধীরে ধীরে উঠিলেন দেখিয়া তিনিও দ্রুত আসিয়া ঘরের দালানে দাঁড়াইলেন!

জীবনানন্দ অন্দরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, 'কে প্রতিমারূপিণী দণ্ডায়মানা! দেখিয়া—প্রাণ স্নেহাকুলিত হইয়া উঠিল, ইনা--দ্রুত আসিয়া চরণে পতিত হইলেন, 'বাবা' এই শব্দমাত্র মুখে উচ্চারণ হইতে হইতেই মোহ আসিয়া জ্ঞান হরণ করিল। জীবনানন্দ দুহিতার মস্তক কোলে লইয়া বসিলেন কেহ জল কেহ পাখা আনিল, কিছুক্ষণ পরে অল্প জ্ঞানের সঞ্চার হইলে ইনা পিতৃমুখপানে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে বলিলেন 'বাবা' তুমি এত দিন কোথায় ছিলে?

সন্ন্যাসী জীবনানন্দের আনন্দে দুঃখে কণ্ঠরোধ হইয়াছিল, দুহিতার স্নেহ আহ্বানে, আজ প্রাণের বাঁধন যেন শিথিল হইয়া আসিল, সংসার ত্যাগী, সাধু

নয়ন হস্তদ্বারা ঢাকিয়া উচ্ছাসিত হৃদয়ে, কাঁদিয়া উঠিলেন, স্নেহের কাছে আজ কঠোর বৈরাগ্য পরাভব হইল !

ইনা ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন, পিতার চক্ষু হইতে হস্ত নামাইয়া—অঞ্চল দ্বারা চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, বাবা আর কেঁদো না আমি তো এখন কাছে আছি !

জীবনানন্দ স্থির হইলেন, দুহিতার সান্ত্বনায় তাঁহার জ্ঞান হইল বলিলেন, যে পত্নীশোক, পুত্রশোক ভুলিয়াছিল, আজ মা তোর স্নেহের সম্বোধনে তাহার কঠিন হৃদয় গলিয়াছে ! এমন দিন, এমন অভাবপূর্ণ দিন, কখনও কি হবার আশা ছিল ! ভগবান ! তুমি ধন্য !

বৃদ্ধ রঘুনাথ এই দৃশ্য নীরবে একধারে দেখিতেছিল ও অজস্র অশ্রুধারায় তাহার বক্ষ প্লাবিত হইতেছিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রভাতে ইনার নিদ্রাভঙ্গ হইল. দেখিলেন যেন নূতন সূর্য্য উঠিয়াছে। সূর্য্যের কিরণরশ্মী নূতন বর্ণে রঞ্জিত হইয়া বৃক্ষে—পত্রে—ফুলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, বিহঙ্গিনী নব মধুরতানে প্রভাতী গাহিতেছে; ঠিক সেই সরস্বতীপুরে, সরসী তীরে, বকুল ডালে, বসিয়া যেমন মধুরস্বরে গাইত, তেমনি আবার গাহিতেছে, সরস্বতীপুরে উদ্যানের ফুটন্ত হাসি দেখিলে, যেমন, এক জনকে দেখিবার বাসনা জাগিত, আজ সেই বাসনা যেন নূতন ভাবে জাগিয়া উঠিল !

ইনা শয়ন গৃহ হইতে বাহির হইয়া, তৃষিত চাতকের ন্যায়, কাহার দরশন আশায় জানালায় উকি দিলেন দেখিলেন পিতা একখানি কম্বলের উপর বসিয়া রহিয়াছেন—সম্মুখে রঘুনাথ বসিয়া কিসের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছে, তিনি সেখানে দাঁড়াইয়া অতি মনোযোগের সহিত কথাগুলি শুনিতে লাগিলেন।

রঘুনাথ, গলার আওয়াজ নরম করিয়া ইনার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল,—

মহারাজ, তোর সাথে যে লোকটী এসেছে, উহার জাত কি ?

ইনার পিতা বলিলেন, উনি আমারই জাত

রঘু, উহার সাথে তোর কি সাদি বিয়া চলে ?

পিতা, সেটা ভাল করিয়া জানিতে হইবে, ইনার তো বিবাহের শীঘ্র প্রয়ো-

জন, তবে আমি এখন আশ্রমে চলিলাম সেখানে তুমি যাইও কথাবার্ত্তা পরিচয় সব হইবে।

রঘুনাথ তাঁহার কথায় আর কিছু উত্তর না দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, সন্ন্যাসী ইনার পিতা আশ্রমে চলিলেন।

ইনার বিবাহের কথা শুনিয়া শরীর অবশ হইয়া আসিল! তিনি মহা সন্দেহে পতিত হইলেন, যাঁহাকে দেখিতে আসিলেন দেখা হইল না, তিনি একটা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া মুন্নিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

মুন্নি রন্ধন গৃহের দাওয়ায় বসিয়া তরকারী বানাইতেছিল একজন দাসী যাইয়া সংবাদ দিল ইনা ডাকিতেছেন, মুন্নি আসিয়া ইনার সম্মুখে দাঁড়াইল, ইনা বলিলেন,

মুন্নি, বাবুজীকে খবর দে, আমি কিষুনজী দর্শন করিতে যাইব।

মুন্নিদাই 'বেশ' বলিয়া চলিয়া গেল। ইনার ১৫ বৎসরের সকল ঘটনার মধ্যে এই ঘটনাই ভয়ানক মনে হইতে লাগিল. কাহার সঙ্গে বিবাহ? এ কে?

যদি সে না হয়? তবে কি তাকে পাইব না, আর কেহ আমার স্বামী হইবে? এ জীবনে তাহা হইবে না, প্রতিজ্ঞায় নিজ হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া ইনা নয়ন মার্জ্জন করিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্যামাসুন্দরী প্রায় দুই তিন সপ্তাহ পরে রমানাথকে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন. রমানাথও ভাবিয়া দেখিলেন যে এতদিন বসিয়া থাকিলে কাজ কর্ম্মের বড় হানি হয়, তিনি স্ত্রীও ছেলে দুটীকে রাখিয়া বাটী ফিরিয়া গেলেন, শ্যামাসুন্দরী ভ্রাতৃ অন্বেষণে নানাদিকে লোক প্রেরণ করিয়াছেন, প্রতি মুহূর্ত্তে সংবাদের আশায় অস্থির চিত্ত হইতেছেন—নয়ন আর মানে না, ভাই ভগ্নীকে ভুলিতে পারে কিন্তু স্নেহময়ী ভগ্না ভ্রাতৃশোক সহ্য করিতে বড় কাতরা হয়। পুত্রভাবে আবার যে ভগ্নী, পিতৃহীন অবস্থায় ভ্রাতাকে পালন করে তাহার পুত্রশোক আর ভ্রাতৃশোক এক ভাবেই হৃদয় দগ্ধ করিতে থাকে, শ্যামা সুন্দরীর পুত্রশোক হইয়াছে।

বেলা দুই প্রহর বাজিয়া গিয়াছে, আকাশে অল্প অল্প মেঘ দেখা দিতেছে,

শ্রাবণের অল্প অল্প রৌদ্রের তেজে বৃক্ষ তৃণ একটু সবেমাত্র আলোক পাইয়া হাসিয়া উঠিয়াছিল, পুনরায় মেঘ দেখিয়া তাহারা ম্লান ছায়ার বিকাশ করিতে লাগিল। শ্যামাসুন্দরী অনন্যমনা হইয়া অঙ্গিনার পার্শ্বস্থ গৃহদ্বারে বসিয়া মেঘ দেখিতেছেন, পুত্র সুরনাথ শচীন্দ্রনাথের কুকুর লইয়া দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইতেছে, তাহার মধুর হাস্য ধ্বনিতে গৃহ নিনাদিত হইতেছে, ক্ষুদ্র শিশু অমরনাথ তাহার নবোদ্গত দন্ত বিকাশ করিয়া একবার একবার নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছে, পিসিমা একখান মাদুর পাতিয়া পড়িয়া আছেন, তিনিও শচীন্দ্রের চিন্তায় দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, শ্যামাসুন্দরী রমানাথের সংবাদ আসার প্রত্যাশা করিতেছেন।

এমন সময়ে, চাকর আসিয়া একখানা পত্র দিয়া গেল শ্যামাসুন্দরী পত্র খুলিলেন, পত্রে লেখা—

কল্যানীয়াসু,—

তোমায় একটী সুখের সংবাদ দিতেছি, অদ্য বীরবর সিং ফিরিয়া আসিয়াছে, শুনিলাম মন্দার পর্ব্বতের সন্ন্যাসাশ্রমে শচী আছেন, আমি অদ্যই সেখানে যাত্রা করিলাম তোমরা ভাল হইয়া থাকিবে।

রমানাথ।

পত্র পাঠ করিয়া শ্যামাসুন্দরীর হর্ষ বিষাদে শরীরকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল, তিনি কম্পিত কণ্ঠে ডাকিলেন 'পিসিমা'। পিসিমা অন্য মনস্কভাবে উত্তর দিলেন—কি বলিস্ গো?

শ্যামা আবার আবেগভরে ডাকিলেন শিগ্‌গির এসো শচীর খবর পেয়েছি,

পিসিমার বসন পরিধানে ঠিক ছিল না তিনি ব্যস্ত হইয়া বসন ঠিক করিতে করিতে দ্রুত শ্যামার কাছে যাইয়া বলিলেন কই, কই, কি এসেছে?

শ্যামা,—(মন্দার পর্ব্বতের) মধুসূদন পাহাড়ের যে, সাধুদিগের আশ্রম আছে, শচী সেখানে আছে।

পিসি ভ্রাতৃষ্পুত্রীচিঠি খানা লইয়া অনেক বার পাঠ করিয়া দেখিতে লাগিলেন, অমরনাথ জিজ্ঞাসা করিল "মাকাল চিথি?" শ্যামা বলিলেন, "তোর মামা আসচে।" অমরনাথ মাতার গলদেশে ক্ষুদ্র বাহু বেষ্টন করিয়া বলিল 'মামা লাল তুক তুক মামী আনবে!'

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসী জীবনানন্দ রঘুনাথ ও নবীনানন্দ তিনজনে আশ্রমে বসিয়া নানাবিধ কথা বার্ত্তা হইতেছে ইতি মধ্যে তুষণা আসিয়া সংবাদ দিল যে, ইনা রাণী কিষুনজী দর্শন, করনেকো হুকুম চাহতে হেঁ, রঘুনাথ হাসিয়া 'আজ নেহি, কাল্ রাতকো দর্শান হোগা' তুষনা চলিয়া গেল।

তুষনার কথা শুনিয়া নবীনানন্দের সন্দেহ ঘনীভূত হইল, তিনি গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রভু! আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে যে আপনার প্রকৃত পরিচয় জানি; বলিবেন কি?

সন্ন্যাসী বলিলেন,—পরিচয় না দিবার আমার কোন কারণ নাই, অগ্রে তোমার সমস্ত পরিচয় পাইলে, আমি বড় সুখী হইতাম।

নবীনানন্দ বলিলেন আমার নাম শচীন্দ্রনাথ চৌধুরী, নিবাস সরস্বতীপুর, (মুঙ্গের জেলা)—

স,—তোমার বাটীতে কে কে আছেন, তোমার বৈরাজ্ঞের কারণ কি? তুমি এত লেখা পড়া শিখিয়া সন্ন্যাস করিতে চাহ কেন?

শ, আমার বাটীতে আপাততঃ আমি একাই ছিলাম, আমি পিতৃ মাতৃহীন, আমার এক জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্বশুরালয়ে আছেন, আর পিতৃস্বসা ৺ কাশীধামে বাস করিতেছেন।

স, তুমি এই সকল পরিজন ছাড়িয়া একা কেন গৃহ ত্যাগ করিলে?

শচীন্দ্র,—লজ্জায় মুখ অবনত করিয়া কহিলেন, প্রভু! ক্ষমা করুণ সেকথা বলিতে পারি না।

সন্ন্যাসী—বলিলেন যাহা বলিতে তোমার ইচ্ছা নাই এমন বিষয় আমি জানিতে চাহি না, আমার পরিচয় শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছ শুন, আমার নাম বীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আমি বহুকাল হইল এদেশে বাস করিতেছি, আমার স্ত্রী একটী পুত্র ও একটী কন্যা রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন, পুত্রটীও ২ বৎসর বয়সে আমাকে ছাড়িয়া যায় সেই অবধি আমি এই পর্ব্বতে আসিয়া সন্ন্যাসী বেশে ভগবদ্ আরাধনা করিয়া থাকি, কখনও কখনও নানা তীর্থেও যাইতাম, আমার কন্যাটী এই রঘুনাথ ও একটি দাসী মানুষ করিয়াছিল। বলিয়া নিস্তব্ধ হইলেন।

শচীন্দ্রনাথের হৃদয় আরও সন্দেহাকুলিত হইয়া উঠিল তিনি অধীর প্রাণে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্, আপনার কন্যা কি কোন মেলায়—হারাইয়া ছিল?

সন্ন্যাসী—বীরেন্দ্রনাথ রঘুনাথের মুখে পূর্ব্বেই সরস্বতীপুরের নাম শুনিয়া ছিলেন, আরও ইনার মুখে শচীন্দ্রনাথের পরিচয়ও অনেকটা পাইয়াছিলেন, তিনি মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন যে বিলাসপুরের মেলায় আমার কন্যা হারাইয়াছিল। ভাল মনে হয় না, বলিয়া মুখ অন্য দিকে ফিরাইয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন, পুনরায় বলিলেন, সে যাহা হউক আমার একটী অনুরোধ তোমার রাখিতে হইবে আমার কন্যাকে তোমার বিবাহ করিতে হইবে।

শচীন্দ্রনাথ বিবাহের নাম শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, আদ্যোপান্ত ঘটনাবলী তাঁহার স্মৃতি পথে নূতন হইয়া জাগিয়া উঠিল, তিনি গুরুর চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া বলিলেন—প্রভু! আপনার কথায় অমত করা আমার মহাপাপ! অধমকে ক্ষমা করুন।

গুরু শিষ্যকে অনেক বুঝাইয়া—বলিলেন তুমি আমার সঙ্গে বাটীতে চল অদ্য তোমাকে সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলিব, তুমি ভ্রমে পতিত হইয়াছ! সংসারে আশক্তি, প্রেম—স্নেহ মায়া, ত্যাগের বয়স তোমার এখনও হয় নাই—এখন তুমি কঠোর বৈরাগ্য সাধন করিতে পারিবে না।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

ইনা শয্যায় উপবেশন করিয়া. চিন্তানিমগ্না, প্রজ্বলিত দীপালোকে ইনার যৌবনে ঢল ঢল মুখমণ্ডল পূর্ণ সৌন্দর্য্য বিভাসিত দেহখানির অনুপম শোভা হইয়াছে! ইনার মনে পড়িল, সেই শচীন্দ্র! একি সেই শচীন্দ্র! রঘুনাথ, মুন্নি যাহা বলিল তাহাতো মিথ্যা হইবে না, পিতার নিকট কি কেহ মিথ্যা করিয়া শচীন্দ্র নাম বলিতে পারে? কখনই নয়! যাইহোক আমি একবার পরিচয় লইব। নানাবিধ ভাবনা চিন্তার পর ইনা শচীন্দ্রের শয়ন গৃহের দ্বারের নিকট আসিয়া দেখিলেন ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ! ঠুক করিয়া একটী আঘাত করিয়া সরিয়া গেলেন। শচীন্দ্রনাথ ঘোর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন কেমন করিয়া গুরুদেবকে অমত জানাইব! ইহাই তাহার চিন্তার বিষয়। শচীন্দ্রনাথের কর্ণে শব্দটী লাগিল ঠিক মনে হইল কে দ্বারে আঘাত করিল, তিনি নিঃশব্দ পদসঞ্চালনে আসিয়া

দ্বার খুলিয়া, এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন, কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া গৃহের বাহিরে গেলেন ; ইতিমধ্যে ইনা গৃহ মধ্যে আসিয়া বসনে মুখাবৃত করিয়া শয্যার অনতিদূরে দাঁড়াইয়া রহিলেন।—শচীন্দ্রনাথ সেখানে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, অন্য মনস্ক হইয়া গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া শয়ন করিতে যাইবেন, দেখিলেন শুভ্র বসন বিমণ্ডিতা রমণী মূর্ত্তি সম্মুখে দণ্ডায়মানা দেখিয়া আপাদ-মস্তক কম্পিত হইয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কে ?

ইনা, কণ্ঠস্বর চাপিয়া উত্তর করিলেন 'আমি ইনা, বীরেন্দ্রনাথ দত্তের কন্যা' আপনি কে ?

শচীন্দ্রনাথের সন্দেহের উপর আরও সন্দেহ বাড়িতে লাগিল, তিনি বলিলেন, আপনি আমার পরিচয় লইয়া কি করিবেন। ইনা মনে মনে বলিলেন (হৃদয় সিংহাসনে তোমায় রাজা করিব) মুখে বলিলেন, আমার প্রয়োজন আছে।

এ স্বর যেন শচীন্দ্রনাথের পরিচিত। তিনি বলিলেন, আমার নাম নবীনানন্দ।

ইনা মস্তক নাড়িয়া বলিলেন "উঁ হুঁ ও নাম নয়।"

শচীন্দ্র বলিলেন তবে কি নাম ?

ইনা বলিলেন 'শচীন্দ্রনাথ'—

শচীন্দ্রনাথ এতক্ষণ স্থির হইয়া ছিলেন এবার দ্রুতবেগে নিকটে আসিয়া মাথার কাপড় খুলিয়া বলিলেন, 'ইনা মরিয়াছে এ—আমার মধুরিমা।'

ইনা মধুরিমা হইয়া গেলে শচীন্দ্র হস্ত ধারণ করিয়া শয্যায় বসাইলেন ও মধুরিমার চিবুক ধরিয়া বলিলেন 'আজ অবধি শচীন্দ্র তোমারই হইল আর কাহারও নয়,' দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু, শচীন্দ্রের মনের বেদনা লইয়া মধুরিমার হস্তোপরি পড়িল। মধুরিমাও সেই অশ্রুতে অশ্রু মিশাইলেন।—

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ।

মধুরিমার সহিত শচীন্দ্রের বিবাহ হইয়াছে। শচীন্দ্র নব বধূ লইয়া সরস্বতী-পুরে আসিতেছেন, চৌধুরী বাটীতে মহা ধূমধাম আরম্ভ হইয়াছে। বেলা তিনটার সময় বর কনে আসিয়া উপস্থিত হইল শ্যামা সুন্দরী অলঙ্কার ভূষিতা রমণীগণকে লইয়া বরণ করিয়া সকলে নব বধূকে ঘিরিয়া বসিল। নীলিমা বউ দেখিতে ঘোমটা খুলিয়া চকমিত হইলেন। একে একে সকলের বউ দেখা

হইল, পীতাম্বর রায়ের স্ত্রী ও পিসিমা সকলে বলাবলি করিতে লাগিলেন এ মেয়ে যেন চেনা চেনা বোধ হইতেছে।—শচীন্দ্রনাথ শ্যামা সুন্দরীকে ডাকিয়া সন্ন্যাসী শ্বশুরের আগমনের সংবাদ দিলেন;

শ্যামাসুন্দরী উঠিয়া গেলে আর সকলেই উঠিয়া গেলেন নীলিমা বৌউর কাছে বসিয়া থাকিলেন, গৃহ শূন্য হইলে নীলিমা ঘোমটা খুলিয়া দিয়া বউকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি আমায় বলবে না?

বউ, কেন বল্‌বনা আমার নাম ইনা।

নীলিমা হাসিয়া গাল টিপিয়া বলিলেন "আর ঢাক্‌ছিস কি, তুই সেই পোড়ার মুখী মধুরিমা"। মধুরিমা হাস্যমুখে সইকে আলিঙ্গন করিলেন।

(সমাপ্ত।)

শ্রীমোহিনী দেবী।

ছবি।

রতণ রচণ, বসন পরিয়া,
সন্ধ্যা আসিল ধীরে,
ঈষৎ অসিত. বিষাদিত ছায়া,
পড়িল যমুনা নীরে।
তীর তরু গুলি, হেলিয়া দুলিয়া,
কি যেন আঁকিছে জলে;
আঁকা বাঁকা ছবি, কাঁপিয়া কাঁপিয়া,
উঠিতেছে প্রতিপলে।
শিহরি তটিনী, রটিনী নটিনী,
ভাবিনী সাজিয়া চলে।
আমি, পুলিনে বসিয়া, তাহারি ছবিটি
লিখিতেছি ক্ষিতিতলে।
সেই, অগুরু রচিত, সুকোমল বাহু,
আমার গ্রীবার ভূষা,

সেই, গৌর মুখের, সৌর কিরণে,
মনে করি যারে উষা।
সেই, হরষ উজোল, স্নেহের নিঝর,
ডাগর ডাগর আঁখি,
যার, মাধুরী লখিতে, মনে এই হয়,
আজীবন চেয়ে থাকি।
সেই, তিল ফুল পরি, শিশির সমান,
নাসায় মুকুতা দোলা।
প্রেমময় প্রাণা, কুন্দদশনা,
সতত হৃদয় খোলা।
সেই, তনুর উপরি, রূপের লহরী,
যেথায় ঝল কে ঝলে,
চকিত থাকিত, লোচন যুগল,
আঁকা জনু শতদলে।
সেই সে আমার, নয়ন রোচনা,
সতত শোভনা বালা,
দিবসে নিশায়, আলোকে আঁধারে
ভাঙ্গা প্রাণ করে আলা।
শিরায় শিরায়, শোণিতে শোণিতে,
পরাণের থরে থরে,
যাহার অনুপ, মুরতি বহিয়া,
গলিত অমৃত ঝরে।
যার, আদর বাদরে, খেলিয়া বেড়াতে
হৃদয় চাতক ভোর,
পর বেদনায়, কাতর যে জন,
নয়নে ব্যথারলোর ;
সে, যেমন কাঁদিতে, তেমনি হাসিতে,
তেমনি করিতে রঙ্গ।

পরশ লাগিয়ে যাহার সতত
কেঁদে কেঁদে উঠে অঙ্গ,
ভক্তি যাহার হৃদয় মাঝারে,
উথলি উথলি ওঠে,
সাগর গরজে, রজত উচ্ছ্বাসে,
দিক দিগান্তরে ছোটে।
যার, সীমন্তে সিন্দুর, করে শঙ্খচুর
লাজে সুরভিত দেহ,
লোমচক্রে যার, সদা বাস করে
ঘন অনাবিল স্নেহ,
সেই সে আমার চোকের অঞ্জন
অসীম মমতা রাশি,
যাহার লাগিয়ে স্বর্গ উপেখিয়ে
বিশ্ব এত ভালবাসি !!
নদীর পুলিনে ধূলির উপরি
কেমনে আঁকিব তারে,
চিত্র ফলকে সে রসাল ছবি
কেহ কি আঁকিতে পারে ?
আকাশ হইতে, রাকার আকারে,
সাগরে ডুবায়ে দিয়া,
সাধ যায় মনে, অসীমতা-মাঝে
(তারে) রেখে আসি সাজাইয়া।
কাঁদ তুমি কাঁদ ফেল অশ্রুধারা,
চাঁদ নাহি কাঁদা জানে,
সে এসেছে হাসিতে, বেদনা বুঝেনা
বিলাপ শোনেনা কানে।
কেবল কেবল, অমল ধবল
তীব্র হাসির পাতি,

হাসিলেও হাসে, কাঁদিলেও হাসে
হাসিয়া পোহায় রাতি।
শুনলো উষসি, আমার সে শশী
সুখেতে উগারে হাস,
আর, পর বেদনায় কাঁদিয়া কাতরে
ফেলে ঘন ঘন শ্বাস।
তার, কোমল আঁচল বহিয়া বহিয়া
শান্তি সলিল ঝরে।
তার, কমকর তলে, প্রলেপ মাখান
হৃদয়ে মমতা ক্ষরে।
তার, কথায় অমিয় চলনে মাধুরী
ভালবাসা জাগে প্রাণে,
বিশ্ব প্রেমের, বিমল নিঝর
উছলিয়া পড়ে ধ্যানে।
জগতের যেন মর্ম্মবেদনা
টানি লয় নিজবুকে,
ছায়াময় কোলে, যত অনাথায়
আশ্রয় দেয় সুখে।
হৃদয় বীণার, তারগুলি তার
সুখে দুখে বেজে উঠে,
নয়নের জল মুছাতে আঁচলে
তীর বেগে সদা ছোটে।

শ্রীবেণোয়ারী লাল গোস্বামী।

সাহিত্য-সেবী অনাথ বন্ধু উইলিয়ম ষ্টেড।

"The union of all who love
In the service of all who suffer."

[বাল্যে দারিদ্র্য—Lowellএর কবিতা পাঠে নবজীবন—পেলমেলগেজেটের সম্পাদক—কুমারী হরণ ব্যবসায় রোধ—পরহিতে কারাবাস—বালিকারক্ষার আইন—প্রেতাত্মার আবির্ভাবে বিশ্বাস—সুলভ সাহিত্যসার প্রচার—আন্তর্জাতিক মৈত্রী স্থাপন প্রয়াস।]

পাঠক! বিলাতের সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'রিভিউ অব রিভিউস্' এর সম্পাদক মহাত্মা উইলিয়ম ষ্টেড সম্ভবতঃ আপনার নিকট অপরিচিত নহেন। কেবল যে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্য সেবক বলিয়া আজ তাহার যশঃ সর্ব্বত্র ঘোষিত তাহা নহে। তাঁহার বিশ্বজনীন প্রেম, পরার্থ পরতা, বদান্যতা, ন্যায় ও সত্যপ্রিয়তা প্রভৃতি সদ্‌গুণের নিমিত্ত তিনি সকলের নিকট বিশেষ রূপে পরিচিত। প্রবাদ আছে 'সৎসঙ্গে স্বর্গবাস'। সাধুদিগের সংসর্গে রহিলে, তাঁহাদিগের জীবনী আলোচনা করিলে তমসাচ্ছন্ন জীবনে আলোক আসে, তাই আমরা এই মহাপুরুষের মহান্ চরিত্র কাহিনী এই স্থানে আলোচনা করিব।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ইউরোপ মহাখণ্ডে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হয়। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্রোহানল প্রশমিত প্রায়,—কিন্তু তাহার উত্তাপ তখনও বেশ স্পষ্ট অনুভূত হইতেছিল। তখনও এক শ্রেণীর লোক অপর শ্রেণীর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত, এবং প্রাচীন ও আধুনিক মতের মধ্যে ঘোর প্রতিযোগীতা বর্ত্তমান। ওয়্যাগনার (Wagner) মার্কস (Marx) নির্ব্বাসিত। চতুর্দ্দিকে ঘোর আশঙ্কায় লোকের হৃদয় উদ্বেলিত কাহারও হৃদয় উচ্চ আশার আলোকে উদ্ভাসিত কাহারও প্রাণ নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে এই দুঃসময়ে মহাত্মা উইলিয়ম ষ্টেড জন্ম গ্রহণ করেন।

তাঁহার পিতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। যৎসামান্য আয়ের দ্বারা তাঁহাকে একটী বৃহৎ পরিবারের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিতে হইত, সুতরাং শৈশব হইতেই ষ্টেডকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। ১৪ বৎসর বয়সে তিনি

একটি মহাজনের আফিসে সাপ্তাহিক চারি শিলিং বা তিন টাকা বেতনে দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত হন। তাঁহার এই ঘোর দারিদ্র্যাবস্থায় আব্রাহামলিঙ্কন প্রভৃতি দরিদ্র বালকের ন্যায় তাঁহার জ্ঞানলিপ্সা অতিশয় প্রবল ছিল। তিনি যে সকল পুস্তক পাইতেন তাহা অতি যত্নের সহিত, হৃদয়ের পূর্ণ আবেগের সহিত অধ্যয়ন করিয়া, পুস্তকের সমস্ত সার চিত্তপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিতেন। বিংশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে "বয়জ্ ওন্ ম্যাগাজিন্" নামক মাসিক পত্রে অলিভার ক্রমওয়েলের জীবনী লিখিয়া এক গিনি বা ষোল টাকা মূল্যের কতকগুলি পুস্তক প্রাপ্ত হন। এই সকল পুস্তকের মধ্যে জেমস্ লাওয়েলের কাব্য গ্রন্থ ছিল। এই পুস্তক তাহার জীবনের ঘোর অমানিশায় আলোক প্রদান করিয়াছে, এই গ্রন্থ তাঁহার বড় আদরের জিনিষ। ইহা তাঁহার প্রাণের বন্ধু। যখন যেখানে যান, যেখানে থাকেন ইহা তাঁহার সঙ্গে থাকে। পূর্ব্বে বলিয়াছি ষ্টেডের পিতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন এবং তন্নিবন্ধন ষ্টেড সাহেব অতি অল্প বয়সে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে বাধ্য হন। দিবসে সমুদয় সময় তাহার প্রভুর কর্ম্মে অতিবাহিত হইত পড়িবার আদৌ অবকাশ হইত না। এইজন্য তিনি রাত্রিকালে পাঠ করিতে বাধ্য হইতেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিল, দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া আসিল, ষ্টেড চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন'; সেই কঠোর পরীক্ষার সময় লাওয়েলেয় কবিতা তাঁহার হৃদয়ে অমৃত সিঞ্চন করিল, মৃত জীবনে সঞ্জীবনী সুধা ঢালিয়া দিল।

শৈশব হইতেই মিঃ ষ্টেডের সমাজের উন্নতি করিবার ইচ্ছা বলবতী ছিল কিন্তু তাঁহার আপনার শক্তির উপর বড় বিশ্বাস ছিল না। তিনি ভাবিতেন—'সমাজের উন্নতির নিতান্ত প্রয়োজন বটে কিন্তু আমি একা কি করিব। যাহা করা একান্ত আবশ্যক তাহার তুলনায় তাঁহার ক্ষুদ্র শক্তি অতি সামান্য? এই তাহার বিশ্বাস ছিল। কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন এবং ফল না পাইলে নিরস্ত হইতেন, তখন নৈরাশ্যপূর্ণ বিরস হৃদয়ে কবি লাওয়েলের বলবিধায়িনী কবিতা পাঠ করিতেন, এবং তাহা পাঠে নবজীবন লাভ করিতেন এবং পুনরায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন।

লাওয়েলের কবিতা মহাত্মা ষ্টেডকে পরহিত ব্রতে, অনাথ ও আতুরের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিল। মিঃ ষ্টেডের আবাস গৃহের চতুর্দ্দিকে অনশন শীর্ণ, জীর্ণ মলিন বসন পরিহিত অনাথদিগের বাস ছিল। মিঃ ষ্টেড এক স্থানে বলিয়াছেন

—আমার বেশ স্মরণ হয় প্রতি রাত্রে নিউকাস্‌লের ‘অল্ সেণ্টস্’ গির্জ্জার তলে দরিদ্র ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিদিগের গৃহ দেখিয়া মনে হইত, যে সকল গৃহে স্তিমিত প্রদীপ জ্বলিতেছে, ঐ সকল গৃহে যাহারা আছে তাহাদের হৃদয় আমারি মতন সুখে স্পন্দিত হইয়া থাকে, তাহাদিগের জীবন আমারই মত ভালবাসা ও ঘৃণার দুর্ম্ম বিষাদ কাহিনীতে পরিপূর্ণ। কিন্তু তথাপি আমার ও উহাদিগের মধ্যে কত প্রভেদ! কবে আমরা সেবা ও প্রীতি দ্বারা পরস্পরে পবিত্র ভ্রাতৃ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইব, হায় সেদিন কবে আসিবে!

কর্ম্মহীন বেকার লোকদিগের দুরবস্থার প্রতি ষ্টেডের সর্ব্ব প্রথমে দৃষ্টি পড়ে। তাঁহার মনে হয় যে এই সকল ব্যক্তিদিগের অবস্থার উন্নতি সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন; তৎসম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি যাহা পাইতেন, তাহা অতি যত্নের সহিত পাঠ করিতেন। একদিন ব্ল্যাক হিথ মেণ্ডাসিটি সোসাইটী (Blackheath Mendacity Society)র কার্য্য-বিবরণী পাঠ করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই সমিতির কর্ম্মচারীদিগের নিকট এতৎ সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিয়া এক পত্র লিখেন। তৎপরে ‘নর্দার্ন ডেলি প্রেস’ নামক সংবাদ পত্রে নিউ কাস্‌লে উপরি উক্ত সমিতির শাখা স্থাপনের প্রস্তাব করিয়া একটী মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং এই মন্তব্যের একশত প্রতিলিপি প্রধান প্রধান নগরবাসিদিগের নিকট পাঠাইয়া দেন। এইরূপে তিনি জন সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং পরে ব্লাকহিথ মেণ্ডাসিটি সোসাইটী’র মত একটী সমিতি গঠনে কৃত কার্য্য হন। এই সমিতিতে কর্ম্মহীন ব্যক্তিদিগের প্রভূত উপকার হইয়াছিল। সফল প্রয়াসে উৎসাহিত হইয়া পরে তিনি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সংবাদ পত্রে এই সম্বন্ধে পত্র লেখেন। ‘নর্দার্নিকা একো’ নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদক তাঁহার রচনায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে তাঁহার পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করেন, মিঃ ষ্টেড তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া উক্ত পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিতে থাকেন এবং তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশের এক বৎসর পরে তিনি এই পত্রিকার সম্পাদক হন এবং নয় বৎসর কাল অতি সুচারু রূপে ইহা সম্পাদন করেন। পরে জনমর্লি সম্পাদিত পেলমেল্ গেজেটের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং মর্লি পার্লমেণ্টে প্রবেশ করিলে তিনি ঐ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হন। তাঁহার সম্পাদন কালে এই পত্রিকা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভাবে সম্পাদিত হইত,

তখন ইহা দরিদ্র শ্রম জীবীদিগের দুঃখে কাঁদিত এবং পরহিতানুষ্ঠান তখন ইহার প্রধান ব্রত ছিল। তিনি, এই পত্রিকায় শান্ত অথচ গম্ভীর স্বরে সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে সৎপরামর্শ দিতেন। যাহাতে দরিদ্রেরা ভাল বাসগৃহ পায় তৎসম্বন্ধে পেলমেল গেজেটে প্রধানতঃ তাঁহারই যত্নে ঘোর আন্দোলন হয়, এবং এই আন্দোলন ফলে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে রাজ সরকার হইতে এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল। এই আন্দোলনে দেশের গণ্যমান্য এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। পার্লমেণ্ট সভার সভ্য নির্ব্বাচকগণের এই বিষয়ে ক্রমশঃ দৃষ্টি পড়ে। তাঁহাদিগের যত্নে উন্নতিশীল (progressive) দলের নির্ব্বাচন হয়। নূতন সভ্যগণ যাহাতে দরিদ্রেরা ভাল আশ্রয় পায়, স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিতে পায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। এই আন্দোলন এখন ও চলিতেছে এবং আশা করা যায় যে এই আন্দোলনে বিশেষ সুফল ফলিবে।

উক্ত পত্রিকা দ্বারা আর একটী বিশেষ উপকার সাধিত হয়। কিছুকাল হইতে লণ্ডন নগরে বালিকা বিক্রয় ব্যবসায় প্রচলিত ছিল। দুঃখের বিষয় বহু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত ও সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণও এই ঘৃণিত ব্যবসায়ের পোষক ছিলেন। কতিপয় সদাশয় দেশহিতৈষী ব্যক্তি এই কুৎসিত ব্যবসা যাহাতে উঠিয়া যায়—মনে মনে ইচ্ছা করিতেন, কিন্তু তাহা করিলে কি হয়। মান মর্য্যাদার ভয়ে এবং বিশিষ্ট প্রমাণাভাবে কেহই এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইতেন না। পার্লমেণ্ট সভার সভ্যগণের মধ্যেও অনেকে এই পাপে লিপ্ত ছিলেন। এই দুই কারণে বালিকাদিগের রক্ষার জন্য পার্লমেণ্ট কর্ত্তৃক কোন আইন হয় নাই। অনেক অনুসন্ধান দ্বারা মিঃ ষ্টেড যখন জানিলেন, এই ব্যবসায় সম্বন্ধে যাহা কথিত হয় তাহা সর্ব্বতোভাবে সত্য, তাঁহার মনে হইল এই ব্যবসায় সম্বন্ধে একটা আইন বিধিবদ্ধ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, এবং তজ্জন্য এই জঘন্য ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে বিশিষ্ট প্রমাণ সংগ্রহের প্রয়োজন। কিন্তু কে এই দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। মিঃ ষ্টেড জানিতেন তাঁহার এই সদিচ্ছার প্রতিকূলে নানা বাধা বিঘ্ন বর্ত্তমান; জানিতেন যিনি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন তাঁহার পদে পদে বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা; সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার বিরোধী হইবেন, সমাজ তাহার শত্রু হইবে।

অপিচ, আইনের খুটী নাটিতে তাঁহাকে হয়ত কারাবাস করিতে হইবে! কিন্তু যাঁহার প্রাণ এই অসহায় অনাথ অবলাদিগের জন্য কাঁদিতেছিল, তিনি যে এই সকল বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া অনাথদিগকে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি! মিঃ ষ্টেড তাঁহার সুনাম, যশঃ এবং মান-মর্য্যাদা এই সকল দুঃখিনীদিগের উদ্ধারের জন্য বিসর্জ্জন দিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি যত্ন ও সতর্কতার সহিত অভ্রান্ত ও অখণ্ডনীয় প্রমাণ সকল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। যখন সমস্ত প্রমাণাদি প্রস্তুত হইল, তখন ১৮৮৫ সালে একদিন ইহার বিস্তারিত বিবরণ পেলমেল গেজেটে প্রকাশিত করিলেন। লণ্ডন চমকিয়া গেল। এই জঘন্য ব্যবসায়ের বৃত্তান্ত পাঠে জগৎ ঘৃণায় ও রোষে, ও দুঃখে স্তম্ভিত হইল। মিঃ ষ্টেডের বর্ণনা সকল মিথ্যা প্রমাণ করিবার বিশেষ চেষ্টা হইতে লাগিল। কিন্তু অবশেষে সত্যের জয় হইল, মিঃ ষ্টেডের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, বালিকাদিগের রক্ষার জন্য ফৌজদারী আইন সংশোধিত হইল। কিন্তু মিঃ ষ্টেড আইনের পারিভাষিক লঙ্ঘনের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। বীরচূড়ামণি মিঃ ষ্টেড ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, তাঁহার যে মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে ইহাতেই তাঁহার সুখ, এই সুখেই তিনি সকল যন্ত্রণা ভুলিতে পারিয়াছিলেন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার স্বপ্রতিষ্ঠিত 'রিভিউ অব্ রিভিউস্' নামক মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হয়। ইহা বেশ সুচারুরূপে মিঃ ষ্টেড কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতেছে। ইহার উদ্দেশ্য দুইটী;—প্রথমতঃ জগতের ভাল ভাল লোকের সুন্দর চিন্তা সকল কেবল মাত্র মাসিক ছয় আনা লইয়া সকলের নিকট প্রচারিত করা; দ্বিতীয়তঃ দরিদ্র-সেবক-সম্প্রদায়কে তাঁহাদের কার্য্যে সহায়তা করা ও উৎসাহ দেওয়া এবং জন-সাধারণের সামাজিক ও নৈতিক উন্নতির চেষ্টাকরা। এই দুই মহদুদ্দেশে 'রিভিউ অব্ রিভিউস্' পত্র প্রচারিত হইয়াছে এবং তাহার পাঠক জানেন ষ্টেড কেমন বীর পুরুষের ন্যায় তাহা সম্পাদন করিতেছেন।

ভারত সম্বন্ধে মিঃ ষ্টেড উদাসীন নহেন। তাঁহার প্রাণ ভারতবাসীর জন্য দুঃখে অভিভূত হয়। যখন শুনেন অনাহারে কোটী কোটী লোকের মৃত্যু হইতেছে, তখন তাঁহার পত্রিকায় ইহা প্রচারিত করেন এবং তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করেন। ভারতবাসীর অত্যাচার কাহিনী পাঠ করিয়া তাঁহার নয়ন

হইতে দরবিগলিত ধারায় অশ্রু পড়ে। আমাদের দেশের সম্পাদকগণ যদি কলহ, দ্বন্দ্ব, কুৎসারটনা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া দেশের অভাব ও অভিযোগ রাজার গোচর করেন, যদি দরিদ্রের সহিত এক হইয়া, প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া গম্ভীর অথচ ধীরস্বরে দরিদ্রের দুঃখসংবাদ জগতে ঘোষণা করেন এবং দরিদ্র সেবায় প্রাণ উৎসর্গ করেন তাহা হইলে দেশের অনেক কল্যাণ হয়। হায় সেদিন কবে আসিবে।

মিঃ ষ্টেডের অন্তঃকরণ এক সময়ে অধ্যাত্ম-তত্ত্বানুসন্ধানে নিয়োজিত ছিল। অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার ধারণা হইল যে এই তত্ত্বের দ্বারা দেশের প্রভূত মঙ্গল হইতে পারে। এই বিবেচনা করিয়া (তিনি 'বর্ডার ল্যাণ্ড' বা ইহজগতের) 'সীমান্ত ভূমি' নামক একখানি ত্রৈমাসিক পত্র প্রকাশ করেন। উহা কিছুকাল বেশ সুচারু রূপে সম্পাদিত হইয়াছিল। অধ্যাত্ম তত্ত্বসম্বন্ধে অনেক উৎকৃষ্ট ও জ্ঞাতব্য প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হয়।

মিঃ ষ্টেডের ভূত প্রেতাদি সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি Letters from Julia বা 'জুলিয়ার পত্র' নামক একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। মিঃ ষ্টেড একস্থানে লিখিয়াছেন যে জুলিয়া নাম্নী কোন রমণীর প্রেতাত্মা দ্বারা তাঁহার হস্ত পরিচালিত হইয়া উক্ত পুস্তক রচিত হয়। তিনি বলেন :—(These communications are what they profess to be real letters irom real Julia who is not dead but gone before). এই পুস্তকে আধুনিক অধ্যাত্ম তত্ত্ব বিষয়ের এবং পরলোক সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

মিঃ ষ্টেড দেখিলেন অর্দ্ধশিক্ষিত দরিদ্র ব্যক্তিগণ অর্থাভাবে ভালপুস্তক ক্রয় করিতে না পারিয়া জঘন্য পুস্তক ক্রয় করিয়া অধ্যয়ন-লালসা চরিতার্থ করে। ইহার ফলে দেশের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে, লোকে মন্দ পুস্তক পড়িয়া মন্দ হইতেছে, এবং দেশের কুরুচি দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। ভাল কাজে ষ্টেড সর্ব্বদাই অগ্রগামী। তিনি সত্তাদরে ভাল ভাল পুস্তক—সাহিত্য, কাব্য, নাটক, উপন্যাসাদি প্রকাশ করিয়া এক একখানি পুস্তকের মূল্য একপেনী বা এক আনা মূল্য নির্দ্ধারিত করিলেন। আমাদের দেশে অল্পমূল্যে ভাল পুস্তক পাওয়া যায় না। অনেকে অধিক মূল্যে ভাল পুস্তক ক্রয় করিতে না পারিয়া জঘন্য পুস্তক সকল ক্রয় করিয়া তাহাদিগের পড়িবার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। ইহাতে

তাহাদিগের রুচি বিকৃত হইতেছে। মহাত্মা ষ্টেডের ন্যায় আমাদিগের দেশের কোন সহৃদয় ব্যক্তি যদি এই রূপে ভাল পুস্তক অল্পমূল্যে প্রকাশ করেন তবে দেশের এবং সাহিত্যের কল্যাণ হইতে পারে।

মিঃ ষ্টেড বুয়ার যুদ্ধের বিশেষ বিরোধী। তাঁহার মতে এই যুদ্ধ যতশীঘ্র শেষ হয় ততই মঙ্গলকর। শান্তিপ্রিয় মিঃ ষ্টেড এই যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁহার বিখ্যাত 'রিভিউ অব্ রিভিউ' পত্রিকায় তাঁহার মত বজ্রনির্ঘোষে প্রচার করিতেছেন। তিনি স্বদেশপ্রেমিক, যাহাতে দেশের মঙ্গল হয় সে বিষয়ে কৃতসংকল্প, কিন্তু যখন তাঁহার দেশের লোক অন্যান্য জাতির উপর অত্যাচার করে, শত সহস্র বিপদ থাকিলেও তার স্বরে তাহা ঘোষণা করেন। বুয়ার যুদ্ধের অত্যাচারের একটী তালিকা করিয়া দেশবাসিগণকে অবগত করিতেছেন। বুয়ারদের সহিত যাহাতে শীঘ্র সন্ধি হয় সে বিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন। ইংলণ্ডে একদল Pro-Boers সম্প্রদায় যে গঠিত হইয়াছে তাহা প্রধানতঃ তাঁহার যত্নের ফলে। মিঃ ষ্টেড শুধু বুয়ার যুদ্ধ কেন কোন যুদ্ধের পক্ষপাতী নহেন; তিনি বিভিন্ন জাতির মধ্যে যাহাতে মিত্রতা স্থাপিত হয় তদ্বিষয়ে ঘোরতর আন্দোলন করিতেছেন এবং বিলাতের ও আমেরিকার অনেক বিশিষ্ট লোককে তাঁহার মতে আনিতে পারিয়াছেন। মিঃ ষ্টেডের যত্ন প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় এইরূপ আন্তর্জাতিক মিত্রতা স্থাপনের সময় এখনও আসে নাই। সমস্ত সভ্যজগত যখন রাজ্য বিস্তারে প্রয়াসী, যখন তাঁহারা কেহই নির্ব্বিবাদে একখণ্ড ভূমিত্যাগে সম্মত নহেন তখন শান্তির সম্ভাবনা কোথায়! যাহা হউক মিঃ ষ্টেডের উদ্যম ও যত্ন যাহাতে সফল হয় তাহা প্রার্থনীয় এবং ভবিষ্যতে যে ইহার সুফল ফলিতে পারে এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

পাঠক, দেখুন মহাত্মা উইলিয়ম ষ্টেডের জীবনী ও চরিত্র কেমন সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ। পরমেশ্বরের কার্য্য করিতে সদাই তিনি আকুল, জীবন বিসর্জ্জনেও তিনি জগতের হিত সাধনে যত্নবান্। তাঁহার হৃদয় 'আশা ও প্রীতি'তে পরিপূর্ণ। পাঠক! এই চরিত্র পাঠ করিলেও ধন্য হওয়া যায়, মন পবিত্র হয়, মনে হয় সব ছাড়িয়া ঈশ্বরের কাজ করি, তাঁহার ক্ষুধাক্লিষ্ট ছিন্নবস্ত্র অনাথ সন্তানগণের সেবা করি, তাহাদিগকে আপনার ভাই বলিয়া কোলে লই। দরিদ্রের অবস্থার উন্নতি না করিলে দেশের কি উন্নতি হইবে? দরিদ্রের অশ্রুজলে সব যে ভাসিয়া

যাইবে, তাহাদের উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে সব যে পুড়িয়া যাইবে। যদি তুমি প্রকৃত দেশ হিতৈষী হইতে চাহ, যদি তোমার প্রাণ সত্যই দেশের জন্য কাঁদে, তবে মহাত্মা ষ্টেডের সেবা ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও, অনাথ ও আতুরের সেবা কর, তাহাদিগের দুঃখ আপনার নিজের দুঃখ বলিয়া অনুভব কর, তাহাদিগের সহিত প্রীতি ও সদ্ভাব স্থাপন কর, দেখিবে করতালি ধ্বনিত সভা-সমিতি যাহা করিতে সমর্থ হয় নাই, তোমার নীরব দরিদ্র সেবায় তাহা সাধিত হইবে। যদি দেশের মঙ্গলের জন্য দল বাঁধিতে চাহ, কর্ম্মীসেবক দল বাঁধ, গরিব সেবক সন্ন্যাসী সম্প্রদায় সংস্থাপন কর।

দীনহীন নিবেদক।

ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া।

(চিত্র)

প্রথমাংশ—শ্রীশরৎকুমার রায়ের কথা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পতিপুত্রবিহীনা বিধবা রমণীর জীবনের শেষ অভিলাষ, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ভাই ফোঁটা প্রদান। সংসারে যখন নারীজাতির সুখের যবনিকা চিরদিন তরে পড়িয়া যায় তখন অভাগিনী একমাত্র ভ্রাতৃস্নেহে আকৃষ্ট হইয়া আবার সংসারে মন বাঁধিবার চেষ্টা করে। ফলতঃ নারীজাতীর হৃদয় সংসারের তিনটী বন্ধনে আবদ্ধ :—প্রথম ও প্রধান পতিপ্রেম, দ্বিতীয় পুত্রস্নেহ, তৃতীয় ও শেষ ভ্রাতৃস্নেহ। অভাগিনী বিধবার যদি এই তিনটী বন্ধনের কোন একটি বন্ধন না থাকিত, তবে তাঁহার জীবন যে কতদূর বিষময় হইত চিন্তাশীল পাঠক তাহা অনুমান করিয়া লইবেন।

পঁচিশ বৎসর বয়সে আমার একমাত্র অগ্রজ হেমনাথ রায়—সংসার ক্ষেত্রে আমার একমাত্র আশ্রয় তরু—বৃদ্ধ মাতা ও ষোড়শ বর্ষের বালিকা-পত্নী হেমলতা দেবীর বুকে ভীম বজ্রাঘাত করিয়া চিরদিন তরে ইহ সংসার হইতে কোনও পুণ্যময় দেশে চলিয়া যান। অগ্রজের মৃত্যুর পর বৃদ্ধা মা আমার এককালীন

জীবন্মৃতা হইলেন। অভাগিনীর এ কঠিন পুত্রশোক—তার পর অন্ন চিন্তা;—এই উভয় চিন্তায় দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে অভাগিনীর চিত্ত দাহ করিতেছিল। শৈশবে আমি পিতৃহীন—সুতরাং অন্ন চিন্তা চিরদিন মার হৃদয় দাহ করিয়া আসিতেছিল। তবে এতদিন—এই পাঁচ বৎসর কাল—অগ্রজ মহাশয় একটা চাকুরী করিয়া যে যৎসামান্য উপার্জ্জন করিতেছিলেন সুখে দুঃখে এক প্রকারে তাহাতেই আমাদের সংসার চলিতেছিল। সম্প্রতি ভ্রাতৃবিয়োগের পর আবার আমরা সেই ভীষণ অন্ন চিন্তায় পড়িলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমার যখন বয়ঃক্রম সবে এক বৎসর তখন আমার পিতৃবিয়োগ হয়। পিতার মৃত্যুকালে দাদার বয়ঃক্রম সপ্তদশবর্ষ মাত্র। পল্লীগ্রামে বাড়ী, সুতরাং শৈশবে লেখা পড়ার তত সুবিধা ছিল না বলিয়া দাদা তখন একটা ইংরেজী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরই তাঁহার বিদ্যালয় ছাড়িয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় বাহির হওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িল। কিন্তু বুদ্ধিমতী মা আমার নিজে শত কষ্ট সহ্য করিয়া এবং এক একখানি করিয়া আপনার অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে বড় কষ্টে দাদাকে পড়াইলেন। তিন বৎসর পরে তিনি প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। কিন্তু অদৃষ্টদোষে বৃত্তি পাইলেন না। সুতরাং তিনবৎসর পরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর বাধ্য হইয়া তাঁহাকে বিদ্যালয় ছাড়িয়া দিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় বহির্গত হইতে হইল। ইতিমধ্যে একটা সুবিধাও উপস্থিত হইল। আমাদের গ্রাম হইতে এক ক্রোশ দূরে প্রতাপপুর গ্রামে একটা উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হইল। তিনিও এই অবসরে মাসিক পঞ্চবিংশ মুদ্রা বেতনে উক্ত বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। এই সময় হইতেই আমাদের অর্থ কষ্ট ও দারুণ অন্ন চিন্তার কতকটা লাঘব হইল।

শৈশবে আমি পিতৃহীন সুতরাং বৃদ্ধা মাতা ও দাদা উভয়েই আমাকে বড় ভাল বাসিতেন। আর বলিতে কি দাদা ও মার অত্যধিক স্নেহে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমার দৌরাত্ম্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। যখন আমার বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর তখনই আমার জ্বালায় পাড়ার প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা

সতত আমার মৃত্যু কামনা করিতেছিল, কিন্তু "রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে ?"—বোধ হয় এই মহা বাক্যের সার্থকতা সম্পাদনের জন্যই আপাততঃ আমাকে কালসদনে প্রেরণের ব্যবস্থা স্থগিত রাখিলেন।

এই প্রকারে যখন আমি ছয় বর্ষে পদার্পণ করিলাম, সেই সময়ে আমার অগ্রজ, জননীর আদেশ অন্যথা করিতে না পারিয়া, হরিপুরের সর্ব্বেশ্বর শর্ম্মার একমাত্র দুহিতা হেমলতা দেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন। দাদার যখন বিবাহ হয় তখন হেমলতার বয়ঃক্রম পূর্ণ চতুর্দ্দশ বর্ষ। কি সে কি হয় জানি না,—মার দেখা দেখি, আমি বউঠাকুরাণীকে বউমা বলিয়া ডাকিতাম। বউমার শুভাগমনের পর হইতেই সহসা আমার শৈশবের চপলতা কতকাংশে দূর হইয়া গেল।

যখন বিবাহ অন্তে দাদা বউমাকে লইয়া গৃহে আসিলেন সেইদিন—সেই শুভদিন হইতে আমি বউমার নিকট হইতে এমন একটা ভালবাসা পাইতে লাগিলাম যে, বউমার সেই মধুর ভালবাসায় আমার চপলতা দূর হইয়া গেল। এতদিন বয়োবৃদ্ধির সহিত দাদা আমাকে লেখাপড়া শিক্ষার জন্য সতত কত চেষ্টা করিতেছিলেন ; কিন্তু সত্য কথা বলিতে দোষ নাই, দাদার সহস্র চেষ্টাও যত্ন আমার দুষ্টামির নিকট হার মানিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সেই আমি বউমার শুভাগমনের পর হইতে বউমার নিকট তাঁহার চেষ্টায়, অতীব যত্ন সহকারে ক, খ শিখিতে লাগিলাম। এবং অল্পদিন মধ্যে প্রথম ভাগ শেষ করিয়া দ্বিতীয় ভাগ ধরিলাম। দাদা আমার প্রতি বউমার অপার স্নেহ ও ভালবাসা দেখিয়া এবং বউমার প্রতি আমার বাধ্য বাধকতা দেখিয়া হৃদয়ে কত অপার স্বর্গসুখ অনুভব করিতেছিলেন, দাদার সেই সতত হাসিমাখা মুখখানি দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারা যাইত।

এইরূপে বড় সুখে দুই বৎসর কাটিল। তারপর বোধ হয় দরিদ্র আমরা আমাদের এই সামান্য সুখ টুকুও বিধাতার চক্ষে সহিল না, তাহাই হঠাৎ দুই বৎসর পরে চারিদিনের জ্বরে অগ্রজ মহাশয় আমাদের মায়া পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, দাদার যখন মৃত্যু হয় তখন আমার বয়ঃক্রম সবে আট বৎসর মাত্র। সেই আট বৎসর বয়সে তখনই বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, এতদিনে আমাদের জীবনের সব সুখে ছাই পড়িল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

দাদার মৃত্যুর দুইমাস পরে দাদার শ্বশুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথম সাক্ষাতে কান্নাকাটী শেষ হইলে পর দাদার শ্বশুর বউমার পিতা বউমাকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। বউমার পিতৃগৃহে যাইবার প্রস্তাব শুনিয়া মাতৃদেবী ঠাকুরাণী কাঁদিয়া ফেলিলেন। তারপর বউমার পিতার হাতে পায়ে ধরিয়া অনেক বুঝাইলেন। শেষে সুশীলা বালিকা বউমাও আমাদিগকে ছাড়িয়া পিতৃগৃহে যাইতে অস্বীকৃতা হইলে পর মা আবার মৃতদেহে প্রাণ পাইলেন।

এই প্রকারে অনেক কান্নাকাটী অনেক তর্ক বিতর্কের পর বউমা একবার তিনদিনের জন্য পিতৃগৃহে যাইয়া মাতৃ চরণ দর্শন করিয়া আসিবেন এই বলিয়া পরদিন পিত্রালয়ে যাত্রা করিলেন।

এদিকে তিনদিনের জন্য পিতৃগৃহে যাইয়া বউমার আসিতে তিনদিনের স্থানে পাঁচদিন হইয়া গেল; কিন্তু কি জানি কেন বউমা ফিরিলেন না। অন্যদিকে বউমার পিতৃগৃহে যাইবার তিনদিন পরে চারিদিনের দিন হঠাৎ বাড়ীতে মায়ের জ্বর আসিল সঙ্গে সঙ্গে প্রলাপ বকিতে লাগিলেন। মার জ্বরের অবস্থা দেখিয়া আমি ভীত হইয়া দুই দিন পরে একখানি পত্র লিখিয়া বউমাকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলাম। সাতদিনের দিন রজনী প্রভাতে বউমা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বউমাকে পাইয়া মার সেই মরণাহত বিষাদ ক্লিষ্ট বদনে আবার হাসি দেখা দিল। এদিকে বউমাও বাড়ীতে পা দিয়া মার মুমূর্ষু অবস্থা দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মার পদপ্রান্তে বসিলেন। মা বউমাকে পদতলে বসিতে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বউমাকে বুকের উপর টানিয়া আনিয়া ধীরে ধীরে অশ্রুপূর্ণ ক্ষীণ নয়নে কহিলেন—শুন মা তুমি রহিলে। গৃহলক্ষ্মী তুমি—তুমি রহিলে আর আমার শরৎ রহিল। এখন তোমার হাতে আমার শরৎকে সঁপিয়া দিলাম—দেখিও শরৎকে ভুলিও না। সংসারে তুমি ও শরৎ—উভয়েই সমান দুঃখী—উভয়ে একত্রে থাকিও; ইহাই আমার শেষ অনুরোধ আর কি বলিব—মনে করিয়াছিলাম, হেম ও শরৎ আর কুল লক্ষ্মী তুমি, তোমরা তিন জনকে সামনে বসাইয়া মনের সুখে হরিনাম করিতে করিতে একদিন গঙ্গা জলে এ প্রাণ পরিত্যাগ করিব। কিন্তু আমি পাপিয়সী আমি তাহা পারিলাম না। তাহাই আজ তোমার বিষাদ

ক্লিষ্ট কালিমাময়ী মুখ দেখিয়া হৃদয়ে আমার বিষের ডালি লইয়া মরিতে হইল। এই বলিয়া বউমার হাত দুইখানি আপনার শোক সন্তপ্ত হৃদয়োপরি সমর্পণ করিলেন। আবার আমার হাত দুইখানি বউমার হাতের উপর রাখিয়া কহিলেন "এই তোমার হাতে আমার শরৎকে দিলাম দেখিও অভাগিনী মার শেষ অনুরোধ ভুলিও না। তাহার পর আমার প্রতি স্নেহ পূর্ণ দৃষ্টি পাত করিয়া কহিলেন,—বউমা রহিলেন, বউমাকে মার মত দেখিও, যে কাজ করিলে বউমা মনে ব্যথা পাইবেন, জীবনে কখনও সে কাজ করিও না। আর তুমি বউমা,—এই পর্ণকুটিরই তোমার গৃহ, দেখিও, আপনার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনবাসিনী হইও না। সুখে হউক দুঃখে হউক,—উপবাসে হউক শাকান্নে হউক, এই পুণ্য ও পবিত্র স্বামীগৃহে বাস করিও! বিধাতা তোমাদের অদৃষ্টে দুঃখ লিখিয়াছেন, কি করিবে, পাষাণীর মত সব দুঃখ ক্লেশ সহ্য করিও? আর আমি কায়মনোবাক্যে মরিবার কালে তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মরিতেছি যে, জীবনে জগদীশ্বর—এক দিন সুখের দিন দিবেন, এবং সেই সুখের দিন মনে করিয়া বর্ত্তমান দুঃখ ভুলিতে চেষ্টা করিও! তুমি ব্রহ্মচারিণী—আশা করি চির দিন পবিত্রা ব্রহ্মচারিণীর ন্যায় জীবন কাটাইয়া আবার আমার কোলে আসিও।"

এবার মার কথায় কাঁদিতে কাঁদিতে বউমা কহিলেন,—"মা আশীর্ব্বাদ করিবেন, শরৎকুমারকে লইয়া চির-দিন মনের সুখে এই পবিত্র পর্ণকুটীরে বাস করিয়া আমরাও আদেশ পালন করিতে পারি;—আর আশীর্ব্বাদ করিবেন যে, আপনার আদেশ পালনে পরাঙ্মুখ হইবার পূর্ব্বেই যেন এ হতভাগিনী দাসীর আয়ুঃ শেষ হইয়া যায়।

এবার বউমার কথায় মার মলিন হৃদয়ে ক্ষণকালের জন্য প্রফুল্ল হাসি দেখা দিল; প্রকৃতই বউমার বালিকা বয়সের সেই কথাগুলি কত মূল্যবান্ তখন শৈশব এতদূর বুঝিতে পারি নাই, বুঝিবার শক্তিও ছিল না,—এখন বুঝিয়াছি। সংসারে অনেক ঘাত প্রতিঘাত পাইয়া এখন বেশ বুঝিয়াছি বউমার বালিকা বয়সের সেই কথাগুলি কতদূর মূল্যবান্।

সেইদিন রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃদেবী ঠাকুরাণী জন্মশোধ আমাদের মায়া পরিত্যাগ করিয়া চির দিনের জন্য চক্ষু মুদিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরা কাঁদিয়া আকুল হইলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যথা সময়ে যথা সাধ্য মার আদ্যকৃত্য সমাপন হইল। মাতৃবিয়োগের পর, বউমা, একমাত্র আমাকে আশ্রয় করিয়া সেই শ্মশানক্ষেত্রে সেই পর্ণকুটীরে বাস করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কয় মাস কাটিয়া গেল। আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসব আসিল। প্রতি বৎসর পূজার সময় পূজোপলক্ষে বউমা পিতৃগৃহে যাইতেন। এবারত পূজা আসিল; কিন্তু বউমাকে লইবার জন্য পিতৃগৃহ হইতে কেহই আসিলেন না। পিতৃগৃহের লোক লইতে না আইসার কারণ বুঝিতে না পারিয়া, বউমার হাসিমাখা মুখখানি আবার মলিন হইয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে আরও কয় দিন কাটিয়া গেল! তারপর ভ্রাতৃদ্বিতীয়া আসিল। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার কয়দিন পূর্ব্বে, একদিন রাত্রিতে আমাকে আহার করাইতে বসাইয়া, বউমা ধীরে ধীরে কহিলেন,—"শরৎ, আগামী সোমবার ভাই ফোঁটা। ভাই ফোঁটা দিতে হরিপুর যাইব মনে করিয়াছি,—তোমাকেও আমার সঙ্গে যাইতে হইবে। আগামীকল্য আমাকে কয়েকটা জিনিস কিনিয়া দিও।

ভাই ফোঁটার কথা শুনিয়া কি জানি আমার মনের ভিতর কি একটা হইয়া উঠিল। প্রতিবৎসর এমনই দিনে ভাই ফোঁটা দিবার কি একটা আনন্দ উৎসব উঠিত;—অথচ সংসারে একমাত্র আমি,—আমি শুধু সেই পবিত্র উৎসবে যোগ দিতে বঞ্চিত ছিলাম,—আমার ভগ্নী ছিল না। আজিও বউমার মুখে ভাই ফোঁটার কথা শুনিয়া মনটা বড় খারাপ হইল, মনে হইল হায় এমন দিনে আমার যদি একটি মাত্র ভগ্নী থাকিত, তবে আজি আমিও এই পবিত্র উৎসবের কত-কটা সুখ উপভোগ করিতে পারিতাম। কিন্তু বিধাতা আমায় সে সুখে বঞ্চিত করিয়াছেন। কথাটা ভাবিতে ভাবিতে, কি জানি কেন আমার মনের ভিতর 'একটা গভীর' দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হইল; অমনি সঙ্গে সঙ্গে মুখখানিও মলিন হইয়া গেল। আমার মলিন মুখ দেখিয়া বউমা স্নেহপূর্ণ মধুর স্বরে কহিলেন,—"ওকি, আমার কথায় তোমার মুখখানি মলিন হইল কেন?' হরিপুর যাইতে কি, তোমার ইচ্ছা নাই।

আমি,—"যাইব বৈ কি?"

বউমা,—"মুখ খানি, তবে এত মলিন হইল কেন?"

আমি,—"কি জানি কেন, ভাই ফোঁটার নামে, কি একটা আমার মনে দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হইল,—জানি না।"

বউমা,—"কি দুঃখ—শরৎ"। বউমার কণ্ঠস্বর স্নেহপূর্ণ—করুণাপূর্ণ। বিবাহের পর হইতে বউমা আমাকে বড় ভালবাসিতেন,—আমার শত অত্যাচার সর্ব্বংসহা মাতা বসুমতীর ন্যায় সহ্য করিতেন। এক দণ্ড আমায় না দেখিলে বউমার হাসি-মাখা মুখকমল মলিন হইয়া যাইত। আর সত্যকথা বলিতে কি, সংসারে এক মাত্র বউমার অপরিমেয় স্নেহ ও ভালবাসায় আমি মা'র শোক পর্য্যন্ত ভুলিয়া-ছিলাম। সুতরাং বউমার কথায় বিষাদভরে আমি কহিলাম,—"কি বলিব! আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বোন ভিন্ন কাহারো কি ফোঁটা দিতে নেই।" পাঠক, আর তুমি সুন্দরী পাঠিকা, আমার কথায় হাসিও না,—তখন আমার বয়ঃক্রম সবে মাত্র আটবৎসর।

এবার মধুর হাসি হাসিয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে বউমা কহিলেন,—"কেন—শরৎ।"

আমি,—"শৈশব হইতে দেখিয়া আসিতেছি প্রতি বৎসর এই ভাই ফোঁটার সময়, কি বালক কি বুড়ো সকলের কপালেই ভাইফোঁটা দেওয়া দেখি; আর তাহা দেখিয়া মনে হয়, আমার যদি একটী বো'ন থাকিত তবে তিনিও কত সুখে আমার কপালে ফোঁটা দিতেন।"

বউমা, ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—"তা, সে জন্য দুঃখ কি? ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ভগ্নীর নিকট ভ্রাতার যাহা প্রাপ্য, আমি তোমাকে তাহাই দিব।"

এবার একটু হাসিলাম,—হাসিয়া কহিলাম,—কি ফোঁটা দিবেন?

আমার কথার বউমা হাসিলেন,—"দূর পাগল, সেকথা কি বল্‌তে আছে?"

আমি নিরাশ হৃদয়ে কহিলাম,—"তবে, কি দিবেন?"

বউমা—"কেন, ফোঁটায় কি আছে? তবে ফোঁটার দিন ভগ্নী ভাইকে খাইবার জন্য যেসব মিঠাই মিষ্টান্ন খাইতে দিয়া থাকেন—আমিও ঠিক তেমি ক'রে খাবার জিনিস দিব।"

বউমার কথায় মনে বড় রাগ হইল, আমি কি কোন দিন মেঠাই খাই নাই যে, আমি তাহারই জন্য ব্যস্ত। শেষে অভিমান ভরে কহিলাম,—"কি, আমি কি কোন দিন সন্দেস খাই নাই, যে, সেই জন্য ব্যস্ত হইয়াছি।" শৈশব হইতে যেমন আমি একগুঁয়ে ছিলাম, অন্য দোষ অভিমানটাও বড় বেশী ছিল। আমার

অভিমান দেখিয়া প্রেমময়ীর পবিত্র হৃদয়ে স্নেহের মন্দাকিনীস্রোত প্রবাহিত হইল। অনেকক্ষণ, আপনার মনে আপনি কি ভাবিলেন; তারপর হাসিয়া কহিলেন,—"অত অভিমান কেন,—শরৎ; আচ্ছা, আমি তোমায় ফোঁটা দেব।"

এবার বউমার কথায় মনের অপ্রসন্নতা সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়া গেল। তখন প্রফুল্ল মুখে কহিলাম,—"আচ্ছা, যাহা তোমার দরকার, আগামী কল্য বলিবে,—কিনিয়া আনিয়া দিব"। এই বলিয়া আহার শেষ করিলাম।

* * *

পর দিন প্রাতে উঠিয়া, একে একে বউমার প্রয়োজনীয় জিনিস,—সন্দেস বাতাসা প্রভৃতি কিনিয়া আনিয়া দিলাম। আহারান্তে বউমা আপনার হাতে পরম যত্ন সহকারে গৃহেও নানা প্রকারের জলখাবার প্রস্তুত করিলেন। তারপর,—পর দিন ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার প্রভাতে সেই সব সহকারে আমাকে সঙ্গে করিয়া যাত্রা করিলেন। সোহাগীর স্বামী লালমোহন,—আমাদের সঙ্গে চলিল। (ক্রমশঃ)

কবিতা-স্তবক।

১। তুমি।

তুমি, নয়নে আমার, তরল নীলিমা
উজ্জ্বল জ্যোতিহার,
তুমি, পরাণে আমার শান্তি সুধারা
শুভ্র সুষমা-ভার।
তুমি, শিরাতে আমার আকুল শোণিমা
নিবিড় মাধুরী মম
তুমি, ভুবনে আমার অতুল গরিমা
স্নিগ্ধ নীরদ সম।
তুমি, বিরাগে আমার বিভোর বাসনা
বিস্মৃতি ব্যথামাঝে,
তুমি, জনমে মরণে চিরদিন মোর সাথী,
দেবতার সাজে!

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

২। তুমি।

তুমি, আমার আকুল পরাণ পাথারে
অতুল রতন রাশি,
তুমি, আমার দুখানি অধর-কুসুমে
সরমের সুধাহাসি!
তুমি, আমার প্রেমের আবেশ-অতলে
প্রীতির লহর মালা,
তুমি, আমারি গগণে, তরুণ অরুণ
স্নিগ্ধ প্রণয়-আলা।
তুমি, সকলি আমার, ইহ পরকালে
সাধনার ধন মম!
তুমি, শোণিতে শিরাতে গাঁথা চিরকাল
চিরজ্যোতি প্রিয়তম!

শ্রীতমাললতা বসু।

বুয়র জাতির ইতিহাস।

তৃতীয় অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ডচ সেনাপতি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে কাফিরদিগের বিশেষ কিছু অপরাধ ছিলনা সুতরাং তিনি পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার কাফিরদিগের সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিলেন। ডাচ বার্গারগণ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট এই মর্ম্মে আবেদন করিলেন, তাঁহারা যে সৈনিক-পুরুষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন তাঁহাকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিয়া কাফিরদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে এবং কাফিরদিগের বাসস্থান হইতে তাহাদিগকে দূরীভূত করা হউক। কিন্তু এবার ও গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন। গবর্ণমেণ্ট বিলক্ষণ জানিতেন যে, শ্বেতাঙ্গদিগের নিষ্ঠুরাচরণই কাফেরদিগকে যুদ্ধার্থ উত্তেজিত করে। সুতরাং নীচাশয় এবং স্বার্থপরায়ণ গবর্ণরগণ ভিন্ন ন্যায়পরায়ণ গবর্ণর যুদ্ধার্থ অনুমতি প্রদান করিতেন না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপে ঘোর সংগ্রামানল প্রজ্বলিত হয়। জগদ্বিখ্যাত ফরাসি বিপ্লব এই সময় সমুপস্থিত হইল।

এই ফরাসি বিপ্লবের প্রভাবে নেথারল্যাণ্ডবাসিগণও উত্তেজিত হইয়া উঠিল, তাঁহারা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। ফরাসি বিপ্লবের সহিত যাহাদিগের সহানুভূতি ছিল তাহারা (Patriot) পেট্রিয়ট নামে আখ্যাত হইলেন। রাজার পক্ষ অবলম্বনকারী দল অরেঞ্জ নামে অভিহিত হইলেন। বীরকুলতিলক নেপোলিয়নের সৈন্যাধ্যক্ষ পিসগ্রু (Pichegreu) পেট্রিয়ট দলের সাহায্যার্থ ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে নেথারল্যাণ্ডে প্রবেশপূর্ব্বক নেথারল্যাণ্ডের ষ্টাড হোল্ডার কে অর্থাৎ রাজা উইলিয়মকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন। রাজ্যচ্যুত হইয়া উইলিয়ম ইংলণ্ডে পলায়ন করিলেন। তাঁহার ইংলণ্ডে অবস্থান কালে ইংরাজগণ তাঁহার নিকট কেপ কলোনি পাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। তিনি তাহাদিগের প্রার্থনানুসারে কেপ কলোনি প্রদেশ ইংলণ্ডেশ্বরকে প্রদান পূর্ব্বক তদ্দেশবাসী ডাচদিগকে ইংলণ্ডের আধিপত্য স্বীকার করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার লিখিত আদেশ সহ ১৭৯৫ সালের জুন মাসে সামুদ্রিক

সেনাপতি আডমিরল্ এলফিনষ্টোন (Admiral Elphinstone) এবং স্থলযোদ্ধা মেজর জেনারেল ক্রেগ (Major General Craig) কেপ কলোনিতে ইংরাজ অধিকার স্থাপনার্থ প্রেরিত হইলেন। উপনিবেশবাসীগণের ফরাসি দিগের প্রতি সহানুভূতি ছিল। তাঁহারা রাজ্যচ্যুত উইলিয়মের আদেশ অমান্য করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। ইত্যবসরে মহাবীর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট তাহাদিগের সাহায্যার্থ যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণ করিলেন। পরন্তু নেপোলিয়নের প্রেরিত সৈন্যদল সালডানহাপ উপসাগরে পরাজিত হইল। উপনিবেশবাসীগণ ও নিরুপায় হইয়া অনিচ্ছা পূর্ব্বক ইংরাজদিগের আধিপত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। এই প্রকারে কেপকলোনি প্রদেশ ইংলণ্ডেশ্বরের রাজ্যাধীন হইল।

চতুর্থ অধ্যায়।

কেপ কলোনিতে ইংলণ্ডের অধিকার স্থাপন।

কেপ কলোনি প্রদেশে ইংলণ্ডের অধিকার স্থাপনের সময়ে সমগ্র উপনিবেশ চারিভাগে বিভক্ত ছিল। ইহার এক এক খণ্ডে এক এক জন ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট (Land dorst) শাসন করিতেন। এই চারিটি খণ্ড বা ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে কেপ ডিষ্ট্রিকেটই ডাচ্ গণ সর্ব্বপ্রথমে উপনিবেশ স্থাপন করেন; আর তিনটি ডিষ্ট্রিক্ট; অর্থাৎ ষ্টেলেন্ বস্ (Stellen bosch) স্বোয়েলেন ডাম (Swellen dam) ও গ্রাফ্ রিণেট (Graaff Reinct), তাঁহারা অন্যায়াচরণ পূর্ব্বক আদিম অধিবাসী দিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া ধীরে ধীরে অধিকার, করিয়া ছিলেন।

উপনিবেশবাসী ডাচ, এবং ফরাসীদিগের আচার ব্যবহার ইংরাজদিগের আচার ব্যবহার হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। এই জন্যই উপনিবেশ বাসীদিগের সহিত ইংরাজদিগের বিশেষ সদ্ভাব সংস্থাপিত হয় নাই।

উপনিবেশবাসীগণ ইংরাজদিগকে স্বার্থপরায়ণ, অহঙ্কারী, আত্মম্ভরী এবং মিথ্যাবাদী বলিয়া মনে করিতেন। ইংরাজগণ ও উপনিবেশবাসীদিগকে অশিক্ষিত জ্ঞানহীন, অসভ্য এবং প্রবঞ্চক মনে করিয়া ঘৃণা করিতেন।

রাজস্ব কিম্বা ট্যাক্স প্রদানে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ এবং প্রকৃত অবস্থা গোপন

ডাচ্‌গণ নীতি বিরুদ্ধ মনে করিতেন না, পক্ষান্তরে জাতীয় কলঙ্ক গোপন এবং স্বজাতীয় লোকের উপকারার্থ সত্যের অপলাপ করিতে ইংরাজেরা কখনও কুণ্ঠিত হয়েন না। ঈদৃশ অবস্থায় পরস্পর পরস্পরকে মিথ্যাবাদী বলিবার স্পষ্ট কারণ রহিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ডাচ্‌গণ অশিক্ষিত হইলেও, আত্মনির্ভর, স্বকার্য্য সাধনার্থ অধ্যবসায়, আতিথ্য এবং সহিষ্ণুতা ইত্যাদি সদ্গুণ তাহাদিগের আচার ব্যবহারে সর্ব্বদাই পরিলক্ষিত হয়।

উপনিবেশ অধিকার করিবার পর ইংরাজগণ কেপ ডিষ্ট্রিক্টের রাজধানী কেপ টাউনে সৈন্য স্থাপন করিলেন; সুতরাং কেপ ডিষ্ট্রিক্ট এবং ষ্টেলেন বস্ ডিষ্ট্রিক্টের অধিবাসীগণ তাহাদিগের আধিপত্য স্বীকার করিলেন।

অপর দুইটী দূরস্থিত ডিষ্ট্রিক্টের বার্গারগণ প্রথমে ইংরাজদিগের অধীনতা স্বীকার করেন নাই, অধিকন্তু গ্রাফ্‌রিণেট ডিষ্ট্রিক্টের বার্গারগণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত বারম্বার চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই।

১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে হলণ্ডের সাধারণ তন্ত্র, আডমিরাল লুকাসকে নয়খানি রণতরী সহ কেপ কলোনির উদ্ধারার্থ প্রেরণ করিলেন, কিন্তু তিনিও যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন।

জেনারেল ক্রেগ কেপ কলোনির গবর্ণরের পদ গ্রহণ করিয়া ডাচদিগকে বশীভূত করিবার অভিপ্রায়ে সর্ব্বদা তাহাদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিতেন। কিন্তু স্বাধীনতাপ্রিয় ডাচগণ অন্য জাতীয় লোকের অধীনতা দুর্ব্বিষহ মনে করিতে লাগিলেন।

এদিকে কেপ কলোনি ইংরাজ অধিকৃত হইবার সংবাদ ইংলণ্ডে পৌঁছিলে ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ জনৈক সম্ভ্রান্ত লোককে এই প্রদেশের শাসন ও সংরক্ষণের সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা প্রদান পূর্ব্বক গবর্ণরের পদে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় করিলেন। তাঁহাদিগের প্রস্তাবানুসারে ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর পুরাতন কর্ম্মচারী আরল্ অব মেকার্টনি কেপকলোনীর গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হইলেন। আরল্ অব মেকার্টনি সকল বিষয়ই অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক ছিলেন। উপনিবেশ বাসীদিগের মধ্যে যাঁহারা ইংরাজ শাসনে কিছুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন মেকার্টনি তাহাদিগকে বিদ্রোহী বলিয়া দণ্ড প্রদানে উদ্যত হইতেন। তিনি সমুদয় বার্গারদিগকে ইংলণ্ডেশ্বরের অধিকার স্বীকার পূর্ব্বক শপথ

করিতে আদেশ করিলেন, যাহারা আদেশ অনুসারে উপস্থিত হইল না, এবং যাহারা শপথ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইল, তাহাদিগকে তিনি সৈনিক বলপ্রয়োগ পূর্ব্বক শপথ গ্রহণ করিতে বাধ্য করিলেন।

দেড় বৎসর পরে আরল্ অব মেকার্টনি শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মেজর জেনারল ফ্রানসিস্ ডাণ্ডাস প্রতিনিধি গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হইয়া ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়াছিলেন। তৎপরে সার জর্জ্জ ইয়ং গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হয়েন। সার জর্জ্জ ইয়ং স্বয়ং উৎকোচ গ্রহণ না করিলেও তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণ উৎকোচ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থিত হইলে তিনি অনতিবিলম্বে কেপ কলোনি পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার পরিবর্ত্তে মেজর জেনারল ডাণ্ডাস পুনর্ব্বার গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ফ্রান্স এবং নেথারল্যাণ্ডের মধ্যে আমিন নগরে সন্ধি সংস্থাপিত হয়। এই সন্ধি দ্বারা ইংরাজগণ কেপকলোনি প্রদেশ বটেভিয়া সাধারণ তন্ত্রকে প্রত্যার্পণ করিলেন।

এই কয়েক বৎসর ইংরাজদিগের অধিকার কালে কেপ কলোনির অন্তর্গত গ্রাফ্ রিণেট ডিষ্ট্রীক্টের আড্রিয়ান ভান জারসরেনড নামক জনৈক বার্গারের বিরুদ্ধে জাল করিবার অভিযোগ উপস্থিত হইলে তদুপলক্ষে কয়েকজন ডাচ রাজবিদ্রোহী হইয়া ছিল। এতদ্ভিন্ন ইহাদিগের কাফিরদিগের সহিতও একবার সংগ্রাম হয়। এই সকল কাফির-যুদ্ধের প্রকৃত ঘটনা ইংরাজ ইতিহাস লেখকেরা প্রায়ই গোপন করিয়া থাকেন। কিন্তু লণ্ডন মিসনারী সোসাইটীর কার্য্য বিবরণী ও ফিলিপ সাহেবের পুস্তকে ইহার বিস্তারিত বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বে সান্ডে (Sunday) নদীর পার্শ্ববর্ত্তী ভূমিও কাফ্রিদিগের ছিল। এই ভূমি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হইতে বারম্বার কাফের যুদ্ধ সমুপস্থিত হইতে লাগিল। থেনের ইতিহাসে এই যুদ্ধ তৃতীয় কাফের যুদ্ধ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন মিসনারী সোসাইটী কর্ত্তৃক দক্ষিণ আফ্রিকায় খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক প্রেরিত হয়েন। ইঁহারা সর্ব্বদাই আদিম অধিবাসীদিগকে নিষ্ঠুরাচরণ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিয়াছেন। ধর্ম্মান্ধ রাজপুরুষেরা মনে করেন যে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারকদিগের দ্বারা রাজ্য শাসনের অনেক ব্যাঘাত হইয়াছে। কিন্তু

এই ধর্ম্ম প্রচারক দিগের শান্তি সংস্থাপন চেষ্টা এবং তাঁহাদিগের সদ্ব্যবহারই শ্বেতাঙ্গদিগকে কাফিরদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

ডাচ গবর্ণমেণ্টের অধিকার পুনঃস্থাপন।

কেপ উপনিবেশে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ডাচ্ গবর্ণমেণ্ট পুনঃ স্থাপিত হইল। ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই বিলুপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং কেপ উপনিবেশের শাসন ও সমর রক্ষণের ভার নেথার ল্যাণ্ডের ষ্টেটস্ জেনারল (পার্লিয়ামেণ্ট) গ্রহণ করিলেন। ষ্টেটস্ জেনারেল কর্ত্তৃক মিষ্টর জেকব ডি মিষ্টর হাই কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইয়া কেপ কলোনিতে আগমন পূর্ব্বক, জেনারেল ভাণ্ডার্শের নিকট হইতে কেপ কলোনির ভার গ্রহণ করিলেন, ১৮০৩ সালের ১লা মার্চ্চ জন উইলিয়ম জান্সিনকে কেপকলোনির গবর্ণরের পদ প্রদান করিলেন, উপনিবেশবাসিগণ ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ ভিন্ন জাতির শাসন হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রতিবৎসর এই শুভদিন উপলক্ষে ধর্ম্মমন্দিরে গমন পূর্ব্বক ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

রাজনীতি ও ব্যবহার শাস্ত্রে ডিমিষ্ট বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি প্রজা বৃন্দের সুশাসনার্থে ব্যবস্থাপক সভা এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সংস্থাপন করেন।

ইংরাজ শাসনাধীনে রাজবিদ্রোহী বলিয়া যে সকল ডাচগণ বন্দী হইয়া ছিলেন ডিমিষ্ট কর্ত্তৃক তাঁহারা সকলেই কারামুক্ত হইলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার আদিম অধিবাসীগণের মধ্যে যে সকল হটেণ্টটকে ইংরাজেরা সৈন্য দলভুক্ত করিয়াছিলেন তিনি তাহাদিগকে বাসোপযোগী ভূমি প্রদান পূর্ব্বক ডাচ সৈন্য দলভুক্ত করিলেন। কোসা নামক কাফির দলের সহিত ভাবী বিবাদ নিবারণার্থ ডিমিষ্ট ফিস্‌ক্ নদীর অপর পার্শ্বের সমুদয় ভূমি তাহাদিগকে প্রত্যার্পন করিয়া ফিস্‌ক্ নদী পর্য্যন্ত কেপ কলোনির সীমা অবধারণ করিলেন।

এই সময়ে কেপ কলোনি প্রদেশে প্রায় পঞ্চবিংশ সহস্র শ্বেতাঙ্গ এবং ত্রিংশৎ সহস্র অসিতাঙ্গ ক্রীতদাস বাস করিতেছিল, কিন্তু এই ত্রিংশৎ সহস্র ক্রীতদাস ভিন্ন অন্যূন বিংশ সহস্র হটেণ্ট এবং বুসম্যান জাতীয় লোক শ্বেতাঙ্গগণের দাসত্বে নিযুক্ত ছিল। এই শেষোক্ত অধিবাসীগণ ক্রীতদাস না হইলেও শ্বেতাঙ্গগণ ইহা-

দিগের প্রতি ক্রীতদাস অপেক্ষাও অধিক নিষ্ঠুরাচরণ করিতেন। এই দুর্ভাগ্য হটেণ্টটগণের এবং অন্যান্য অত্যাচার নিপীড়িত আদিম নিবাসীগণের উপকারার্থ, লণ্ডন মিসনারী সোসাইটি প্রেরিত খৃষ্টীয়ধর্ম্ম প্রচারক ভাণ্ডার (Vander kemp) ডাচ্ গবর্ণর জান ভান সেনের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক আলগোয়া উপসাগরের উপকুলে বেথেলসডর্প নামে ক্ষুদ্র একটী নগর সংস্থাপন পূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। বহুসংখ্যক হটেণ্টট এই নব প্রতিষ্ঠিত নগরে আশ্রয় প্রাপ্ত হইল।

ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গগণের মধ্যে অনেক লোক নামে খৃষ্টান কিন্তু ব্যবহারে নরপিশাচ। উপনিবেশ বাসী ডাচ্ বার্গার গণের কুলি কিম্বা শ্রমোপজীবীর প্রয়োজন হইলে তাঁহারা সর্ব্বদা মিসনারী দিগকে তাঁহাদের প্রচার মণ্ডলী হইতে হটেণ্টট প্রেরণ করিতে লিখিতেন। প্রচারকেরা হটেণ্টট শ্রমজীবী প্রেরণ করিতে অসমর্থ হইলে তাহাদিগকে ম্যাজিষ্ট্রেটগণ তিরস্কার পূর্ব্বক ভয় প্রদর্শন করিতেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারক ডাক্তার ভাণ্ডর কেম্প গবর্ণরের নিকট লিখিলেন যে ডাচ বার্গরগণ এবং কৃষকগণ শ্রমোপজীবী হটেণ্টট দিগের প্রতি যেরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করেন, তাহাতে তিনি বিবেকের আদেশ লঙ্ঘন না করিয়া বার্গরদিগকে কার্য্যার্থ হটেণ্টট প্রেরণ করিতে পারেন না* বিশেষতঃ হটেণ্টটগণ অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া বিচার প্রার্থী হইলে ম্যাজিষ্ট্রেটগণ কখনও সুবিচার করেন না।

স্বার্থপর শ্বেতাঙ্গগণ মিশনারীদিগের প্রতিবাদের প্রত্যুত্তরে সর্ব্বদাই বলিতেন যে অসিতাঙ্গদিগের মানসিক এবং আধ্যাত্মিক অবস্থা সমুন্নত করিবার উপায় নাই। যাহাদের আত্মাই নাই তাহাদের কিরূপে আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে? কিন্তু কেবল স্বার্থপরতা এবং ধন লোভের বশীভূত হইয়াই তাঁহারা এই প্রকার অলীক মত প্রচার করিতেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বহু সংখ্যক হটেণ্টট খৃষ্ট চরিত্রের মধুরতা দর্শনে মোহিত হইলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে আবার কেহ

* On the 18th april 1804 Dr. Vander Kemp had written to the Governor Stating that his Conscience would not permit him any longer to encourage Hottentots to enter the service of the farmers because of the cruelty and injustice with which they were treated, without any relief being afforded them by the Magistrates. (vide Philips researches of South Africa Vol. 1, page 103.4).

খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে আত্ম সমর্পণ করিলেন। পরন্তু ইঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা মিশনরি দ্বিগের প্রদত্ত সংশিক্ষার প্রভাবে ধর্ম্ম প্রচার করিবার উপযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহাদিগকেও ডাচ্ বার্গরগণ শ্রমোপজীবীর প্রয়োজন হইলে দাসের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসেই আবার বটেভিয়া সাধারণ তন্ত্র ফরাসি ও স্পেন একত্র হইয়া ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এই সংগ্রাম উপলক্ষে ইংরাজগণ যে পুনর্ব্বার কেপকলোনি প্রদেশে অধিকার স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইবেন তাহা কেপ কলোনির গবর্ণর জনসন পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি পূর্ব্ব হইতেই সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী ইংরাজ সেনাপতি মেজর জেনেরল ডেভিড বেয়ার্ড সাত সহস্র সৈন্য সহ টেবিল উপসাগরের প্রবেশ দ্বারে রবেন দ্বীপের পশ্চিম পার্শ্বে তাঁহার রণতরী স্থাপন করিলেন, ব্লুবর্গে ইংরাজদিগের সহিত ডাচদিগের সামান্য যুদ্ধ হইল; এই যুদ্ধে ডাচগণ পরাজিত হইলেন। কেপকলোনিতে পুনরায় ব্রিটিশ নিশান সমুত্থিত হইল এবং ব্রিটিশ সিংহের গর্জ্জনে পুনরায় কেপ নিনাদিত হইতে লাগিল।

আবার পূজা আসিল।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

"In all ages of the world, among all peoples, from the Savage to the *most highly* civilised, *images* have been used in religious worship, and among the latter as a help in meditation. From local and *temporary* causes this use has been thrown aside by three *small minorities*, but even then in appearance rather than in reality. Thus for about three and a half-centuries a small minority of Christians have discarded the use of images but this is a mere temporary reaction from the superstitions which had grown up in connection with

their use" * * * Now whenever a practice is found thus universal and persistent we may be sure that some fact in nature is its root and that it should be understood & *purified if necessary, not destroyed.*" Mrs. Annie Besant "In Defence of Hinduism—*Idolatry*."

"To the common Protestant mind the dignities ascribed to the Madonua have been always a violent offence, they are one of the parts of the Catholic faith.—But after the most careful examination, I am persuaded that the worship of the Madonna has been one of its (Catholicsm's) noblest and most vital graces and has never been otherwise than productive of true holiness of life and purity of character.—I am certain that to the *habit of reverent belief in and conemplation of character ascribed to the heavenly hierarchies*, we must ascribe the highest results yet achieved in human nature, *and that it is neither Madonna—worship nor Saint-worship, but the evangelical Self-worship and hell-worship*, which have in reality degraded the languid powers of Christianity to their present state of shame and reproach."

Ruskin's Fors Clavigera.

আবার পূজা আসিল। আবার "বিকচ পদ্ম—মনোজ্ঞবক্ত্রা," "সোন্মাদ হংসরবনূপুরনাদরম্যা," "আপকশালিরুচিরা"—শরৎ, নবীনা বধুর ন্যায় উপস্থিত হইল। আবার বিশাল পুলিনশালিনী—চঞ্চলতরঙ্গিণী—মন্থর-গমনে চলিতে লাগিল। আবার শরতের সুখময় শান্তি হেমন্তের হেমময় শস্যের সহিত বিজড়িত হইল। আবার শারদীয় পূর্ণিমার পূর্ণশশী, নির্ম্মল শরতের সুবিমল আকাশে—শোভা পাইল। আবার সুমধুর সুমিষ্ট—শারদী—ভৈরবী-রাগিণী—সুস্নিগ্ধ শান্তিময় শারদীয় প্রভাতে, "সুরূপা, সুনেত্রা, কোমলাঙ্গী, শ্বেতবসনা, রক্তবর্ণা, গলশোভিত চম্পকমালা, প্রফুল্ল পদ্মযুক্ত পর্ব্বত গুহায় শিবপূজাপরায়ণা, অল্পবয়স্কা সুন্দরী ভৈরবী" কর্ত্তৃক—কোমল সকরুণস্বরে গীত হইল।—আবার শেফালিকা—শতদল করবী চম্পক কেতকী, মল্লিকা ফুটিল, আবার শরৎকাল, সুজলা সুফলা বর্ষার বুকভরা আশা লইয়া, শীতের সোহাগ ও আদরকে জাগাইয়া তুলিল।—আবার দুঃখিনী, মলিনা বঙ্গভূমি, দুর্গোৎসবে

ক্ষণিক সুখের আশায় ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া উঠিল। স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমিঃ,—আজ ক্লিষ্ট, সহস্রাধিক দুঃখ ও অভাবে পীড়িত, আজ দুর্গোৎসবে কেবলমাত্র অতীত-আনন্দ-সুখ-গৌরবের ম্লান স্মৃতি লইয়া উপস্থিত।

পূজা আসিল সত্য; কিন্তু পূর্ব্বেকার সে সহৃদয়তা কোথায়; সে ভক্তি শ্রদ্ধা, অনুরাগ কোথায়; সে প্রীতি ভালবাসা কোথায়;—সে আনন্দ কোথায়।—হতভাগ্য বঙ্গদেশ হইতে আনন্দ যেন কোথায় পালাইয়া গিয়াছে। স্বার্থপরতায়, বিলাসে, আনন্দ বাড়ে না; কমিয়াই যায়।—তাই পূজার সময় দেখি কি?—দেখি কৃতীবাবু পূজার আসরে নিজের স্ত্রী ও পুত্রকন্যা দিগকে সাজাইতে নিতান্ত ব্যস্ত ও ব্যাকুল; স্ত্রীর জন্য সল্‌মাচুম্‌কি বসান ৫০৲ টাকার পার্শী সাড়ী, নিজের ছেলে মেয়েদের জন্য সল্‌মাচুম্‌কি খচিত ভেলভেটের পোষাক আসিল! দূরে দরিদ্র ভগিনী ভাগিনেয়দের কথা, দরিদ্র ভাই ও ভাইপো-দের বিষয় একবার ও মনে উদিত হইল না। পূজার সময় তাহাদের হয় ত পূজার কাপড় ও জুটিল না। হয় ত ক্ষুদ্র ভগিনীটি ভাবিতেছে তাহার কৃতী ডেপুটী ডাক্তার বা উকিল ভাই, এই পূজার সময় তাহাদের ভগ্নী ও ভাগ্নেদের খোঁজ খবর লইবেন। চতুর্থী পঞ্চমী ষষ্ঠী গত হইল, কিন্তু তাহাদের কোন খোঁজ খবর কেহ লইল না। তখন সেই ক্ষুদ্র, স্নেহ মাখা পিতৃ মাতৃ হীন দুঃখিনী ভগ্নীটী গত বৎসরের পুরাণ মলিন কাপড় কয়েক খানি নিজে সাবান দিয়া ধুইয়া, শুখাইয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে ছেলে মেয়েদের পরাইয়া তাহাদিগকে পূজা দেখিতে পাঠাইল। সত্য কথা বলিতে কি সেই কৃতী বাবুটী তাঁহার স্ত্রীর ভগ্নীর জন্য জরি বসান বিশ টাকার মিহিন ঢাকাই শাড়ী প্রেরণ করিলেন।—এখন পূজার সময় দেখি কি?—দেখি, পূজার সময় বাড়ী গেলে ও হয়, না গেলেও হয়, ভ্রাতা ভগিনীদের সহিত দেখা করিলেও হয়, না করিলেও হয়। এখন পূজার সময় শৈল বিহারে, মদ্য মাংসে শরীরটা কিঞ্চিৎ তাজা ও গোলগাল করিতে পারিলে পূজার ছুটীর সার্থকতা সম্পাদিত হইয়া থাকে।—আর যদি এই পূজার সময় কৃতি বাবুদের স্ত্রী দিগের খোঁজ লও তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, যে তাঁহাদের মধ্যে একটি বিপুল মহতী চেষ্টা হইতেছে যে কে কত, অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া, কে কত সাজিয়া গুজিয়া, অহঙ্কারে হেলিয়া দুলিয়া, গরিবকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া, এই পূজার সময় বাহার দিতে পারেন।—তবে বড় পরিতাপের বিষয়, যে, সুখের

জন্য রাম বাবুর স্ত্রী এত বেশ ভূষা সাজ গোজ করিলেন তাহা সুখ আনয়ন না করিয়া কেবল অসুখের কারণ হইল। ঐ যে শ্যামবাবুর স্ত্রীর নেকলেস্‌টী বড়ই চমৎকার ও হরি বাবুর স্ত্রীর ব্রেসলেটটী বড়ই ভাল। সুতরাং রামবাবুর স্ত্রীর রাত্রে আর ভাল ঘুম হইল না, সকাল বেলা মেজাজটা বে-আন্দাজ গরম হইয়া উঠিল। পূজার আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হইল। হতভাগ্য রামবাবুর বৎসরব্যাপী পরিশ্রমের টাকা-কড়ী ভস্মে ঘৃতাহুতি হইল মাত্র। আগে সামান্য কাপড় পরিয়া এবং গরিব ভাই ভগ্নী আত্মীয় স্বজন বন্ধুকে পরাইয়া, নিজের ছেলেমেয়েদের যৎসামান্য বেশভূষণায় সাজাইয়া, আত্মীয় স্বজন ও দশজন গরিব লোককে খাওয়াইয়া, কত আনন্দ হইত। আর আজ কাল সাধারণ বলয়ের পরিবর্ত্তে, অসাধারণ ও অপূর্ব্ব ব্রেস্‌লেট্, সামান্য সরু হেলেহারের স্থানে মণি মুক্তা খচিত নেক্‌লেসেও তেমন সুখটী হইতেছে না।

পাঠক, বলিতে পার কি কেন এমনটী হইল? বলিতে পার কি, পাঠিকা, বঙ্গের কুলবালা,—যাঁহাদের লইয়া অমরা এত গৌরব করি,—কেন এত হীন মলিন হইয়া পড়িলেন? অতীব ক্ষোভের সহিত বলিতে হইতেছে, যে আমাদের গৃহিণীরা আর পূর্ব্বের ন্যায় লক্ষ্মীরূপিণী নহেন। আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা আর মধুর কোকিল মৃদুস্বরা স্নেহপ্রীতিভরা' নহেন। আজ তাঁহারা নবদ্বীপের ন্যায়-চুঞ্চু। আজ, হায়! 'সাবিত্রী' সীতানুধায়িনী, দুখে-দীনা-দাসী, প্রেমিকা, নীরবা, নিঠুর-ভাষে, পীড়নে প্রিয়-ভাষিণী বঙ্গ গৃহ লক্ষ্মীরা সব কোথায়? অশ্রু সিক্ত নয়নে বাধ্য হইয়া লিখিতে হইতেছে, যে এক্ষণে তাঁহারা বিগতলক্ষ্মী বঙ্গভূমি হইতে অন্তর্হিতা।

আজ বঙ্গপত্নী স্বার্থ-দাস ধর্ম্মহীন স্বামীর অধর্ম্মের সহায়। গর্ব্ব সর্ব্বস্ব বাক্য-ভাণ্ড হিন্দুয়ানী-অভিমানী বাঙ্গালীর জানা কর্ত্তব্য যে বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে। স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবু বলিয়া গিয়াছেন যে, "পিতা এখন My dear father—অথবা বুড়ো বেটা। মাতা, বাপের পরিবার, বড় ভাই, জ্ঞাতি মাত্র। শিক্ষক, মাষ্টার বেটা। পুরোহিত, চাল কলা-লোলুপ ভণ্ড" পাঠক, কেন এমনটী হইল এবং ইহার প্রতিকারের উপায়ই বা কি?—পূজা আসিয়াছে; পূজার সময় এই সব বিষয়ের আলোচনা করা যুক্তি সিদ্ধ বিবেচনা করি।

যিনি যাহাই বলুন, আমাদের দেশে, ধর্ম্ম ভাব ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়িতেছে। হিন্দু ধর্ম্মের বিচারশূন্য ভক্তি-শ্রদ্ধা বিহীন অনুষ্ঠানে প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্ম লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে. প্রত্যেক শিক্ষিত হিন্দুর প্রথমে জানা উচিত যে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্ম কি এবং কাহাকে বলে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার গীতায় বলিয়া গিয়াছেন যে "ধর্ম্ম প্রাণীগণকে ধারণ করে বলিয়া ধর্ম্ম নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব যদ্দ্বারা প্রাণীগণের রক্ষা হয় তাহাই ধর্ম্ম"। তুমি হয় তো বলিবে যে, এই কৃষ্ণোক্ত গীতাব্যাখ্যাত ধর্ম্ম, ইউরোপীয় হিতবাদ ধর্ম্ম। হইতে পারে, তাহাতে ক্ষতি কি? তুমি বলিতে পার, হিন্দু ধর্ম্মের বিশেষত্ব কি বা বিশিষ্ট লক্ষণ কি? বিপুল বিশাল সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের চরম পরিণতির ইতিহাস কি?

হিন্দু ধর্ম্ম বিভিন্ন সময়ে বিবিধ আকার ধারণ করিয়াছে। আমাদের সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন হিন্দু ধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ইহার যত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা কেবল ইহাকে সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন করিবার চেষ্টার ফল। ইহার প্রথম স্তরে বৈদিক ধর্ম্ম। এই আদিম বৈদিক ধর্ম্মে শক্তিশালী উপকারী ও সুন্দরের উপাসনা বিদ্যমান আছে। সচরাচর উপাস্যের সহিত সাধারণ উপাসকের যে সম্বন্ধ, বৈদিক ধর্ম্মে উপাস্য উপাসকের সেই সম্বন্ধ ছিল। "হে ঠাকুর, আমার প্রদত্ত এই সোম রস পান কর, হবি ভোজন কর, আর আমাকে ধন দাও, সম্পদ দাও, পুত্র দাও, গোরু দাও শস্য দাও, আমার শত্রুকে পরাস্ত কর।" বড় জোর প্রার্থনা করিলেন আমার পাপ নাশ কর। বৈদিক ধর্ম্মে আনন্দ ভাগ যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সতের ও চিত্তের উপাসনার অর্থাৎ জ্ঞান ভক্তি ও ধ্যানের অভাব ছিল। বৈদিক যুগের শেষাংশে কাম্য কর্ম্ম যাগ যজ্ঞের দৌরাত্ম্যে ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বিলুপ্ত হইল। প্রতিভা সম্পন্ন মুনি ঋষিগণ বুঝিতে পারিলেন যে এই জগতের ভিতরে একটী অনন্ত অজ্ঞেয় কারণ আছে। বৈদিক যাগ যজ্ঞের অত্যাচারে চার্ব্বাকাদি সম্প্রদায় প্রচার করিলেন কর্ম্মকাণ্ড সকলই মিথ্যা সত্য কেবল 'খাও দাও নৃত্য কর—মনের সুখে' তাহার পর শাক্যসিংহ বলিলেন কর্ম্ম ফল মানি বটে কিন্তু কর্ম্ম হইতেই দুঃখ; কর্ম্ম হইতেই পুনর্জ্জন্ম; অতএব বিষয় লালসা তৃষ্ণা দূর কর; চিত্ত সংযত কর, কর্ম্মের ধ্বংস কর; এবং অষ্টাঙ্গ ধর্ম্ম পথ দিয়া নির্ব্বাণ লাভ কর। বৌদ্ধ ধর্ম্মে উপাসনা নাই।

বৌদ্ধেরা সৎ মানিতেন না, এবং তাঁহাদের ধর্ম্মে আনন্দও ছিল না। তৎপরে হিন্দু দার্শনিকের দ্বারা তৃতীয় বিপ্লব সংঘটিত হইল! 'তাঁহারা প্রায় ব্রহ্মবাদী। তাঁহারা দেখিলেন যে জগতের যে অনন্ত কারণভূত চৈতন্যের অনুসন্ধানে তাঁহারা প্রবৃত্ত, তাহা অতিশয় দুজ্ঞেয়। সেই ব্রহ্ম জানিতে পারিলে সেই জগতের অন্তরাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ, এবং জগতের সঙ্গেই বা তাঁহার বা আমাদের কি সম্বন্ধ, তাহা জানিতে পারিলে, বুঝা যাইতে পারে, যে এ জীবন লইয়া কি করিতে হইবে। সেটা জানা কঠিন তাহা জানাই ধর্ম্ম। অতএব জ্ঞানই ধর্ম্ম—জ্ঞানেই নিঃশ্রেয়স। বেদের যে অংশকে উপনিষদ বলা যায়, তাহা এই প্রথম জ্ঞানবাদীদিগের কীর্ত্তি। ব্রহ্ম নিরূপণ এবং আত্মজ্ঞানই উপনিষদ সকলের উদ্দেশ্য। ছয় দর্শনে এই জ্ঞানবাদ আরও বিবর্দ্ধিত ও প্রচারিত হইয়াছে। কপিলের সাংখ্যে ব্রহ্ম পরিত্যক্ত হইলে ও সে দর্শনশাস্ত্র জ্ঞানবাদাত্মক। দর্শনের মধ্যে কেবল পূর্ব্ব মীমাংসা কর্ম্মবাদী—আর সকলেই জ্ঞানবাদী।'

উপনিষদের ধর্ম্ম—চিন্ময় পরব্রহ্মের উপাসনা তাহাতে জ্ঞানের ও ধ্যানের অভাব নাই, কিন্তু আনন্দ ভোগের জন্য সেই জ্ঞান ও ধ্যানময় ধর্ম্মে কোন ব্যবস্থা নাই। 'উপরোক্ত ধর্ম্মের একটীও সচ্চিদানন্দ প্রয়াসী হিন্দু জাতির মধ্যে অধিক দিন স্থায়ী হইল না। বঙ্কিম বাবু যথার্থই বলিয়াছেন যে, বেদ উপনিষদ এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের সার ভাগ লইয়া পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম সংগঠিত হইয়াছে, এবং এই পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম্মে সৎ, চিৎ, এবং আনন্দের উপাসনা প্রচুর পরিমাণে আছে। বিশেষ আনন্দ ভাগ বিশেষ রূপে পরিস্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম্মই জাতীয় ধর্ম্ম হইবার উপযুক্ত এবং এই কারণেই সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন হিন্দু ধর্ম্মকে অন্য কোন অসম্পূর্ণ বিজাতীয় ধর্ম্ম স্থানচ্যুত বা বিজিত করিতে পারে নাই। উপনিষদ বেদান্তের ধর্ম্ম সর্ব্ব সাধারণের উপযোগী হইতে পারে না। আমরা সান্ত শরীরী সগুণ মনুষ্য; নিরাকার নির্গুণ ঈশ্বরের কল্পনা করিতে অক্ষম। মুখে বলিতে পারি বটে ঈশ্বর 'নিরাকার' নির্গুণ কিন্তু তাহাতে বুঝি কি? মুখে বলিতে পারি বটে যে 'সোনার পাথরের বাটি' বা 'গোলাকার চতুষ্কোণ গোলক; কিন্তু

ইহাতে বুঝি কি ? মুখে কোন বিষয় বলিতে পারিলেই তদ্বিষয়ের অনুভব বা উপলব্ধি হইল এমন নহে। কেহ কেহ এ প্রকার ও বলিয়া থাকেন, যে যে প্রকৃত নির্গুণ 'বাদী তাহাকে নাস্তিক বলিলেও হয়। তবে জ্ঞান বাদীরা 'মায়া' নামে ঈশ্বরের একটী শক্তি কল্পনা করিয়া থাকেন! এই মায়াই জগৎ সৃষ্টির কারণ এই 'মায়ার জন্যই আমরা ঈশ্বর কে জানিতে পারি না। সাধন ভিন্ন এই জ্ঞান জন্মিতে পারে না। শম দম উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা এই ছয় সাধনা; ঈশ্বর ভিন্ন অন্য বিষয় হইতে অন্তরিন্দ্রিয় ও বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ ও নিরোধ, মনের একাগ্রতা ধ্যান ধারণা তপস্যাদি, এই সকল প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থা জ্ঞানবাদী যোগীদিগের জন্য বিহিত হইতে পারে। তুমি আমি সাধারণ ব্যক্তি যাঁহাদের মন নিয়ত সংসারে আবদ্ধ, সংসারিক কোলাহলে বিচলিত ও বিচঞ্চল, জীবন সংগ্রাম ও অর্থোপার্জ্জনে উদ্বিগ্ন, ইন্দ্রিয়াদি সম্ভোগ বিষয় লালসায় কলুষিত; এবম্প্রকার দুর্ব্বল স্বল্পমতি ও মন্দবুদ্ধির জন্য কখনই নিরাকার ঈশ্বরের পূজা সম্ভবপর বা বিহিত বা ফলদায়ক হইতে পারে না। নির্গুণ নিরাকারের উপাসনা, বিশিষ্ট যোগী ঋষির উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু সাধারণের পক্ষে এ প্রকার উপাসনা বিহিত হইতে পারে না। আমরা যেমন সান্ত ও শরীরী, হৃদয়ের পূজা ও ভক্তি সাকার শরীরী ঈশ্বরকেই দিতে উৎসুক।* কেহ বা ঈশ্বরের স্থাপিত প্রতিমাকে কেহ বা ঈশ্বরের স্বয়ংব্যক্ত প্রতিমাকে পূজা করিয়া থাকেন। সকলেই জানে যে স্থাপিত প্রতিমা ঈশ্বর নহেন। উপাসনা ও আরাধনার সুবিধার জন্য, চঞ্চল মনের একাগ্রতা সম্পাদনের জন্য, চঞ্চল মনকে ঈশ্বরাভিমুখী করিবার জন্য, জড়ে ঐশী শক্তি কল্পিত হইয়াছে।† গারুড় পুরাণে স্থাপিত প্রতিমা ও স্বয়ংব্যক্ত প্রতিমা উল্লি-

* "Our conception of the Deity is then bounded by the conditions which bound all human knowledge and therefore we can not represent the Deity as he is but as he appears to us"—Mansel's Metaphysics—Herbert Spencer নির্গুণ ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরকে "Some thing higher than personality" কল্পনা করিয়াছেন।

† "In meditation an idol forms a point on which mind can be concentrated and after a few moments of steady gazing the eyes should be closed and the image reproduced by the mind and the attention fastened to it. As the mind grows steady the form disappears and the indwelling life pervades the consciousness and filling it with life and joy." Mrs. Annie Besant.

খিত হইয়াছে। পৌরাণিক ধর্ম্মে, স্থাপিত ও স্বয়ংব্যক্ত প্রতিমা পূজা সম্মিলিত হইয়াছে। যাঁহারা ভাবুক ও কবি তাঁহারাই কেবল ঈশ্বরের স্বয়ংব্যক্ত প্রতিমা উপলব্ধি করিতে পারেন। দূরে গম্ভীর পর্ব্বত মালা, আকাশে সুন্দর চন্দ্রমা, জ্যোৎস্নায় পর্ব্বত উপত্যকা অধিত্যকা ভাসিয়া যাইতেছে, মলয় মারুৎ সুগন্ধ বিতরণ করিতেছে, জ্যোৎস্না স্নাত নদী তরতর করিয়া বহিয়া যাইতেছে। এক জন ভাবুক বা কবি বা যোগীর নিকট এই সৌন্দর্য্যমণ্ডিত জগৎ ঈশ্বরের স্বয়ংব্যক্ত প্রতিমা বলিয়া প্রতীয়মান হইবে ; এবং সেই কবি বা ভাবুক বা যোগী হয়তো গাহিয়া উঠিবেন—

"প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে
এ বিশ্ব নিখিল তোমারি প্রতিমা ?
মন্দির তোমার কি গড়িব মাগো !
মন্দির যাঁহার দিগন্ত নীলিমা।
তোমার প্রতিমা শশী, তারা, রবি,
সাগর, নির্ঝর, ভূধর, অটবী,
নিকুঞ্জ ভবন, বসন্ত পবন
তরু, লতা, ফল, ফুল, মধুরিমা।
সতীর পবিত্র প্রণয়-মধু, মা !
শিশুর হাসিটি জননীর চুমা,
সাধুর ভকতি, প্রতিভা, শকতি;
—তোমারি মাধুরী তোমারি মহিমা
যেই দিকে চাই এ নিখিল ভূমি—
শতরূপে মাগো বিরাজিত তুমি
বসন্তে, কি শীতে, দিবসে নিশীথে,
বিকশিত তব বিভব গরিমা।
তথাপি মাটীর এ প্রতিমা গড়ি,'
তোমারে পূজিতে চাই, মা ঈশ্বরী
অমর কবির হৃদয় গভীর
ভাষায় যাহার দিতে নারে সীমা ;

খুঁজিয়ে বেড়াই অবোধ আমরা,
দেখিনা আপনি দিয়েছ মা ধরা,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে, হাতটী বাড়ায়ে,
ডাকিছ নিয়ত করুণাময়ী মা।"

(শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পাষাণীতে যোগীদিগের গান)

কিন্তু এ সংসারে হায় ভাবুক কবি বা যোগী কয়জন, সহস্রের ভিতর একজনও মেলে কি না সন্দেহ? তাই পৌরাণিক মুনি ঋষি দেখিলেন যে ঈশ্বরকে এমন ভাবে সকলের সম্মুখে দিতে হইবে, যাহা সকলে বুঝিতে পারে এবং যাহার আরাধনায়, উপাসনার প্রবৃত্তিগুলি ঈশ্বরাভিমুখী হয়। তাই পৌরাণিকেরা বলিয়া দিলেন যে বেদান্তানুসারে ঈশ্বর অতীন্দ্রিয় এবং নিরাকার। তবে যে সকল লোক নিরাকার ঈশ্বরকে অবলম্বন করিতে অসমর্থ তাহাদিগের ধর্ম্মোন্নতির জন্য, ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় আকারবিশিষ্ট কল্পিত ও বর্ণিত হইয়াছেন।*

বেদান্ত ও উপনিষদের মতে ঈশ্বর সর্ব্বজীবে সর্ব্বলোকে সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান। ভগবান বৃক্ষেও আছেন পাথরেও আছেন স্থাপিত প্রতিমাতেও আছেন। যদি কেহ ঈশ্বরকে বাদ দিয়া অর্থাৎ ঈশ্বরকে পূজা না করিয়া গাছ কিম্বা পাথরকে পূজা করে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই অজ্ঞ ও মূর্খ। কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি সেই বৃক্ষে নিহিত ঈশ্বরকে পূজা করে তাহা হইলে সে ঠিক পূজাই করিতেছে বলিতে হইবে। মূর্ত্তি পূজা তখনি খারাপ ও ক্ষতিকর যখন অন্তর্নিহিত প্রতিষ্ঠিত প্রাণকে পূজা না করিয়া বাহ্যিক আকারকে পূজা করা হয়।†

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বেদান্ত উপনিষদের ধর্ম্ম নিতান্ত কঠোর শুষ্ক ও আনন্দ বিহীন, ইহাতে জ্ঞান ও ধ্যানের প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ভক্তি আনন্দ-

* টেলরসাহেব বলেন যেখানে Spiritual Beings অর্থাৎ দেবদেবী সম্বন্ধে বিশ্বাস আছে সেইখানেই Religion বিদ্যমান বেদশাস্ত্রের Divine man such as Sri Ram or Sri Krisna কিম্বা *Beings* such as Durga and Laxmi এবং রস্কিনের *Heavenly Hierarchies* টেলরের উপরোক্ত মতটি সমর্থন করিতেছে।

† Another fact on which idolatry is based is that God is the one life, the only life. He is everywhere and in everything and therefore can be worshipped in anything. A tree, a stone. may serve as a physical representation of God. If a man worship a tree or a stone as itself he is ignorant, if he worship God in the tree or stone, he is wise and worships rightly. It is idolatry in the bad sense to worship a form instead of the indwelling life; it is idolatry in the good sense to worship God in every thing and love Him in all objects."—Mrs. Annie Besant.

উচ্ছাসের আয়োজন নিতান্ত স্বল্প। জ্ঞান ও কর্ম্মের ভিতর দিয়া ঈশ্বরের উপাসনা নিতান্ত কঠিন। প্রকৃতোপাসনা ভক্তি প্রসূত। মন ভক্তিরসে পরিপ্লুত হইলেই ঈশ্বরের উপাসনা আরাধনা আপনি উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে। কিন্তু এই ভক্তি কেমন করিয়া কোথা হইতে আসে এবং তাহার কি আয়োজনই হিন্দুধর্ম্মে সূচিত হইয়াছে। পৌরাণিক ধর্ম্মে ভক্তির ভাগ যথেষ্ট আছে, এবং ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ, প্রেম, ভক্তি,—(অর্থাৎ শাণ্ডিল্য সূত্রের "সা (ভক্তি) পরানুরক্তিরীশ্বরে।) বিশিষ্টরূপ সম্প্রসারিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে সগুণ ব্রহ্মেরই উপাসনা সম্ভব। বেদান্তসার-কর্ত্তা সদানন্দাচার্য্য উপাসনা শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—উপাসনানি সগুণব্রহ্মবিষয়কমানসব্যাপাররূপাণি শাণ্ডিল্যবিদ্যাদীনি।" সুতরাং গুণানুবাদ বা উপাসনা সগুণ ব্রহ্মেরই সম্ভব। নির্গুণের উপাসনা হইতে পারে না। এই গুণানুবাদ বা উপাসনা, কখন কোন প্রকার অবস্থায় এবং কোন উপায়ের দ্বারা সহজে স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে, তাহার আয়োজন ও অনুষ্ঠান পৌরাণিক ধর্ম্মে বহুল পরিমাণে পরিলক্ষিত হইবে। যাহার প্রতি অনুরাগ নাই তাহার আমরা গুণানুবাদ বা উপসনা করি না। কোন্ উপায়ে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বা অনুরাগ জন্মিতে পারে? অনুরাগ নানা কারণে জন্মিতে পারে। কিন্তু সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ জনিত যে অনুরাগ তাহা মনুষ্যের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। সৌন্দর্য্যাদির পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা নির্ম্মল ও অতুলনীয় আনন্দ অনুভব করি; এবং এই সৌন্দর্য্যগ্রাহিতার সম্যক্ অনুশীলন করিলে সচ্চিদানন্দময় জগৎ এবং জগন্ময় সচ্চিদানন্দের সম্পূর্ণ স্বরূপ অনুভব করিতে পারি। এই সৌন্দর্য্যের বিকাশ ও তাহার আরাধনা পৌরাণিক ধর্ম্মে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে পৌরাণিক ধর্ম্মে অধিকাংশের পক্ষেই উপযোগী। হিন্দুরা সকলের জন্যই ভাবিতেন। সেই কারণেই সর্ব্ব সাধারণের জন্য পঞ্চম বেদ মহাভারত রচনা করিলেন। চারিবেদ শূদ্র স্ত্রীলোকের অনধিগম্য; কিন্তু হিন্দুরা দেখিলেন জাতীয় শিক্ষার পথ অবরুদ্ধ হইলে ক্রমে সমাজ ও জাতির অবনতি হইবে, তাই ব্রাহ্মণ মুনি ঋষিরা স্ত্রীলোক শূদ্র ও ইতর শ্রেণীর শিক্ষার জন্য, সর্ব্বজন মনোহর হিন্দুর জ্ঞানরাশির ভাণ্ডার, হিন্দুধর্ম্মের সার

সঙ্কলন, সহজবোধগম্য মহাভারত প্রণয়ন করিয়া দুরদর্শিতার ও উদারতার একশেষ দেখাইলেন। যে ভগবদ্গীতা হিন্দুদিগের জ্ঞান ও বুদ্ধি ও ভক্তির বিশিষ্ট পরিচায়ক, এবং যে গীতাব্যাখ্যাত ধর্ম্ম অনুশীলন করিলে, পরম মঙ্গল নিঃশ্রেয়স লাভ করা যায়, তাহাই আপামর সাধারণের শিক্ষা ও সুখের জন্য মহাভারতে অনুপ্রবিষ্ট হইল। যেমন আপামর সাধারণের শিক্ষার জন্য মহাভারত রচিত হইল তেমনি বেদ উপনিষদ বৌদ্ধ ধর্ম্মের সার-সঙ্কলন সর্ব্বজন প্রীতিকর, সহজ লভ্য ঈশ্বর-ভক্তি-সৌন্দর্য্য-আনন্দ-পূর্ণ, শরীরী পৌরাণিক ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠাপিত হইল। অবশ্য স্বীকার করি পৌরাণিক ধর্ম্মে অনেক আবর্জ্জনা জমিয়াছে, অবশ্য তাহা বর্জ্জন করিতে হইবে। জাতীয় পৌরাণিক ধর্ম্ম, সংস্করণ সাপেক্ষ হইলেও,—আমূল উৎপাটিত হইবার বিষয় নহে; এবং তাহা হইবারও সম্ভাবনা নাই। বুদ্ধির তারতম্য, শিক্ষাভেদ, চরিত্র ভেদ, ধারণা ভেদ চির-কালই থাকিবে; সুতরাং অধিকাংশের পক্ষে পৌরাণিক ধর্ম্ম, পৌরাণিক প্রতিমা-পূজা চিরকালই থাকিবে। ধর্ম্ম একটী বস্তু হইলেও জেলখানা নহে, যে তাহার একটীমাত্র দ্বার বা ফটক আছে। মহাভারতে শান্তি পর্ব্বে কথিত আছে যে "ধর্ম্মের অসংখ্য দ্বার। যে কোন প্রকারে হউক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে উহা কদাপি নিষ্ফল হয় না।"

স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায় মহাজনোদ্ধৃত-মান্যটীকা-টীপ্পনি-বিশিষ্ট পুরাণাদি শাস্ত্র মান্য করিতেন; এবং পৌরাণিক প্রতিমা পূজাও আংশিকভাবে সমর্থন করিয়াছিলেন। পরম শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রবাবু, তদ্‌রচিত মূল্যবান পুস্তক রাজা রাম-মোহন রায়ের জীবন চরিতে লিখিয়াছেন, যে রাজা রামমোহন রায় বলিয়াছেন যে পুরাণাদি শাস্ত্র বেদান্তানুসারে ঈশ্বরকে অতীন্দ্রিয় ও নিরাকার বলেন। তবে যে সকল মন্দবুদ্ধি লোক নিরাকার পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিতে অসমর্থ তাহা-দিগকে ধর্ম্মহীনতা এবং দুষ্কর্ম্ম হইতে রক্ষা করিবার জন্য, ঈশ্বরকে মনুষ্যের ন্যায় আকারবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এই সকল কল্পিত দেবতাদিতে ঈশ্ব-রের উদ্দেশ হইলে, এবং ধর্ম্মবিষয়ে যত্ন ও শাস্ত্রাভ্যাস করিলে, ক্রমে যথার্থ জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা থাকে।" নগেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, যে "রাজা রামমোহন রায়, জনসমাজে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য, শাস্ত্রের আবশ্যকতা অনুভব করিতেন; এবং আরও বলিয়াছেন যে কেবল ব্যক্তিগত জ্ঞান ও ইচ্ছা প্রবল হইলে সমাজ

উৎসন্ন যইবে; অর্থাৎ এমন কিছু চাই, যদ্বারা সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির শিক্ষা ও শাসন হইতে পারে। তবে তিনি শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে গিয়া দেখিতেন, যাহাতে যুক্তি বিরুদ্ধ কিছু স্বীকার করা না হয়। ৮ রাজা রামমোহন রায় আরও বলেন, যে যাহাতে লোকের মঙ্গল হয়, তাহা সার্ব্বভৌমিক হইলেও উহাকে জাতীয় আকারে পরিণত করিয়া কার্য্য করা আবশ্যক।

কেবল সার্ব্বভৌমিকতা শক্তিহীন। এ বিষয়ে হিগেল প্রচারিত সমাজতত্ত্ব এবং ক্রমবিকাশ মূলক সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের সহিত রাজার একমত।" যে রাজা রামমোহন রায়ের সমাজ সম্বন্ধে, শাস্ত্র সম্বন্ধে পুরাণ সম্বন্ধে এবম্প্রকার মত, তিনি যে বর্ত্তমান ব্রাহ্ম সমাজের অর্থাৎ নববিধান এবং সাধারণ সমাজের স্থাপয়িতা তাহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। রাজা রামমোহন রায় যে ট্রষ্ট ডিড্ দ্বারা ১৮৩০ সালে ধর্ম্ম-সভা সংস্থাপন করেন, তাহার কোনস্থানে এ প্রকার বলেন নাই, যে "শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, মূর্খ কি পণ্ডিত তোমরা সব এক নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা কর।" তিনি ট্রষ্ট ডিড্ এ কেবল এই মাত্র ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে তৎস্থাপিত সভায় বা সমাজে নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা হইবে, যাঁহার ইচ্ছা তিনি আসিতে পারেন। আমরা যতদুর বুঝিতে পারিয়াছি তাহা এই মতই বদ্ধমূল হয় যে, রাজা রামমোহন রায় কেবল মাত্র শিক্ষিত অধিকারীর নিমিত্ত জ্ঞান ও ধ্যানময় উপনিষদ বেদান্ত সম্মত নিরাকার উপাসনার প্রচার করিয়া গিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায় বিশিষ্ট প্রতিভাশালী, দুর-ও-বহুদর্শী ছিলেন।—রাজা রামমোহন রায় হিন্দু-সমাজের হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থাশূন্য ছিলেন না। তিনি জাতীয় ভাব ও রুচি—সম্মান করিতেন। তিনি বিশেষরূপ বুঝিয়াছিলেন যে হিন্দুসমাজের ও হিন্দুধর্ম্মের সংস্করণ প্রয়াসীদিগের হিন্দুসমাজে থাকিয়া হিন্দুধর্ম্মের সংস্করণ করিতে হইবে। তিনি হিন্দুসমাজও হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই এবং হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুসমাজের বাহিরে গিয়া একটী অভিনব সমাজ, "ব্রাহ্মসমাজ" স্থাপন করেন নাই। তিনি আমরণ উপবীত ধারণ করিয়াছিলেন, কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ বেদীতে বসিয়া বেদ পাঠ করিবে ইহার অনুজ্ঞা ও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ ইহাও বলিয়া থাকেন যে রাজা রামমোহন রায়ের সমাজে যে ঘরে

বেদ পাঠ হইত সে ঘরে শূদ্রের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল।—রাজা রামমোহন রায়ের পরবর্ত্তী "নববিধান" সম্প্রদায় এবং 'সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ রামমোহন রায়ের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিলেন না। তাহার ফলে হইল কি? তাঁহারা নিজের সমাজেরও কিছু বিশেষ উন্নতি করিতে পারিলেন না এবং হিন্দু-সমাজ ও ধর্ম্মেরও বিশেষ কিছু উপকারে আসিলেন না। এই ব্রাহ্ম-সমাজ সম্বন্ধে বাবু প্রমথনাথ বসু (B.'sc. Lond., F. G. S., & M. R. A. S.) তাহার সারবান ও উৎকৃষ্ট পুস্তক "History of Hindu civilisation under British Rule এ যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"According to the census cf 1891 the Bramhos number altogether 3051, of whom no less than 2,056 belong to Bengal. Bramhoism has been shewing signs of decline. The Adi Bramha sect which was founded by Raja Rammohan Ray & revived by Devendranath Tagore has now well-nigh merged into Neo-Hinduism The Progressive Bramha sect founded by Keshub ch sen has now dwindled into a small body torn by internal dessensions. Several of the most zealous of the Sadharan Bramho Samaj, the strongest body of the Bramhas at the present day, have recently gone back towards Neo'Hinduism."—

শ্রদ্ধাস্পদ নগেন্দ্রবাবু নিজে আমাদিগকে বলিয়াছেন যে ব্রাহ্ম সমাজের ধর্ম্ম সাধারণের (mass) জন্য উপযোগী নহে।—"ব্রাহ্মধর্ম্ম" ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের উপযোগী উপাসনার আরাধনার পদ্ধতি হইতে পারে কিন্তু কখনই হিন্দুর জাতীয় ধর্ম্ম হইতে পারে না।—তাই বলিতেছি যে কেবল পৌরাণিক ধর্ম্ম জাতীয় ধর্ম্ম হইতে পারে।—তাই এস আমরা গীতার ধর্ম্মকে মূল ও কেন্দ্র করিয়া পৌরাণিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠানসমষ্টিকে ভাল করিয়া বুঝিয়া, দরকার হয় সংস্কৃত করিয়া আমরা সকলে পূজার্চ্চনায় মন দিই।—শুধু গীতা পাঠ করিলে চলিবে না। গীতার ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া স্ত্রীলোক, ছেলেমেয়ে, ও সাধারণের সহিত মিলিয়া মিশিয়া, পৌরাণিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে।—যদি আমরা গীতা-ব্যাখ্যাত 'ধর্ম্মে'র মর্ম্ম ঠিক উপলব্ধি করিতে পারি, এবং সেই মতানুসারে কার্য্য করিতে সক্ষম হই এবং জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া, গীতাখ্যাত

'ধর্ম্মের' মর্ম্মের আলোকে অশেষ সৌন্দর্য্যশোভাসমন্বিত পৌরাণিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠানগুলিকে উদ্ভাসিত করিতে সক্ষম হই তাহা হইলে অচিরে জাতীয় উন্নতি সংসাধিত হইবে। তাই প্রভূত প্রতিভাশালী স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবু তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে বলিয়াছেন যে "যদ্দ্বারা লোকরক্ষা বা লোকহিত সাধিত হয়, তাহাই ধর্ম্ম, আমরা যদি ভক্তিসহকারে এই কৃষ্ণোক্তি হিন্দুধর্ম্মের মূলস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুজাতির উন্নতির আর বিলম্ব থাকে না। তাহা হইলে, যে উপধর্ম্মের ভস্মরাশি মধ্যে, পবিত্র এবং জগতে অতুল্য হিন্দুধর্ম্ম প্রোথিত হইয়া আছে, তাহা অল্পকালে কোথায় উড়িয়া যায়। তাহা হইলে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কুক্রিয়া, অনর্থক সামর্থ্য ব্যয়, ও নিস্ফল কালাতিপাত, দেশ হইতে দূরীভূত হইয়া সৎকর্ম্ম ও সদনুষ্ঠানে হিন্দুসমাজ প্রভাবিত হইয়া উঠে। তাহা হইলে ভণ্ডামি, জাতি মারামারি, পরস্পারের বিদ্বেষ ও অনিষ্টচেষ্টা আর থাকে না। আমরা মহতী কৃষ্ণকথিতা নীতি পরিত্যাগ করিয়া, শূলপাণী ও রঘুনন্দনের পদানত লোকহিত পরি ত্যাগ করিয়া তিথিতত্ত্ব মলমাসতত্ত্ব প্রভৃতি আটাইশ তত্ত্বের কচকচিতে মন্ত্রমুগ্ধ। যদি এখনও আমাদের ভাগ্যোদয় হয়, তবে আমরা সমস্ত হিন্দু একত্র হইয়া "নমো ভগবতে বাসুদেবায়" বলিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রণাম করিয়া, তদুপদিষ্ট এই লোক হিতাত্মক ধর্ম্ম গ্রহণ করিব। বেন্থামের কথা ইংলণ্ড শুনিল—কৃষ্ণের কথা ভারতবর্ষ শুনিবে না?"

হে দুর্গে, দুর্গতিনাশিনি, মঙ্গলদায়িনি কল্যাণময়ি, নারায়ণি, অবনত পীড়িত মলিন ব্যথিতা দুঃখিনী বঙ্গভূমি, আজ এই 'মহোৎপাতে, মহারোগে মহাবিপদে সঙ্কটে,—মহাদুঃখে মহাশোকে মহাভয়সমুত্থিতে—" তোমাকে ডাকিতেছে; তুমি আমাদিগকে পৌরাণিক ধর্ম্মে মতি দেও। হে ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদা, সর্ব্বকামফল প্রদা, প্রসন্নবদনা দেবী—"আমাদিগের হাত ধরিয়া জাতীয় ধর্ম্মোন্নতির পথে লইয়া চল, পতিত বঙ্গভূমিকে উদ্ধার কর। কেমন করিয়া তোমাকে অন্তরের সহিত পূজা করিতে হয় শিক্ষা দেও।—আবার পূজা আসিল। মা দুর্গা তুমি আমার হৃদয় মন্দিরে একবার দেখা দেও।

আশ্বিন, ১৩০৮। শ্রীশিবনাথ বেদান্তবাগীশ এম্ এ।

হাসির গান।

"সালসা খাও।"

দেশটা দেখ যাচ্ছে ভরে ম্লেচ্ছ আর নাস্তিকে,
হচ্ছে সবে তুল্য পাপী, দিচ্ছে তারে শাস্তি কে,
মানছে না কেউ শাস্ত্রগত মিথ্যা ও কি সত্যং,—
ধর্ম্ম যদি রাখতে চাও, প্রত্যুষেতে প্রত্যহ
সালসা খাও।

[কোরস]
সালসা খাও ভগ্নী ভাই, বন্ধু গুরু শিষ্য,
সালসা খাও রাত্রিদিবা, বর্ষায় কি গ্রীষ্মে,—
সালসা খাও।

দুর্ভিক্ষে খাদ্যাভাব দেখ্‌লে দুর্ব্বৎসরে,
নাইক যবে মাংস আর ধান্য আর মৎস্যরে;
পাচ্ছনাক কোথা কিছু খাদ্য নাম গন্ধেও,
বাঁচতে চাও?—বাঁচবে সবে,—নাইক কোন সন্দেহ,—
সালসা খাও।

[কোরস]
সালসা খাও ভগ্নী ভাই, বন্ধু, গুরু শিষ্য,
সালসা খাও রাত্রিদিবা, বর্ষায় কি গ্রীষ্মে,—
সালসা খাও।

কন্যাদায়ে বিব্রত যে কচ্ছে মেয়ে পক্ষকে,—
সম্বন্ধ হচ্ছে যেন খাদ্য আর ভক্ষকে;
কন্যা বড় দেখলে যবে নিন্দা করে নিন্দুকে,
শূন্য সম দেখ্‌বে যবে সংসারেও সিন্ধুকে,—
সালসা খাও।

[কোরস]

সালসা খাও ভগ্নী ভাই, বন্ধু, গুরু শিষ্যে,
সালসা খাও রাত্রিদিবা, বর্ষায় কি গ্রীষ্মে,—
সালসা খাও।

ছাত্রগুলো রঙ্গালয়ে কচ্ছে কোকেন চর্ব্বনাশ,
চর্চ্চা অভিনেত্রী নিয়ে কচ্ছে যে সে সর্ব্বনাশ,
বিদ্যালয়ে দিচ্ছে ফাঁকি কিছু ভেবে পাচ্ছ না
পুত্র নিয়ে কর্ব্বে যে কি ?—সালসা কেন খাচ্ছ না ?—
সালসা খাও।

[কোরস]

সালসা খাও ভগ্নী ভাই, বন্ধু, গুরু শিষ্যে,
সালসা খাও রাত্রিদিবা বর্ষায় কি গ্রীষ্মে,—
সালসা খাও।

সালসা খাও বসবে হয়ে উচ্চ মণিমঞ্চবান
বিদ্যা হবে পঞ্চানন ও মূর্ত্তি হবে পঞ্চবাণ,
শত্রু দলে কমবে, মিত্র সংখ্যা দলে বাড়বে খুব ;
ভ্রাতৃসনে দ্বন্দ্বরণে গাত্রজোরে পারবে খুব ;
সালসা খাও।

[কোরস]

সালসা খাও ভগ্নী ভাই, বন্ধু, গুরু শিষ্যে,
সালসা খাও রাত্রিদিবা বর্ষায় কি গ্রীষ্মে,—
সালসা খাও।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

"কর্ম্মবাদ" সম্বন্ধে উত্তর।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় গত শ্রাবণ মাসের "নবপ্রভা"তে "কর্ম্মবাদ" সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার সদুত্তর দিবার আমাদের

বিদ্যাবুদ্ধি না থাকিলেও প্রশ্নগুলির গুরুত্ব অনুভব করিয়া যথাসাধ্য উত্তর দিতে চেষ্টা করিলাম। প্রবন্ধলেখকের এরূপ ইচ্ছা নহে যে কেবল শাস্ত্রবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া উত্তর দেওয়া হয়, যুক্তিহীন শাস্ত্রবাক্যকে তিনি মানিতে অনিচ্ছুক। শাস্ত্রবাক্যে অন্ধবিশ্বাস বৃহস্পতিসংহিতাতেও নিষিদ্ধ—

"কেবলং শাস্ত্রমাস্থিত্য ন কর্ত্তব্যা বিচারণা,
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥ (বৃহস্পতিসংহিতা)

অতএব দেখা যাইতেছে প্রবন্ধলেখক "যুক্তির" দোহাই দিয়া শাস্ত্রের অবমাননা করেন নাই ; অন্ধবিশ্বাসীর সহিত বিচার একপ্রকার অসম্ভব।

প্রবন্ধলেখকের প্রথম প্রশ্ন এই যে যদ্যপি "অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং" "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য মানিতে হয়, তাহা হইলে দয়াল পিতার দয়ার স্থান কোথায় থাকে? কর্ম্মফল রোধ করিয়া বিশ্বের নিয়ম ব্যতিক্রম করিলে দয়াল পিতার দয়া বেশি প্রকাশ পায়, না অনুতপ্ত হৃদয়ে বল ও শক্তি দিয়া কর্ম্মফলের তিক্তত্ব দূর করিলে তাঁহার দয়া বেশি প্রকাশ পায়? আমরা কি প্রত্যেকে দেখি নাই, যে লোকে কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে—সংসারের অশেষ ক্লেশ যাতনা ভোগ করিতেছে অথচ একদিনের জন্যও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে না—কি মনের বল, কি হৃদয়ের শান্তি, কি বিশ্বাসের মহিমা, এ সকল দেখিয়াও কি বলিব যে কর্ম্মবাদ মানিলে ঈশ্বরকে আর "দয়াময়" বলিয়া ভাবিতে পারি না। অতএব উপাসনা, প্রার্থনা, অনুতাপ কখনই বৃথা যায় না। আর Theosophist সম্প্রদায় মতে আমাদের প্রত্যেক ইচ্ছা প্রত্যেক কর্ম্ম, ও প্রত্যেক বাক্যের এক একটা ছাপ (Impression) আমাদের মনের উপর পড়ে, এবং তাহা হইতেই আমাদের চরিত্র গঠন হইতে থাকে, এ মতেও উপাসনা, প্রার্থনা, অনুতাপ ইত্যাদি কখনই নিষ্ফল হইতে পারে না কারণ এই সকল প্রতিনিয়ত আমাদের চরিত্র গঠন করিতেছে। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে এই চরিত্রই চিরস্থায়ী, এই চরিত্রের উৎকর্ষের উপর আমাদের জীবনের সার্থকতা নির্ভর করিতেছে। কাচের বদলে কাঞ্চন পাইলাম,—তবুও কি বলিব "উপাসনা" "প্রার্থনা" "অনুতাপ" ইত্যাদি কর্ম্মফল ভোগ করিলে বৃথা হইল? আর চন্দ্রশেখর বাবু মানুষের Sentimentality সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা একেবারেই ঈশ্বর সম্বন্ধে খাটে না। মানুষ প্রার্থনা ইত্যাদির বশীভূত হইয়া

অনেক অপরাধীকে মার্জ্জনা করেন বটে, কিন্তু তাহাতে যে অনেক সময়ে অনিষ্ট হয় না তাহা কে বলিল ? চন্দ্রশেখর বাবু কি সেইরূপ ঈশ্বরকে অমঙ্গলের নিদান করিতে চান ? কর্ম্মফলের ব্যতিক্রম করিলে যে সমূহ অনিষ্টের আশঙ্কা তাহা কি চন্দ্রশেখর বাবু ভাবিয়া দেখেন নাই ? এই Iron Law of Karma হেতু আমাদের যে রূপ দায়িত্ব ও স্বাবলম্বন বোধ হয় এমন আর কিছুতেই হয় না, এ নিয়মের ব্যতিক্রমে আমরা সকলে Irresponsible beings হইয়া দাঁড়াইব তাহা কি প্রার্থনায় ? অতএব মানুষের দয়ার সহিত ঈশ্বরের দয়া তুলনা করিতেই নাই। ইহার একটি Sentimentality অপরটি Real mercy, দুইটি স্বতন্ত্র পদার্থ। আর "As below, so above" সম্বন্ধে প্রবন্ধলেখক যাহা বলিয়াছেন সে সম্বন্ধে এই বক্তব্য যে আমাদের কর্ম্ম সীমাবদ্ধ জ্ঞান দ্বারা কৃত, ঈশ্বরের ক্রিয়া অনন্তজ্ঞানসম্ভূত ; অতএব দুইটি এক প্রকারের হইবে কি প্রকারে ? আমরা কি প্রতিদিন দেখিতেছি না যে আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত আমরা পূর্ব্বকৃত অজ্ঞানকৃত কর্ম্মের জন্য কতই না লজ্জিত হই, কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞানের ক্ষয়বৃদ্ধি নাই ! অতএব তাঁহার কার্য্যকলাপ আমাদের Standard দ্বারা মাপিলে চলিবে কেন ? অতএব আমাদের সহিত ঈশ্বরের কোন বিষয়ে আদৌ তুলনা না করিলেই ভাল হয়, সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন পদার্থের কি কখন তুলনা সম্ভবে ? এ সংসারে চৈতন্যের আধিপত্য আছে বলিয়া আমরা এই সকল কথা বলিতেছি। "অসৎ" হইতে কখনই "সতের" উদ্ভব হইতে পারে না, আমাদের ক্ষমা দয়া ইত্যাদি সকলই ঈশ্বরের ক্ষমা দয়ার অস্ফুট ছায়া মাত্র, কিন্তু জ্ঞানের তারতম্যে তাহার ক্রিয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আমাদের কিসে প্রকৃত মঙ্গল হয়, তাহা ঈশ্বরের অনন্তজ্ঞানে যেরূপ প্রকাশ পাইবে, সেরূপ কখনই আমাদের নিতান্ত অসম্পূর্ণ জ্ঞানে প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নহে। আমরা "সংসারকে একটা প্রকাণ্ড কল" বলিয়া কখন বিশ্বাস করি না, সংসার ক্ষমা দয়া ইত্যাদি কঠোর নিয়মের অধীন না ভাবিয়া কেবল জ্ঞানের অধীন বলিয়াই বিশ্বাস করি, প্রেমের আইনকে আমরা "কঠোর" বলিয়া ভ্রমবশতঃ বিশ্বাস করিতেছি।

Astral world এবং Devachanic world সম্বন্ধে Theosophist গণ যে সকল মত প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন তদনুরূপ আমাদের শাস্ত্রে কিছু দেখিতে পাই না। সাধারণ হিন্দুগণের জন্য গরুড় পুরাণে পরলোক সম্বন্ধে

অনেক কথা আছে বটে কিন্তু তাহা অন্যরূপ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদগীতাতে মৃত্যুর পর "পিতৃযান" ও "দেবযান" এই দুই মার্গের বিষয় উপদেশ দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা কোন ভাষ্য বা টীকাকর ভাল বুঝাইতে পারেন নাই।

"অগ্নি র্জ্যোতি রহঃ শুক্লঃ ষন্মাসাঃ উত্তরায়ণং
তত্র প্রজাতাঃ গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনা।
ধূমো রাত্রি স্তথা কৃষ্ণঃ ষন্মাসাঃ দক্ষিণায়নং
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতি যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে"॥

এই দুই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ কি তাহা এপর্য্যন্ত কিছুই বুঝিতে পারি নাই এবং যত জ্ঞানীলোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি তাহারাও বুঝাইতে পারেন নাই। "ছান্দোগ্য উপনিষদেও এইরূপ দুই মার্গের কথা আছে কিন্তু তাহার অর্থও বোধগম্য নহে। Theosophistরা কহেন তাঁহারা নিজে যোগবলে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহাই প্রচার করিয়াছেন। এত হিন্দুযোগী ঋষিরা যাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিলেন না তাহার বিষয়ে আমাদের কিছু না বলাই ভাল। পারলৌকিক অবস্থা সম্বন্ধে Theosophistগণের সহিত আমাদের বিশ্বাস আদৌ মেলে না, এবং তাঁহাদের Personal Experience সম্বন্ধে আমরা কি বলিব?

প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন "অপরাধ স্মরণ না থাকিলে দণ্ডের উদ্দেশ্য সাধিত হয় কিপ্রকারে?" পূর্ব্বজন্মের কথা ছাড়িয়া দিন, বর্ত্তমান জন্মে যে সকল নিয়ম ভঙ্গ জনিত ফল বা কষ্ট আমরা ভোগ করিতেছি তাহা কি আমরা জানি? কোন পাপের কোন ফল ভোগ করিলেন তাহা কি বলা যায়? "রোগ-শোক-পরিতাপ বন্ধন-ব্যসনানিচ—

আত্মাপরাধবৃক্ষাণাং ফলান্যেতানি দেহিনাম"

ইহা ত আমরা সকলেই জানি, কিন্তু বাস্তবিক কি আমরা বলিতে পারি কবে কখন কোন প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছিলাম সেইজন্য এই রোগ ভোগ করিতেছি? কেবল মাত্র এই কথা বলি যে অবশ্য কোন নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছিলাম নতুবা এ রোগ হইল কেন? যখন বর্ত্তমান জন্মের কথা কিছুই বলিতে পারি না, তখন কিপ্রকারে পূর্ব্বজন্মের কথা বলিব? সমুদয় স্মৃতিশক্তির আধার যে মস্তিষ্ক তাহা ত পূর্ব্বজন্মের শরীরের সহিত ভস্মাবশেষ হইয়াছে, তবে এ নূতন

মস্তিষ্কে পূর্ব্বজন্মের কথা জানিতে পারিব কিপ্রকারে? তবে শাস্ত্রে বলে, কারণ শরীরে সমুদয় সংস্কার বর্ত্তমান আছে তাহা যোগশাস্ত্রোক্ত "সংযম দ্বারা অর্থাৎ ধ্যান+ধারণা+সমাধি দ্বারা আমরা সমস্তই জানিতে পারি। যোগশাস্ত্র Practical Science সুতরাং ইহাতে সকলেরই অধিকার আছে। যাঁহারা পূর্ব্বজন্মের বিষয় জানিতে নিতান্তই উৎসুক তাঁহারা যোগ অভ্যাস করিতে পারেন, দুরূহ বিষয় জানিতে হইলে দুরূহ সাধনের আবশ্যক! যাঁহারা সেরূপ কঠিন সাধনায় অপারগ তাঁহারা ঈশ্বরের গৌরব রক্ষার্থে কর্ম্মবাদে বিশ্বাস করিতে বাধ্য। কর্ম্মবাদ না মানিলে ঈশ্বরকে কখনই ন্যায়বান বলা যায় না। চন্দ্রশেখর বাবু এ বিষয়ের বার বার আলোচনা করেন ইহা আমার একান্ত ইচ্ছা।

বিনীত শ্রীমন্মথনাথ চৌধুরী।

সংক্ষিপ্ত-সমালোচনা।

১। **স্বাস্থ্য।** সম্পাদক শ্রীদুর্গাদাস গুপ্ত এম, বি। এই মাসিক পত্রখানি বেশ দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে। ইহা পাঠ করিলে অনেকেই উপকৃত হইতে পারেন। ইহাতে একদিকে ইউরোপীয় বিজ্ঞান অনুসারে স্বাস্থ্যসম্বন্ধে যেরূপ আলোচনা করা হইতেছে, অন্যদিকে আয়ুর্ব্বেদ মতে এবং আমাদিগের দেশের আচার ব্যবহার, সাধারণ লোকের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া যদি অনুশীলন করা হয় তবে আরও উপকার হইতে পারে।

২। **উৎসাহ।** বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮। "বঙ্গ দর্শনের পুনর্জ্জন্ম" প্রবন্ধে বঙ্গদর্শনের সমালোচনোপলক্ষে বঙ্গদেশের মাসিকপত্রগুলির শোচনীয় অবস্থার কথঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়াছেন; যথা—"যদি বিশেষ কোন উদ্দেশ্য লইয়া কোন পত্র জন্মগ্রহণ করে তবে তাহা বাঁচে না, তাহার লেখক ও গ্রাহক উভয়েরই অভাব হয়। যদি বিশেষ ভাবে মাসিক পত্রকে সমুন্নত করিবার শুভ সংকল্প লইয়া কোনও পত্র জন্ম গ্রহণ করে লোকে তাহা চাহে না"—বিষম বিপদ। "আবার বাঙ্গালা কাগজের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অভাব লেখকের"— এ কথা মিথ্যা নহে। উৎসাহ বাঙ্গলা মাসিক পত্রের যে দুর্দ্দশা বর্ণনা করিয়াছেন উৎসাহ দ্বারা তাহার প্রতিকার সংসাধিত হইতেছে তাহা বোধ হয় না। তবে উচ্চ আদর্শ থাকা ভাল।

৩। **পূর্ণিমা।** ভাদ্র ১৩০৮। ভাদ্রের পূর্ণিমায় শরৎকালের পূর্ণিমা রজনীর মনোহর শশধর দেখিতে পাইলাম না। "মৃত্যুর পর" "হিন্দু বৈরাগ্যে ইতিহাস" ইত্যাদি কৃষ্ণমেঘে যেন পূর্ণিমার আকাশ আচ্ছন্ন।

৪। **বীরভূমি।** শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ সম্পাদিত। শ্রাবণ, ১৩০৭। এই সংখ্যা বীরভূমি পড়িয়া সন্তুষ্ট হইলাম। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা 'একটি উল্লেখ যোগ্য প্রবন্ধ।' "সরফবাজ খাঁ" বেশ লেখা হইয়াছে।

৫। **ভাস্কর।** শ্রীসত্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। ভাদ্র, ১৩০৮। ভাস্করের ভাষা ভাল বিষয় নির্ব্বাচনও মন্দ নহে। আমরা ভাস্করের উন্নতি কামনা করি।

৬। **চিকিৎসক ও সমালোচক।** এই পত্রিকাখানি অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ। ভাষাটি আরও একটু মার্জ্জিত হওয়া প্রার্থনীয়।

৭। **প্রয়াস,** ভাদ্র, ১৩০৮। "প্রাচীন কলিকাতা" শীর্ষক প্রবন্ধ কৌতুহলজনক বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ।

৮। **প্রয়াস,** আশ্বিন, ১৩০৮। 'কৃষিশিক্ষা' প্রবন্ধটি সময়োপযোগী এবং স্বদেশ প্রেম প্রসূত। বঙ্গদেশের স্বাধীনচেতা দেশহিতৈষী জমিদারগণ যদি একটী রীতিমত কৃষিস্কুল করেন, তাহা হইলে যে দেশের বিশেষ মঙ্গল সাধিত হয় তাহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। ভরসা করি শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আন্দোলনে এ বিষয়ে বাঙ্গলার সুশিক্ষিত মহানুভব জমিদারগণের দৃষ্টি পড়িবে। নিত্যগোপাল বাবু লিখিয়াছেন যে কৃষিবৃত্তি রীতিমত শিক্ষা ভিন্ন আর যাহা কিছু উপায় দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ উদ্ভাবিত হইতেছে বা হইবে সমস্তই ইহার তুলনায় অপদার্থ। একথা অন্ততঃ মান্দ্রাজ বোম্বাই অঞ্চল সম্বন্ধে ঠিক নহে। কারণ উৎপন্ন শস্যের যতই বৃদ্ধি হউক, গভর্ণমেণ্ট যদি সমুদয় বর্দ্ধিত শস্য রাজস্বরূপে গ্রহণ করেন তাহা হইলে দুর্ভিক্ষ কখনই নিবারিত হইবে না।

৯। **New India** (নিউ ইণ্ডিয়া)। নূতন ইংরাজী সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র। মিঃ বিপিনচন্দ্র পাল সম্পাদিত। বেশ সুদক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে। আমরা যে কয় সংখ্যা দেখিয়াছি তাহাতে অনেক প্রয়োজনীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় পূর্ণ দেখিলাম। এই পত্রিকার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

সাবিত্রী লাইব্রেরী—১৫শ—২১শ—বিবরণী। সাবিত্রী লাইব্রেরীতে কিছুকাল ধরিয়া দেশের গণ্য মান্য চিন্তাশীল লেখক কর্ত্তৃক রচিত বাঙ্গলা প্রবন্ধ সময় সময় পঠিত হইয়া আসিতেছে। ইহা বাঙ্গালা সাহিত্য বিকাশের পক্ষে সহায়তা করিতেছে। উপস্থিত বিবরণীতে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক রচিত "জাতীয় সাহিত্যের আবশ্যকতা ও উন্নতি" শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের "বাঙ্গালীর অভাব ও অবস্থা" শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসুর "কঃ পন্থা!" শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর "সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার" এই কয়েকটী সুলিখিত প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত সার প্রকাশ করা হইয়াছে। সমুদয় প্রবন্ধের সুর অনেকটা এক রকম। হীরেন্দ্র বাবু বলেন 'আমরা দারুণ স্বার্থপর হইতেছি আমরা পরলোকে বিশ্বাস হীন, ইহলোক সর্ব্বস্ব হইয়াছি'; চন্দ্রনাথ বাবু বলেন প্রাচীন ভারতের বিলাস সামগ্রী মধ্যবিত্তের নিকট ও শ্রম জীবীদিগের ঘরে পৌঁছিত না; গরীব মজাইতে গরীবের সর্ব্বনাশ করিতে পারিত না' কিন্তু এখন সকল শ্রেণীর ভারতবাসীই বিলাসী হইয়া উঠিতেছে। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী বলেন দেশের বিলাসিতার বৃদ্ধি হইতেছে কিন্তু কৃষকের ঘরে অন্ন নাই, সপরিবারে একাশনে বা অর্দ্ধাশনে দিনযাপন করিতেছে কিন্তু তাহার মাথায় ছাতি, গায়ে জামা পায়ে জুতা; তাহার গৃহিণীর অঙ্গে অলঙ্কার বিলাতের মত অস্বাভাবিক বিলাসপ্রিয়তা আমাদের ধ্বংসের হেতু।" ফলকথা সমুদয় প্রবন্ধেই আত্মগ্লানির পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথবাবু ঠিক বলিয়াছেন যে "এখন আমাদের আত্মগ্লানি বোধ হইয়াছে; মানুষের যতদিন আত্মগ্লানি না জন্মে ততদিন স্বীয় দোষ সংশোধনে, অভাব মোচনে প্রবৃত্তি জন্মে না।" ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ বলেন প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিকতাই আমাদের মুক্তির উপায়। কেহ বলেন, আত্মসমাজের প্রতি অকপট শ্রদ্ধা ও অবিচলিত ভক্তি সমাজ শরীরের ব্যাধির একমাত্র ঔষধ। কেহ বলেন জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি ব্যতিরেকে কোন জাতীর অভ্যুত্থান হয় না। মাননীয় গুরুদাসবাবু বলেন যে কেবল আধ্যাত্মিক অবস্থার উপর নির্ভর করিলে চলিবেনা, অসময় আমাদের বৈরাগ্য ধর্ম্ম অবলম্বন ভাল নয়। পাঠক দেখিতে পাইবেন এই সকল প্রবন্ধে যে যে মীমাংসা করা হইয়াছে তাহাতে বিশেষ নূতনত্ব নাই, তবে তাহাতে সহৃদয়তা আছে। যাহা হউক এই সকল প্রবন্ধের জন্য সাবিত্রী লাইব্রেরীকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিই এবং তাহার মহদুদ্দেশের জন্য তাহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।

লহরী—চৈত্র, ১৩০৭। লহরী বিবিধ বিষয়িণী কবিতাময়ী পত্রিকা। এই পত্রিকা খানি পড়িয়া আমরা প্রীত হইয়াছি।

দৈনিক ঘটনা সংগ্রহ।

আশ্বিন।

১লা আশ্বিন ১৭ই সেপ্টেম্বর। ইংরাজগণ পিকিন পরিত্যাগ করেন।

৩রা আশ্বিন, ১৯শে সেপ্টেম্বর। প্রেসিডেণ্ট ম্যাক কিনলীর সমাধি হয়।

সংবাদ পাওয়া যায় যে জেনারেল বোথা কর্ত্তৃক মেজর গফের সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হয়। এই যুদ্ধে তিনটি কামান এবং পাঁচ জন অফিসার বন্দী হয়। আর একটী সংবাদ আসে যে এলাণ্ড রিভার পোর্টের নিকট ইংরাজগণ বুয়ার কর্ত্তৃক পরাজিত হয়।

৪ঠা আশ্বিন, ২০শে সেপ্টেম্বর। অদ্য ইংরাজগণের ব্লাক্ ফনটিনে বুয়ার কর্ত্তৃক পরাজয়ের সংবাদ আসে। এই যুদ্ধে ইউ ব্যাটারির দুইটি কামান, অশ্বারোহী গোলন্দাজ প্রভৃতি বুয়রগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়।

৭ই আশ্বিন ২৩শে সেপ্টেম্বর। ইংরাজগণ কর্ত্তৃক বুয়ারদিগের দুই জন দলপতি বন্দী হয়।

১১ই আশ্বিন, ২৭শে সেপ্টেম্বর। মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায়ের স্মরণার্থ নানা স্থানে সভা সমিতি আহুত হয়।

জুলুল্যাণ্ড হইতে যুদ্ধের সংবাদ আসে।

১৪ই আশ্বিন, ৩০শে সেপ্টেম্বর। লর্ড কিচনার ঘোষণা করেন যে যে সকল বুয়ারগণ এখনও যুদ্ধে লিপ্ত তাহাদিগের সম্পত্তি বিক্রীত হইবে।

১৫ই আশ্বিন, ১লা অক্টোবর। তুরস্ক কর্ত্তৃক ফ্রান্সের দাবীদাওয়ায় সম্মত হওয়ায় উভয়ের মধ্যে বিবাদ মিটিয়া যায়।

১৬ই আশ্বিন, ২রা অক্টোবর। ইংরাজ কর্ত্তৃক কিক্উইচে ডিলারী পরাজিত হন। বুয়ার কর্ত্তৃক একদল ইংরাজ বন্দী হয়।

১৭ই আশ্বিন, ৩রা অক্টোবর। আফগানিস্থানের আমীর আবদর রহমণের ৭১ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়।

২৩শে আশ্বিন, ৯ই অক্টোবর। জেনারেল বোথা লর্ড লিটলটনের সৈন্য দলের মধ্য হইতে পলায়ন করেন।

২৬শে আশ্বিন, ১২ই অক্টোবর। বুয়ার সেনাপতি লটারের ফাঁসী হয়। সেনাপতি স্কীপার বন্দী হন।

জান জিববারের প্রধান মন্ত্রী লয়ড উইলিয়ম ম্যাথিউ এর মৃত্যু হয়।

২৯শে আশ্বিন, ১৫ই অক্টোবর। পিট রিটিফ ইংরাজ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়।

৩০শে আশ্বিন, ১৬ই অক্টোবর। পিকেট্-বর্গে ইংরাজ ও বুয়ারে যুদ্ধ হয়। ইংরাজ দলের কাপ্তেন বেলু হত হন।

কলিকাতা, ২৫।১নং স্কট্‌স্ লেন ভারতমিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানির দ্বারা মুদ্রিত।
ভবানীপুর ১৬নং চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট হইতে শ্রীরণেন্দ্রলাল রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

নবপ্রভা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

১ম খণ্ড। | কলিকাতা, অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১৩০৮ সাল। | ১০ম ও ১১শ সংখ্যা

সীতা।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—বাল্মীকির তপোবন। কাল—অপরাহ্ণ।

সীতা ও ঊর্ম্মিলা।

(দূরে তাপস বালক বালিকাদিগের গীত)

এই সব—হে অসীম হে ব্যোমবিহারী
দেবব্রহ্ম !—এ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমারি
খণ্ডরূপ। মহাশূন্য অব্যয় অক্ষয়
তোমারি জ্যোতিতে কাঁপে।—মহাশক্তিময় !—
তোমারি শক্তিতে ঘুরে প্রদীপ্ত আকাশে
বিক্ষিপ্ত বিপুল পৃথ্বী। তোমারি নিঃশ্বাসে
প্রশ্বসে অসীম বিশ্ব। নিত্য নিভে জ্বলে
কোটি সূর্য্য কোটি চন্দ্র তব পদতলে।
আসে যায় রাত্রি দিবা নিত্য। নৃত্য করি'
আবর্ত্তে বসন্ত বর্ষা ধরণী উপরি।

গভীর গর্জ্জনে বজ্র তোমারি মহিমা
নির্ঘোষে। তোমারি সৌম্য নম্র মধুরিমা
সুগন্ধ কুসুমে হাসে। তুঙ্গ শৈলশির,
নিম্ন সানু, ঘন নীল জলধি গম্ভীর,
নির্ম্মল নির্ঝর কান্তি, ভূকম্প, ঝটিকা,
ধীর স্নিগ্ধ মলয়, মাধুরী মাধবিকা,
দুর্ভিক্ষ উলঙ্গ, শস্যশ্যামলতাকুটি,
মনুষ্য, পতঙ্গ, কীট, নগর, অটবী,
ক্রোধ স্নেহ, সুখ দুঃখ ;—এ নিখিল ভূমি
সর্ব্ববিশ্বে সর্ব্বভূতে—বিরাজিত তুমি।

সীতা। কি মধুর! স্তনিত জলদমন্দ্র সম
শান্ত গীতধ্বনি। স্নিগ্ধ তপ্তপ্রাণ মম
আকণ্ঠ করিয়া পান এ স্বর্গীয় সুধা
দূরে যায় ক্লেশ, ক্লান্তি, সর্ব্ব তৃষ্ণা, ক্ষুধা ;
বল পাই দুর্ব্বল হৃদয়ে—

উর্ম্মিলা। অভিরাম
সৌম্য মধুময় দিদি এই বনগ্রাম ;—
স্নিগ্ধ কান্ত অতি শান্ত চির পুণ্যভরা ;
এর জন্য শুষ্ক রাজভোগ ত্যাগ করা
নহে সুকঠিন।

সীতা। —হায় পঞ্চবটী বনে
থাকিতাম যবে বোন্ প্রিয়তম সনে—

উর্ম্মিলা। সে কথা স্মরিয়া কাজ নাই—যাও ভুলি'।
এই দেখ কুরঙ্গিনী গর্ব্বে শৃঙ্গ তুলি
খেলা করে বৎস সনে—আহা কি সুন্দর
শুনিছ না অবিশ্রান্ত নদী কুলুস্বর
ওই দূরে?—আশ্চর্য্য ও বটশাখামূল
চুম্বে ধরা। কি সুন্দর ও বিহঙ্গকুল।

সত্য দিদি যদি নিত্য চিরদিন থাকি
এই তপোবনে, তৃপ্ত হয় না এ আঁখি,
দেখি শ্যাম বনশোভা।

সীতা। এসেছিস তাই
বুঝি মোর সঙ্গে এই তপোবনে ভাই?

ঊর্ম্মিলা। এই পল্লবিত কুঞ্জ দিদি কি সুন্দর;
ওই খর্ব্ব গিরিশৃঙ্গ বড় মুগ্ধকর,
ও তরঙ্গায়িত ক্ষেত্রে।

সীতা। শোন্ এক কথা।—
কেন ছল?—বুঝি সব—হৃদয়ের ব্যথা
লুকাবি লো কত?—শোন্ বলি পুনরায়
যা ফিরি আলয়ে।

ঊর্ম্মিলা। নিত্য কেন দিদি হায়
বল এই নিদারুণ কথা?

সীতা। আমি যদি
চিরদিন নাথ হারা। তুই নিরবধি
কেন র'বি মোর সঙ্গে—জ্যোৎস্নার মত
নিশাসহ। নিজে যদি দুঃখিনী নিয়ত,
অপরে সে দুঃখভাগী করি কেন আর?
তুই পতিগতপ্রাণা সতি, তুই তার
নয়নের মণি। তুই এ বিচ্ছেদে দহি'
থাকিস্ লো নিত্য কেন? আমি সহি, সহি;
অভাগিনী আমি মগ্ন হই—নিজে হই।
তোরে কেন আপনার সঙ্গে টেনে লই
এ অতল জলে। ফিরে যাও অযোধ্যায়
প্রাণের ভগ্নীটি মোর। করি পুনরায়
অনুনয়; যাও ফিরে; যাও ছেড়ে যাও
কলঙ্কিনী অলক্ষ্মী সীতারে

উর্ম্মিলা। এসো না ও

বাণী মুখে সুভাগিনী। পরম সুখিনী
আমি হেথা। করো না বঞ্চিত তাহে।

সীতা। চিনি

জানি তোরে রে উর্ম্মিলা—তোর স্নেহভরা
অমূল্য হৃদয়রত্ন। নিত্য সহ্য করা
সে বিচ্ছেদ স্বেচ্ছায় নীরবে ; আমি যাহা
ভুঞ্জি বোন্ নিজ কর্ম্মফলে। কিন্তু তাহা,—
ছায়া তার, কেন স্পর্শে তোরে পুণ্যবতি
পতিসোহাগিনী তুই। এ দুর্ভাগ্য সতি
বাজে না এ প্রাণে তত, বাজে যত তোর
এই নিরন্তর অন্তর্দাহ—এ কঠোর
জ্বালা তোর—চতুর্দ্দশবর্ষ পরে ফিরে
মিলাইল বিধি হায় যদি দম্পতীরে
পরক্ষণে স্বপ্নলব্ধ ঐশ্বর্য্যের প্রায়
কোথা মিলায়ে গেল সে সুখ পুনরায়।
যা ফিরে উর্ম্মিলা।

উর্ম্মিলা। পায়ে ধরি আরবার

কহিও না ওই কথা। দেখেছ আমার
চক্ষে কবে অশ্রুজল ? কবে দীর্ঘশ্বাস
শুনিয়াছ ?—তবু মোর বাক্যে অবিশ্বাস !

সীতা। দেখি নাই চক্ষে অশ্রু, শুনি নাই কভু
কাতরোক্তি বিম্বাধরে প্রাণাধিক ! তবু
বুঝি আমি ও প্রাণের নিত্য ও নিয়ত
নিদারুণ অন্তর্দ্দাহ। জানি না কি—কত
পতিপ্রেম পতিভক্তি ও নব উদ্দাম
সুপবিত্র নিষ্পাপহৃদয়ে ? অবিশ্রাম

কার চিন্তা কার ছবি তোর চক্ষে ভাসি'
রহে সদা। ভগ্নি আমিও যে ভালবাসি
নাথে মোর রাখিয়াছি চাপি' এই ক্ষুদ্র
চক্ষে মোর বিক্ষুব্ধ উত্তাল সমুদ্র ;
শৃঙ্খলিত করিয়াছি মোর সব সাধ
শুষ্ক তপস্যায় ; তবু ভেঙ্গে যায় বাঁধ
অসতর্ক মুহূর্ত্তে কখন ;—জেগে ওঠে
ঘুমন্ত সে প্রেম ; রুদ্ধ অশ্রুবারি ছোটে,
উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে।—বোন্ বুঝি না কি তোর
নিরুদ্ধ প্রেমের তীব্র আবেগ ? কঠোর
তপস্যায় কেন শুষ্ক করিবি ও কোমল হৃদয়
ফিরে যা উর্ম্মিলা বোন্ করি অনুনয়।

উর্ম্মিলা। প্রিয় ভগ্নি ! আমি মূর্খ আমি ক্ষুদ্র নারী
এ যুক্তি তোমার দিদি বুঝিতে না পারি।
ক্ষমিও আমায়। দেবি করিও না ক্রোধ
পারিব না রাখিতে অন্যায় অনুরোধ
[প্রস্থানোদ্যত]

সীতা। যাস্‌নে উর্ম্মিলা।

উর্ম্মিলা। [সহাস্যে] এই আজ্ঞা কর দেবি
নিত্য যেন কাছে থাকি নিত্য যেন সেবি।
ব্যগ্র হই একদণ্ড না দেখিলে যারে
যূথভ্রষ্ট হরিণীর মত—নিত্য তারে
আজ্ঞাকর চলে যেতে নিষ্ঠুর !—সতত
কে দিবে সান্ত্বনা দুঃখে ? কেবা অবিরত
রহিবে তোমারে দুটি বাহুবন্ধে ঘিরে
নিশীথে নিদ্রায় ?—যদি আমি যাই ফিরে
কে দিবে চুম্বনরাশি কপোলে যখন
রহিবে নিদ্রায় তুমি গাঢ় অচেতন।

সীতা। জানি বোন্ তোর যত্ন তোর নিদ্রাহীন
ব্যগ্রতা, আগ্রহ, মোরে ঘিরে নিশিদিন
আছে ল্লো। এ দুঃখ বক্ষে শেল সম বাজে
আমি নিজে অভাগিনী যাহাদের মাঝে
এসেছি তাদেরও লই টানিয়া আমার
দুঃখের আবর্ত্তে।

উর্ম্মিলা। দিদি হাসে কি সংসার
যবে মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্র ?—হাসে কি যামিনী ?
ভুলে যাও—সেই সব কথা—সুহাসিনী
আমরা তাপসী দিদি, প্রণয়ের কথা
অলীক দুঃস্বপ্ন বাতুলের বাতুলতা।
এস ভুলে যাই সেই শৈশবের ভ্রম ;
এস গালি পাড়ি যত নির্দ্দয় নির্ম্মম
পুরুষ জাতিরে—

সীতা। হৃদয়ের কথা একি

উর্ম্মিলা। কোথা কুশীলব দিদি যাই গিয়ে দেখি

[প্রস্থান]

সীতা। অমূল্য হৃদয় রত্ন গড়েছিলে প্রভু
পরমেশ ! ধন্য তুমি ! দেবতা কি কভু
উচ্চ এর চেয়ে ?

—ঐ কম্র সন্ধ্যা আসে ;
জগৎরঞ্জিত স্বর্ণবর্ণে ; নীলাকাশে
মেঘখণ্ড নাই ; স্তব্ধ মুগ্ধ অরণ্যানী
চাহে অনিমেষ নেত্রে তুলি মুখখানি
আকাশের পানে ; বিশ্ব নিষ্কম্প নীরব
মগ্ন অর্চ্চনায়।—সেই সব, সেই সব
যেরূপ সুন্দর শান্ত পঞ্চবটী বন।
কোথা তুমি কোথা তুমি হৃদয়ের ধন

প্রিয়তম!—কোথা তুমি?—পারিনা যে আর
নিরুদ্ধ করিতে অশ্রু নয়নে আমার।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান-রাজসভা।　কাল—প্রাহ্ল।

রাম ও লক্ষ্মণ।

রাম।　গিয়াছে ভরত রাজ্য ছাড়ি আজি প্রিয়বর!—দূরে
গিয়াছে মাণ্ডবী সঙ্গে।　গিয়াছে শত্রুঘ্ন মধুপুরে।
শূন্য রাজ্য! শূন্য এ প্রাসাদ।—শুদ্ধ দেবতার মত
সৌমিত্রি!—প্রগাঢ় প্রেমে আছো রামে ঘেরিয়া সতত।

[কতিপয় ঋষি সহ বশিষ্ঠের প্রবেশ]

বশিষ্ঠ।　দাক্ষিণাত্য হতে মহারাজ, এই ঋষি কয়জন
আসিয়াছে অভিযোগ করিতে তোমারে নিবেদন।

রাম।　ভাগ্যবান্ আমি দেব!—পবিত্র অযোধ্যা আজি তাহে;
পুণ্য এ প্রাসাদ আজি ঋষিদের চরণ ধূলায়।
ঋষিগণ! আজি কোন গরিষ্ঠ আদেশে রামে—আজ
করিবেন ধন্য?

বশিষ্ঠ।　কি বক্তব্য ঋষিগণ?

১ম ঋষি।　মহারাজ
মৃত পুত্ররত্ন মোর।—

রাম।　তারে বাঁচাইতে হবে মুনি?
সঞ্জীবনী মন্ত্র নাহি জানি ঋষি

বশিষ্ঠ।　মহারাজ শুনি
দক্ষিণে শৈবাল পতি শূদ্ররাজ শম্বূক সম্প্রতি
করিছে তপস্যা বেদপাঠ ধর্ম্মকর্ম্ম নরপতি
অশাস্ত্রীয় কাজ।　তাই এই দুর্ঘটনা অত্যাচার।

রাম। কি করিব গুরুদেব ?

বশিষ্ঠ। প্রাণদণ্ড বিধান তাহার :

লক্ষ্মণ। শাস্ত্রচর্চ্চা অশাস্ত্রীয় ?

বশিষ্ঠ। হাঁ শূদ্রের

লক্ষ্মণ ; অশাস্ত্রীয় যাগ।

বশিষ্ঠ। হাঁ শূদ্রের।

রাম। যথা আজ্ঞা তাহাই করিব মহাভাগ,
যাইব দণ্ডকে নিজে সসৈন্যে।

ঋষিগণ। ভূপতি জয় হোক
দূরে যাক অকল্যাণ। দূরে যাক সর্ব্ব দুঃখ শোক।

[ঋষিগণের সহিত বশিষ্ঠের প্রস্থান]

রাম। দাক্ষিণাত্যে !—সেইখানে পঞ্চবটীবন। সেইখানে
যাপিয়াছি জীবনের প্রভাত। জীবন অবসানে
একবার সেইস্থান দেখিতে বাসনা প্রিয়বর
মনে পড়ে সেই পঞ্চবটী ?

লক্ষ্মণ। জাগে নিত্য নিরন্তর
অন্তরে সে কথা আর্য্য। স্মরণে জাগিবে আজীবন।

রাম। বড় মনোহর স্থান বৎস সেই পঞ্চবটীবন,
পুণ্যস্মৃতিময়। আমি যাব তীর্থস্থানে। বৎস যাবে ?
তুমি আমি উভয়েই বিপত্নীক। যাব সমভাবে
সমদুঃখে।—না লক্ষ্মণ তোমার দুঃখের সীমা নাই।
আমার দুঃখের সীমা আছে। আমি—আমি সহি ভাই
আপনার পাপে। আর তুমি ভাই নিষ্কলঙ্ক, সহ
পুণ্যে আপনার—ভ্রাতৃস্নেহে—চিরদিন অহরহ ;
আমি নিজস্বার্থে তুমি স্বার্থত্যাগে। ভুঞ্জিয়াছি আমি
তথাপি মিলন সুখ ; পায়নি তা উর্ম্মিলার স্বামী
একবর্ষ। সত্য বৎস আমার এ যন্ত্রণা গভীর ;

তোমার অতলস্পর্শ। আমার এ কহিবার। বীর!
তোমার সে কথার অতীত।

লক্ষ্মণ। আর্য্য! লক্ষ্মণের সুখ
রাঘবের সেবা। অন্য চিন্তা কিছু নাহি জাগরুক
তাহার অন্তরে! অন্য বাসনা কি অন্য অভিলাষ
নাহি তার। নহি আমি অসুখী!

রাম। লক্ষ্মণ! অবকাশ
হইল না দেখাইতে কৃতজ্ঞতা কভু প্রিয়বর,
দেখাইতে অন্তরের স্নেহ। বন্ধু তোমার অমর
অক্ষয় অনন্ত কীর্ত্তি—চিরদিন ঘোষিবে জগৎ;—
তোমার পবিত্র প্রীতি,—তোমার বিশাল সুমহৎ
চরিত্র, তোমার অনুপম স্বার্থত্যাগ। যেইদিন
শক্তিশেল বাজিল তোমার বক্ষে; প্রবাহিল ক্ষীণ
ক্ষত হতে রক্তস্রোত; দেখিয়াছিলাম অন্ধকার
চক্ষে মোর। সেইদিন তুমি ভাই বুঝেছি আমার
প্রাণাধিক।—সেইদিন বুঝেছি আমার অবিচ্ছেদ
সেইদিন জেনেছি সংসারসিন্ধুহৃদয়ে, অভেদ
আমরা যুগলযাত্রী একতরীক্রোড়ে আজীবন।
চল বৎস চল শূন্য অন্তঃপুর ভবনে লক্ষ্মণ।

[নিষ্ক্রান্ত]

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

ম্যালেরিয়া।

ম্যালেরিয়া জ্বরে আমাদের দেশ উৎসন্ন হইতে চলিল। অতএব এই বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখা সকলেরই উচিত।

ম্যাল এবং এরিয়া ইহাতে ম্যালেরিয়া শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার প্রকৃত অর্থ মন্দ বায়ু। বাস্তবিক বায়ু দুষিত হইয়াই এ জ্বরের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

বহুকাল হইতেই বর্ষার শেষে জ্বর প্রকাশ পাইতে দেখা গিয়াছে। বর্ষাকালে জল আসিয়া সমস্ত ডোবা, পুষ্করিণী প্রভৃতি জলপূর্ণ হয়; সেইজলে পাতা লতা প্রভৃতি পচিয়া এক প্রকার বাষ্প উত্থিত হয়, সেই বাষ্প শরীরস্থ হইলেই ম্যালেরিয়া জ্বর প্রকাশ পায়।

ইংরাজ জাতি এখন সকল বিষয়েই আমাদের নেতা, তাঁহারা যাহা বলেন তাহাই আমাদের বেদ বাক্য। এ ম্যালেরিয়া বিষয়েও তাঁহারা সময়ে সময়ে নানা মত প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন।

ইংরাজ জাতির আর এক গুণ (দোষ বা গুণ কি তাহা ঠিক বলা কঠিন) আছে যে তাঁহারা বড়ই 'নূতন' প্রিয়। কোন একটা বিষয়ে একটা নূতনত্ব বাহির না করিতে পারিলে ইংরাজ সমাজে পদস্থ হওয়া কঠিন, ইহাতে উপকার ও অপকার দুই আছে। ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে দোষের ভাগটাই অতিরিক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একজন আজ যে মত ব্যক্ত করিলেন দশ দিন পরে আর একজন তাহা যুক্তি বিরুদ্ধ বলিয়া প্রমাণ করিলেন। ইহাতে যুক্তি, তর্ক সমুদয়ই তখন নূতন আকার ধারণ করে।

স্থূলকথা এই যে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে তাঁহাদের মত তর্ক, ও যুক্তি সমুদয়ই এখন পর্য্যন্ত ভ্রমসঙ্কুল রহিয়াছে। আমরা গুটীকতক দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি।

প্রথমতঃ। এদেশীয় রাজক্ষমতাপ্রাপ্ত সাহেব ডাক্তারেরা বিশ্বাস করিতেন, উদ্ভিদ পচিয়া ম্যালেরিয়া প্রকাশ পায়, তজ্জন্য পুলিশের উপর হুকুম হইল জঙ্গল কাটিয়া মরুভূমি প্রস্তুত কর। পুলিশের ক্ষমতা অসাধারণ; তাহার ফল এই হইল কাহারও নারিকেল বাগান কাহারও আম্র বাগান বৃক্ষহীন হইল, উপকার কিছুই হইল না। ম্যালেরিয়া যেমন হইতেছিল তেমনি চলিল।

কোন কোন স্থানে জঙ্গল পরিষ্কার হইল বটে, কিন্তু তাহা নিয়ম মত হইল না। সকল জঙ্গলই যে দোষের আকর তাহা নহে। স্নান ও পানীয় জলাশয়ের নিকটস্থ যে জঙ্গল, যাহাতে ঐ জল দূষিত হইয়া উঠে তাহা দূর করাই কর্ত্তব্য। তাহা তো হইল না সুতরাং ম্যালেরিয়া যেমন ছিল তেমনিই রহিয়া গেল।

ইহাতে চিকিৎসক ও বিজ্ঞানবিৎ মহাত্মাদিগের মনে ঘোর সন্দেহ হইল।

তাঁহারা জঙ্গল পরিষ্কার বন্ধ করিয়া দিলেন। এমনও হইল যে জঙ্গল বেচারির উপর দয়া হওয়াতে তাহার গুণ ব্যাখ্যা হইতে লাগিল।

এইরূপে নানা প্রকার অনুসন্ধান করিয়া কিছুই স্থিরীকৃত হইল না। এইরূপ নানাবিষয়ের আন্দোলন হইয়া শেষে মশার উপরে দৃষ্টি পতিত হইল। এখন পণ্ডিতেরা স্থির করিলেন মশা দ্বারা ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হইতেছে। অতএব "মশা মারিতে কামান পাতার" উদ্যোগ হইতেছে। দেখা যাউক মশককুল নির্ম্মূলের সঙ্গে ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদ সাধন হয় কি না? যদি হয় তবে আমাদের মত গরীব বেচারিদের বড়ই উপকার সাধিত হয়। একেবারে এক উপায়ে দুই কার্য্য সাধিত হইয়া পড়ে। মশার অত্যাচার দুরীভূত হয়, মশারি ক্রয় করিবার পয়সা বাঁচিযা যায়; দ্বিতীয় ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া মরিতে হয় না, কুইনাইন ক্রয় করিবার পয়সাও বাঁচিয়া যায়।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কচ সাহেব এই মত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার মস্তকে পুষ্প বৃষ্টি হউক, এখন চারি দিক হইতে মশক কুল নির্ম্মূলের উদ্যোগ হইতেছে। হইলে সব দিক রক্ষা হয়, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস মশকেরা যদি বোয়ারদিগের মত না ছোড় বান্দা হয় তবে বড় বিপদ। তবে ভরসা এই যে মশকেরা এদেশী কিন্তু বোয়ারেরা ইউরোপ সম্ভূত। এখন প্রকৃত কথা এই, লতা পাতা পচিয়া এবং ভূমি আর্দ্র হইয়া প্রকৃত পক্ষেই ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হয়; যাহাতে তাহা না হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

পল্লীগ্রামে এখন অনেক স্থানেই দেখা যায় যে জঙ্গলের প্রদুর্ভাব অনেক বাড়িয়াছে। বর্ষার প্রদুর্ভাব কখনও কম, কখনও বেশী। বেশী হইলেও দোষ, কম হইলেও দোষ, তবে লোকের কর্ত্তব্য যাহাতে জল নষ্ট না হয় তাহার বিবিধ উপায় অবলম্বন করা।

ভূমি আর্দ্র হইবার প্রধান কারণ জল বাহির হইবার উপায় না থাকা। জল একস্থানে স্থায়ী হইয়া বহু দিবস অবস্থান করিলে ভূমি সেঁত সেঁতে হয়। সেই আর্দ্র ভূমিতে বাস করিলে ঠাণ্ডার জন্য জ্বর, কাশি ইত্যাদি প্রকাশ পায়।

সুতরাং যাহাতে জল বাহির হইয়া যাইতে পারে তদ্রূপ পয়ঃপ্রণালী প্রস্তুত করা, গাত্রবস্ত্র দ্বারা শরীর রীতিমত আবৃত করিয়া রাখিলে অনেক সময়ে জ্বরের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা, আমাদের মধ্যে অনেকেই তর্ক করেন যে

পূর্ব্বে তো গাত্র বস্ত্র ব্যবহৃত হইত না তাহাতে তখন জ্বরের তেমন প্রাদুর্ভাব ছিলনা। কথা সত্য, কিন্তু এখন তখনকার অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যদি ঠাণ্ডা না লাগে তবে ম্যালেরিয়া জ্বরের তত প্রকোপ হয়না।

অতএব গাত্রবস্ত্র দ্বারা শরীর রক্ষা করিতে নিয়ত চেষ্টা করিবে। এই জ্বর প্রাদুর্ভাবের সময়ে অর্থাৎ বর্ষার শেষ হইতে শীতের প্রথম পর্য্যন্ত এই নিয়ম অবলম্বন করিতে আমরা সকলকেই পরামর্শ দিতেছি।

অনেক স্থানে পানীয় জলের বড়ই দুরবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেখানে নদী বা তাদৃশ বৃহৎ জলাশয় আছে তথায় কোন কষ্ট নাই। কিন্তু যেখানে তাহার জলের উৎকৃষ্ট ও প্রচুর প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকে তথায় পানীয় জলের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

জল গরম করিয়া খাইলে অনেক দোষ নিবারিত হইয়া থাকে অতএব এ বিষয় অবহেলা করা উচিত নহে।

স্নানের জল ও গরম করিয়া ও তাহার পর ঠাণ্ডা করিয়া স্নান করিলে সুবিধা হয়। স্রোতস্বতীর জলে অবগাহন করিতে পারিলে ভাগ্যের কথা বলিতে হইবে। ইহাতে অনেক উপকার আছে। তাহা না হইলে গরম জলে স্নান মন্দ নহে। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়ার কয়েক মাস এ নিয়ম অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। আমরা কেবল ঔষধ খাইতে জানি। যিনি যত ঔষধ সেবন করেন তিনি চিকিৎসার ততই গৌরব করিয়া থাকেন। এটী এখন সভ্যতার এক অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং ঔষধের ব্যবস্থা না করিয়া কেবল স্বাস্থ্যের নিয়ম পালনের ব্যবস্থা করিলে লোকের বিরাগভাজন হইতে হয়।

ডাক্তারদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেই তাঁহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিবেন "ম্যালেরিয়ার একমাত্র ঔষধ কুইনাইন" জ্বর বা বিজ্বর উভয় অবস্থাতেই উহা সেবন করিতে হইবে। অনেকে পরামর্শ দেন সুস্থ শরীরে প্রাতঃকালে উঠিয়াই কুইনাইন ও ব্রাণ্ডি মিশাইয়া খাইলে আর ম্যালেরিয়ায় ধরিতে পারে না। এই সমুদায় ব্যবস্থায় যে কত অনিষ্ট হয় তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না।

আজকাল গবর্ণমেণ্ট ডাক ঘরে কুইনাইনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। উদ্দেশ্য যতই ভাল হউক না কেন, ইহাতে যে ভয়ানক কুফল উৎপন্ন হইতেছে

তাহার সন্দেহ নাই। আমাদিগের বিশ্বাস প্লীহা, যকৃৎ, শোথ, মুখে ঘা প্রভৃতি এত যে অধিক হইতেছে অতিরিক্ত কুইনাইন সেবনই তাহার কারণ। এ স্থলে ইহাও বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে ম্যালেরিয়া জ্বরের সময় ও অবস্থা ভেদে কুই-নাইন মহৌষধ। সেইটী বিবেচনা না করিয়া অযথা কুইনাইন প্রয়োগ করাতেই এত অনিষ্ট ঘটিতেছে। যেখানে কুইনাইন খাইয়া জ্বর বন্ধ হইল না, অথবা বন্ধ হইয়া আবার প্রকাশ পাইল, তথায় পুনরায় কুইনাইন সেবন করিতে দেওয়া অত্যন্ত যুক্তি বিরুদ্ধ কার্য্য, ইহাতে সুফল কিছুই হয় না, প্রত্যুত নানা প্রকার কুফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ম্যালেরিয়া জ্বরের আক্রমণ হইতে কিরূপে রক্ষা পাওয়া যায় এই বিষয়ের উপদেশ আমাদের নিকট প্রাপ্ত হইবার জন্য অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমাদের কোন বন্ধুকে উপদেশ দিয়া আমরা যে প্রকার অবস্থা হইতে দেখিয়াছিলাম গল্প স্থলে তাহাই এখানে উল্লিখিত হইতেছে। আমাদের বন্ধু, গবর্ণমেণ্টের অধীন কোন উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী, তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বদলী হইতে হয়, কোন সময়ে তিনি আমাদের নিকটে আসিয়া বলেন ভাই এবার তোমার সঙ্গে শেষ "দেখা করিতে আসিয়াছি"। আমরা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন? তিনি বলিলেন, এবার যে স্থানে যাইতেছি তাহা ভয়ানক ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত। তথায় গেলে আর রক্ষা নাই।

এই বন্ধুবর বড় সাহেবী মেজাজের লোক অর্থাৎ সাহেবী খানা ও সাহেবী পোষাক প্রভৃতির বড়ই পক্ষপাতী। আমরা সকল সময়ে তাঁহার সহিত এক মত হইতে না পারিয়া তর্ক করিতাম, এবং বিলাতী সবই যে ভাল নয় এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতাম। আমি বলিলাম ভাই! তোমার সাহেবী এখন কাজে লাগিবে, যদি তথায় গিয়া তুমি সেইরূপে থাক তাহা হইলে আর কষ্ট পাইবে না। তিনি বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করায় আমরা নিম্নলিখিত মতে উপদেশ দিলাম।

১। আর্দ্র স্থানে বাস করিবে না।

২। সর্ব্বদাই পোষাক পরিয়া থাকিবে, সাহেবী পোষাক আরও ভাল।

৩। জল গরম করিয়া খাইবে ও গরম জলে স্নান করিবে, বহির্বায়ুতে স্নান

না করিয়া ঘরের মধ্যে স্নান করিবে, স্নানের পর গায়ে জামা আঁটিয়া বাহির হইবে।

৪। টেবিলে খাইবে ও খাটে মশারি খাটাইয়া শুইবে।

৫। পারতপক্ষে নিমন্ত্রণ খাইবে না, সময়ে খাইবে ও অতিরিক্ত খাইবে না।

বলা বাহুল্য ইহাতে আমাদের বন্ধুর প্রভূত উপকার হইয়াছিল। তিন বৎসর পরে তিনি সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন তাঁহার উন্নত স্বাস্থ্য দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

গরিবসেবা।

মুষ্টি ভিক্ষা।

বাল্যকালে যখন মাকে মুষ্টিভিক্ষা দিতে দেখিতাম, তখন প্রায়ই বলিতাম, 'মা, একমুষ্টি চাউলে উহার কি উপকার হইবে, আমাদের এত চাউল রহিয়াছে, তুমি কি উহাকে এক সেরও দিতে পার না ?' তখন আমার বয়স ৭।৮ বৎসর হইবে। তখন আমি মনুষ্য হই নাই। এখন আমি "মনুষ্য" হইয়াছি, জ্ঞানেরও বিকাশ হইয়াছে। আপনারা পাঁচজন বিজ্ঞ লোক আছেন, দয়া করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারেন কি যে এখন কোন ভিখারী দ্বারে আসিয়া ভিক্ষা চাহিলে, ভিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক, একগাছা লাঠী লইয়া বাহির হইতে ইচ্ছা হয় কেন ?

আমি ত বাল্য কালে মন্দ লোক ছিলাম না। মা যাহাকে একমুষ্টি ভিক্ষা দিতেন, আমার তাহাকে সের প্রমাণ দিতে ইচ্ছা হইত। তৎপরে অনেক সুশিক্ষাও লাভ করিয়াছি। বুদ্ধের স্বার্থত্যাগ, চৈতন্যের প্রেম, গীতার নিষ্কাম ধর্ম্ম আমার হৃদয়ে নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছে। বলিতে পারি না, কোন্ দুর্লক্ষ্য কারণে আমার ভিখারী-আতঙ্ক রোজ রোজ বাড়িয়া উঠিতেছে।

আমরা যে মুষ্টিভিক্ষা দানে অসমর্থ, একথা আমরাবলিতে পারিনা। মাসে দুই সের চাউল বা চারিগণ্ডা পয়সা হইলেও এই সনাতন ব্রত পালন হইতে পারে,

তাহা কখনই আমাদের অসাধ্য নহে। আমরা দরিদ্র হইলেও আমাদের মধ্যে এত দরিদ্র কে যিনি গৃহস্থাশ্রমে বাস করিয়া মাসে ২।১ সের চাউল ব্যয় করিতে না পারেন। যদি বাস্তবিকই না পারেন, তাহা হইলে সেই দীন ভ্রাতাও আমাদের সহানুভূতির পাত্র, আমরা সকলে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া তাঁহার অবস্থাই বা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল করিয়া দিই না কেন?

মুষ্টিভিক্ষা দানের বিরুদ্ধে সাধারণতঃ যে আপত্তি উত্থিত হইয়া থাকে, অন্ততঃ ইংরাজি বিদ্যার তেজে এই ক্ষুদ্রজনের তরুণ ও তরল মস্তিষ্কে যে আপত্তি এক দিন মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় প্রভা বিকীর্ণ করিয়াছিল, সে এই ;—সমাজে কাহারও বসিয়া খাওয়া উচিত নহে। আমি জগতের কোন কার্য্য করিব না, অথচ জগৎ আমার আহার যোগাইবে, যাহারা এই প্রকার আশা করে, তাহারা অতি অলস ও নীচ; সেই সকল লোককে ভিক্ষা দিলে আলস্য ও নীচতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়, এবং পরিণামে সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করা হয়।

এই প্রকার জ্ঞান সহকারে পল্লি-নিবাসে প্রত্যাগত হইয়াই মাকে বলিলাম, 'মা আর ভিক্ষা দিও না, ভিক্ষা দিলে দেশের সর্ব্বনাশ করা হয়।' ভিখারী দিগকে মুহুর্মুহু প্রশ্ন করিতে লাগিলাম, 'তোমরা কি জমি চাষ করিতে পার না?' কি একস্থানের দ্রব্যাদি অন্য স্থানে লইয়া বিক্রি করিতে পার না? গরু পুষিয়া দুধ বিক্রি করিলেও ত গুজরান চলে। আর যদি ইহার কিছুই না পার, তবে কাহারও বাটীতে ঝি চাকর থাকিয়া পেটের কর্ম্ম চালাও; ভিক্ষা পাইবে না।'

ভিখারীরা প্রায়ই কোন উত্তর করিত না। কেহ কেহ বলিত, 'এই ছেলে যদি উকীল হয়, তবে মুল্লুকের টাকা এই বাড়ী আসিবে।' বাটীর লোকে লুকাইয়া ভিক্ষা দিতে ছাড়িত না। পিতা মহাশয়ও সাধ্যানুসারে আতিথ্য দিতে ত্রুটি করিতেন না। পাঁচ সাতজন ভিখারী নিত্যই অতিথি আসিত। জননীকে অষ্টপ্রহর রন্ধনশালাতেই থাকিতে হইত। ইহাতে আমার ছোট ছোট ভাই ভগিনীগুলির দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। কেহ নিরন্তর কাঁদিতেছে। কেহ বা কাদা করিয়া তাহার মধ্যে তিন ঘণ্টা যাবৎ পড়িয়া আছে। পিতা মহাশয়কে এই সমস্ত বিষয়ে সর্ব্বথা উদাসীন দেখিয়া প্রস্তাব করিলাম, যাহারা অতিথি হইবে, তাহারা স্বয়ং পাক করিয়া খাইবে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিন।

তিনি প্রথমতঃ বলিলেন, 'তাহাতে ততদূর ফল হয় না, পরে অগত্যা স্বীকার

করিলেন। বাহির বাটীতে চাউল ডা'ল লবণ তৈল সমস্তই থাকিত। ভিখারী অতিথিরা যখন যে আসিত পাক করিয়া খাইত। এইরূপে জননীর কষ্ট কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিলাম বটে, কিন্তু মনের আসল কষ্ট দূর করিতে পারিলাম না।

যাহা হউক আর দুই বৎসর কাল ইংরাজী পড়িয়া আমার জ্ঞান সম্পূর্ণ হইয়া দাঁড়াইল। তখন ভিখারীকে ভিক্ষা কিংবা আতিথ্য দান সমস্তই সমাজের ঘোর অমঙ্গলের হেতু বলিয়া দৃঢ় প্রতীতি হইয়া উঠিল। এদিকে বয়োবৃদ্ধি সহকারে সাহস ও উৎসাহ বৃদ্ধি পাইল। তৎসহ নবীকরণ প্রিয়তা, অবাধ্যতা, গুরুজনের অপ্রিয়কারিতা, চিরপ্রচলিত রীতির বিরুদ্ধবাদিতা, পরচ্ছিদ্রান্বেষণে অতুল তৎপরতা, মানীর অবমাননা দর্শনে নিরতিশয় প্রীতিপ্রফুল্লতা প্রভৃতি যে সকল গুণ আধুনিক শিক্ষার স্তরে স্তরে সজ্জিত আছে, সেই সমস্ত গুণ পরম্পরা, এক কথায় নিবিড় নিরবচ্ছিন্ন পশুতা আসিয়া যোগদান করিল। বলা বাহুল্য, সেই মনোহর পল্লীনিবাসে ভিখারীরা যে একমুষ্টি চাউল পাইত, কিংবা মধ্যাহ্ন সময়ে ক্ষুৎপীড়িত দুঃখী লোকেরা আসিয়া যে একমুষ্টি অন্ন পাইত, অনতি বিলম্বে তাহা রহিত হইয়া গেল। পিতা মাতা ভাই বন্ধু কাহারও আপত্তি গ্রাহ্য হইল না। সামাজিক রীতি, চিরপ্রচলিত প্রথা, দুঃখীর দুঃখ, গরিবের কাতরতা, ক্ষুধার্ত্তের কণ্ঠাগতপ্রাণভাব, কিছুতেই এই সমাজসংস্কারকের গতিরোধ করিতে পারিল না। কিন্তু জগতের নীতি কি বিচিত্র! সেই সকল ভিখারী সেই দেশে সেই ভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু ইংরাজী বিদ্যায় আমার পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে বিস্তর,—আমার সেই ধনধান্যপূর্ণ পল্লী নিবাস অরণ্যে পরিণত করিয়াছে, এবং স্বাধীনতা দিবার ছল করিয়া, আমাকে সর্ব্বথা পরাধীন করিয়া রাখিয়াছে।

এখন সেই আপত্তির কথা হইতেছে, অর্থাৎ সমাজে কাহারও বসিয়া খাওয়া উচিত কি না, অথবা একের শ্রমলব্ধ ধনের অংশ অপরে বিনা পরিশ্রমে ভোগ করিবার যোগ্য কি না।

আমি এক দিন এক ভিখারীকে বিনা পরিশ্রমে খাওয়ার দোষারোপ করায় সে আমাকে প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিল, 'মহাশয়! কে বলে যে আমরা বিনা পরিশ্রমে খাই? জগতে কজন লোক আমাদের মত পরিশ্রম করিয়া খাইয়া থাকে? সকাল হইতে তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত ৩।৪ ক্রোশ পথ ঘুরিয়াছি, এখনও এক পেটের

যোগাড় হয় নাই। আপনার বাটীতে কাঠ কাটিলেও এতক্ষণ পেট ভরিয়া খাইতে পাইতাম, আরও নগদ চারিটী পয়সা পাইতাম।

আমি বলিলাম, 'তুমি পরিশ্রম কর সত্য, কিন্তু ইহাকে অনুৎপাদক শ্রম বলে, অর্থাৎ ইহাতে কিছু ফলেনা, এই পরিশ্রমে তুমি যদি এক বন্দ জমি চাষ করিতে, ভাবিয়া দেখ, তাহাতে কত উপকারের সম্ভাবনা ছিল।'

ভিখারী বলিল, 'মহাশয়! আমি আপনার মত শাস্ত্র জানি না, কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায়, কৃষক সারা বৎসর চাষ করিলেও সময় কালে হয়ত ফলে না। ভগবান্ সফল শ্রমকেও নিষ্ফল করিতে পারেন, নিষ্ফল শ্রমকেও সফল করিতে পারেন। সকলই তাঁহার ইচ্ছা। আর আমার এই শ্রমে যে কিছুই ফলে না, তাহাই বা আপনি কেমন করিয়া জানিলেন! আমি ঘুরিয়া বেড়াইতেছি বলিয়া আপনার হৃদয়ে দয়া ধর্ম্ম ফলিবার সম্ভাবনা আছে; নচেৎ আপনাতে ও পশুতে প্রভেদ কি প্রকারে থাকিবে?"

এই কথা শুনিয়া আমি এক প্রকার নিরুত্তর হইতেছিলাম, কিন্তু তর্কে পরাজয় অসহনীয় বোধ হওয়ায় বলিলাম, "এখন দয়া ধর্ম্মের কথা রাখিয়া দাও, ঈশ্বর সকলকেই হাত পা দিয়াছেন, সকলেই কাজ করিবে, খাইবে, এই তাঁহার উদ্দেশ্য; হস্ত পদের ব্যবহার করিব না, অথচ আহার মিলিবে, এইরূপ আশা করা অন্যায়।

ভিখারী বলিল 'মহাশয়! যদি ভগবান্ কাজ করিবার জন্যই হস্ত দিয়া থাকেন, তবে দানও একটী কাজ, দান করিবার জন্যও হস্ত দিয়াছেন বলিতে হইবেক, তাহাই বা লোকে না করিবে কেন? আর দেখুন, যাহাদের হস্ত থাকিয়াও নাই, শক্তি নাই, তাহারা কি করিয়া খাইবে?'

আমি বলিলাম "কিন্তু ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখ যে, একজনের শ্রমলব্ধ ধনের দ্বারা একজনের অনায়াস জীবিকা নির্ব্বাহ কোন ক্রমেই ন্যায় সঙ্গত হইতে পারে না।"

ভিখারী বলিল, 'মহাশয়! এ কথা কি সত্য? কই আপনার বৃদ্ধ পিতা মাতা কিংবা পরিবার, ইঁহাদের কেহইত রোজগার করিতেছেন না, তবে ইঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতেছে কি প্রকারে?'

আমি বলিলাম, 'ইঁহাদের কেহই বিনা পরিশ্রমে আহার পাইতেছেন না। পিতা মাতা শ্রম করিয়া আমাকে বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন, স্ত্রী নিত্য কাছারীর

ভাত রাঁধিতেছেন। ইঁহারা নিজে রোজগার করিতেছেন না বটে, কিন্তু সকলেই আমার রোজগারের সহায়তা করিতেছেন, তাই ইঁহাদের অন্ন মিলিতেছে।'

ভিখারী। তাহা যদি বলিলেন, তবে আমিও আপনার রোজগারের সহায়তা করিতেছি।

আমি। কি প্রকারে?

ভিখারী। আমি তত শাস্ত্র জানি না; কিন্তু আমার বোধ হয় যে, দেশের সকলে সমান কাজ পায় না; আর যদি সকলেই কাজ করিতে যায়, কাজের দর এত কমিয়া যাইবে যে তাহাতে আর কাহারও চলিবে না। দেখুন আমরা যদি লেখা পড়া শিখিতাম, তাহা হইলে আপনারা এক্ষণে যত সহজে চাকুরী পাইতেছেন, তাহাও পাইতেন না, অথবা চাকুরীর মুল্য কিয়ৎ পরিমাণে কমিয়া যাইত। আমাদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। কৃষি বলুন, দাসত্ব বলুন, ব্যবসা বলুন, আমরা যে দিকে যাইতাম, সেই দিকেই কিয়ৎ পরিমাণে হাহাকার উত্থিত হইত। এবং আমাদের অবস্থাও কাহারও অপেক্ষা নিকৃষ্ট থাকিত না। কিন্তু আমরা সে সমস্ত আশা পরিত্যাগ করিয়া আপনাদিগকেই কার্য্যক্ষেত্র ছাড়িয়া দিয়াছি। শ্রম ও পুরস্কার আপনাদেরই হইয়াছে। আমরা মাত্রমুষ্টি ভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া আছি।

তৎপরে এক দিন একটী ভিখারিণী আমার নিকট ভিক্ষা চাহিলে, আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম, 'তোমাকে ভিক্ষা দিবে কেন? তোমার শরীর আছে, কাজ করিয়া খাইতে পার না?' ভিখারিণী বলিল, 'মহাশয়! কাজ কোথা পাইব?' আমি বলিলাম, "আমাদের বাটীতে চাক্‌রাণী থাক না কেন?" তাহাতে সে উত্তর করিল, 'এক মুষ্টি ভিক্ষা দিতে যার বুক চড়্ চড়্ করে, সে আবার চাক্‌রাণী রাখিবে কি প্রকারে?' এই বলিয়া ভিখারিণী ক্রোধভরে চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে আমি বলিলাম, 'ভিক্ষা লইয়া যাও'। সে ভিক্ষা পাইয়া প্রীতি প্রফুল্ল বদনে কহিল, "আপনাকে ভাল কথা বলিতেছি, আপনি আর কখনও ভিখারিণীকে চাক্‌রাণী রাখিবার কথা মুখে আনিবেন না। যাহারা ওরূপ বলে, তাহারা কখনও ভাল লোক নয়।"

ফলতঃ যে সমস্ত লোক একবার ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, তাহাদের দ্বারা সমাজের আর কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। উহারা মুখে বলে

কোন কাজ পাই না, কিন্তু উহাদিগকে কোন কাজ দিলেও উহারা তাহা করিতে সম্মত নহে। উহাদের প্রবৃত্তি অত্যন্ত স্বাধীন। উহারা অলস নহে; কিন্তু কোন প্রকার অধীনতা উহাদের পক্ষে একান্ত অসহনীয়। সমাজের নিয়মাবলী উহাদের এতই কঠোর বলিয়া বোধ হয় যে উহারা বরং লজ্জা ও অভিমানে জলাঞ্জলি দিয়া ভিক্ষারূপ নীচতম বৃত্তি অবলম্বন করে, তথাপি ঐ সমস্তের বশে আসিতে পারে না। উহারা সমাজের দুর্ব্বহ ভার, শান্তির অনুরোধে সমাজকে চিরকালই ঐ ভার বহন করিতে হইতেছে।

সাধারণতঃ ভিক্ষুকদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—১ম বিধিপ্রেরিত, ২য় স্বেচ্ছানোদিত। অন্ধ, কুব্জ, খঞ্জ, কুষ্ঠী, চিররোগী, উন্মাদগ্রস্ত, আতুর, হস্তপদাদি বিহীন এবং স্বভাবতঃ কার্য্যাক্ষম লোক সকল ১ম শ্রেণীর অন্তর্গত। আর ইতি পূর্ব্বে যাহাদের কথা বলা হইয়াছে সেই সমস্ত শক্তি-সত্ত্বে অলস ব্যবসাদার ভিক্ষুকগণকে ২য় শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট করা যাইতে পারে। ইহাদের ব্যবসার মূল ধন "হরেকৃষ্ণ"। ইহারা যেন 'হরেকৃষ্ণ' রবে গৃহস্থের বাস ভবন চরিতার্থ করিয়াই ভিক্ষা লইয়া থাকে। অন্যের কথা বলিতে পারি না, উহাদের নাম প্রচারে আমার কিন্তু অধিকাংশ সময়েই বিরক্তির উদ্রেক হয়। উহারা যে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন এরূপ বলিতে পারি না, কারণ সময়ে সময়ে গীত বাদ্যাদি সহকারে নাম কীর্ত্তন করিয়া আমার হৃদয়ে প্রেম ও প্রীতির উদ্বোধন করিতে চেষ্টা পায়। বুদ্ধ চৈতন্য প্রভৃতি অবতারগণ নীতি ও ধর্ম্মের প্রচারার্থেই ইহাদের ভিক্ষুজীবন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহারা কালে কালে আপন আপন চরিত্র দোষে সে উদ্দেশ্য হারা হইয়াছে। উহারা শুকের ন্যায় অভ্যস্তভাবে 'হরে কৃষ্ণ' উচ্চারণ করে মাত্র; উহাদের শিক্ষা নাই, সংযম নাই, নেতা নাই, চরিত্র নাই; উহাদের হৃদয়ে কোন মহত্তর ভাব নাই। উহারা সংসারত্যাগী হইয়াও সংসারের যাবতীয় নিকৃষ্ট—বাসনার অন্ধীভূত। উহাদিগের দর্শন মূর্ত্তিমতী কপটতার দর্শন মাত্র, ইহার উপর যখন দ্বারে আসিয়া অধিক মাত্রায় চীৎকার করিতে থাকে, তখনই যেন লাঠীর কতকটা দরকার হইয়া পড়ে।

কিন্তু উপায় নাই; সমাজকে ঐ কপটতার ভারও বহন করিতে হইবে। বুদ্ধ চৈতন্য উহাদের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক আমাদিগকে মুষ্টি ভিক্ষা দিয়া তাঁহাদিগের মান্য রক্ষা করিতে হইবে। উহাদিগের

সংস্কার সাধন করা, উহাদিগকে স্ব স্ব কর্ত্তব্যে প্রেরিত করা আপনার বা আমার সাধ্য নহে, তজ্জন্য দ্বিতীয় বুদ্ধচৈতন্যের প্রয়োজন। যত দিন তাঁহাদের অবতারণা না হইতেছে, ততদিন আমাদিগের মুষ্টি ভিক্ষা দিয়া প্রাচীন ঠাট বজায় রাখা কর্ত্তব্য কিনা, তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, প্রাচীন ঠাটে আছে কি? আমার বোধ হয় নূতন ঠাটেও যাহা ছিল, পুরাতনেও তাহাই রহিয়াছে। বুদ্ধ চৈতন্য এই সকল ভিক্ষুক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া জগতের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিয়াছেন কি না, তৎ সম্বন্ধে আমি এস্থলে কিছুই বলিতেছি না; কিন্তু তাঁহারা সমাজের কতকগুলি লোককে ইন্দ্রিয়নিগ্রহে দীক্ষিত করিয়া জগতের যে মহৎ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন তৎপক্ষে আর কোনই সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়ের প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই সময়ে যদি তিনি একটী লোককেও অকৃতদার জীবন অবলম্বন করাইয়া থাকেন, তাহা হইলে আজি এই দুর্ভিক্ষ পীড়িত ভারতে তিনি ন্যূন কল্পেও ৫০ কোটী লোকের আবির্ভাব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

আর চৈতন্যও যদি নিজসময়ে একটী লোককে বংশবৃদ্ধি কার্য্যে বিরত করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনিও বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষে অন্যূন আর দেড়কোটী লোকের হা-অন্ন রব নিবৃত্তি করিয়া গিয়াছেন। অতএব যখন আমরা দেখিতে পাই, ঐ দুই মহাত্মা স্ব স্ব অলৌকিক ক্ষমতায় ভারতের বহু সংখ্যক লোককে বংশবৃদ্ধি বিষয়ে ঘোর বীতস্পৃহ করিয়া তুলিয়াছিলেন বলিয়াই আজি মাত্র ত্রিশ কোটীর ভাবনা করিয়া চলিতেছে, নচেৎ আজি সহস্র কোটীর হতাশ ভাবনায় দশ দিক্ অন্ধকার হইয়া যাইত,—তখনই আমরা বুঝিতে পারি সন্ন্যাসী ও বৈরাগী সম্প্রদায়ের দ্বারা ভারতের কি মহোপকার সংসাধিত হইতেছে। পক্ষান্তরে ইহাও বিবেচনা করা যাইতে পারে যে যদি যথাসময়ে বুদ্ধ ও চৈতন্য জাতীয় বংশ বৃদ্ধি স্রোতঃ কিয়ৎ পরিমাণে অবরুদ্ধ না করিতেন, তাহা হইলে যখনই লোক সংখ্যা উৎপন্ন দ্রব্যের অনুপাত অতিক্রম করিত, তখনই কোন না কোন প্রকারে দারুণ লোক সংক্ষয় উপস্থিত হইত, অন্তর্বিবাদ ও আভ্যন্তরিক সমরে ভারত ভূমি আকুলা হইয়া পড়িত, কত কত ফরাসী উপপ্লব ভারতে পদার্পণ করিয়া দশ বৎসরে এগার লক্ষ লোকের শিরশ্ছেদ করিয়া ফেলিত। জগতের

ইতিবৃত্ত হইতে ইহা একপ্রকার বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে যে, যে দেশে যথা সময়ে বুদ্ধচৈতন্যের আবির্ভাব না হয়, সেই সেই দেশেই পরিণামে মারা (Marat) ড্যানটন (Danton) ও রোবস্পায়ারের পদধূলি পড়িয়া থাকে।

ভারতের সন্ন্যাসী ও বৈরাগীরা আধ্যাত্মিক ভাবে সমুন্নত হউক আর না হউক, তাহারা যে গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া গৃহস্থদিগের বিবৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধির পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে, তাহার আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। তাহাদের আর কোন মহত্ত্ব না থাকিলেও, এই ত্যাগই তাহাদের মহত্ত্ব; এবং এই মহত্ত্বের জন্যই তাহারা অমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে। তাহারা ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ব্রতে দীক্ষিত হইয়া আবহমানকাল ভারতের লোক সংখ্যা স্থির রাখিতেছে; তাহারা স্বয়ং ভোগসুখাশা বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া সাধারণের ভোগসুখের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতেছে। যে সমাজে ইহাদের সেই অলৌকিক দানের প্রতিদান নাই, অথবা যে সমাজে ইহাদের জীবন রক্ষার উপযোগী মুষ্টিভিক্ষারও অসদ্ভাব দৃষ্ট হয়, সে সমাজ মনুষ্যের অপেক্ষা পশুর সমাজ বলিয়া পরিচিত হওয়াই ভাল।

ভিক্ষুকগণের যে দুই শ্রেণী বিভাগ করা গিয়াছে তন্মধ্যে ১ম শ্রেণীর ভিক্ষুকেরা আমাদের দয়ার উপর নির্ভর করে বটে, কিন্তু ২য় শ্রেণীর ভিক্ষুকেরা কদাচ আমাদের দয়ার অপেক্ষা করে না, তাহারা আমাদিগকে বিস্তর দান করিয়াছে, আমরা মুষ্টি ভিক্ষা দ্বারা তাহারই প্রতিদান করি মাত্র। বিধিপ্রেরিত ভিক্ষুকেরা সমাজের দুর্ব্বহ ভার, মৃত ও কেবল অনুগ্রহোপজীবী; কিন্তু স্বেচ্ছানোদিত ভিক্ষুকগণ ভারাক্রান্ত প্রকৃতির লঘুতা সম্পাদক, জীয়ন্ত, এবং ন্যায়তঃ ভিক্ষার অধিকারী। আত্মাকে নীতিবিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ করিতে না পারিলে, ইহাদিগকে মুষ্টিভিক্ষাতেও বঞ্চিত করা যায় না। উহাদের যে আধ্যাত্মিক অধোনতি ঘটিয়াছে, তাহা আমি শতমুখে স্বীকার করি। কিন্তু সেই অধোনতিতে উহাদের ব্যক্তিগত দোষের সঙ্গে সঙ্গে, আমরা যে বহুকাল ধরিয়া ভিক্ষাদান নীতির অবমাননা করিয়াছি, তাহারও বিবরণ কথঞ্চিৎ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথোপযুক্ত ভিক্ষার অসদ্ভাবেই উহারা মিথ্যা চৌর্য্য প্রতারণা প্রভৃতি অসদ্বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। আমরা যদি উহাদিগকে ন্যায়তঃ প্রাপ্য মুষ্টিভিক্ষায় আর বঞ্চিত না করি; তাহা হইলে উহাদের সংস্কার আমরাই

সাধন করিব, তজ্জন্য বুদ্ধ চৈতন্যকে পুনরায় অবতরণ-ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না।

কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, এক্ষণে সমাজের এক তৃতীয়াংশ লোকে ভিক্ষা দিতেছে, ইহাতেও যখন ভিক্ষুকগণের একপ্রকার চলিতেছে, তখন সকলে ভিক্ষা দিতে থাকিলে, হয় উহারা বিলাসী হইবে, না হয় আরও কতক-গুলি লোককে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে উৎসাহিত করা হইবে। তাহার উত্তরে আমি বলিতে ইচ্ছা করি, জগতে মুষ্টিভিক্ষা আশ্রয় করিয়া কেহ কখনও বিলাস পদবীতে পদার্পণ করিতে পারে নাই। মুষ্টি মুষ্টি লইয়া একব্যক্তি সমস্ত দিনে ঊর্দ্ধসংখ্যা তিন সের চাউল সংগ্রহ করিতে পারে। ইহার জন্যও তাহাকে শতাধিক দ্বারে ঘুরিতে হইবে। তদপেক্ষা অধিক পরিভ্রমণ তাহার দৈহিক শক্তি ও দৈনিক নিয়মিত শ্রমকালে কখনই কুলাইয়া উঠিবে না। আবার দৈনিক তিনসের চাউলও একজনের পক্ষে প্রয়োজনাতিরিক্ত বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহাও বিবেচনা করা আবশ্যক, গণনাকালে ঊর্দ্ধসংখ্যা যাহা ধরা যায়, গড়ে সধারণতঃ তাহার অর্দ্ধেক বই হয় না। ভিখারী সহস্র পরিশ্রম করিলেও রোজ গড়ে দুই সেরের অধিক চাউল ভিক্ষা করিতে পারে না; ইহা দ্বারা বিলাস কি প্রকারে সম্ভবে?

আর আপনারা মুক্ত হস্তে ভিক্ষা দিলে, তাহা দেখিয়া যদি আরও কতক-গুলি লোকে রক্তবস্ত্র পরিধান ও দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ করে, তাহাতে সংসারের ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট হইবে না। এক দিল্লীর লাড্ডু লইয়া সকলে কাড়াকাড়ি করি-বার পরিবর্ত্তে, জনকয়েক বুদ্ধচৈতন্যের পথে শান্তিলাভ করিলে, তাহাতে সর্ব্বদিক্ রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা। ফলতঃ আমাদের এরূপ উদারতাও আছে যে আপনাদের বিবৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য আমরা সংসার ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে পারি। কিন্তু শেষে আপনারা পাছে আমাদের জীবনধারণোপযোগী মুষ্টিভিক্ষা দিতেও কাতর হয়েন, এই ভয়ে আমাদের সেই উচ্চতম বৃত্তি হৃদয়েই বিলীন হইয়া যাইতেছে। আমরা ভাবিতেছি দিল্লীর লাড্ডু লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে করিতে প্রাণ যায় তাও স্বীকার, তথাপি যে দেশের লোক মুষ্টিভিক্ষা দিতেও কাতর হয়, সে দেশের জন্য তাদৃশ স্বার্থত্যাগ করিব না।

তাই বলিতেছি এই বেলা মুষ্টিভিক্ষা দিয়া সমাজের সেফ্‌টি ভাল্‌ভ খুলিয়া

দিন, আমরা জনকয়েক সেই পথে সরিয়া পড়ি। আপনারা অপেক্ষাকৃত আরামে বাস করুন। আমাদিগকে মুষ্টিভিক্ষা মাত্র দিয়া জগতের যাবতীয় সুখ নিষ্কণ্টকে ভোগ করিতে থাকুন। আমরা গৃহ চাহি না, বৃক্ষতল আছে; আচ্ছাদন চাহি না কৌপীন আছে; শীতে বস্ত্র চাহি না, অগ্নি আছেন; রোগে ঔষধ চাহি না, যম আছেন। চাহি কেবল একমুষ্টি চাউল, কেন না ক্ষুধা আছে। এই ক্ষুধা, এই অপরিহার্য্য জ্বালা আপনাদিগকে বুঝানও কঠিন হইয়াছে, কারণ আপনাদিগের।আদবেই ক্ষুধা নাই, অম্লপিত্ত ও ডিস্‌পেপ্‌সিয়া রোগে আপনারা অনেকদিন এই জ্বালায় অব্যাহতি পাইয়াছেন, তাই বুঝি ক্ষুধার্ত্তের সহিত আপনাদের সমবেদনা বিলুপ্ত প্রায়। আপনারা সমস্ত দিন যাহাদের সহিত মসীযুদ্ধে ব্যাপৃত থাকেন, তাহারা সায়ংকালে গৃহে গিয়া তিন সের আমমাংস জীর্ণ করে, আর আপনারা নাকি একখানি বিস্কুট ও এক তোলা মিশ্রীর জল গ্রহণ করিয়া সমস্ত রাত্রি অম্ল উদ্গার তুলিতে থাকেন। দেখুন, দেশের লোককে ন্যায়তঃ প্রাপ্য মুষ্টি ভিক্ষায় বঞ্চিত করিয়া আপনারা এই নিগ্রহে পতিত হন নাই ত? আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন না, হিন্দুদিগের মধ্যে এইরূপ কথা প্রচলিত আছে বলিয়াই আমি বলিতেছি। অনেক বিলাতী ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছেন ত, তাহাতে কেবল রোগের বৃদ্ধিই পায়। একবার এই অবধৌতিক ঔষধটি সেবন করিয়া দেখুন, যে অপরের ক্ষুধানল নির্ব্বাপিত করিলে, নিজের ক্ষুধানল উদ্দীপ্তি হয় কিনা, নচেৎ একখানা বিস্কুটের উপর নির্ভর করিয়া আর ক'দিন চলিবে?

আমরা স্বেচ্ছানোদিত ভিক্ষুকগণের কথা একপ্রকার শেষ করিলাম। এখন বিধিপ্রেরিত ভিক্ষুকের কথা বলিতেছি! এক হিসাবে ভিক্ষুক মাত্রকেই বিধি-প্রেরিত বলা যাইতে পারে কারণ ইহাও প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম যে, সমাজের কতকগুলি লোককে শক্তিসামর্থ্য সত্ত্বেও কার্য্যক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষোপজীবী হইতে হয়।

বিধিপ্রেরিত দুঃখী লোকদিগের সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ঈশ্বর যাহাদিগকে কষ্ট দিয়াছেন, তুমি আমি তাহাদের কি করিতে পারি? কেহ আর একমাত্রা চড়াইয়া বলিয়া থাকেন, ভগবান্ যে কষ্ট দিতেছেন সে কষ্টের লাঘব করিতে গেলেও পাপ। এইপ্রকার দর্শন সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে,

তাঁহারা যদি বস্তুতঃই ঐ তত্বের আবিষ্কার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা গরিবদুঃখী ভিন্ন আর কাহারও বিষয়ে ঐ তত্ব খাটাইতে পারেন না। কারণ নিজ গৃহে কাহারও রোগ হইলে, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করেন, তখন কি এই বলিয়া ক্ষান্ত হইয়া থাকেন যে ঈশ্বর উঁহাকে কষ্ট দিতেছেন, ডাক্তার ডাকিলেই পাপ!

অতএব দুঃখীর দুঃখ বিমোচনে পাপ, এই প্রকার দর্শন ঠিক নহে, অন্ততঃ ব্যক্তিগত বিবেক কখনই ঐ মতের পরিপোষণ করে না। বিবেক শক্তি যথা সম্ভব কলুষিত না হইলে, মনোমধ্যে ঐরূপ তর্কের উদ্ভবই হয় না। দুঃখীর দুঃখ বিমোচনে পাপ নাই বলিয়া, আমি এরূপ বলিতেছি না, যিনি দুঃখীর হস্তে একটী পয়সা দান করেন, তাঁহার জন্য স্বর্গ হইতে পুষ্পক রথ প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। তবে আমি একথা বলিতেছি, যখন গরীব দুঃখী লোক দেখিয়া আমাদের হৃদয়ে স্বতঃই দয়ার উদ্রেক হয়, তখন যদি আমরা তদনুযায়ী কার্য্য না করি, তাহা হইলে আত্মার কিয়ৎ পরিমাণে অনিষ্ট সংসাধিত হয়। কারণ ঐরূপ কয়েকবার আলস্য ও ঔদাস্য প্রকাশ করিতে করিতে, পরিণামে যখন দয়ার উদ্রেক এককালে রহিত হইয়া যায়, তখন কি বলিব, আমাদের বিবেক বা আত্মার মৃত্যু ঘটে নাই?

অতএব আমরা এই প্রবন্ধে কেবল তাঁহাদিগকেই সম্বোধন করিতেছি, দুঃখীর দুঃখের প্রতি যাহাদের স্বতঃই দৃষ্টি নিপতিত হয়, উপচিকীর্ষা জন্মে, অথচ আলস্য আসিয়া ক্রিয়াকাণ্ডের ব্যাঘাত জন্মায়। আর যাহারা ইতিপূর্ব্বেই দুঃখীর চীৎকারে বধির হইতে অভ্যাস করিয়াছেন, ক্ষুধার্ত্তের আর্ত্তনাদ, Disturbance of public peace সেক্‌সনের মধ্যে গণনা করিতে শিখিয়াছেন তাঁহাদের নিকট আমার কিছুই বক্তব্য নাই; আর তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু বলিতেও আমার সাহস হয় না, কারণ তাঁহারা মাসিক তিন সহস্র টাকা উপার্জ্জন করেন। তাঁহাদের বিবেক শক্তি নাই বলিলে, কে তাহা বিশ্বাস করিবে? ফলতঃ সমাজের উপর ও নীচে চিরদিনই মৃত ও প্রকৃতির দুর্ব্বহ ভারস্বরূপ; মধ্যস্তরে বিবেক স্রোতঃ প্রবাহিত থাকে বলিয়াই, সর্ব্ব দিক্ রক্ষা পায়।

বস্তুতঃ দান বিষয়ে পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে, ইত্যাদি ফলশ্রুতি অতিরঞ্জিত হইলেও, মুষ্টি ভিক্ষা দিয়া আত্মোন্নতি সাধন করা যায় একথা কখনই অতিরঞ্জিত

নহে। পরের জন্য স্বার্থত্যাগ করিতে না শিখিলে, মনুষ্যত্বে অধিকার জন্মে না ইহা সত্য। অমুক ব্যক্তি দশ টাকা উপায় করিয়া খাইতেছে, এইমাত্র বাক্যই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক হইতে পারে না, কারণ কাক কুকুরাদিও স্ব স্ব আহার যোজনা করিয়া থাকে। অমুক ব্যক্তি অপরকেও আহার দিতেছে এই কথাই আবহমান কাল মনুষ্যত্বের জ্ঞাপক হইয়া আসিতেছে। জগতে সভ্য অসভ্য অৰ্দ্ধ সভ্য সকল প্রকার সমাজেই ভিক্ষাদানের রীতি আছে। ইংলণ্ডের প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তিকেই স্বোপার্জ্জিত ধনের কিয়দংশ গরিবদিগের জন্য দান করিতে হয়। আমাদের দেশে অনেকে এপর্য্যন্ত গরিব দুঃখীকে দিবার জন্য স্বকীয় উপার্জ্জনের অতি অকিঞ্চিৎকর ভগ্নাংশও সঙ্কল্প পূর্ব্বক পৃথক্ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ স্থল। যিনি যাহা উপায় করেন তাহার শতাংশের একাংশ পরিত্যাগে তাঁহার কোন ক্লেশ হয় না; কিন্তু উহা যথা নিয়মে পরিত্যক্ত হইলে তদ্দ্বারা দরিদ্রগণের যে উপকার হয়, তাহা একপ্রকার বর্ণনাতীত। চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে স্বহস্তে কিংবা বাটীর বালক বালিকা দ্বারা মুষ্টিভিক্ষা দান করিলেই অশেষ প্রকার মঙ্গলের সূচনা হইতে পারে।

শ্রীকেদারনাথ বিদ্যাবিনোদ।

আমাদের দুঃখ-কাহিনী।

(২)

আমাদের দুঃখ দারিদ্র্য কষ্ট অভাবের বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া সর্ব্বদা সাধারণ ভাবে যে সকল কথা উত্থাপিত হইয়া থাকে সে গুলি দেখা যাউক। পূর্ব্বে এক প্রকার বলা হইয়াছে, অনেকের মুখে এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে রাজার দোষে আমাদের এত ক্লেশ,—ইংরাজ এদেশে আসিয়া আমাদের সকল প্রকার দুঃখের কারণ হইয়াছেন। অনেকের মতে ইংরাজ জাতি ভারতবর্ষ অধিকার না করিলে আমরা স্বর্গ সুখ ভোগ করতঃ মহানন্দে দিন কাটাইতাম; ইংরাজ আসিয়া আমাদিগকে দারুণ দুঃখ ক্লেশের নরকে ফেলিয়া তামাসা দেখিতেছেন। ইংরাজ শাসনে রাজার জাতি ও প্রকৃতি বর্গের মধ্যে একটা বিকট বিরুদ্ধ সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত ও

সশঙ্কিত থাকা হেতু আমাদের চিত্তেরভাব দিন দিন ম্লানতর হইতেছে, এবং তজ্জন্য আমরা স্ফূর্ত্তিহীন ও নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছি;—আগে গ্রাসাচ্ছাদন সস্তা ছিল, এখন ভয়ানক দুর্ম্মূল্য হইয়া জন সাধারণের অন্ন বস্ত্রের দারুণ কষ্ট হইয়াছে, কেবল ইংরাজেরই জন্য;—আমাদের চাল-চলন বিগ্‌ড়াইয়া বাবুগিরি বাড়িয়াছে, তদ্ধেতু সর্ব্বদা বিলক্ষণ অনটন; ইংরাজের সহিত মিসিয়া;—ইংরাজের নিকট রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে পাশ্চাত্য ধরণের উদার শিক্ষা পাইয়া আমাদের মেজাজ গরম আগুণ ইহয়া উঠিয়াছে, অথচ সিমলা দার্জ্জিলিং গিয়া কিছু দিন ঠাণ্ডা ভাবে থাকিবার সংস্থান করিতে পারি নাই;—ইংরাজী শিক্ষা-প্রাপ্ত হইয়া পৈতৃক ব্যবসায়াদি পরিত্যাগ করিয়াছি, অথচ রাজা আমাদের কাজ যোগাইয়া উঠিতে পারেন না, কাজেই উদরান্নের জন্য এত ছুটাছুটি করিয়াও তাহা জুটাইয়া উঠিতে পারি না;—পাশ্চাত্য বিদ্যা দ্বারা মস্তিষ্কের বিকার উপস্থিত হইয়া আচার ভ্রষ্ট ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইয়াছি, ইংরাজরাজের বিবেচনার ত্রুটিতে;—মূল কথা, সামান্য গৃহস্থালীর ব্যাপার হইতে ঈশ্বর পরলোক সম্বন্ধীয় জ্ঞানাদি পর্য্যন্ত দৈহিক, পারিবারিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, সকলদিক ইংরাজের দোষে নষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। শুদ্ধ চাসা ভূসা মূর্খ লোকেরা যদি এরূপ দুঃখ করিত, কোন কথা ছিল না; কিন্তু দেশের অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোকের মুখেও যখন এবম্প্রকারের বিলাপ শুনিতে পাওয়া যায় তখন বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য, কত খানি ইংরাজের দোষে এবং কত খানি আমাদের নিজেদের দোষে বর্ত্তমান দুরবস্থায় পতিত। তবে, একটা কথা এখানে বলিলে অন্যায় হয় না,—দুঃখ কষ্ট যখন ঘাড়ে পড়িয়াছে তখন তাহা দূর করিবার চেষ্টা না করিয়া সর্ব্বদা কেবল কপালে করাঘাত করতঃ অপরকে গালি-মন্দ দেওয়া নিতান্ত কাপুরুষের লক্ষণ। যে দিক দিয়া যাহার দ্বারা দুঃখ আসুক না কেন, নিজের দুষ্কৃতি ব্যতীত অন্য কিছু উহার মুখ্য কারণ হইতে পারে না। সে স্থলে অহরহ "পোড়া বিধাতা" "পোড়া রাজ জাতি" প্রভৃতিকে তজ্জন্য অভিসম্পাত করা কি নৈতিক অবনতির প্রমাণ নয়? সবল ক্ষমবান উচ্চমনা পুরুষ নিজের ক্লেশের জন্য অপরকে দায়ী করিতে প্রয়াস পান না। তাঁহার উপদেশ এই;—যদি বেশ বুঝিয়া থাক, অন্যের ত্রুটি জন্য কষ্টভোগ করিতেছ, তৎ প্রতিবিধানের চেষ্টা পাও; প্রতিবিধান করা যদি স্বীয় ক্ষমতার অতীত বোধ কর, নীরবে বসিয়া হিত চিন্তায়

রত হও; শিশুর ন্যায় আব্দার রোদন জোয়ান-মরদের ভাল দেখায় না,—নাকে কান্না কেবল অক্ষম অবলারই কাজ।

যাহা হউক, এখন ক্রন্দনের ধুয়া গুলি একে একে পর্য্যালোচনা করিলে ভাল হয়। প্রথমটী যে গুরুতর ব্যাপার সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং উহা যে নিতান্ত অসঙ্গত তাহা বলা যাইতে পারে না। আর্য্যশাসনকালে ত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা ছিল। রাজা ও প্রজার মধ্যে ওরূপ সুমধুর সম্বন্ধ কোন কালে অন্য কোন দেশে ছিল বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। প্রজারঞ্জন রাজার প্রধান কর্ত্তব্য ছিল এবং স্বয়ং রাজ্যেশ্বর যখন ওরূপ ব্রতধারী ছিলেন তখন রাজ পরিবার রাজামাত্য বর্গ হইতে অতি সামান্য রাজকর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সবাই সর্ব্বদা যে ন্যায়ের পথে স্থির থাকিয়া ছোট বড় সকল শ্রেণীর প্রজাকে সন্তুষ্ট রাখিতে কায়মনোবাক্যে যত্ন পাইতেন, এ কথা বলা বাহুল্য। মুসলমান জেতৃগণ বিজাতীয় ও বিধর্ম্মী হইলেও সম্পূর্ণরূপে প্রাচ্য ছিলেন, এবং জিত ভারতবর্ষকে নিজেদের আবাস ভূমি করিয়া লওয়া হেতু, ক্রমে দেশের লোকের সহিত ষোল-আনা মিশিয়া গিয়া ছিলেন, এমন কি কেবল মাত্র ধর্ম্ম সম্বন্ধে মতবিশ্বাস ব্যতীত আর কোন বিষয়ে জেতৃজিতে কিঞ্চিন্মাত্রও পার্থক্য লক্ষিত হইত না। সুতরাং তাঁহাদের আমলে প্রাচীন প্রাচ্য প্রথানুযায়ী একজন সাধারণ প্রজা অনায়াসে রাজ্যেশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহার সকল প্রকার দুঃখ জানাইতে পাইত, এবং সম্রাটও সর্ব্বসাধারণের আদ্দাশ মনোযোগের সহিত শুনিয়া প্রতিবিধানে যত্ন করিতেন। এইরূপ নানা কারণে আমাদের দেশে কোন কালে রাজভক্তির অভাব দেখা যায় নাই। রাজার বিরুদ্ধে প্রকৃতিবর্গ কখন কোন প্রকার উপদ্রব করিয়াছে, এমন কথা আমাদের (হিন্দু মুসলমান উভয়ের) কোন গ্রন্থাদিতে প্রকাশ নাই। রাজা যেমন সর্ব্বদা প্রজাহিতে রত, প্রজবর্গও তেমনি বিশ্বাস করিতেন, রাজার সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হেতুই তাঁহাদের সৃষ্টি। কোন প্রকার যুদ্ধাদি ব্যাপারে রাজা যদি পলায়িত বা হত হইলেন, অমনি সৈন্য সামন্ত ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল —যেন যুদ্ধের আর আবশ্যকতা নাই; অর্থাৎ কেবলমাত্র যাঁহার স্বার্থের জন্য যুদ্ধ চলিতেছিল, তিনিই যখন পলাতক বা মৃত, তখন আর কাহার বা কিসের জন্য যুদ্ধ করা হইবে? নরপতি স্বয়ং ভগবানের অবতার, তাঁহার সেবার্থ প্রজা-বর্গের জন্ম, ভারতবাসীর ইহাই প্রচীন ধারণা। ভূপাল যে বংশের যে জাতির

বা যে ধর্ম্মের হউন না কেন, সে বিষয়ে বিচার করিবার অধিকার প্রজার নাই, কেবল তিনি রাজা বলিয়া দেবতার ন্যায় পূজার্হ।* যবন নৃপতিগণও আর্য্য ভূপালগণের ন্যায় সমান ভাবে ভগবানের অংশাবতার, জাতি বা ধর্ম্মভেদে উক্ত বিষয়ে কোন প্রকার প্রভেদ হইতেই পারে না, ইহা ভারতীয় প্রকৃতিবর্গের ধর্ম্মমত ;—"দীল্লী শ্বরোবা জগদীশ্বরোবা।" তাহার প্রমাণ।

মুসলমানাধিকারের পরে ইংরাজরাজের আবির্ভাব। সুবিখ্যাত কোম্পানি বাহাদুর তখন মুলুকের মালিক। ঐ সময়ে যদিও দেশের লোক কখন রাজাকে চক্ষে দেখে নাই, তথ্যাপি জান্ কোম্পানি নামক সুদুর দেশস্থ কোন ব্যক্তি বিশেষকে ভারতের নরপাল জানিয়া তাঁহাকে দিল্লির সম্রাটের ন্যায় ভক্তি করিত। অনেকে বলেন, বিখ্যাত ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে যত কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহা তন্মধ্যে একটী প্রধান। ভারতবর্ষের লোক কোম্পানি বাহাদুরকে যত দিন এক জন প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতি বলিয়া জানিত, তত দিন তাহাদের শ্রদ্ধা ভক্তি বৃটীশরাজের প্রতি অটুট ছিল, কিন্তু যখন জানিল যে জান্ কোম্পানি নামে কোন ব্যক্তি বিশেষের অস্তিত্ব নাই, এই বিশাল ভারত সম্রাজ্য এক দল অর্থ লোলুপ বণিকের দ্বারা শাসিত হইতেছে,

---

* কোচ-বিহার প্রদেশে একটি গল্প প্রচলিত আছে। বেশী দিনের কথা নয়, বর্ত্তমান মহারাজার প্রপিতামহের আমলে তাঁহার জনৈক সামান্য বেতনের ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীর গৃহ-প্রাঙ্গনে কোন রাজ জাতি প্রবেশ করায় তিনি ঘরের সমস্ত পানাহারের সামগ্রী মৃণ্ময় পাত্রাদিসহ ফেলিয়া দিয়াছিলেন। ঐ কথা রাজার কাণে উঠিলে তিনি স্বয়ং উহা পরীক্ষা করিতে যান। নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ মধ্যাহ্নে আচমনান্তে আহারে উপবিষ্ট, এই সুযোগে রাজা একদিন হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত। ব্রাহ্মণ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে আহার সমাপন করতঃ নরপতিকে অভ্যর্থনা করিলেন। ইহাতে রাজা বিশেষ প্রীত হইয়া পূর্ব্বোক্ত ঘটনা উল্লেখ করতঃ বলিলেন,—"আমি যে শুনিয়াছিলাম, আপনি আমাদের কোচম্যানকে অসদৃশ অনার্য্য বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন, স্বচক্ষে দেখিলাম, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা।" তদুত্তরে ব্রাহ্মণ অকুতোভয়ে বলিলেন,—"রাজন্! উক্ত ঘটনা সম্পূর্ণ সত্য। আপনাতেও আপনার স্বজাতীয় ব্যক্তিগণে বিলক্ষণ প্রভেদ, বাস্তবিকই উঁহাদের সংস্পর্শে সমস্ত অপবিত্র হইয়া থাকে; আর আপনার শুভাগমনে আমার গৃহ পবিত্র, সমস্ত দ্রব্যাদি পবিত্র, আমি নিজে পবিত্র হইলাম; যে হেতুক আপনি নরেশ সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের অংশে আপনার জন্ম, আপনার জাতি-বর্ণ বিচারে আমার অধিকার কোথায়?"—ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের ইহাই অনুজ্ঞা।

তখন সুদ্ধ তাহাদের হৃদয়ের ভক্তি শ্রদ্ধা বিদূরিত হয় নাই, তৎস্থানে বিলক্ষণ বিদ্বেষ ও ঘৃণা সঞ্চারিত হইয়া সিপাহী ও প্রজাবর্গকে বিদ্রোহে প্রোৎসাহিত করে। বিপ্লবের কালে যে সকল লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল তাহার বর্ণনার স্থান ইহা নহে, তবে সংক্ষেপে এই মাত্র বলিলে দোষের হয় না—যে প্রথমে "অসভ্য ধর্ম্মহীন বর্ব্বর" আমরা ক্রোধ পরবশ হইয়া শ্বেতাঙ্গ মাত্রের প্রতি যেরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলাম, শেষকালে "সুসভ্য ধর্ম্মপ্রাণ খৃষ্টান" ইংরাজ প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ হেতু আমাদের আবালবৃদ্ধ-বণিতার প্রতি ততোধিক নৃশংসতা প্রকাশ করিতে কিঞ্চিন্মাত্র ক্রুটি করেন নাই। অবশ্য এ কথা বলি না যে উভয় পক্ষের মধ্যে একজনও হৃদয়বান ব্যক্তি ছিলেন না; কিন্তু ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না যে দুই দলের অধিকাংশই ক্ষিপ্তের ন্যায় কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানহীন হইয়াছিলেন। অপাত্রে বিশ্বাস ভক্তি স্থাপন করতঃ প্রাণপ্রিয় মাতৃ ভূমি সমর্পণ করিয়া নিজে চোর হইলাম, ভাবিয়া এক পক্ষ রোষোন্মত্ত; অপর পক্ষের রাগ যাহাদিগকে কৃপাপাত্র অর্ব্বাচীন কালা আদ্‌মী বলিয়া চিরকাল অগ্রাহ্য করিয়া আসিয়াছি তাহাদের এত বড় স্পর্দ্ধা সে দেবোপম শ্বেতাঙ্গের প্রতি কৃষ্ণ হস্ত উত্তোলন করে।

যিনি যাহাই বলুন, ইংরাজ অস্ত্রবলে ভারত অধিকার করেন নাই, উঁহাদের নৈতিক বলের প্রতাপে মুগ্ধ হইয়া মন্ত্রাহতের ন্যায় নিরীহ ভারতবাসী সুশাসন আশায় হীনতেজ মুসলমানের নিকট হইতে এই বিপুল সাম্রাজ্য বৃটীশরাজের হস্তে সমর্পণ করত নিশ্চিন্ত হইয়াছিল; ঐ কার্য্যের মূলে বিশ্বাস ও প্রেম ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। কোম্পানি বাহাদুরের লোল জিহ্বার দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপ কালে সেই বিশ্বাস ও প্রেমের স্থলে ঘোর অবিশ্বাস ও ভয়ঙ্কর বিদ্বেষ আসিয়া উপস্থিত হয়। সিপাহী-বিদ্রোহ তাহারই প্রমাণ। ঐ খান হইতে ইংরাজ রাজও ভারতীয় প্রজার মধ্যে সম্বন্ধ কটুতর হইতে চলিল। ইংরাজের যে ধারণা ছিল, ভারতীয় প্রকৃতিবর্গ নিতান্ত নিস্তেজ, সহস্র অত্যাচারেও উত্তেজিত হইবার নহে, তাহা বিদূরিত হওয়ায় মিঠে-কড়া ব্যবহারের সূচনা আবশ্যক বোধ হইল। যাহা হউক বিদ্রোহান্তে শান্তি সংস্থাপিত হইলে বৃটনেশ্বরী স্বয়ং রাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ করিলেন। তখন কোম্পানির অত্যাচার সমস্ত বিস্মৃত হইয়া আবার দেশের লোক উক্ত প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলাকে সাক্ষাৎ ভগবতীর ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে

লাগিল।* কিন্তু কোম্পানির আমলে ইংরাজ বণিক-সম্প্রদায় ও তাঁহাদের কর্ম্মচারীগণ নানা কারণে গরজে পড়িয়া দেশীয় লোকের সহিত মিলিয়া মিশিয়া তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন দ্বারা সে ভাবে আত্মীয়তা সংস্থাপন করিতে চেষ্টা পাইতেন, ভিক্টোরিয়ার আমলে অনেকগুলি হেতু একত্রিত হইয়া সেটা ধীরে ধীরে কম হইতে লাগিল। তন্মধ্যে একটী প্রধান কারণ এই যে পূর্ব্বে এক বৎসর বা ততোধিক কালে ইংলণ্ড হইতে আসা বা এখান হইতে তথায় যাওয়া ঘটিত; ক্রমে সেই সুদীর্ঘ কালের স্থানে এখন কেবলমাত্র দুই সপ্তাহ দাঁড়াইয়াছে। সেকালের ইংরাজগণ এ দেশে আসিয়া পুনরায় শীঘ্র স্বদেশে ফিরিবার আশা ভরসা কম রাখিতেন, কাজেই বাধ্য হইয়া এ দেশের লোকের সঙ্গে মিশিতে হইত, তখন শ্বেতাঙ্গও সংখ্যাতে অতি অল্প ছিলেন। তদবস্থায় অনেকে দেশীয় স্ত্রী গ্রহণ করতঃ এখানে গৃহস্থালী পর্য্যন্ত পাতিয়াছিলেন। ক্রমে ইউরোপীয়ের সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং যাতায়াতের কাল সংক্ষেপ ও সুবিধা বশত উহা প্রত্যহ এত বাড়িতেছে যে এখন কালার সহিত গোরার আর কোন সম্পর্ক না রাখিলেও চলে। বর্ত্তমানের ব্যবস্থানুযায়ী এক দল আসিতেছেন, এক দল যাইতেছেন, কাহারও দেশের বা দেশের লোকের সহিত কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই। একমাত্র উদ্দেশ্য অর্থ সংগ্রহ, তাহা যে কোন প্রকারে সাধিত হইলেই কাজ হইল। এই নিয়ম মিলিটারি, সিবিলিয়ান, চাকর, নীলকর প্রভৃতি সকল শ্রেণীর শ্বেতাঙ্গের প্রতি খাটে। সামান্য চাকর বাকর দেশ হইতে আনিতে গেলে বিস্তর খরচ এবং এরূপ হুকুম-জারি চলে না, কাজেই দেশীয় ভৃত্যের প্রয়োজন, নচেৎ ওটুকুও দরকার ছিল না, আপিসাদিতে ক্রমে ইংরাজ ফিরিঙ্গি যত প্রবেশ করাইতে পারা যায় তাহার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে; কার্য্য পরিণত হইলেই চূড়ান্ত হয়।

---

* তাঁহার মৃত্যুর পর শোকপ্রকাশে উহা বিলক্ষণ প্রমাণিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য কোন দেশে এরূপ ব্যাপার দেখিতে পাওয়া অসম্ভব। বিজাতীয় বিধর্ম্মী সম্রাটের মৃত্যুতে জিত কোন জাতি এরূপ ভাবে শোক করিতে প্রবৃত্ত হয় ইহা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। নরপতির প্রতি এ প্রকার শ্রদ্ধা ভক্তি ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য কোন দেশে সম্ভবে না? তবুও রাজপুরুষগণ আমাদের সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে নানারূপ প্রলাপ বকিয়া থাকেন, এবং অধুনা সিডিশন আইন প্রয়োগ করিয়াছেন; ইহাই দুঃখ।

একে ত ইংরাজের সহিত আমাদের সকল বিষয়ে এত পার্থক্য যে কেবল মাত্র পায়ে হাঁটা ব্যতীত আর কোথাও সম্পূর্ণ ঐক্য ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। এক পক্ষে পায়ে না হাঁটিয়া মাথায় হাঁটিলে কোন বিষয়ে ষোল আনা বৈপরীত্যের অভাব থাকিত না। এরূপ ক্ষেত্রে যদি উভয়ের মধ্যে একটু মিষ্টভাব না থাকে, নিয়ত নানা প্রকার অনিষ্টেরই আশঙ্কা। একথা রাজকর্ম্মচারীগণের যেরূপ ভাবা উচিত, আমাদেরও তেমনি চিন্তার বিষয়। আকৃতি, প্রকৃতি পানাহার, পোষাক পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, রীতি নীতি, জ্ঞান ধর্ম্ম প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে সম্যক পার্থক্য থাকা সত্বেও ভারতীয় জীব সমুহ যে ইট পাথর সদৃশ সংজ্ঞাহীন জড়পিণ্ডবৎ অসাড় সামগ্রী নয়; ইউরোপীয় ধুরন্ধরগণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও তাঁহাদের ন্যায় মনুষ্যপদবাচ্য, একথা কোন জীবতত্ব বিশারদ পণ্ডিত এ পর্য্যন্ত অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

বর্ত্তমানের সম্বন্ধে একটী উদাহরণ দ্বারা পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা পাইব।—বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী কোন বিশিষ্ট ভদ্রলোক ডাক্তার সে দিন একটী গল্প করিলেন, শুনিলে পাঠকগণ সহজে বুঝিতে পারিবেন, অবস্থাটা কি। তিনি কার্য্য বশতঃ কোন স্থানেররেল-ষ্টেশনে গিয়াছিলেন, তথায় দেখিলেন জনৈক আন্‌কোরা ইংরাজ যুবক বোম্বাই হইতে টাটকা বিলাতীভাবে উপনীত হইয়া, দেশীয় ভাষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা হেতু বিষম মস্কিলে পড়িয়াছেন। ডাক্তার বাবু যথাসাধ্য সাহায্য দ্বারা তাঁহার গম্য স্থানে পহুঁছিবার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়াতে সাহেব বিশেষ প্রীত ও বাধ্য হইয়া তাঁহাকে উহার সহিত কর্ম্মস্থানে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বলা বাহুল্য সাহেবপুঙ্গব একজন নূতন সিবিলিয়ান। মাসখানেক পরে ডাক্তার বাবু কোন কার্য্যোপলক্ষে সদরে গমন করায় ঐ অবকাশে সাহেবের কুঠিতে যান। তথায় যাহা দেখিলেন, শুনিলে দারুণ কষ্ট হয়। অবশ্য সাহেব তাহাকে দেখিয়া যথোচিত আদর অভ্যর্থনা করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু খানসামা, বেহারা এবং অধীনস্থ ভদ্র কর্ম্মচারীর প্রতি অনবরত যেরূপ অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, তাহাতে অভ্যাগত ভদ্রলোকের নিতান্ত মর্ম্মপীড়া উপস্থিত হইল। এত অল্পকালে এরূপ খারাপ কথা সমূহ কেন শিখিলেন, এবং কি প্রকারে শিখিলেন, প্রশ্ন করাতে সাহেব অতি সরল ভাবে বলিলেন, ওগুলি যে

অশ্লীল মন্দ কথা বা কুৎসিত গালাগালি তাহা তিনি জানেন না, তাহার উপর-ওয়ালা সাহেব তাহাকে উপদেশ দিয়াছেন যে দেশীয় ভদ্র ও ইতর সমস্ত চাকর বাকর নিতান্ত অলস, মিথ্যাবাদী, জুয়াচোর, লোভী, ঘুস্‌খোর; তাহাদিগের নিকট ঠিক কাজ লইতে গেলে উক্তরূপ কথাবার্ত্তা ব্যবহার করা একান্ত কর্ত্তব্য; তাই তিনি কেবল মাত্র উপদিষ্ট হইয়া ওরূপ করিতেছেন। তদ্ভিন্ন ও সকল কথা যে ভদ্রোচিত নহে তাহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন না, কারণ তাহা হইলে তাহার বন্ধু কখনই ওরূপ শিক্ষা প্রদান করিতেন না। এদেশে আসিয়াই যে ঐ প্রকার উপদেশ প্রাপ্ত হন, এমত নহে; প্রথম পাশ করিবার পর যে কাল কেম্ব্রিজ ও অক্ষফোর্ডে শিক্ষা প্রাপ্ত হন সে সময়েও কতিপয় ভারত-ফেরত শিক্ষক দ্বারা ভারতীয় প্রজার চরিত্র সম্বন্ধে বিলক্ষণ জ্ঞান প্রদত্ত হইয়া থাকে। একব্যক্তি যিনি আজ কাল জেলার হর্ত্তাকর্ত্তা হইয়া অত্যাচার উৎপীড়নে বিশেষ যশোলাভ করিতেছেন, তিনি কেম্ব্রিজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভারতের জন্য রওনা * হইবার পূর্ব্বে তাহার জনৈক ব্রাহ্মণ বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—এখন তোমাদের দেশে যাইতেছি। সেখানকার প্রকৃতিবর্গ যেরূপ নষ্ট-দুষ্ট শুনিলাম, তাহাতে লৌহ দণ্ডের শাসন ব্যতীত তাহাদিগকে দুরন্ত রাখা কঠিন, একটু মোলায়েম ব্যবহার করিলে তাহারা নাকি বড়ই অত্যাচার করিয়া থাকে।” এরূপ মন্ত্র ইহাদের কর্ণে সেখান হইতেই দেওয়া হয়, এখানে যে উপদেশ পান তাহা জ্বলন্ত অগ্নিতে ইন্ধন দান মাত্র। অবশ্য ভারতের মাটীরও অনেকটা দোষ আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, তৎসম্বন্ধে আর একটী উদাহরণ দিব।

কলিকাতার কোন প্রধান বিলাতী কাটাপোষাক- ওয়ালার দোকানে জনৈক ইংরাজ কিছু দিন চাকরী করেন, পরে দেশে ফিরিয়া গিয়া লণ্ডনে নিজে এক দোকান খুলিয়াছিলেন। আমি তাঁহার একজন খরিদদার ছিলাম। এক দিন এই ব্যক্তি কথায় কথায় আমাকে বলিলেন;—তোমাদের দেশ

* এই ব্রাহ্মণ বহুকাল হইতে বিলাতবাসী হইয়াছেন। সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার সময় উক্ত ইংরাজযুবক ইঁহার নিকট ইংরাজী রচনা সংশোধন করাইয়া লইতেন; সুতরাং তৎকালে খুব সম্মান করিতেন। তখন ভারতের লোকের প্রতি বেশ শ্রদ্ধা ছিল; কিন্তু শেষটা কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন।

কি ভয়ঙ্কর স্থান। ইংরাজ বিগ্‌ড়াইবার ওরূপ জায়গা পৃথিবীতে আর একটী নাই। আমি এখানে যাহাদের সঙ্গে এক স্কুলে এক ক্লাসে পাঠ করিয়াছি, বাল্যাবধি যাহাদের সহিত বিশেষ ঘনিষ্টতা সেরূপ কয় ব্যক্তির সহিত কলিকাতার পথে ও গড়ের মাঠে দেখা হইল, আমি আনন্দ সহকারে তাহাদিগকে সম্ভাষণ করিতে গেলাম, অথচ তাহারা আমাকে এড়াইবার চেষ্টা করিল। আমি-ত তাহাদের ব্যবহারে হতবুদ্ধি হইলাম। শেষে বুঝিলাম, তাহারা সেখানে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, আরি সামান্য দরজির কাজ করি, এই জন্য আমাকে খাটো জ্ঞান করিয়া তাহারা আমার সহিত সমান ভাবে আলাপ করিতে কুণ্ঠিত। তদবধি আমি উহাদের নিকটেও যাইতাম না। আমি অন্যান্য উপনিবেশও দেখিয়াছি, কিন্তু কোথাও এরূপ তারতম্য লক্ষিত হয় নাই।" *

একজন খাশ বিলাতি ইংরাজ, যিনি কখন প্রাচ্যভূমিতে পদার্পণ করেন নাই, তাঁহার জ্ঞান স্বতন্ত্র,—তিনি জানেন, পক্ষহীন দ্বিপদ মনুষ্য-নামধারী জীবমাত্রেই মনুষ্যোচিত ব্যবহার পাইবার সম্পূর্ণ দাবী রাখে; সেই ন্যায্য প্রাপ্য হইতে তাহাকে কোন প্রকারে বঞ্চিত করিলে মানুষ ও ভগবান্ উভয়ের নিকট বিশেষরূপে অপরাধী হইতে হয়। এ বিষয়ে শ্বেত, কৃষ্ণ, ধূসর, পিঙ্গল প্রভৃতি বিচার করিবার কাহারও অধিকার নাই, যিনি করেন তিনি অমানুষ।—বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তিমাত্রেই অসঙ্কুচিতচিত্তে এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতে প্রস্তুত; এবং যিনি দ্বিধাশূন্য হৃদয়ে এ কথাও বলিবেন যে একই ইংরাজ বিলাতে ও ভারতে ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন।

যাঁহারা এদেশে আসিয়া রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন তাঁহারা স্বদেশে কোন বিশেষ কারণে বাধ্য হইয়া স্বীয় দুষ্ট প্রকৃতি চাপাদিয়া থাকিতেন; সেখানকার

---

*হতভাগা মহল্লার রাও গুইকুমারের বিচারকালে বরদারতৎকালিক রেসিডেণ্ট সাহেব অন্যতম বিচারক জয়পুরাধিপতি মহারাজা রামসিংহকে কাগজপত্র বুঝাইবার সময় একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"কর্ণেল ফেয়ার একজন ইংলিসম্যানে, সুতরাং তাঁহার জমানবন্দী আপনারা অবিশ্বাস করিবেন কি প্রকারে? যে হেতু ইংলিশম্যান কখন মিথ্যা বলিতে পারে না।" রামসিংহ তাঁহাকে অতি সমীচীন উত্তর দেন,—"প্রথমতঃ বরদাধীশ্বর মলহল্লার রাওয়ের অপেক্ষা একজন রেসিডেণ্টের কথা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। আর, যদি এমন হয় যে ইংলিশম্যান মাত্রই সত্যবাদী যুধিষ্ঠির তাহা হইলে বোধ হয় আপনাদের দেশের আদালত সমুহ উঠিয়া গিয়া থাকিবে।

বাঁধা গরু এখানে ছাড়া পাইয়া ওরূপ দাপট। সভ্যতা, ভব্যতা, ভদ্রতা, নম্রতা, বিনয়াদি সদ্‌গুণ বিলাতি সমাজের এ প্রকারে অস্থিমজ্জাগত হইয়াছে যে আপামরসাধারণ সবাই সর্ব্বদা ধীর, স্থির, শান্ত, সমাহিত ভাবে সকলের সহিত ব্যবহার করিতে আজন্ম শিক্ষিত; সে দেশে এবম্প্রকার ঔদ্ধত্য এক সম্পূর্ণ অভিনব দৃশ্য, বাতুলতা অপেক্ষাও অজ্ঞগুবি জিনিস; কাজেই হাস্যাস্পদ হইবার বিষয়। সুতরাং এখানে যেরূপ উচ্ছৃঙ্খল ভাবে অনেকে চলিয়া থাকেন যে সেখানকার ভদ্র সমাজে তাহা একেবারেই অসম্ভব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

কংগ্রেস।

হর্ষ না বিষাদ ?

আবার সেই কংগ্রেস। বড় দিনের ছুটীতে, বড় আশায়, আমরা আবার সেই মহামণ্ডপে মহাসমিতিতে সম্মিলিত হইয়া, মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, হোমে আহুতি দিব। ভক্ত যেমন ভগবান্‌কে ডাকিয়া বলে, "প্রভু রক্ষা কর, প্রভু রক্ষা কর," তেমনি করযোড়ে করুণস্বরে, আমাদিগের সুখদুঃখের ঈশ্বর, আমাদিগের ভাগ্যের নিয়ন্তা, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে আবার আমরা ডাকিব। আবার কখন বা, ইংরাজি মহাসমিতির পদ্ধতির অনুকরণের ভ্রমে পড়িয়া, আমরা যে বিজিত অধম জাতি, আমরা যে কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গের কৃপার ভিখারী, তাহা ভুলিয়া গিয়া, বৃথা বাগ্মিতার মনোমোহন উচ্ছ্বাসে, কংগ্রেসের রঙ্গভূমিতে, স্বাধীনতা-প্রাণ বর্ক স্বাধীনতা-জীবিত পিটের অভিনয় করিয়া উল্লাসিত হইব। ক্ষণকালের জন্য স্বপ্ন দেখিব, আমরা সকলেই স্বদেশপ্রেমিক, স্বদেশহিতব্রত, আমরা এক এক জন নিঃস্বার্থ বীর, স্বদেশের মঙ্গলকল্পে জীবন উৎসর্গ করিয়া, আজি স্বদেশ-প্রেম-সাগর-সঙ্গমে উপনীত হইয়াছি। আমরা তিন দিন মধুর দিবা-স্বপ্ন দেখিব, যে স্বদেশ মঙ্গলোদ্ধারের জন্য কেবলমাত্র সুসজ্জিত বিশালমণ্ডপে একত্র হইয়া বক্তৃতা করা আবশ্যক, আর কেহ সুন্দর সুললিত উদ্দীপক ভাষায় বক্তৃতা করিলে, করতালী ধ্বনি করা প্রয়োজন। আরও প্রত্যক্ষ করিব যে—

এই করতালী ধ্বনির ইন্দ্রজালে, গভীর নিমগ্ন, শোচনীয় অধঃপতিত স্বদেশ, সোঁ সোঁ, করিয়া সগৌরবে উর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে। সমুদয় বৎসর স্বদেশের মঙ্গলের জন্য কিছু করি নাই, অনশন-মরণোন্মুখ প্রতিবেশীকে এক মুষ্টি অন্ন দেই না, মূর্খ দরিদ্রের শিক্ষার জন্য এক বৎসরের মধ্যে এক ঘণ্টাকাল ক্ষেপণ করি নাই, নিজের গ্রামের স্বাস্থ্য কিসে ভাল হয়, তজ্জন্য এক বৎসরের মধ্যে ক্ষণকাল চিন্তা করিবার সময় করিতে পারি নাই; আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, আমি ভ্রমেও এই এক বৎসরের মধ্যে নিঃস্বার্থভাবে স্বদেশীর কোন উপকার করি নাই; তথাচ—আমি কংগ্রেসে এমনই বিশ্বাসবান্ তাহাতে আমার এমনি অচলা ভক্তি যে—আমি যথার্থই বিশ্বাস করি, এই কংগ্রেসে আমার যোগ দেওয়াতে আমাদিগের দেশের উদ্ধার হইবে। আমি যদি চাকরী করি, আমি সাহেবের নিকট কংগ্রেসের ভূয়সী নিন্দা করিব, এমন কি আমার দুই এক জন বন্ধু কংগ্রেসভক্ত, ইহা সাহেবকে গোপনে জানাইয়া, তাহাদিগের অনিষ্ট করিয়া, নিজে সাহেবের প্রিয় হইতে চেষ্টা করিব—তথাপি কংগ্রেসে আমার ভক্তি অচলা। আমি যদি উকীল হই, তাহা হইলে আমি কংগ্রেসে প্রকাশ্যভাবে যোগদান করিব, পারিত বক্তৃতাও করিব; কিন্তু মোকদ্দমায় দেশ উৎসন্ন যাইতেছে, যাউক; মোকদ্দমার সংখ্যার হ্রাস হয় তাহার চেষ্টা কখন করিব না, কারণ তাহাতে আমার আয়ের হ্রাস হইবে—বরঞ্চ যাহাতে মোকদ্দমা বৃদ্ধি হয়, তাহাই করিব; দেশের মঙ্গলের জন্য স্বার্থত্যাগের আবশ্যক নাই—কেবল কংগ্রেসে যোগ দিলেই, কেবল বক্তৃতাতে করতালী ধ্বনি করিলেই, দেশের মঙ্গল হইবে, ইহা আমার ধ্রুব বিশ্বাস। আমি বড় জমিদার, সহস্র সহস্র প্রজার সুখ দুঃখ আমারই হস্তে; দরিদ্র প্রজার হিতের জন্য কংগ্রেসে মিলিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট দয়া ও সুবিচার প্রার্থনা করিতেছি। কিন্তু আমার নিজের প্রজাগণকে আমার কর্ম্মচারীগণের দ্বারা নিপীড়ন করিয়া তাহাদিগের অর্থ শোষণ করিব; আমার নিজের ক্ষমতা দ্বারা, নিজের সম্পত্তিতে, নিজের হাজার হাজার প্রজার যে দুঃখ মোচন করিতে পারিব, তাহা মোচন করিবার আবশ্যক নাই; তাহা করিব না; আমার পক্ষে আবশ্যক, এবং দেশের মঙ্গলের জন্য আবশ্যক, কেবল কংগ্রেসে যোগ দিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রজার মঙ্গলের জন্য তারস্বরে চীৎকার করা। আমি শিক্ষক, কুশিক্ষায় দেশে যে সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহার সাধ্যমত প্রতীকার করিবার

চেষ্টা করা আমার কর্ত্তব্য নহে, ছাত্রগণ অধঃপাতে যায় যাউক, তাহাতে ক্ষতি কি, আমি কংগ্রেসে যোগ দিব, তাহাতে দেশের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হইবে। সংক্ষেপে, আমরা যদিও ইতিহাসে পড়িয়াছি ও চতুর্দ্দিকে দেখিতেছি যে, স্বার্থত্যাগ ব্যতীত, চরিত্রবল ব্যতীত, কখন কোনও দেশের উন্নতি হয় নাই—তথাপি আমরা বিশ্বাস করিব, কেবল ভারতবর্ষে বিনা স্বার্থ ত্যাগে, বিনা চরিত্রবলে, ভারতবাসিগণ উন্নতি লাভ করিবে—অথবা আমরা বিশ্বাস করিব, বক্তৃতা করা, এবং বক্তৃতা শ্রবণ করাই স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা ও চরিত্রবলের অসংশয়িত নিদর্শন।

এ ভ্রম আমাদিগের আর কত দিন থাকিবে! প্রত্যেকের জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে যে জাতীয় জীবন ঘটিত হইতেছে, এই স্বতঃসিদ্ধ কথা আমরা আর কত দিন ভুলিয়া থাকিব!

কেবল "যাচ্ঞা," কেবল "বিনীত প্রার্থনা" দ্বারা, কবে কোন জাতি উন্নতি লাভ করিয়াছে? আর, যদি প্রতি বৎসর এইরূপ বিনীত প্রার্থনা করিতে চাহ, তাহা হইলে অত চড়া তীব্র স্বরে প্রার্থনা কর কেন? যদি ভিক্ষুক তোমার দ্বারে আসিয়া কড়া সুরে তোমার নিকট এক মুষ্টি ভিক্ষা চায়, তাহা হইলে তুমি তাহাকে কি ভিক্ষা দেও? সে যদি তাহার উপর আরও তোমাকে বলে যে, "তুমি যে ধন ভোগ করিতেছ তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ, ন্যায় বিরুদ্ধ; সংসারে একজন লোক্ খাইতে পাইবে না, আর একজন লোক অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবে ইহা ঈশ্বরের বিধান নহে, ইহা ধর্ম্মান্ধ মনুষ্যের ব্যবস্থা, ইহা এক প্রকার দস্যুবৃত্তির ফল, অর্থাৎ তুমি ধনী, অতএব তুমি দস্যু,"—যদি ভিক্ষুক্ বিনীত্ প্রার্থনার সহিত এইরূপ একটা সাম্যবাদীর বক্তৃতাসংযুক্ত করিয়া দেয়, তাহা হইলে তুমি তাহাকে ভিক্ষা দেও, না যষ্টি দেও? আধুনিক সাম্যবাদীদিগের মতে, ভিক্ষুকের কথা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু ভিক্ষুক ঐ কথা বলিলে ভিক্ষা পায় না। দাতার স্তব করিলে, ভিক্ষুক ভিক্ষা পায়। বলি, হে কংগ্রেসীজন, আপনি যদি দয়ার ভিখারী হয়েন, তাহা হইলে তর্জ্জন গর্জ্জনের ছলনা করিবেন না। আর যদি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে চাহেন, তাহা হইলে এই অধীন জাতির নিরুপায় অবস্থা স্মরণ রাখিবেন। গলা চাপিয়া ধরিলে যাহারা চী চাঁ করে, ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাক ছাড়ে, তাহাদের কণ্ঠে স্বাধীনজনোচিত বজ্রনির্ঘোষ

শোভা পায় না। তোমাদিগের যেমন দীন হীন অবস্থা, তেমনি বিনীত স্বরে দীন হীনভাবে প্রার্থনা কর, তাহা হইলে হয়ত জেতা তোমাদিগের মনোবাঞ্ছা কতকটা পূর্ণ করিতে পারেন। নতুবা তুলা যন্ত্রের এক দিকে যেমন তোমাদিগের অসংযত রসনা চালনার চাপ পড়িবে, তেমনি অন্য দিকে তোমাদিগকে অস্ত্রাদিহীন করার আইনের এবং সিডিশন আইনাদির ভার সেই পরিমাণে গবর্ণমেণ্ট বাড়াইয়া দিয়া, পাল্লার দুই দিকের ওজন ঠিক রাখিবেন।

শিক্ষিত বাঙ্গালি—তুমি স্বাধীন নহ, অথচ স্বাধীন জাতির ঢং অনুকরণ কর ইহাই তোমার অশেষ অমঙ্গলের কারণ দেখিতেছি। সাহেবি-পরিচ্ছদ পরিয়া সাহেবি স্বরে সাহেবি বোল বলিয়া, তুমি আপনাকে সাহেব মনে করিয়া আনন্দিত হও। "বাবু" না লিখিয়া তোমাকে "মিষ্টার" লিখিলে আহ্লাদে গদগদ হও। ঐখানে যে ব্যাধি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তুমি স্বজাতির উন্নতি বলিয়া চীৎকার করিতেছ, অথচ তোমার স্বজাতিভক্তিপ্রেম এমনি, যে স্বজাতির মধ্যে গণ্য না হইয়া, বিদেশীয়দিগের মধ্যে গণ্য হইবার তোমার নিয়ত লালসা। তুমি স্বাধীন নহ, অথচ হাত নাড়িয়া, হেলিয়া দুলিয়া, ঘর ফাটাইয়া স্বাধীন ব্যক্তির ন্যায় তীব্র তেজস্বী ভাষায় তুমুল বক্তৃতা করিবে—আর বলিবে, "যদি গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুগ্রহ বা স্বত্ব পাইতে চাহ, তাহা হইলে আন্দোলন কর, আন্দোলন কর agitate, agitate"। কিন্তু স্বাধীন জাতির পক্ষে এই আন্দোলন এক বস্তু, আর অধীন জাতির পক্ষে এই আন্দোলন আর এক বস্তু। স্বাধীন জাতির মধ্যে সভাসমিতিতে বক্তৃতা করিয়া যদি অধিকাংশ লোক একমতাবলম্বী হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট সেই মতে চলিতে বাধ্য। কিন্তু অধীন দুর্ব্বল জাতির মধ্যে, আন্দোলনের ফল সেরূপ হইবে তাহা প্রত্যাশা করা অসঙ্গত।

যদি বল, গবর্ণমেণ্টকে তোমরা প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত সকলে সমবেত হও, তাহা হইলে তাহার উত্তর :—(১) গবর্ণমেণ্ট যাহা বুঝিবার তাহা নিজেই বুঝেন, যাহা বুঝিবার নহে তাহা তোমরা বুঝাইতে পারিবে না। যখন দেখিতেছ, ঘন ঘন দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী লোক মরিলেও, দেশে প্রকৃত সুখ সমৃদ্ধির বৃদ্ধি হইতেছে, গবর্ণমেণ্টের এই ধারণা অটুট থাকিবে; যখন দেখিতেছ, আমরা যদি দুঃখে কাঁদি, গবর্ণমেণ্ট অঙ্ক সংখ্যা দ্বারা গণিতের

সাহায্যে প্রমাণ করিয়া দেন যে, আমরা দুঃখী নহে আমরা সুখী, তবে আমাদিগের ভ্রমবশতঃ অথবা আমাদিগের অকৃতজ্ঞতা বশতঃ কাঁদিয়া থাকি ;— তখন নিশ্চয় জানিও, তোমরা যে প্রণালীতে সাহেবদিগকে বুঝাইতে বসিয়াছ, সে প্রণালীতে সাহেবরা বুঝিবেন না। আর মেজাজ গরম করিয়া দিলে, চিত্তবিক্ষোভ জন্মাইলে, সহজ কথাও শীঘ্র বুঝা যায় না। কাজেই তোমাদিগের চিত্তবিক্ষোভক বাক্য গবর্ণমেণ্ট যে বুঝিবেন তাহা আশা হয় না। (২) গবর্ণমেণ্টকে বুঝাইবার জন্য ভূরি ভূরি সংবাদ পত্র প্রতি সপ্তাহে, প্রতিদিন, নির্গত হইতেছে। বুঝাইবার জন্য এত ব্যয় করিয়া এত ধুমধাম করিয়া অনর্থক জনতা করার আবশ্যক কি ? (৩) যদি গবর্ণমেণ্টের নিকট সমুদয় ভারতের সম্মিলিত আবেদন করিতে চাহ, তাহা হইলে প্রত্যেক প্রদেশের কয়েকটী যোগ্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করতঃ এক একটী ক্ষুদ্র কার্য্যকরী সভা গঠিত কর। আলোচ্য বিষয় এই সকল সভাতে বিবেচিত হইয়া যাহা স্থির হয় তাহা গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হউক। যদি সমুদয় প্রদেশের প্রতিনিধিগণ একত্রিত হওয়া আবশ্যক বোধ হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক প্রদেশ হইতে দুইটী অথবা তিনটী প্রতিনিধি কোন মধ্য স্থানে গিয়া পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই দশ পনর জন একত্র হইয়া, বিচার করিয়া মন্তব্য স্থির করুন এবং তাহা গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করুন। তাহা হইলে ত এত অনর্থক ব্যয় হয় না, কর্ত্তৃপক্ষের বিরক্তির কারণও হয় না।

তোমরা বলিয়া থাক যে সকলে এক সঙ্গে মিলিলে, একটা ভারি উৎসাহ হয়, একটা ভ্রাতৃভাব হয়—যাহা এইরূপ সম্মিলন ব্যতীত অন্য কোনও উপায়ে কখন হইতে পারে না। এ কথার অর্থ আমরা ভাল বুঝিতে পারি না। এই উৎসাহের ফল, এই ভ্রাতৃভাবের কার্য্য এত দিনে কি হইল ? এই উৎসাহ, অধিকাংশ দর্শকের পক্ষে, রঙ্গভূমিতে অভিনয় কালের উৎসাহের ন্যায় নহে কি, অথবা একটা বড় বনভোজনের আনন্দ উৎসাহের মত নহে কি ? যে উৎসাহে লোককে ত্যাগ স্বীকারে, ভ্রাতৃসেবাব্রতে, দীক্ষিত করিতে না পারে, এ ক্ষেত্রে সে উৎসাহের কোন মূল্য নাই। বস্তুতঃ এ উৎসাহ নহে, এ একটা মোহ।

তোমরা বলিয়া থাক, "মিলনে বল, বিচ্ছেদে বিনাশ"। ভাল কথা। কিন্তু দুর্ব্বলতার মিলনে, স্বার্থপরতার মিলনে, আত্ম গৌরবানুসন্ধানের মিলনে

—কেবল দোষেরই বৃদ্ধি হয়, দোষেরই বল হয়। এই মিলনে প্রকৃত ভ্রাতৃভাব সঞ্জাত হইতে পারে না। প্রকৃত ভ্রাতৃভাব এত সস্তা নহে। তিন দিনের মিলনে তাহা উৎপন্ন হয় না। অনেক দিন ব্যাপী পরস্পরের সাহায্যে, পরস্পরের জন্য ত্যাগ স্বীকারে, এই ভ্রাতৃভাব আস্তে আস্তে আবির্ভূত হয়। আর, যতদিন তোমার আত্মসম্মান ও সৎসাহসের বৃদ্ধি না হইবে, ততদিন তোমার ভ্রাতৃভাব বা পুত্রভাবের, বা পতিভাবের কোন বিশেষ ফল নাই। তোমার কংগ্রেসের ভ্রাতৃভাব ত জনক-জননী-জাত সহোদরত্বের অপেক্ষা অধিক প্রিয়তর বন্ধন নহে। কিন্তু, যে ভীরু নিজের ভগ্নীকে রেলের গাড়িতে গোরা অপমান করিলে, প্রাণপণ করিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ, তাহার ভ্রাতৃত্বের মূল্য কি? যে নিজের ভগ্নীর সম্মান ভয়ে রক্ষা করিতে পারে না, সে আবার দেশের জন্য বা তিন-দিনের-সম্পর্ক-পাতান-ভাইয়ের জন্য কি করিতে পারে? যতদিন আমাদের ত্যাগস্বীকার ও সৎসাহস না হইবে, ততদিন সাহেবেরা হৃদয়ের সহিত আমাদিগকে সম্মান করিতে পারেন না—ততদিন তাঁহারা মেকলের ন্যায় আমাদিগকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিবেন; তোমাদিগের বক্তৃতা যতই ভাল হউক, তাহাতে এই ঘৃণা কমিবে না, বরঞ্চ বাড়িবে। তোমরা বলিয়া থাক যে, ভারতে কংগ্রেস না থাকিলে, আমাদিগের বিলাতী বন্ধুরা আমাদিগের জন্য বিলাতে যে যুদ্ধ করিতেছেন তাহাতে বল ও রসদ পান না। আমরা কিন্তু বিলাতী বা বিদেশীয় সাহায্যের উপর অধিক ভরসা করি না। স্বদেশের চেষ্টা ব্যতীত পরকীয় বিদেশীয় চেষ্টায় কখন কোন দেশের প্রকৃত মঙ্গল হয় নাই।

তবে কি কংগ্রেসে কোন উপকার নাই? উপকার হইতে পারে। কিন্তু এই উপকারের জন্য কংগ্রেসের কার্য্য দুই শাখায় বিভক্ত হওয়া আবশ্যক। প্রথম, আত্ম চেষ্টায়, সাহেবদিগের মুখাপেক্ষা না করিয়া, স্বদেশের যতদূর মঙ্গল সাধন করা যায়, তাহাই কংগ্রেসের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ কেবলমাত্র গবর্ণমেণ্টের দ্বারা যে সকল বিষয়ের প্রতীকার হইতে পারে, সেই সকল বিষয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করা কংগ্রেসের গৌণ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

আত্ম চেষ্টায় স্বদেশের উপকার করিবার জন্য কংগ্রেস অগ্রসর হইলে, কংগ্রেসে যাহারা স্পষ্ট স্বদেশহিতৈষী আছে, তাহারা আপনিই কংগ্রেস হইতে

সরিয়া পড়িবে; এবং যাহারা অকপট স্বদেশপ্রেমিক তাঁহাদিগকে সহজে চিনিয়া লইতে পারা যাইবে। এইরূপে কংগ্রেস ক্রমে একটি স্বদেশহিতরত নিঃস্বার্থ সাধু কর্ম্মী সম্প্রদায়ে পরিণত হইবে। প্রত্যেক সভ্য তাহার নিজের নগরে বা গ্রামে সদনুষ্ঠানের কেন্দ্র হইবেন। যেমন জেনারেল বুথের মুক্তিফৌজ সম্প্রদায়ে কর্ম্মচারীদিগের কার্য্যানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করা হয় এবং ক্ষমতা দেওয়া হয়, তেমনি কংগ্রেসের কর্ম্মচারীদিগকে যোগ্যতা অনুসারে ক্ষমতা ও পদ দেওয়া হইবে। ইঁহারা সমুদয় বৎসর ধরিয়া স্ব স্ব স্থানে কংগ্রেসের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিবেন।

দেশের লোকের যাহাতে স্বার্থপরতা, বিলাসিতা কমিয়া গিয়া সত্যবাদিতা সৎসাহস ও পরোপকারিতার বৃদ্ধি হয়, স্বজাতির চরিত্রের উন্নতি হয়, তজ্জন্য কংগ্রেসের নিয়ত যত্ন করা উচিত। দেশের লোকের চরিত্রের দিন দিন যেরূপ অবনতি হইতেছে, ধনের জন্য লোকে দিন দিন যেরূপ ন্যায় ও ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতেছে, ধনী নিতান্ত পাপী হইলেও তাহাকে লোকে যেরূপ অর্চ্চনা করিতেছে, প্রবলের তোষামোদ, ও দুর্ব্বলের পীড়ন দেশে যেরূপ প্রচলিত হইতেছে, তাহাতে যেন হতাশ হইয়া পড়িতে হয়। শঠতার, স্বার্থপরতার বন্যা, যেন আমাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য, উত্তাল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে আমাদিগের দিকে ধাবিত হইতেছে। কংগ্রেস, তুমি যদি আমাদিগকে এই আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পার, তুমি যদি সুনীতির দৃঢ় উচ্চ শৈল শিখরে আমাদিগকে স্থাপিত করিতে পার, তাহা হইলে তুমি ধন্য। যে কোন জাতির সংস্কার বা উন্নতির চেষ্টা কর না কেন, যদি তাহা সুনীতির ভিত্তির উপার স্থাপিত না হয়, তাহা হইলে তাহা কইনই সংসাধিত হইবে না।

কংগ্রেসী ভাই, রাগ করিও না। দাদাভাই প্রভৃতি কয়েকটী মহাত্মাগণের প্রতি আমার ভক্তি আছে। কিন্তু তাই বলিয়া স্বাধীন ভাবে বিচার করার অধিকার বিসর্জ্জন দিতে পারি না। তাঁহাদিগের স্বদেশহিতচেষ্টা আপাততঃ যে পথে যাইতেছে, সে ঠিক পথ নহে, এই আমাদিগের মত। গোড়া কাটিয়া আগায় জল দিলে কি হইবে?

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

জয়কৃষ্ণ।

৺ জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবন চরিত। শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত প্রণীত।

এই পুস্তক খানি সরল ভাষায় লিখিত। ইহাতে জয়কৃষ্ণ চরিত আলোচনার সঙ্গে অনেক জ্ঞাতব্য কথা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থকার যে বিচারকের অপক্ষপাতিতা সকল স্থানে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, অথবা কোন বিষয়ে বিশেষ চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। জয়কৃষ্ণ বাবুকে বঙ্গের আদর্শ জমিদার বলিয়াছেন। এ কথায় অনেক পাঠক তাহার সহিত ঐক্যমত না হইতে পারেন। তবে আমরা একথা বলিতে পারি যে, যে দেশে জমিদারগণের মধ্যে আজি কালি অনেকেই অলস, বিদ্যাহীন, ব্যসনাসক্ত, প্রজাসমূহের শিক্ষাসম্বন্ধে নিতান্ত উদাসীন দেখা যায়, সেদেশে অনেক বিষয়ে অনেক জমিদার, কার্য্যশীল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বহুবিদ্যালয় সংস্থাপক, বিদ্বান্, তেজস্বী জয়কৃষ্ণ বাবুকে আদর্শ করিয়া কার্য্য করিলে, জীবনে অনেকটা উন্নতি লাভ করিতে পারেন।

জয়কৃষ্ণ বাবুর জীবনের ঘটনাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই:—

তাঁহার পিতা সৈনিক বিভাগে বেনিয়ান ছিলেন। সেনাগণকে অভাবের সময় অর্থসাহায্য করিতেন এবং মাসের শেষে, তাঁহারা বেতন পাইলে, শতকরা ২০।২৪ টাকা সুদ সহ আসল টাকা শোধ করিয়া লইতেন। জয়কৃষ্ণ বাবুর জননী দার্শনিকের কন্যা। সুতরাং তিনি পিতৃকুল হইতে বৈষয়িক লোকের বিষয় বুদ্ধি, মাতুলকুল হইতে দার্শনিকের তীক্ষ্ণ মেধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি বাল্যকালে তাঁহার পিতামহীর কুশীদের হিসাবাদি রাখিয়া ক্ষুদ্র মুহুরীর কার্য্যে শিক্ষানবিশি করিয়াছিলেন। তিনি উত্তরপাড়াতে ১৮১৮ সালে ১০ বৎসর বয়সে ইংরাজি শিক্ষা আরম্ভ করেন। দুই বৎসর পরে তিনি পিতৃসমভিব্যাহারে মিরট যাত্রা করেন। সেখানে সৈনিক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া কিছুকাল নিবিষ্ট মনে ইংরাজি শিখিতে লাগিলেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ষোলবৎসর বয়সে ব্রিগেড মেজর আপিসের প্রধান কেরাণীর পদ অধিকার করেন। এই নবীন বয়স হইতেই "বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম (অষ্টাদশ ?) কাল পর্য্যন্ত" মিরাটে অবস্থিতি

করিয়া কার্য্যে অসাধারণ দক্ষতা প্রকাশ করিয়া দুর্লভ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এই সময় ভরতপুর ইংরাজসেনা দ্বারা অধিকৃত হয়, জগনমোহন ও জয়কৃষ্ণ পিতাপুত্র সেনা সঙ্গে ভরতপুর গিয়া লুণ্ঠিতদ্রব্যের অংশ পাইয়া লাভবান্ হইয়াছিলেন। মিরাটে লর্ড আমহার্ষ্টের পুত্রের সহিত বিশেষ সৌহৃদ্য হইয়াছিল। দেশে আসিয়া জয়কৃষ্ণ চুঁচড়ায় পেমাষ্টার আফিসের প্রধান কেরাণী হইয়া কিয়দ্দিন প্রশংসার সহিত কার্য্য করেন। ১৮২৮ খৃঃ তিনি হুগলি জেলার বন্দীপুর নামক গ্রামে ৺গঙ্গাচরণ ঘটকের কন্যাকে বিবাহ করেন; ও ১৮৩১ সালে হুগলির জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের আফিসে বক্সিগিরি কার্য্য গ্রহণ করেন। এক-বৎসর মাত্র এই কার্য্য করিয়া হুগলি কালেক্টরিতে মহাফেজী পদে উন্নীত হয়েন।

এই মহাফেজের কাজে হুগলী জেলার প্রত্যেক গ্রামের রাজস্বের অবস্থা সকর ও নিষ্কর ভূমির স্বত্ববিষয়ক জ্ঞান, এবং সাধারণতঃ জমীদার ও প্রজা সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় অবগত হইবার সুবিধা হইয়াছিল। এই বৎসরেই তিনি হুগলী জেলার হরিপাল থানার অধীন "জোত হারানন্দ বাটী ও কৃষ্ণরামবাটী" নামক দুইটী মহলের সিকি অংশ ক্রয় করেন ইহার পরে ক্রমান্বয়ে কতকগুলি জমিদারী ক্রয় করেন।—১৮৩৪ সালে তিনি কর্ম্মচ্যুত হন।

১৮৩৭ সাল হইতে জয়কৃষ্ণ জমিদারী কার্য্যে মনোনিবেশ করেন এবং আপন জমিদারীগুলি স্বচক্ষে দেখিতে আরম্ভ করেন। তিনি জলা ডুবি মহালে বাঁধ বাঁধিতে খাল কাটাইতে লাগিলেন, পতিত জমি উত্থিত করিতে লাগিলেন। যে সকল লাখরাজভোগী দলিল দস্তাবেজ দেখাইতে না পারিত; তাহাদিগকে উচ্ছেদ ও লাখরাজ জমি বাজেয়াপ্ত করিতে লাগিলেন।

নিজের জমিদারীর উন্নতি ও আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের নানা হিতকর কার্য্য করিতে লাগিলেন। স্বকীয় জমিদারীতে অনেকগুলি বঙ্গবিদ্যালয় ও ইংরাজি স্কুল স্থাপন, উত্তর পাড়ার বিখ্যাত পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা, ও দাতব্য চিকিৎ-সালয় স্থাপন, নিজে কৃষিতত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়া প্রজাগণকে উপদেশ দান, গ্রামের মণ্ডল ও গোমস্তাগণের প্রতি পুলিশের অত্যাচার বন্ধ করা, জমীদারের আমলা-গণ ও গ্রামবাসিগণকে যাত্রি-পল্টনগণের উপদ্রব হইতে রক্ষা করা; ১২৭১ সালে ঝটিকা-বিপন্ন প্রজাগণকে অর্থ দান দ্বারা সাহায্য; ১২৭৩ সালে দুর্ভিক্ষ ক্লিষ্ট প্রজাগণকে অন্ন ও অর্থদান; ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত দরিদ্র প্রজাগণের

মধ্যে ঔষধ পথ্য বিতরণ—ইত্যাদি নানাবিধ হিতকর অনুষ্ঠানে তাঁহার জীবন ধন্য ও কীর্ত্তিমান্ হইয়াছিল।

ধনী লোকের জীবন সমালোচনা করিতে হইলে দেখা আবশ্যক যে তিনি ধন কিরূপে উপার্জ্জন করিয়াছেন, এবং তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছেন কি না। ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থ (Words worth) বলেন যে একজনের প্রভূত ধন, না হয় অধর্ম্মের বীজ, না হয় অধর্ম্মের ফল। মনু বলেন বিত্তাদি মান্যার্হ। কিন্তু বিত্ত শব্দে এই স্থানে ন্যায়ার্জ্জিত ধন। অর্থাৎ যে ব্যক্তির ধন ন্যায়ার্জ্জিত নহে সে ব্যক্তি মান্যের পাত্র নহে। জীবনী লেখকের নিকট জানিতে পাই যে ভরতপুরের লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির কিছু অংশ পাওয়ায় জয়কৃষ্ণের বিপুল অর্থাগম হয়। ন্যায়নীতির অভিধানে লুণ্ঠন শব্দের অর্থটা ভাল নহে। যাহা হউক পামর কোম্পানি দেউলিয়া হইলে এই লুণ্ঠিত ধনের নাশ হয়। তাহার পরে চরিতলেখক বলেন "অল্প বেতনে মহাফেজের কাজ করিতে করিতে প্রভূত ভূসম্পত্তির অধিকারী হইলেন" কিছুকাল পরেই কমিশনার সাহেব তাঁহাকে (বিনা তদন্তে) কর্ম্মচ্যুত করিলেন। গ্রন্থকার এই সকল ঘটনার নির্ম্মল সদাশয়তার সহিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং জয়কৃষ্ণ বাবু যে নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক ছিলেন তাহা দেখাইবার জন্য পরবর্ত্তী কমিশনরের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। তবে অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন না করিয়া জমিদারীর পর জমিদারী ক্রয় করিবার টাকা জয়কৃষ্ণ কোথায় পাইলেন? তদুত্তরে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে জয়কৃষ্ণ "অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ করিতে লাগিলেন।"

জয়কৃষ্ণ ধনের সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জয়কৃষ্ণ বাবুর যে যে গুণ ছিল, তাহা আমাদের দেশের অধিকাংশ জমিদারের নাই। তাঁহার গুণগুলি এ দেশের জমিদারগণ যদি অনুকরণ করেন তাহা হইলে দেশের বিশেষ উপকার হইতে পারে।

জমিদারীর বর্ত্তমান প্রণালীতে যে কত অত্যাচার হয় তাহা কৃষকবন্ধু তীক্ষ্ণদর্শী বঙ্কিম বাবু বঙ্গদর্শনে বঙ্গীয় কৃষক সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছেন। জয়কৃষ্ণচরিত লেখকও তাহা সংক্ষেপে বিশদভাবে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন:—"কথায় কথায় মাথট, জমিদারের বাড়ী দুর্গোৎসব, পুত্র কন্যার বিবাহ, অন্নাশন প্রভৃতি উপস্থিত হইলে মাথটের ফর্দ্দ প্রস্তুত হয়, প্রজার স্কন্ধে

জমার হিসাবে টাকায় এক আনা আধ আনা করিয়া চাঁদা পড়ে, তাহাতে যাহা আদায় হয় তাহার কিঞ্চিন্মাত্র জমিদার প্রাপ্ত হয়েন, অবশিষ্ট প্রধান পক্ষীয়গণের (নায়েব গোমস্তা প্রভৃতির) উদরসাৎ হয়। হিন্দুর ঘরে বার মাসে তের পর্ব্ব, এইরূপে প্রজাকে বার্ষিক খাজনা অপেক্ষা মাথটের হিসাবে অধিক দিতে হয়। মাথট বাকি থাকিতে, জমির খাজনার হিসাবে আদায় টাকার মুসমা পড়িবার নহে। মাথট সর্ব্বাগ্রে দেয়। পশ্চাৎ জমির খাজনা। এই সকলের উপর বৎসরে দুই বাব গোমস্তার পার্ব্বণী, বৎসরের শেষে হিসাবানা, তাহাও জমার হিসাবে প্রত্যেক টাকায় এক আনা আধ আনা। গোমস্তা মাসে আড়াই টাকা তিন টাকার (না হয় ৬৲ বা ৮৲) হিসাবে বেতন পাইয়া থাকে, এই সামান্য টাকার উপর নির্ভর করিয়া পরিবার প্রতিপালন করা দূরে থাকুক, তাহার আপন অশন বসন ব্যয় সংকুলান করা কষ্টসাধ্য। কাজে কাজেই তাহাকে নানা অসদুপায় অবলম্বন করিতে হয়; হয় জমিদারের তহবিল তছরূপ, না হয় প্রজার উসুল ছাট করিতে বাধ্য হয়; সৎপথে থাকিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা তাহার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব।" অম্বিকাচরণ বাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহাতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন বর্ত্তমান প্রণালী জমিদারী কার্য্যে প্রজাদিগের উপর কি অত্যাচার হইয়া থাকে। যে প্রজা সুশিক্ষিত ভদ্রলোক, অথবা সঙ্গতি সম্পন্ন তেজস্বী ব্যক্তি, তাহার নিকট গোমস্তা মাথট আদায় করিতে পারে না, যে প্রজা যত গরিব ও দুর্ব্বল, গোমস্তা সেই প্রজার উপর ততই জুলুম করিয়া আইন বিরুদ্ধ বাজে আদায় করিয়া থাকে।

ইহাতে যে কেবল প্রজাপীড়ন হয় তাহা নহে, জমিদারেরও প্রভূত ক্ষতি হইয়া থাকে। গরিব প্রজার নিকট অগ্রে পাইক, পিয়াদা, পাইক, মুহুরি, গোমস্তা ও নায়েবের "উপরি" প্রাপ্য আদায় হয়। গরিব প্রজার এই সমস্ত টাকা দিতে হওয়ায় খাজনা দিতে অক্ষম হয়। সুতরাং তাহার নিকট ক্রমে অনেক টাকা বাকী পড়িয়া যায়। সদর হইতে বাকী আদায়ের জন্য গোমস্তা নায়েবকে উত্তেজনা বা ভর্ৎসনা করিলে তাহারা প্রজার নামে নালিশ করিবার প্রস্তাব করে। হৃতসর্ব্বস্ব নিঃস্ব প্রজার নামে নালিশ করিয়া টাকা আদায় হয় না, কেবল নালিশের খরচাতে জমিদারের অপব্যয় হয়। বাকীপড়া জমি বিক্রয় হইয়া যায়। জমিতে যদি লাভ থাকে, গোমস্তা নিজে অন্যের নামে ডাকিয়া

লয়, কখন বা জমিদারের তরফে ডাকিয়া জমি কাগজে পতিত খাস লোকসান বলিয়া লেখে। কোথায়ও বা "গোমস্তা নিজে পতিত জমির আবাদ করিয়া, কোথায়ও বা এইমত জমি—কাল্পনিক প্রজার নামে বিলি করিয়া আপনি তাহার চাস করে, উৎপন্ন শস্য আত্মসাৎ করে, খাজনার হিসাবে কখন কিছু জমা দেয়; কখন বা সমস্ত বাকী ফেলিয়া দুই চারি বৎসর পরে কাল্পনিক প্রজাকে ফৌত ফেরার দেখাইয়া অন্য নামে নূতন জমা পত্তন করে।" ইহাতে হয় কি?—প্রজা নিঃস্ব হইয়া ফেরার হয়, জমিদারের অত্যধিক ক্ষতি হয়, কিন্তু গোমস্তা ও নায়েব এক পুরুষ চাকরি করিয়া ধনশালী ব্যক্তি হয়। কেবল মাত্র যে সকল জমি জমিদার নিজে ক্রম করেন সেই সকল জমির বাঞ্চ, গোমস্তা ও নায়েবের অসততায় জমিদারের যাহা ক্ষতি হয় তাহা দেখুন।

১। ডিক্রির বাকী—প্রায়ই চারি সনের খাজনা সেস সুদ।

২। মোকদ্দমার খরচ।—কোর্টফীর মূল্য ও বিবাদীর ও সাক্ষীর প্রতি সমন জারীর খরচ, সাক্ষীর বারবরদারি ও তদ্বিরকারের বারবরদারি ও মোকদ্দমার কয়েক দিবসের হারাহারি বেতন। প্রতি নম্বর দাখিল করিবার সময়, রায় ফয়সালা লইবার সময়, ডিক্রি জারি করিবার সময়, ডিক্রিদার নিজে খরিদ করিলে বয়নামা জারি করিয়া দখল করিবার সময় আমলাগণের দক্ষিণা ও সমনাদি জারির সময় পেয়াদাদিগের বক্সিস এই সমুদয় বাজে খরচ। তাহার উপর উকীলের ফী উকীলের মুহুরীর পারিতোষিক। মোকদ্দমার দিন বারম্বার পরিবর্ত্তন হওয়ায় সাক্ষীর বারবরদারি ও উকীলের ফির বাবত ব্যয় বিলক্ষণ বৃদ্ধি হয়। সুতরাং ২০৲ টাকা খাজনার দাবির নালিশে আর ২০৲ টাকা মোকদ্দমার খরচা পড়া আশ্চর্য্য নহে।

৩। তাহার পর জমিদার নিজে খরিদ করিলে তাহা গোমস্তা হয় অত্যধিক উৎকোচের আশায় তাহা যথার্থই পতিত রাখে, অথবা গোপনে জমিদারকে কিছুমাত্র খাজনা না দিয়া নিজে আবাদ করে, অথবা কোন প্রজা (সম্ভবত সাবেক প্রজা) গোমস্তাকে উৎকোচ দিয়া পূর্ব্বের মত আবাদ করিতে থাকে। অথচ গোমস্তা জমি পতিত লোকসান বলিয়া উল্লেখ করে। ধরা পড়িলে নানা মিছে কৈফিয়ত দিয়া থাকে এবং যাহাতে শীঘ্র বন্দবস্ত না হয় তলে তাহার চেষ্টা করে। সুতরাং জমিদার স্বয়ং খরিদ করার পর এই সকল জমির খাজনা গড়ে ৪ চারি,

সন আদায় হয় না এইরূপ ধরা যাইতে পারে। কোনও কোন জমিদারিতে প্রজা এই সকল পতিত জমি নিজের জমাই জমির ভুক্ত করিয়া বিশ বা ত্রিশ বৎসর ভোগ করিতেছে। যে সকল গ্রামে জরিপী চিঠা নাই, এবং আদায় তহশীলের কোন কাগজে জমির উল্লেখ নাই, সে সকল গ্রামের এই সকল জমি ধরা বড় কঠিন।

উপরি উক্ত তিন দফাতে যাহা লেখা হইল, তাহাতে পাঠক দেখিবেন এইরূপ নালিশ ও খরিদ করায় জমিদারের খরিদা নালিশী জমির চারি সনের নালিশী খাজনা, মোকদ্দমার ব্যয় ঐ পরিমাণ টাকা অর্থাৎ চারি সনের খাজনার পরিমাণ টাকা, এবং খরিদের পরে পতিত লোকসান উল্লেখ গড়ে আর চারি সনের খাজনা যাহা আদায় হয় না, অর্থাৎ মোট কয় বৎসরের খাজনাদির পরিমাণ টাকা জমিদারের ক্ষতি হইয়া থাকে। অল্প বেতনে অসৎ গোমস্তা নায়েব রাখাতে এইরূপে আপনাদিগের যে প্রভুত অর্থের ক্ষতি হয় তাহা প্রায় জমিদারই বুঝিয়া দেখেন না। গ্রন্থকার যে এই সকল শোচনীয় বিষয় তাঁহার গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি পাঠকের ধন্যবাদের পাত্র। আশা করি এ বিষয়ের চর্চ্চা হইতে হইতে জমিদারগণ অন্ততঃ নিজের অর্থ ঘটিত স্বার্থ বুঝিয়া বর্ত্তমান জমিদারী কার্য্য প্রণালী পরিবর্ত্তন করিয়া, সঙ্গত বেতনে নায়েব ও গোমস্তা রাখিয়া আপনাদিগের ক্ষতি ও প্রজাদিগের প্রতি পীড়ন উভয়ই নিবারণ করিবেন। ইহাতে সরঞ্জামি খরচ বাড়িয়া সামান্য ব্যয় বৃদ্ধি হইবে, বটে, কিন্তু নানা প্রকার ক্ষতি নিবারিত হইয়া মোটের উপর জমিদারের লাভ হইবে।

এক্ষণে জমিদারীর যে কার্য্য প্রণালী তাহাতে যেমন এক দিকে জমিদারগণের ক্ষতি হইয়া থাকে, তেমনি দুর্ব্বল নিরপরাধ প্রজাগণের উপর অত্যাচার হইয়া থাকে। যে প্রজা যত গরিব ও যত দুর্ব্বল গোমস্তা ও নায়েবগণ তাহাদিগের নিকটই তত অধিক পীড়ন, করিয়া আইন বিরুদ্ধ বাজে আদায় করিয়া থাকে। জড় জগতে, যে দিকে বাধা সর্ব্বাপেক্ষা কম সেই দিকে শক্তি প্রসারিত হয়। প্রজাকুলের মধ্যে, গোমস্তা ও নায়েবের অর্থশোষণ শক্তিও সেইরূপে সঞ্চারিত হয়। যদি কোন একটা আকস্মিক ঘটনা হয়, যথা প্রজার বাটীতে অথবা বাটীর নিকট একটি লোকের সহসা দৈব ঘটনায় মৃত্যু তখন যেমন

পুলিশ আসিয়া দুর্ব্বল নিরপরাধী প্রজাকে টাকার জন্য পীড়ন করিবে, গোমস্তাও তেমনি পীড়ন করিবে। প্রজা জাঁতার দুইটী প্রস্তরের মধ্যে নিষ্পেসিত হইবে। হতভাগ্য দরিদ্র বঙ্গ প্রজা! যখন তোমার ভীরু ও দয়াপ্রার্থী অশ্রুসিক্ত বদন মণ্ডল মনে করি,—তোমার সরলতা, তোমার অবিরাম শ্রম,সহিষ্ণুতা ক্ষমা, তোমার অনশনক্লিষ্ট দেহযষ্টি তোমার ছিন্ন বস্ত্র, তোমার ভগ্ন কুটীর, তোমার জঠরানল দগ্ধ পুত্র কন্যা যখন মনে করি—তখন চক্ষু আর্দ্র হইয়া যায়—কিছুই বুঝিতে পারি না। হায়! স্বদেশহিতৈষী বাগ্মীতা এ বিষয়ে কেন নীরব। হিন্দু সনাতন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সদনুষ্ঠান কেন এ বিষয় ধাবিত হয় না। কেন সাধু স্বদেশ প্রেমিকগণ, বাগ্মীগণ নিঃস্বার্থ প্রেমের কমণ্ডলু ধারণ করিয়া, জমিদারগণের দ্বারে দ্বারে, গরিব প্রজাগণের জন্য দয়া ও ন্যায় বিচার ভিক্ষা করেন না? জমিদারগণের মধ্যে কেহ বা ধার্ম্মিক কেহ বা স্বদেশপ্রেমিক বলিয়া পরিগণিত আছেন। তাঁহারা নিজের প্রজাদিগের দুঃখ মোচন করাই তাঁহাদিগের প্রথম কর্ত্তব্য কার্য্য কেন মনে করেন না? ইউরোপের বোণ্টিন কিং প্রভৃতি কত জমিদার নিজের প্রজাদিগের সহিত কৃষিক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া, কুটীরে কৃষকদিগের সহিত বাস করিয়া, কৃষকদিগের অবস্থা উন্নত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমাদিগের দেশে কি সেরূপ জমিদার দেখিতে পাইব না?

যাহা হউক এ বিষয় জয়কৃষ্ণবাবু যাহা করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইলাম। গোমস্তাগণকে অসৎপথ হইতে ফিরাইবার জন্য তিনি তাহাদিগের বেতনের পরিমাণ ৮ হইতে ১২ পর্য্যন্ত অবধারিত করিয়াছেন। যদিও সে সময় দ্রব্যাদি সুলভ ছিল তথাপি এই বেতন গোমস্তা ও তাহার পরিবারের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য যথেষ্ট তাহা বিবেচনা করা যায় না। ৺ জয়কৃষ্ণ মাথটের প্রথা একবারে উঠাইয়া দেন। এখনকার জমিদারগণ এ বিষয় জয়কৃষ্ণ বাবুর পথ অনুসরণ করিলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না এবং প্রজার মহোপকার করিবেন।

গ্রন্থকার বলেন হৃতস্বত্ব ভূসম্পত্তির ব্যবহার শাস্ত্রসঙ্গত উদ্ধার সাধন জন্য জয়কৃষ্ণের লাখেরাজ "কুখ্যাতি" বাজেয়াপ্ত। তিনি দেখাইয়াছেন অন্ততঃ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন জয়কৃষ্ণ বাবু "যে গুলি আইনানুসারে সিদ্ধ বলিয়া বুঝিতেন সে গুলি ছাড়িয়া দিতেন, আর সেগুলি অসিদ্ধ প্রতিপন্ন হইত সে গুলি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইতেন" কিন্তু জীবনীলেখক আর একস্থানে লিখিতেছেন

যে যাহারা "পূর্ব্ববর্ত্তী কোন প্রসিদ্ধ জমিদারের নিষ্কৃতি পত্র রাখিতেন, তাঁহাদিগকে তিনি যে একবারে বঞ্চিত করিতেন তাহা নহে"। প্রকারান্তরে ইহাতে এই বলা হইল যাহারা পূর্ব্বের প্রসিদ্ধ জমিদারগণের নিকট নিষ্কৃতি পাইয়াছে তাহারাও জয়কৃষ্ণ বাবুর নিকট একবারে নিষ্কৃতি পায় নাই। এই কথাটি পড়িয়া দুঃখিত হইলাম। কেন না এই কথাটী লেখকের পূর্ব্ব কথা "হৃতস্বত্ব ভূসম্পত্তির" এই শব্দগুলির শক্তি ও সার্থকতা অনেকটা কমিয়া গেল। কারণ, যাহারা পূর্ব্ব জমিদার গণের নিকট কোন জমির নিষ্কৃতি পাইয়াছিল তাহারা যে সেই সম্পত্তির স্বত্ব হরণ করে নাই তাহা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে। যে ত্যাগ স্বীকার পূর্ব্ব জমিদার করিয়াছেন তাহা জয়কৃষ্ণ বাবু করিতে পারিলেই সুখের বিষয় হইত। অনেক প্রজাদিগের ঘরেই স্বত্বের দলিল দস্তাবেজ নাই। ন্যায়তঃ তাহাদিগের প্রকৃত স্বত্ব থাকিলেও তাহারা তাহা মোকদ্দমায় আদালতে প্রমাণ করিতে পারে না। আর এক কথা, যাহা আইন সঙ্গত তাহাই যে নীতি সঙ্গত, তাহা নহে। আপনার দেনা টাকা তামাদি হইলে মোকদ্দমা করিয়া মহাজন আদায় করিতে পারে না। কিন্তু কেহ বলিবে না যে টাকা তামাদি করিয়া মহাজনকে না দেওয়া নীতিসঙ্গত।

অম্বিকা বাবু বলেন (পৃ—৫৩) প্রজা অবাধ্য হইলে জয়কৃষ্ণ প্রথমে তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন। প্রজা "না বুঝিলে আদালতের আশ্রয় লইয়া তাহাকে স্ববশে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতেন। যতদিন সে বাধ্য না হইত, তিনি উচ্চ হইতে উচ্চতর আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন জলস্রোতের ন্যায় অর্থব্যয় হইয়া যাইত, এ অবস্থায় প্রজা বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহার আশ্রয় ভিক্ষা করিলে" তাহাকে আশ্রয় দিতেন।" প্রজা দিগের সহিত এইরূপ মোকদ্দমার কথা পাঠ করিয়া আমরা প্রফুল্ল হইলাম না। জমিদার ও প্রজার মধ্যে যতই কম মোকদ্দমা হয় ততই ভাল। ইহাতে প্রজা যে কেবল বিপন্ন হয় এমন নহে, জমিদারকে ও অনেক সময় বিপন্ন ও লাঞ্ছিত হইতে হয়। তাহার প্রমাণ গ্রন্থকার নিজেই দিয়াছেন। যথা, বলুটীর মদনদের জমির মোকদ্দমায় এবং মাথলার জালের মোকদ্দমায় এই দুইটী মোকদ্দমায় জয়কৃষ্ণ বাবুর কারাদণ্ড হয় (পৃ—১৪১)।

জয়কৃষ্ণ জীবন রবি হাসিতে হাসিতে অস্তাচলে গমন করে নাই। তাহার

জীবন সায়াহ্ন ঘোর কৃষ্ণমেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছিল এবং শোচনীয় বিপত্তি ঝটিকা সাংসারিক ঐশ্বর্য্য ও প্রতাপের ক্ষণভঙ্গুরতার ও অকিঞ্চিৎকরতা প্রমাণীকৃত করিয়াছিল; বৃদ্ধ বয়সে কারাদণ্ড ও অন্ধতা ইহা তাহার জীবনের শোচনীয় দুর্ঘটনা। ঐ দুইটী মোকদ্দমার আলোচনা করিলে মন এই দুইটি চিন্তায় বিষণ্ণ হয়ঃ—আমাদিগের বিচার প্রণালী এমন দুষিত যে একজন জমীদার নির্দ্দোষ নিরপরাধ বিদ্বান, সাধারণের হিতকারী, ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি হইলেও আইনের বিপাকে পড়িয়া বিশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে পারেন; না হয় জয়কৃষ্ণ বাবু নানা অসাধারণ গুণে বিভূষিত হইয়া অপরজনপীড়ক ও অবৈধ কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন।

একদিকে জয়কৃষ্ণ বাবুর মত ধনী ক্ষমতাশালী মেধাবী ব্যক্তি নির্দ্দোষী হইলেও যদি দণ্ডিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে দুর্ব্বল দরিদ্র ব্যক্তিগণ কতই না জানি নিরপরাধে কারাগারে প্রেরিত হইয়া থাকে। আর একদিকে, যদি এমন বিবেচনা করিতে হয় যে জয়কৃষ্ণ বাবু যথার্থই দোষী ছিলেন তাহা হইলে জয়কৃষ্ণ বাবুর মত সুশিক্ষিত জমিদারের দ্বারা যদি এরূপ পীড়ন ও নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই মনে হয় যে অশিক্ষিত জমিদারগণের দ্বারা না জানি কতই অত্যাচার ও অবৈধ কার্য্য হইয়া থাকে।

যাহা হউক জয়কৃষ্ণ চরিত্র সম্বন্ধে ইহা আহ্লাদের বিষয় যে মদনের মোকদ্দমায় হাইকোর্ট হইতে তিনি মুক্তিলাভ করেন এবং মাখলার মোকদ্দমায় বিলাত আপিল করিলে প্রিভি কৌন্সিলের জজেরা হাইকোর্টের উপর আপনাদের ক্ষমতা না থাকিবার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে শাসনবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের প্রকারান্তরে মুক্তি দিবার ক্ষমতা আছে। অতএব তাহাদিগের নিকট আবেদন করা উচিত, তাহা হইলে যে ন্যায় বিচার হইবে সে পক্ষে সন্দেহ নাই”—

আলোচ্য গ্রন্থখানি আমাদিগের দেশের জমিদারগণকে আমরা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।—গ্রন্থখানি মোটের উপর এত ভাল হইয়াছে যে তাহার দোষের কথা আমরা অধিক বলিতে ইচ্ছা করি না। গ্রন্থকার কোন কোন স্থানে অপ্রয়োজনে পাণ্ডিত্য (অপাণ্ডিত্য) প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা,—

জয়কৃষ্ণ ১৮০৮ সালে ভূমিষ্ট হয়েন * * “ইহার চারি বৎসরের পূর্ব্বে

গৌরবরবি মহাবীর নেপোলিয়ন বোনাপার্টি প্রসিদ্ধ ওয়াটার্লু ক্ষেত্রে ডিউক অব ওয়েলিংটন কর্ত্তৃক বন্দী হইয়াছিলেন।” গ্রন্থকার পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে গিয়া একটি বাক্যে ৩টি ভুল করিয়াছেন। (১) ওয়াটার্লু ক্ষেত্রে নেপোলিয়ন বন্দী হন নাই, সেখানে পরাজিত হন এবং সেই স্থান হইতে পলায়ন করেন। ওয়াটার্লু যুদ্ধের প্রায় একমাস পরে নেপোলিয়ন কাপ্তেন মেটল্যাণ্ডের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন। (২) উক্ত ডিউক তাহাকে বন্দী করেন নাই পরাজিত করিয়াছিলেন মাত্র। (৩) ১৮০৮ সালের চারিবৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮০৪ সালে ওয়াটার্লু যুদ্ধ হয় নাই, ১৮১৫ সালে হইয়াছিল। সামান্য স্কুলের ছাত্র যাহা অবগত তদ্বিষয়ে লেখকের কেন স্থান সময় ও ব্যক্তি সম্বন্ধে ভ্রান্তিত্রয় হইল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আর নেপোলিয়নের পরাজয় আর জয়কৃষ্ণের জন্মের সহিত কি সম্বন্ধ আছে তাহাও সহজে বোধগম্য নহে।

গ্রন্থকার নিজের সন সাল গণনাতেও কখন কখন ভ্রান্তি দেখিতে পাই।

তিনি বলেন জয়কৃষ্ণের জন্ম ১৮০৮ সালে। তিনি বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত মিরাটে কার্য্য করেন পৃঃ ১৬। আবার (পৃঃ ২২) ১৮২৬ সালে অর্থাৎ ১৮ বৎসর বয়সে উত্তরপাড়ায় আসিয়া আর কখনও চাকরীর জন্য পশ্চিমাঞ্চলে যান নাই। যাহা হউক আমরা আহ্লাদের সহিত এই পুস্তক পাঠ করিয়াছি এবং ইহাকে একখানি সুপাঠ্য পুস্তক বিবেচনা করি।

শ্রীরামমোহন চক্রবর্ত্তী।

ক্ষুদ্র আমি—মহৎ তুমি।

The consciousness of this inner unity and the recognition of the oneself dwelling equally in all is the one sure foundation of Brotherhood”—Ancient wisdom.

The Nirvanic consciousness is the antithesis of annihilation. Ibid.

এ সংসারে আমি ক্ষুদ্র। হে মহামহিমান্বিত, মহানুভব, মহদ্ব্যক্তি! আপনি অনুগ্রহ করিয়া এ ক্ষুদ্রের কথায় কর্ণপাত করুন। আপনি উদারচিত্ত ও

মহা-প্রেমিক। এজন্য আপনি সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন ক্ষুদ্র ও মহতে কোন পার্থক্য নাই। সকলেই এক পিতার সন্তান। এ জগতে সকলেই সমান। আপনার পরদুঃখকাতর প্রেমপ্রবণ হৃদয় সকলকে সমান বলিয়া লইতে চাহে, সর্ব্বজীবে সমান স্নেহ ও দয়া বিতরণ করিতে চাহে। কিন্তু, দীন হীন, নিঃস্বম্বল দরিদ্র আমি কি বলিয়া আপনার সমান হইব? আপনাতে আমাতে ত কথন মিল হইবার সম্ভাবনা নাই। আপনি অতুল ঐশ্বর্য্যশালী। আমি চীরপরিহিত, ছত্র ও পাদুকা বিহীন, দীনবেশ, রুক্ষকেশ ভিখারী। আপনার নিকট যাইতে যে আমি বড়ই ভীত হই। আপনার অট্টালিকায় প্রবেশ-কালে আপনার আশ্বাস বাক্য পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়াও যে আপনার সুসজ্জিত ভীমদর্শন দ্বারবানগণকে দর্শন করিয়া আমার অন্তরাত্মা ত্রস্ত হয়। যদি বা ভাগ্যক্রমে আপনার সাক্ষাৎলাভ ঘটিয়া উঠে, তথাপি যতক্ষণ আপনার সমক্ষে থাকি, আমার দেহ মন যে কেমন এক প্রকার জড়ভাবাপন্ন হয়। আপনার রূপলাবণ্যসম্পন্ন অপূর্ব্ব দেহ, আপনার বহু কারুকার্য্য খচিত বিচিত্র বসনাদি দেখিয়া আমি যে স্তম্ভিত হইয়া যাই। আপনি আমাকে আসীন হইতে আজ্ঞা করিলেও যে আমার আসন পরিগ্রহ করিতে সাহস হয় না। আপনি আমাকে সস্নেহ সম্ভাষণ করি-লেও যে আমার কণ্ঠ হইতে বাক্য নিঃসৃত হয় না। তাই বলিতেছি আপ-নাতে ও আমাতে অনেক প্রভেদ। সর্ব্বান্তর্য্যামী ন্যায়বান্ বিধাতা আপনার সুকৃতি অনুসারে আপনাকে মহৎ করিয়াছেন, আর আমার দুষ্কৃত ফলে আমারে ক্ষুদ্র করিয়া ভূমণ্ডলে আনিয়াছেন। আপনাতে আমাতে যে স্বাভাবিক বৈষম্য তাহা কেমন করিয়া অপনীত হইবে? আপনি আমাকে সমান করিয়া লইতে চাহিলেও, আমাদের অবস্থাগত পার্থক্য কেমন করিয়া বিলুপ্ত হইবে? যাঁহার সহিত প্রাণ খুলিয়া কথা কওয়া দূরের কথা, যাঁহার দুই একটি সামান্য কথার উত্তর প্রদানকালেও আমাকে হতবুদ্ধি হইতে হয়—স্বকীয় অবস্থা স্মরণ করিয়া যাঁহার কাছে বসিতে আমি কুণ্ঠিত হই কেমন করিয়া তাঁহাকে আমার সমান মনে করিব? আমরা উভয়েই এক পরমেশ্বরের সন্তান এ কথা যথার্থ। হইলে কি হয়, আমি যে দীন দুঃখী, পথের ভিখারী, আর আপনি যে রাজরাজেশ্বর, আমি কখনই উভয়ের এই অবস্থাগত বৈষম্য—বোধ হয় আপনিও সম্পূর্ণ

তুলিতে সমর্থ নহেন। তবে কেমন করিয়া বলিব, আপনাতে আমাতে কোন পার্থক্য নাই? সুতরাং যেখানে সাম্যের অভাব সেখানে মৈত্রী ও প্রেমেরও অভাব বলিতে হইবে। তবে আমার স্থায় হীনাবস্থ লোকের প্রতি আপনার কিঞ্চিৎ দয়া থাকা অসম্ভব নহে। কারণ আপনাদিগের দয়াবৃত্তির বিকাশ ও চরিতার্থতার নিমিত্তই মাদৃশ দীন দুঃখীর জন্ম। তবেই বুঝিলাম, আমাদের স্থায় হতভাগ্য দরিদ্রজন, কখন মহাবিভবশালী মানবগণের বন্ধু বা সখা হইতে পারেন না, কিন্তু কেবল তাঁহাদিগের দয়ার পাত্র object of pity হইতে পারেন এই মাত্র।

তারপর, আপনি অশেষ বিদ্যায় পারদর্শী, মহাজ্ঞানী মহাপণ্ডিত। আপনকার ঐশ্বর্য্য বিদ্যার ফল কিনা জানি না, কিন্তু দেখিতেছি বিদ্যা ও বিভব, উভয় সম্পত্তিতেই আপনি বিভূষিত। আপনার বিভবের দিকে দৃষ্টি না করিলেও আপনার অসাধারণ জ্ঞান ও বিদ্যার সীমা নির্ণয় করিতে না পারিয়া আমি মুহ্যমান ও স্তম্ভিত হই। তবে কেমন করিয়া আমি ও আপনি সমান হইব? কেমন করিয়া আমরা নিজ নিজ অবস্থা বিস্মৃত হইব।

তার পর, সমাজে, রাজদ্বারে, দেশে, বিদেশে সর্ব্বত্রই আপনার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত। ভূমণ্ডলের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আপনার যশোগান গীত হইতেছে। আর আমি, ক্ষুদ্র নগণ্য, সকলের পরিত্যজ্য। আমাদের এই ঘোরতর বৈষম্য কেমন করিয়া দুরীভূত হইবে? এই বিসদৃশ অবস্থায় পড়িয়া পরস্পরের সাম্য অনুমান করিতে যাওয়া কি নিতান্ত অযৌক্তিক নয়? আপনাতে আমাতে কখন সমান হইতে পারে না। আপনাতে আমাতে বিস্তর প্রভেদ।

তার পর, আপনি জন্মাবধি সাধু ও শিষ্টজন সহবাসে পরিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া সভ্যতা ও বিনয়াদি সদ্গুণের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন। আর আমি চিরদিন কুসমাজে, কুলোকের সহিত বাস করিয়া অসভ্য, বর্ব্বর, ও অশিষ্টের শিরোমণি হইয়াছি। আমি সভ্য সমাজে বসিতে জানি না, উঠিতে জানি না, আলাপ করিতে জানি না। আমাকে সুহৃদজ্ঞানে সঙ্গে লইয়া সভ্যজনগণকে সর্ব্বদাই বিব্রত হইতে হয়, সর্ব্বদাই লজ্জা ও অপ্রসন্নতা ভোগ করিতে হয়। আপনার ও আমার আচার ব্যবহারেও দেখিতেছি ঘোরতর পার্থক্য। তবে

কোন্ বিষয়ে আমি আপনার সমান হইতে পারি ? ঐশ্বর্য্যে নয়, বিদ্যায় নয়, খ্যাতিতে নয়, ব্যবহারে নয়, তবে কোন্ বিষয়ে আমাদের পরস্পরের ঐক্য আছে ?

তার পর দেখুন, আপনি উচ্চ কুলোদ্ভব মহান্ ব্যক্তি। বংশগৌরবে ও আভিজাত্যে আপনি সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন। মাদৃশ ব্যক্তি অত্যন্ত নীচ কুলোৎপন্ন। সুতরাং সমাজের সর্ব্বত্রই অপদস্থ ও উপেক্ষিত হইয়া থাকে। কেমন করিয়া বলিব আমরা উভয়েই সমান ? আপনি বলিতে পারেন যে এ সকল বাহ্য অবস্থাগত পার্থক্যের কথা ছাড়িয়া দাও। আত্মাহৃদয়ের সম্পত্তিতে আমরা উভয়েই সমান। কিন্তু কৈ, আমি মানসিক বা আধ্যাত্মিক রাজ্যেও ত উভয়ের সাম্য অনুভব করিতে পারিতেছি না। আপনার হৃদয় মন জ্ঞানপ্রভায় উদ্ভাসিত—দয়া দাক্ষিণ্যাদি স্বর্গীয় কুসুম শোভায় পরিশোভিত, আর আমার হৃদয় মন কুচিন্তায় কলুষিত, পাপবিকারে সংক্ষুব্ধ, নীচতা ও স্বার্থপরতায় সঙ্কুচিত। কেমন করিয়া বলিব আপনায় আমায় প্রভেদ নাই ? কেমন করিয়া বলিব আমরা উভয়ে স্বরূপতঃ সমান ? কেমন করিয়া বলিব আমরা উভয়ে ভাই ভাই, ভিতরে কোন ব্যবধান নাই ?

বস্তুতঃ আমরা উভয়ে সমান নহি। আমরা উভয়ে মনুষ্য নামে অভিহিত হইলেও, দেবতা ও পশুতে যে প্রভেদ, আপনাতে ও আমাতেও সেই প্রভেদ। আমাদের এই বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ পার্থক্য নিজ নিজ কর্ম্মজনিত। শত চেষ্টা করিলেও আমাদের এই পার্থক্য দূরীভূত হইবার নহে। কিন্তু আছে কেবল একটি স্থানে। আপাতদৃষ্টিতে আমরা উভয়েই সমান বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মৃত্যুকে সকলের সাম্যকারী (the great leveller) বলিয়া যে এইরূপ ভ্রান্তি জন্মে, কিন্তু বস্তুতঃ দেহান্তেও জীবগণের কর্ম্মগত পার্থক্য বিলুপ্ত হয় না। যাঁহারা পরলোকে বিশ্বাস করেন, যাঁহারা মৃত্যুর পর অবস্থান্তর প্রাপ্তির কথা স্বীকার করেন, তাঁহারা জানেন যে সেই অতীন্দ্রিয় রাজ্যেও কর্ম্মানুসারে জীবগণের ভিন্ন ভিন্ন গতিলাভ হইয়া থাকে। যখন ইহলোকে পরস্পর সমান হইতে পারিলাম না, পরলোকেও সমান হইতে পারিলাম না, তবে কোথায় আমরা সমান হইব ? বস্তুতঃ যত দিন আমাদের ভেদ জ্ঞান থাকিবে তত দিন কোন স্থানেই আমরা পরস্পর সমান হইতে পারিব না। এই ভেদজ্ঞান কি ?

এই বিষয় লইয়া শাস্ত্রকার ও দার্শনিকেরা অনেক বাদানুবাদ করিয়াছেন। এই ভেদজ্ঞান লইয়াই দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের উৎপত্তি হইয়াছে, মাদৃশ জনের পক্ষে এই দুরূহ তত্ত্বের রহস্যভেদ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। তথাপি মানবাত্মার আকাঙ্ক্ষা কতদূর গমন করে কি বলিব? আর সে আকাঙ্ক্ষা একবার জাগিলে তাহাকে সহজে নিবৃত্ত করাও সুকঠিন। অতএব আমাদের অধিকার থাকুক বা নাই থাকুক, ভেদজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতে সাহসী হইব। জ্ঞানীরা অনেকেই বলেন, জীবে ও ব্রহ্মে, অর্থাৎ সৃষ্টপদার্থে ও সৃষ্টীকর্ত্তায় স্বরূপতঃ কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু 'অহংজ্ঞান' বলিয়া একটি ভাব জীবকে চিরদিন ব্রহ্ম হইতে বিযুক্ত রাখিয়াছে। এই অহংজ্ঞান ও স্বাতন্ত্র্য জ্ঞানই জীবের ব্রহ্মত্ব লাভের অন্তরায়। যত কাল জীব আপনাকে ব্রহ্ম এবং জাগতিক অন্য অন্য পদার্থ হইতে পৃথক বা স্বতন্ত্র অস্তিত্বসম্পন্ন বলিয়া মনে করে, ততকাল তাহার বন্ধন। আর যে দিন জীব এই স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন করিতে পারে, সেই দিন তাহার মুক্তি বা নির্ব্বাণ। এই অহংজ্ঞানই আমাদিগকে সৃষ্টিকর্ত্তা ও তাবৎ সৃষ্টবস্তু হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। 'সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিকর,' 'সর্ব্বভূতে দয়াপরবশ হও' বিশ্বজনীন প্রেম ও ভ্রাতৃভাব লাভকর' ধর্ম্মাচার্য্য ও শাস্ত্রকারগণের এবম্প্রকার শিক্ষা কেবল যথাশক্তি অহংজ্ঞান বিসর্জ্জন করিতে উপদেশ দেওয়া মাত্র। 'অহংজ্ঞান বিসর্জ্জন কর' বলিলে কথাটা কিঞ্চিৎ দুরূহ ও নীরস বোধ হয়। এই জন্যই সূক্ষ্মদর্শী ধর্ম্মগুরুরা নানা কৌশলে এবং নানাবিধ সরস ও সুমিষ্ট উপায়ে আমাদিগকে অহংজ্ঞান বিসর্জ্জন করিতে শিক্ষা দিতেছেন। স্বার্থ ত্যাগ করিয়া পরার্থ অন্বেষণ করা এই অহংজ্ঞান ত্যাগেরই সোপান মাত্র। 'অহিংসাপরমো ধর্ম্মঃ' এই মহাবাক্যও অহংজ্ঞান বিসর্জ্জনের নামান্তর মাত্র। ভেদজ্ঞান বা অহংজ্ঞান জীব কখন এক দিনে বিসর্জ্জন করিতে পারে না। বহু জন্মের চেষ্টা ও সাধনায় এই অহংভাব দূর করিতে হয়। আত্মবিস্মৃতি ও আত্ম-বিসর্জ্জন, অহংজ্ঞান ত্যাগ করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সকল ধর্ম্মেই এই স্বার্থত্যাগ বা আত্মবিসর্জ্জনের উপদেশ আছে। সুতরাং বলিতে হইবে, সকল ধর্ম্মই আমাদিগকে পরোক্ষে অহংজ্ঞান বিসর্জ্জন করিতে উপদেশ দিতেছেন। স্বার্থত্যাগ না থাকিলে পুণ্য হয় না। পুণ্য সঞ্চয় করিতে হইলেই

কিছু না কিছু বিসর্জ্জন করিতে হইবে। আর পুণ্য অর্থে যদ্যপি মোক্ষজনক ধর্ম্মমাত্র বুঝা যায়, তবেই দেখিব পরম পুণ্য বা মোক্ষ লাভ করিতে হইলে, সামান্য অর্থাদি বা কিঞ্চিৎ কায়িক পরিশ্রম হইতে আরম্ভ করিয়া কালে আমাদিগকে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিতে হইবে। শুধু ধন জন, গৃহ পরিবার নহে, শুধু দেহ মন প্রাণ নহে, কিন্তু আমাদিগের আমিত্ব, পরিশেষে আমিত্বের এক মাত্র আশ্রয় আমাদিগের অহংজ্ঞান বা পৃথক অস্তিত্বটুকু পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে হইবে। এই অহংজ্ঞান বিসর্জ্জনই মনুষ্যের চরম সাধনা। জ্ঞানের সাহায্যেই হউক আর প্রেমের সাহায্যেই হউক, আর সাধনার সাহায্যেতেই হউক যে কোন উপায়ে মনুষ্যকে এই ভেদজ্ঞান দূর করিতে হইবে। ভেদজ্ঞান প্রভাবে সংসারে দ্বেষ, হিংসা, কলহ, বিবাদ, অপ্রেম, অশান্তি এবং নানাবিধ দুঃখ যন্ত্রণা। এই ভেদজ্ঞান ত্যাগ করা, ঈশ্বর, বা ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ বা জগতকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নহে। কিন্তু নিজ নিজ সুখ শান্তি লাভের নিমিত্ত। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে যেখানে স্বার্থ সেইখানেই অশান্তি। স্বার্থের সঙ্গে যেন দুঃখ মিশ্রিত রহিয়াছে। স্বার্থপর মনুষ্য কখন জগতে সুখী হইতে পারেন না। শান্তিপ্রার্থী প্রত্যেক মানবকেই স্বার্থশূন্য হইতে হইবে। স্বার্থত্যাগ করিয়া আমরা অপরের যে কিছু ইষ্ট সাধন করি তাহা গণনার মধ্যে না ধরিলেও চলে, কারণ ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে স্বার্থত্যাগ দ্বারা আমরা প্রধানতঃ নিজ নিজ ইষ্টসাধনই করিয়া থাকি। আর চরমশান্তি বা মোক্ষ লাভ করিতে হইলে, আমাদিগকে কেবল সামান্য স্বার্থ ত্যাগ নহে, কিন্তু অহংজ্ঞানটি পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে হইবে। এই অহংজ্ঞান বিলুপ্ত হইলেই আর ভেদ বোধ থাকিবে না। চরাচরাস্থ তাবৎ প্রাণী তখন বস্তুতঃ এক হইয়া যাইবে। যখন আকৃতিগত, প্রকৃতিগত, অবস্থাগত, নানাবিধ বৈষম্য সত্ত্বেও সকলকেই নিজস্বরূপ বলিয়া অনুভব হইবে, তখন আর ভিন্ন ভিন্ন জীবের পৃথক অস্তিত্ব উপলব্ধ হইবে না, তখন তাবৎ সৃষ্টিমধ্যে একই বিশ্বাত্মার প্রকাশ, সর্ব্বজীবে একই ব্রহ্মশক্তির স্ফূর্ত্তি দেখিয়া অপার আনন্দ লাভ হইবে।

কিন্তু এই স্থলে আমাদের মনে রাখা উচিত, যত দিন ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত না হয়, তত দিন বিভিন্ন অবস্থাপন্ন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে সমান মনে করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত না হইলে মানবমণ্ডলীর মধ্যে কখনই প্রকৃত

ভ্রাতৃভাব বা বিশ্বজনীন প্রেম সংস্থাপিত হইতে পারে না। অতএব শুধু প্রেম বা ভ্রাতৃভাবের কথা আলোচনা না করিয়া, কিসে আমাদের স্বার্থভাব বিদূরীত হইতে পারে, কিসে আমাদের ভেদজ্ঞান লুপ্ত হইতে পারে তদ্বিষয়ের চিন্তা করাই আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। সকলকে সমান দেখা, এবং সর্ব্বজীবকে সমান বলিতে অভ্যাস রাখা অবশ্য ভাল। কিন্তু ভেদজ্ঞান দূর করিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। তত্ত্বজ্ঞানের অভাবেই আধুনিক হিন্দুজাতির এতাদৃশ অধঃপতন ঘটিয়াছে। জগতের হিতার্থী ব্যক্তিরা শুধু ভাবুক হইয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন না, তাঁহারা ভাবপদার্থ লইয়া ক্রীড়া ত্যাগ করুন, কারণ ভাবরূপ তরল বা কোমল পদার্থের ভিত্তিতে কোন সুদৃঢ় হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হইতে পারে না।

এস্থলে বলা আবশ্যক, ভাব ও ভক্তি এ দুইয়ে বিস্তর প্রভেদ। ভক্তি দ্বারা অতি সহজে আত্ম বিসর্জ্জন হয় বটে, অতি সহজে অহংজ্ঞান ত্যাগ করা যায় বটে, কিন্তু যে শুদ্ধা স্বাত্বিকী ভক্তি দ্বারা জীব আমিত্ব বিসর্জ্জন করিয়া সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি করিতে পারে, সর্ব্বজীবে আপনার প্রেমস্বরূপ আরাধ্য দেবতার বিকাশ দেখিয়া বিহ্বল হইয়া পড়ে, পরিশেষে আপন উপাস্য পদার্থে নিজ অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিয়া নিরবচ্ছিন্ন প্রেমানন্দরসে ডুবিয়া যায়, সে ভক্তি নিতান্ত দুর্ল্লভ। সেই অনুপমা অহৈতুকী ভক্তি লাভ করা সাধারণ মানবের সাধ্য নহে। বরং তদপেক্ষা যুক্তি ও বিচারসাপেক্ষ জ্ঞানচর্চ্চার অধিকার অনেকের আছে আমাদের এইরূপ মনে হয়। জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ এই দুই বিভিন্ন পন্থা লইয়া জগতে অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় উভয় পন্থারই চরম ফল সমান। দ্বৈতজ্ঞান ও অদ্বৈতজ্ঞান সাধকের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা মাত্র, এবং উভয়ের পরিণামফল এক। সে যাহা হউক, আমরা বলিতেছিলাম, ভাব ও ভক্তি এক পদার্থ নহে। ভাব ক্ষণিক ও অস্থিত। বহুদিবসের সাধনায় পরিপক্কতা লাভ করিলে, তবে ভাব প্রেমে পরিণত হয়। প্রেম আবার স্বার্থপরিশূন্য হইয়া বহুকালে শুদ্ধা ভক্তিতে পরিণত হয়। সুতরাং যখন প্রকৃত প্রেম বা ভক্তি লাভ করা সুকঠিন, তখন নিতান্ত চঞ্চল ও অস্থায়ী ভাবকে আদৌ বিশ্বাস না করিয়া বরং, শুষ্ক, নীরস, কঠিন হইলেও আমাদিগকে জ্ঞানভিত্তির উপরই যাবতীয় শান্তিমন্দির নির্ম্মাণ করিতে

হইবে। তাই বলিতেছি, মুখে, ক্ষুদ্র মহত্তকে সমান বলিবেন না। ভাবাবেশে উভয়ের সাম্য কল্পনা করিবেন না, আকস্মিক প্রেমের উচ্ছ্বাসে যাহাকে তাহাকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিবেন না। আপনি ক্ষণিক প্রেমের আবেগে আজ যাহাকে ভাই বলিতেছেন, স্নেহের চক্ষে দেখিতেছেন, কালি তাহাকে হয়ত সে চক্ষে দেখিতে পারিবেন না। তাই বলিতেছি, দণ্ডে দণ্ডে ক্ষণে ক্ষণে অভেদ মন্ত্র জপ করিয়া, অহর্নিশ মন্ত্রার্থ ভাবনা করিয়া বুঝুন এবং দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করুন যে প্রকৃতপক্ষে আমরা সকলেই সমান। স্বরূপতঃ আমরা সকলেই এক। হে ঐশ্বর্য্যবান্, প্রতাপবান্, সহৃদয়, মহানুব্যক্তি! আপনার প্রতিই আমার এই বিশেষ নিবেদন। আপনার প্রভূত শক্তি, অপ্রতিহত প্রভাব, বিপুল বিভব। আপনি মনে করিলে জগতের অশেষ হিতসাধন করিতে পারেন। আপনার ভেদ বুদ্ধি প্রকৃতভাবে তিরোহিত হইলে জনসমাজের সমূহ মঙ্গল সংসাধিত হইতে পারে। অতএব হে মহানুব্যক্তি! আপনাকে বলি, আপনি আর বিনয় বা শিষ্টাচারের অনুরোধে, দুর্ব্বল ও হীনাবস্থ লোকদিগকে সমান বলিয়া বৃথা আপ্যায়িত করিবেন না। জীবগণের এতাবৎ সৃষ্ট পদার্থ মধ্যে যে বাস্তবিক স্বাতন্ত্র্য নাই এইটি অনুভব করিবার চেষ্টা করুন, সাধন-বলে ঐ অনুভূতিকে আত্মার সংস্কাররূপে পরিণত করিবার অভ্যাস করুন, এবং সেই বিবেকবৈরাগ্য সমুদ্ভাসিত বিমল সংস্কারবশে আপনার দৈনিক জীবনকে পরিচালিত করিতে থাকুন। দেখিবেন, ভাবের ঘোরে প্রেমের উচ্ছ্বাসে একদিন যে কথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা অলীক নহে—ধ্রুব সত্য, কল্পনা নহে—প্রকৃত বস্তুতত্ত্ব। সত্য সত্য জগতে ক্ষুদ্র মহৎ নাই, সকলেই এক ব্রহ্মপদার্থের বিকার ও বিবর্ত্তস্বরূপ, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এক বস্তুর মাত্র প্রকৃত অস্তিত্ব আছে। সকল পৃথক পৃথক অস্তিত্বই এক মহাসত্ত্বার অন্তর্নিহিত, সকল পৃথক পৃথক প্রাণ এক মহাপ্রাণে নিবদ্ধ। আপনার ভুলিয়া এই বিশাল বিশ্ব ভুলিয়া এক নিবিড় অন্ধকারময় প্রদেশে সেই একমাত্র মহাসত্ত্বার সহিত যোগ সংস্থাপন করিবার চেষ্টা করুন। অচিরে দেখিবেন, জ্ঞানে সমস্ত আলোকিত হইয়াছে—এই ব্রহ্মাণ্ড ও চরাচরস্থ তাবৎ জীব এক মহাসাগরে ডুবিয়া রহিয়াছে—এবং এক বিরাট বিশ্বাত্মাই এ ব্রহ্মাণ্ড ক্রোড়ে লইয়া সৃষ্টি পালন ও সংহাররূপ বিবিধ ক্রীড়া করিতেছেন।

আপনাকে ভুলিলে, নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব লুপ্ত হইলে, কেমন করিয়া ব্রহ্ম-সত্ত্বার অনুভব হইবে, এরূপ আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই। নির্ব্বাণ তত্ত্বের অধিকারী যোগীরা বলেন যে নির্ব্বাণরূপ শান্তিময় অবস্থায় নাকি অহংজ্ঞান লুপ্ত হইলেও, ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইলেও, আনন্দাদি উপভোগের নিমিত্ত মুক্ত ব্যক্তির স্বকীয় অস্তিত্ব জ্ঞানের বিলোপ হয় না। সেই মোক্ষধামে নাকি জীবের ক্ষুদ্র 'আমি' এক বিশাল বিরাট 'আমিতে' পরিণত হয়! সেখানে প্রত্যেক জীব নাকি প্রত্যেক জীবের সহিত সম্পূর্ণ সাম্য অনুভব করিয়া থাকেন। তাই বলিতেছি, হে মহান্ ব্যক্তি! আপনি কাল্পনিক সাম্যের কথা না বলিয়া, প্রকৃত সাম্য লাভের চেষ্টা করুন। এই চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার হৃদয় দিব্যভাবে পরিপূর্ণ হইবে এবং আপনার জীবন বিশুদ্ধ ও শান্তিময় হইবে। আপনার অন্তঃকরণ হইতে প্রেম ও পবিত্রতার উৎস ছুটিতে থাকিবে এবং আপনার মস্তিষ্ক হইতে আনন্দ ও সুধার ধারা ক্ষরিত হইয়া আপনাকে এবং আপনার সহবাসী জগজ্জনকে অমৃতরসে অভিষিক্ত করিবে। ক্রমে দেখিবেন সত্য সত্যই এ জগতে কেহ পর নাই—সকলেই আপন, সকলেই ভাই ভাই, সকলেই সমান, সর্ব্বত্রই এক ব্রহ্ম পদার্থের স্ফুর্ত্তি। এই বিশ্বে ক্রন্দন কোলাহল, শোক দুঃখ, জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি সকলই স্বপ্নের খেলা, বস্তুতঃ সর্ব্বত্রই আনন্দময়ের লীলা, সর্ব্বত্রই এক অবিরল আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইতেছে।

এ ক্ষুদ্রের কথা শেষ হইল। আনন্দময়ের পূত নামে এই প্রবন্ধের উপসংহার করিয়া তাঁহারই পবিত্র স্বরূপ স্মরণ করিতে করিতে ক্ষুদ্র আমি পাঠকবর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করি।

ক্ষুদ্র আমি।

ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ঠিক বেলা প্রহরেক সময় আমরা হরিপুরে বৌমার পিতৃগৃহে পৌঁছিলাম। বউমার পিতৃগৃহে তাঁহার পিতা মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃপানাথ বাবু আর তাঁহার পত্নী দক্ষবালা। বউমার পিতা সর্ব্বেশ্বর শর্ম্মার পূর্ব্বাবস্থা বড় একটা ভাল ছিল

না। কিন্তু সম্প্রতি আট দশ বৎসর হইতে কৃপানাথ বাবু এম, এ, বি, এল্‌ হইয়া জজকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করায় কয় বৎসর হইতে অবস্থা বেশ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এত দিন পরে কৃপানাথ বাবুর প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন। তাহাই ওকালতিতে প্রবৃত্ত হইবার পর হইতে, আজি এই আট বৎসর মধ্যে তাঁহার সুন্দর অট্টালিকা হইয়াছে এবং গৃহ সতত দাসদাসীতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। কিন্তু কৃপানাথ বাবুর সুখ হইলেও অদৃষ্টদোষে কৃপানাথ বাবুর বৃদ্ধ পিতা সর্ব্বেশ্বর শর্ম্মা, অথবা তাঁহার পত্নী তারা সুন্দরীর অদৃষ্টে বড় একটা সুখ ছিল না। কেন না, কৃপানাথ বাবুর পত্নী দক্ষবালাই এখন আপনার গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ; এবং সত্য কথা বলিতে কি পাপিষ্ঠা দক্ষবালা হতভাগ্য বৃদ্ধ শ্বশুর অথবা বৃদ্ধা শাশুড়ীকে বড় একটা সুনজরে দেখিতেন না। এবং তাঁহারই নূতন কর্তৃত্বাধিনে বলিয়া, এ বৎসর পূজার সময় বউমার পিত্রালয় যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই।

* * * * *

বউমার সঙ্গে সবে এই নূতন তাঁহার পিত্রালয়ে প্রবেশ করিলাম। বহুদিন গত হইয়াছে,—জীবনে অনেক সুখ দুঃখ ভোগ করিয়াছি—করিতেছি—করিব ; কিন্তু বউমার 'পিত্রালয়ে প্রথম প্রবেশের যে চিত্র দেখিলাম, সে চিত্র এখনও আমার চিত্তপটে তেমনি উজ্জ্বলতরভাবে অঙ্কিত আছে, যত দিন বাঁচিব, তত দিন তেমনি ভাবে সে চিত্র উজ্জ্বলতর থাকিবে।

বউমার সহিত তাঁহার পিতৃগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে, গৃহিণীঠাকুরাণী তারা সুন্দরী মলিন মূর্ত্তিতে প্রাঙ্গনের এক পার্শ্বে কৃপানাথ বাবুর পুত্র অমরনাথকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন। আর কৃপানাথ বাবুর পত্নী দক্ষবালা দেবী আজ ভাইফোঁটা দিবার জন্য দালানের এক প্রকোষ্ঠে বসিয়া আপনার মনে আপন ইচ্ছানুসারে জলখাবার সাজাইতেছিলেন।

হঠাৎ বউমাকে দেখিয়া কৃপানাথ বাবুর মা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া, আপনার দুই হাতে বউমাকে বুকে তুলিয়া লইলেন। গৃহিণীঠাকুরাণীর কাতর ক্রন্দন ধ্বনি, আর বউমার নীরব অশ্রুপাতে, আমার হৃদয়ে যে ভাব উপস্থিত হইয়াছিল,—তাহা বর্ণনার অতীত। আমি তখন গঠিত কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায়, সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

এ দিকে আজিকার এই শুভ দিনে শুভক্ষণে বিনা কারণে হঠাৎ শাশুড়ীকে

কাঁদিতে দেখিয়া সাক্ষাৎ ব্যাঘ্রিণীর ন্যায় দক্ষবালা আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমি দক্ষবালাকে একবার নয়ন ভরিয়া দেখিলাম,—দেখিলাম যে দক্ষবালার মূর্ত্তিখানি পাপের করাল-ছায়ায় প্রতিফলিত। ঠিক বিধাতা যেন হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ প্রভৃতি কতকগুলি নিকৃষ্ট বৃত্তির দ্বারায় দক্ষবালাকে গড়িয়াছিলেন। দক্ষবালা শাশুড়ীকে কাঁদিতে দেখিয়া ক্রোধভরে কহিলেন "আঃ মরণ আর কি? শুভ দিনে—শুভ ক্ষণে একটা শুভকাজে হাত দিলাম,—আর 'উনি কিনা, অমনি মরাকান্না জুড়ে দিলেন।"

দক্ষবালার কথা কয়েকটী শুনিয়া, ঘৃণায় আমার হৃদয় পূর্ণ হইল।

বউমার মা কহিলেন,—আর বাছা, তুমি আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিও না।"

দক্ষবালা। "তা বটে, দোষ আমার,—না। বলি লোকের মেয়ে তো আর কারই বিধবা হয় না, জামাই তো আর কারো মরে না; যে রোজই বাপের বাড়ী আস্‌বেন, আর রোজই এই মরাকান্না জুড়ে দেবেন। দিন নাই, ক্ষণ নাই,—শুধু মরাকান্না; কান্নাতেই এ সংসার পয়মাল দিতে ব'সেছেন।" তার পর, বউমার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"আর তোমার ত ব'সে কাজ নাই,—এক কুল খেয়ে, আবার এ কুলও খেতে এসেছ,—না।"

পূর্ব্ব হইতেই বউমা বড় কথা জানিতেন না; সুতরাং ভ্রাতৃজায়া দক্ষবালার কথায় সহসা কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, শুধু নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ কাঁদিবার পর, বউমা ধীরে ধীরে অশ্রুপূর্ণ দীন নয়নে কহিলেন,—"আর আসিব না; বৎসরের মধ্যে শুধু এক দিন—এই ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার দিন আসিব। তাহাতে নিষেধ করিও না,—দাদা গে'লে আমি আসিতাম না।

এবার দক্ষবালা তীব্র ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন,—"উঃ, বাপরে, কি সুখেই আছেন যে, আবার ভাই-ফোঁটা দিবারও সাধ যায়।

বউমা,—"আমার নিজের সুখ দুঃখ, আমার নিজের হাতে। আমি সুখে থাকি বা দুঃখে থাকি,—সে ভাবনা তোমাকে ভাবিতে হইবে না। মিছে কেন আমার সঙ্গে কোন্দল ক'র।"

দক্ষবালা—মর মাগী,—আমি কোন্দল কচ্ছি, না, তুই বাড়ী বয়ে ঝগড়া

কর্ত্তে এসেছিস্।" তার পর আপন মনে কহিলেন,—"তবুও যদি বড় লোকের মাগ হতিস, তবে না জানি কত সাধ পেত।"

বউমা,—"বড় লোক সকলে হয় না। সকলেই যদি মুলে বড় লোক হ'তো তা হ'লে আজ আর আমাকে এত কথা শুনিতে হইত না।"

কথা কয়েকটা দক্ষবালার বুকে বড় বাজিল; কেন না দক্ষবালার পিতৃ-গৃহের অবস্থা বড় শোচনীয় ছিল, পূর্ব্বে দিনান্তে অন্ন মিলিত না, তবে কৃপানাথ বাবু অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম হওয়ার সময় হইতে, দক্ষবালার কৃপায়, কতকটা অন্নকষ্ট ঘুচিয়া ছিল। সুতরাং কথা কয়েকটী শুনিয়া দক্ষবালা কালভুজঙ্গিনীর ন্যায় গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে কহিলেন,—"দূর হ' মাগী,—আমার বাড়ী হ'তে দূর হ', নহিলে ঝাটা মেরে দুর করে দিব।

এবার বউমারও একটু রাগ হইল। তাই তিনি স্থির থাকিতে না পারিয়া কহিলেন,—"এতো আমার বাপের বাড়ী এসেছি,—আমায় দুর ক'রে দেবার তুমি কে? যখন তোমার বাপের বাড়ী যাব, তখন তুমি দুর করে দিও।" তার পর আবার চ'খের জল মুছিয়া কহিলেন,—"আর দুর করেই বা দিতে হইবে কেন? যে জন্য এসেছি—সেই ভাইফোঁটা দেওয়া হইলেই চলে যাব।"

আবার ব্যঙ্গস্বরে চিড়াইয়া দক্ষবালা কহিলেন,—"আহা, কি সাধরে,—তবুও যদি ভিখারির স্ত্রী না হতিস্। ঐ যে কথায় বলে,—'ভিখারীরও সাধ যায় সোনার পালঙ্কে শুতে।"

বউমা—"আমরা তো গরিব দুঃখির মেয়ে—গরীব দুঃখীর স্ত্রী, তুমিই বা ক'দিনের বড় মানুষের মে'য়ে, একবার সেটা ভাবিয়া দেখিলেই তো সব হয়।"

কথায় কথায় বেশ ঝগড়া বাধিল। আমি এতক্ষণ বোকার মত এক ধারে দাঁড়াইয়াছিলাম। ঝগড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া বউমাকে কহিলাম,—"বিবাদে দরকার কি? চল ফিরে যাই।"

বউমা কোন উত্তর দিলেন না,—দিতে পারিলেন না। শুধু নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। হায়। সংসার সুখ বঞ্চিতা অভাগিনী বিধবার নীরব অশ্রুপাত দেখিবার লোক ইহসংসারে কেহই নাই,—হা, ভগবান্।

তখনও দক্ষবালার জিহ্বার কণ্ডূয়ন কিছুমাত্র নিবৃত্তি নাই। এমন সময়ে বউ-মার একমাত্র অগ্রজ দক্ষবালার স্বামী কৃপানাথ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কৃপানাথ বাবু দক্ষবালার মুখে বিবাদের কারণ শুনিয়া, বউমার উপরই রাগ করিয়া কহিলেন,—"তুই পোড়ার মুখি বাড়ী বয়ে মরতে এসেছিস্ কেন?"—হায় এমএ. বিএল—তুমি অধঃপাতে যাও। কৃপানাথ বাবুকে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম, হয়ত তিনি এক মাত্র সংসার সুখ বঞ্চিতা হত-ভাগিনী বালিকা কনিষ্ঠা ভগিনীর মনের দুঃখের লাঘব করিবেন। কিন্তু হায়! পিশাচেরও হৃদয় এতদুর কঠিন নয়! হায়, কৃপানাথ বাবু তুমি না; এমএ, বি; এল—তুমি না জ্ঞানী,—তুমি না বিদ্বান: এ সংসারে তুমি যদি বিদ্বান, তবে এ সংসারে মূর্খ কে? তুমি যদি মনুষ্য,—তবে এ সংসারের পশু কে? তোমাতে ও পশুতে তো কোনও প্রভেদ নাই। হায়, উচ্চশিক্ষায় মনুষ্যকে যদি এমন করিয়া পশুত্বে পরিণত করে,—তবে, উচ্চশিক্ষা তুমি অধঃপাতে যাও। চিরজীবন সংসারে মূর্খ হইয়া, পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী লইয়া দিন কাটাইব, তবু ও এমন উচ্চশিক্ষা আমরা চাহি না।

কৃপানাথ বাবুর কথায় বউমা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"দাদা, সুসময়ে অনেকেই আপনার হয়, কিন্তু অসময়ে কেহই কাহার নয়। এখন তোমার সুসময় পড়িয়াছে, তাহাই এ হতভাগিনী ভগিনীকে ভুলিলে? কৃপানাই বাবু কহিলেন "তোর কোন কথা শুনিতে চাহি না, তুই যা।" এবার দক্ষবালার সাহস বাড়িলে তিনি কহিলেন, ভালয় ভালয় বাড়ী হ'তে বের বলছি,—নহিলে, এখনই ঝাঁটা মেরে দুর করে দিব।

বউমা কি বলিতে যাইতে ছিলেন;—আমি বউমার মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিলাম, "আর কাজ নেই,—চল ফিরে যাই।"

বউমা এবার কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"দাদা, এখন আমাকে পর ভাবিলে, ক্ষতি নাই; কিন্তু আমি সতত তোমার মঙ্গল প্রার্থিনী। বড় সাধ ছিল, ভাই ফোঁটা দিয়ে যাব, আর পূজোর সময় এবার আন নাই ব'লে দু'টো কথা বলিব; তা, এতদুর হবে বুঝি নাই,—বুঝিলে আর আসিতাম না।

কৃপানাথ বাবু কহিলেন, তোর ভাইফোঁটা দিবার দরকার কি? যখন ভাই ফোঁটা দিবার উপযুক্ত হবি,—তখন আসিস্। এখন দুর হ'য়ে যা।" আর না, অগ্রজের এই কথা শুনিয়া বউমা আর একটু অপেক্ষা না করিয়া আমাকে টানিয়া আনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গাড়ীতে উঠিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময়, অনাহারে আমরা জজকোর্টের উকিল কৃপানাথ বাবুর বাড়ী হইতে বহির্গত হইলাম। পিশাচের হৃদয়েও দয়া আছে পাষাণও দ্রবীভূত হয়; কিন্তু পিশাচ অপেক্ষাও হেয়, পাষাণ অপেক্ষায় ও কঠিন কৃপানাথ বাবুর হৃদয়ে লেশ মাত্র করুণা হইল না।

কৃপানাথ বাবুর গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া প্রায় একক্রোশ পথ আসিবার পর বউমা হঠাৎ আমার শুষ্ক ও মলিন মুখ দেখিয়া কহিলেন, "শরৎ,—গাড়ী রাখিতে বল; এখানে স্নান করে নিই।" এখন বউমার মুখ বড় প্রসন্ন—যেন কোন ঘটনাই ঘটে না।

আমি লালমোহনকে বলিয়া, নিকটে একটী সরোবরেয় ধারে গাড়ী লাগাইলাম। গাড়ী লাগিলে লালমোহন নিকটবর্ত্তী বাজার হইতে খাবার কিনিয়া আনিল। এদিকে লালমোহন আসিলে আমি ও বউমা উভয়ে সেই সরোবরের জলে স্নান করিলাম। স্নানান্তে বউমা, ভাইফোঁটার জল খাবার যাহা কিছু বাড়ীতে নিজ হস্তে করিয়া ছিলেন, সমুদয় বাহির করিয়া, সেই সরোবরের সোপানে বসিয়া অতীব যত্নের সহিত দুই খানি রেকাবে তাহা সাজাইলেন। তারপর, প্রসন্ন বদনে একখানি রেকাব আমার হাতে দিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠস্বরে কহিলেন, "এই নাও, ভাইফোঁটার তোমার যাহা প্রাপ্য, এই নাও, জল খাও। এই বলিয়া একখানি রেকাব আমার হাতে দিয়া, অপর খানি লইয়া সরোবর সোপান অবতরণ করিয়া, চুপে চুপে আপনার মনে আপনি কি মন্ত্র পাঠ করিলেন, তার পর প্রসন্ন বদনে সেই রেকাবখানি সরোবরের জলে ভাসাইয়া দিলেন। হায়, রেকাবখানি সরোবরের জলে ভাসাইয়া দিবার কালে, সহসা প্রসন্নময়ীর প্রসন্ন নয়নে জল আসিল।

বউমা রেকাবখানি ভাসাইয়া দিয়া আবার প্রসন্ন বদনে আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—ও কি, কি ভাবছ শীঘ্র খেয়ে না'ও বেলা গেল। বলিতে কি এই ভাইফোঁটার উপহার দ্রব্য খাইতে আমার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি ছিল না। সুতরাং বউমার স্নেহপূর্ণ কাতর কণ্ঠস্বরে আমি বালকেয় ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলাম।

আমাকে কাঁদিতে দেখিয়া, বউমা আবার স্নেহপরিপূর্ণ কণ্ঠে আমায়

কহিলেন,—"খাও, দুঃখ কি? আমি জানি এক দিন তোমা হইতে আমার এই মর্ম্মান্তিক দুঃখের অবসান হইবে।" এই বলিয়া আপনার বসনাগ্র ভাগের দ্বারায় আমার নয়নের জল মার্জ্জনা করিয়া দিলেন। এদিকে বউমার কথায় আমিও সেই শৈশবে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, "দেবী! একদিন তোমার দুঃখ দূর করিব।"

তারপর উভয়ে জলযোগ সমাপন করিয়া, গাড়ী ছাড়িয়া দিলাম, এবং সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে বাড়ী আসিলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সুখে দুঃখে হাসি কান্নায় একেবারে বার বৎসর কাটিয়া গেল। বারবৎসর পরে, বউমার আশীর্ব্বাদে আমি প্রশংসার সহিত এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। এত দিনে, আমার পরীক্ষার সুফল দেখিয়া বউমার বিষাদ-ক্লিষ্ট মলিন মুখে আবার মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল। এম, এ, পাসের সংবাদ বাহির হইবার কয় দিন পরে, এক দিন বৈকালে বউমা আমায় আপনার কাছে বসাইয়া কহিলেন,—"শরৎ লেখা পড়া শিখিলে—এম, এ, পাস করিলে, এখন বিয়ে কর,—তোমার স্ত্রীকে দেখিয়া হৃদয় শীতল করি।"

বিয়ের কথায় আমার সেই দ্বাদশ বর্ষের অতীতকাহিনী মনে হইল। ভাবিলাম,—"বিবাহ করিব,—দক্ষবালার ন্যায় স্ত্রীকে না কি? এই ভাবিয়া আমি কহিলাম,—"বিয়ে করে আর কাজ নেই, আবার যদি দক্ষবালার আবির্ভাব হয়; তখন লাভের মধ্যে জীবনের সুখটুকু চলিয়া যাইবে।"

বউমা কহিলেন—তবে তুমি কি রকম স্ত্রী চাও।

আমি কহিলাম—আমি আপনার মত গুণান্বিতা দ্বিতীয়া হেমলতা চাই।

আমার এই কথায় বউমা মধুর অধরে মধুর হাসি হাসিয়া কহিলেন,—"কেন, দক্ষবালা না হইয়া, দ্বিতীয়া হেমলতাও তো হইতে পারে।

আমি তখন পূর্ব্ব কথা চাপা দিয়া কহিলাম,—'চিন্তা কি? আগে উকিল হই,—টাকা মজুত করি, তার পর, বিয়ে করে আপনার চরণ সেবার জন্য দাসী আনিয়া দিব।" ইতিপূর্ব্বে পাঁচ বৎসর হইতে আমার বিবাহের সম্বন্ধ আসিতেছিল, কিন্তু আমার সাংসারিক অবস্থা দেখিয়া প্রায় সকলেই পিছাইয়া যাইত;

যে দুই একটা পশ্চাৎপদ হইত না, তাহারা প্রায়ই দক্ষবালার শ্রেণীভূত; সুতরাং এত দিন বিবাহ করি নাই।

বউমা আমার উকিল হইবার কথায় শিহরিয়া উঠিয়া কহিলেন,—"না, উকিল হয়ে কাজ নেই। ন'বাড়ীর মেজ কর্ত্তার মত একটা কালেজে চাকুরী জুটাইয়া নাও গে। উকিলের নামে বউমার অভক্তি দেখিয়া, আমি হাসিয়া কহিলাম,—"ভয় নাই, আমি উকিল হইয়া উকিল নামের কলঙ্ক অপনোদন করিব।" উভয়ে আরও অনেক কথাবার্ত্তা হইল। শেষে আমার বি, এল্, পড়াই স্থির হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে আরও ছয় বৎসর কাটিল। ছয় বৎসর পর আমি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইতি পূর্ব্বে, বি, এল্. পরীক্ষা দিবার এক বৎসর পূর্ব্বে বউমার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া বনগ্রামের হরিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দুহিতা শ্রীমতী রণকল্যাণী দেবীর পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলাম। বউমার কথাই ঠিক, রণকল্যাণী ঠিক বউমার সদৃশ গুণবতী ও সুশীলা, আমার জীবনসঙ্গিনী হইয়া আমার শোক দুঃখ পরিপূর্ণ জীবনে আনন্দধারা প্রবাহিত করিতে লাগিল।

*　　　*　　　*　　　*

হাইকোর্টে ব্যবসা আরম্ভ করার পর আরও আট বৎসর কাটিল। এত দিন পরে আমার প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইলেন। ওকালতিতে প্রবৃত্ত হওয়ার পর এই আট বৎসরে বিপুল অর্থোপার্জ্জন করিলাম, এবং কৃপানাথ বাবুর অপেক্ষায় সুবৃহৎ প্রাসাদমালা নির্ম্মিত হইল এবং দাস দাসীতে গৃহ পরিপূর্ণ করিলাম।

নবম পরিচ্ছেদ।

যখন আমি চারিদিকে বেশ গুছাইয়া উঠিয়া,—"শরৎকুমার রায় এম, এ, বি, এল্—উকিল—হাইকোর্ট, কলিকাতা",—ইতিনামে চারিদিকে খ্যাত হইলাম ঠিক সেই সময় আমার মনে একটা দুষ্ট বুদ্ধির আবির্ভাব হইল। শৈশব হইতেই আমি দুষ্ট,—তবে, অবস্থার অনুরোধে বাধ্য হইয়া এতদিন দুষ্টবুদ্ধি ত্যাগ করিতে

হইয়াছিল। সম্প্রতি অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আবার শৈশবের সেই লুপ্ত-প্রায় দুষ্ট বুদ্ধি জাগিয়া উঠিল। আমার একবার ইচ্ছা হইল যে, এবার ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া উপলক্ষে সস্ত্রীক কৃপানাথবাবুকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া আমার এই অতুল বিভবরাশি দেখাইয়া দিই। ইতিপূর্ব্বে ওকালতিতে প্রবৃত্ত হইবার অল্পদিন পরে, যখন কৃপানাথ বাবুর শ্বশুর—দক্ষবালার পিতা বাণেশ্বর শর্ম্মা জাল মোকর্দ্দমায় পতিত হইয়া জেলার জজ কর্ত্তৃক কঠিন করাদণ্ডে দণ্ডিত হন, তখন আমি বিনা পয়সায় তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়া হাইকোর্টে আপীল করি এবং আপীলে তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়া দিই। সুতরাং, বিশ্বাস ছিল, কৃপানাথ বাবু ও তদীয় পত্নী দক্ষবালা, আমার এ উপকার মনে করিয়া এবং নিজের পূর্ব্বকৃত ব্যবহার স্মরণ করিয়া,—এখন পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবহার ত্যাগ করিবেন। এইসব মতলব আটিয়া, পূজোপলক্ষে হাইকোর্ট বন্ধ হইলে আমি সপরিবারে বাড়ী আসিলাম।

দশম পরিচ্ছেদ।

যথাসময়ে দুর্গোৎসব শেষ হইয়া গেল। পূজার পর আবার সেই ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া আসিল। আমি বউমাকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার আয়োজন করিতে বলিয়া, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার তিনচারি দিন পূর্ব্বে, সস্ত্রীক কৃপানাথবাবুকে নিমন্ত্রণ করিয়া পত্র পাঠাইলাম। পত্রে লিখিলাম ঃ—

আমার প্রণাম জানিবেন ঃ—

অনেক দিন আপনার সংবাদ জানিনা,—নানা কারণে আমাদের মধ্যে পত্র লেখাও চলিত নাই; যাহাহউক, আমি প্রথম পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম, আশাকরি,—আমার এই ধৃষ্টতা ক্ষম করিবেন। আপনার সহোদরার আন্তরিক অভিলাষ, যে, একবার আপনার চরণদর্শন করেন। তিনি বালিকা এবং বয়ঃ কনিষ্ঠা—সুতরাং, শত অপরাধে আপনার নিকট অপরাধিনী হইলেও, জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা আপনি,—আপনি প্রসন্নবদনে সে অপরাধ ক্ষমা করিবেন! শৈশবে বিধাতার ঘোর অভিসম্পাতে তিনি বিধবা—সংসারের সর্ব্বসুখে বঞ্চিতা। এমন অবস্থায় আপনার কাছে আমার সহস্র অনুরোধ আপনি তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া একবার দর্শন দিবেন। এবিষয় অধিক কি লিখিব,—আগামী বুধবার

ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া—ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পূর্ব্বদিন আপনি সপরিবারে এখানে আসিয়া অবশ্য অবশ্য একবার দর্শন দিয়া আপনার অভাগিনী ভগ্নী ও আমাকে সুখী করিবেন। নিবেদনমিতি

শ্রীশরৎকুমার শর্ম্মণঃ।

পত্রখানি একবার বউমাকে পড়িয়া শুনাইয়া প্রেরিত হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে কৃপানাথবাবুর নিকট হইতে পত্রের উত্তর আসিল। কৃপানাথবাবু লিখিয়াছেন ঃ—

"সোদর প্রতিম স্নেহাস্পদ শরৎ বাবু! আপনার পত্র পাইয়া অতীব সুখী হইলাম। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। আমি স্ত্রীর বাধ্য হইয়া, সংসারে যে সব ঘৃণিত কার্য্য করিয়াছি, তাহাতে মনুষ্যালয়ে আমার এ কালামুখ দেখাইতে আর প্রবৃত্তি নাই, আশা করি, আপনিও আর অনুরোধ করিবেন না। সংসারে আসিয়া যে পিতা মাতার ঋণ জীবনে কেহ পরিশোধ করিতে পারে না—পিশাচ আমি,—আমি স্ত্রীর বাধ্য হইয়া সেই পরমারাধ্য পিতা মাতার শেষ জীবনে কি মর্ম্মান্তিক যন্ত্রনাই না দিয়াছি। তার পর অমন স্নেহ প্রতিমা ভগ্নী সাক্ষাৎ সরলতার প্রতিমূর্ত্তি হেমলতা,—চির হতভাগিনী হেমলতার কুসুম কোমল অন্তঃকরণেই বা কি ব্যাথা না দিয়াছি। এখন সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি। কত দিন—কত দিনে যে, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইবে জানি না। এই সব কারণে আমি লোক সমাজে মুখ দেখাইতে আর ইচ্ছা করি না, এবং শুধু সেই জন্যই আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না,—ক্ষমা করিবেন। শ্রীমতী হেমলতাকে আমার প্রায়শ্চিত্তের কথা বলিবেন এবং বলিবেন এখন সতত তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, সে যেন শেষ জীবনে আপনার দুঃখপূর্ণ জীবন সুখে যাপন করে। আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আপনি সুখে দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া দেশের ও সমাজের মুখ উজ্জ্বল করিতে থাকেন। নিবেদন ইতি

হতভাগ্য

শ্রীকৃপানাথ শর্ম্মা।"

" কৃপানাথ বাবুর অনুশোচনা পরিপূর্ণ পত্র পাঠ করিয়া, হৃদয়ে বড় আঘাত পাইলাম। আমি ভাবিলাম, যে ভাবে কৃপানাথবাবুকে পত্র লিখিয়াছিলাম,—সে ভাবে আমার পত্র লেখা উচিত হয় নাই। শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আবার একখানি পত্র লিখিয়া, এবার একজন লোক পাঠাইয়া দিলাম, এবং আসিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিয়াছিলাম। পত্রে লিখিলাম,—আপনার পত্র পাইলাম,—পত্রে বুঝিলাম, আমার ওরূপ ভাবে পত্র লেখা আমার উচিত হয় নাই। যাহা হউক, আপনি জ্যেষ্ঠ তুল্য, কনিষ্ঠের শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া প্রেরিত লোক সহকারে অবশ্য অবশ্য আসিবেন। আপনি না আসিলে বউমা কতদূর মনঃকষ্ট পাইবেন,—একবার ভাবিয়া দেখিবেন। নিবেদন ইতি।

* * * *

ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার দিন প্রহরেক বেলার সময়, কৃপানাথ বাবুর নিকট হইতে লোক ফিরিয়া আসিল, কৃপানাথ বাবু আসিলেন না। পত্রের উত্তরে লিখিয়াছেন "এখন আমার মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে। আপনার পত্র পাঠ করিয়া যারপর. নাই সুখী হইয়াছি। আপনার উপর আমার কিছুমাত্র রাগ নাই। আপনাকে কনিষ্ঠের ন্যায় ভালবাসি, গুরুর ন্যায় ভক্তি করি। মরিয়া আবার যদি মনুষ্য হই, প্রার্থনা করি আপনার ন্যায় প্রিয়ংবদ এবং মিষ্টভাষী হইতে পারি, এবং আর যেন দক্ষবালার ন্যায় পিশাচিনীর স্বামী হইতে না হয়। আমি যাইতে পারিলাম না বলিয়া, মনে করিবেন না যে, অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া গেলাম না; একমাত্র লজ্জাবশতঃই যাইতে পারিলাম না। চিরজীবনের অহঙ্কার আমার দূর হইয়াছে। আর অধিক কি লিখিব,—আমার শত অপরাধ ক্ষমা করিবেন। নিবেদনমিতি"।

পত্র পাঠ করিয়া আর কি করিব? বউমাকে একে একে সব বলিলাম,—তিনি বিষাদের মলিন হাসি হাসিয়া কহিলেন, "এমন যে, ঘটিবে পূর্ব্বেই জানিতাম।

এইরূপে পূজার অবকাশ শেষ করিয়া, হাইকোর্ট খুলিবার পরই কলিকাতা যাত্রা করিলাম। অগ্রহায়ণ পৌষ দুই মাস কাটিল,—মাঘের শেষে কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া, অনেক চিকিৎসা করিলাম, কিন্তু কিছু ফল পাইলাম না, শেষে বিরক্ত হইয়া, জন্মশোধ কলিকাতার দোকানপাট তুলিয়া সপরিবারে বাড়ী

আসিলাম। আমার ক্ষুদ্র ও জীবনের ক্ষুদ্র অসার ঘটনা আমি এইখানেই শেষ করিলাম। জীবনের এই অংশের ইতিহাস লিখিতে আমার আর প্রবৃত্তি নাই। তবে, শৈশবে, কৈশোরে এবং যৌবনে, যিনি আমাকে একাধারে মাতার স্নেহ, পিতার সদুপদেশ, বউ ঠাকুরাণীর আদর, ভগ্নীর ভালবাসায় সর্ব্বদা আমার এই শোক দুঃখ পরিপূর্ণ ক্ষুদ্র ও অসার জীবন তরুকে, এক দিন কালের কুঠারাঘাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন ইচ্ছা করিলে, তিনি আমার জীবনের এই অংশের ইতিহাস লিখিতে পারেন,—আমি আর লিখিব না।

ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া।

দ্বিতীয়াংশ শ্রীমতী হেমলতা দেবীব কথা!

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমার শোক দুঃখ পরিপূর্ণ জীবনের এই অংশের ইতিহাস আমাকেই লিখিতে হইবে,—আমিই লিখিব। চতুর্দ্দশবর্ষে আমার বিবাহ হয়, ষোড়শ বর্ষে আমি বিধবা হই। অল্প বয়সে. আমি বিধবা হইলেও, তখনই জীবনের সুখ দুঃখ বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। সংসারে অল্প বয়সে পুত্রহীনা হইয়া বিধবা হইলে, স্বামী যদি দরিদ্র হয়, তবে সে সংসারে স্ত্রীলোকের কোন বন্ধনই থাকে না'—সংসারে সচরাচর ইহাই দেখিতাম। আর দেখিতাম, অল্প বয়সে বিধবা হইলেই স্ত্রীলোকের স্বাধীন হইবার বাসনা বড়ই বলবতী হয়; এবং সহজে সে বাসনা পূর্ণ করিতে না পারিলে, নানা ছলে শাশুড়ী ননদ অথবা দেবর ও দেবর পত্নী প্রভৃতির সহিত বিবাদ করিয়া সুখ ভোগ করিবার জন্য পিতৃগৃহে আসিয়া পার হয়। আমি কিন্তু বিধবাদের ঐ পদ্ধতিটা বড় ভাল বাসিতাম না। মৃতস্বামীর স্বর্গীয় চরণ ধ্যান করিয়া, সেই শ্মশান সদৃশ স্বামী গৃহে বাস করিলে, হৃদয়ে যে অনন্ত সুখ হয়, শত রাজকন্যার সুখে পিতৃগৃহে বাস করিলেও, সে সুখলোভের সম্ভাবনা কোথায়? অপরের যাহাই হউক,—আমার তাহা হইত না।

সত্য বিধবা হইয়া স্বামীগৃহে আমার কোন বন্ধনই ছিল না। কিন্তু তবু ও বিবাহের পর, প্রথম যখন স্বামীগৃহে প্রবেশ করিয়া, প্রথম যে দিন শরৎকুমারকে দেখিয়া ছিলাম, জানিনা কেন সেই দিন হইতেই শরৎকুমারকে আমি এতদূর ভালবাসিতে লাগিলাম ; যে মনে হয়, আমার কনিষ্ঠ সহোদর থাকিলেও তাহাকে এত ভাল বসিতাম কিনা সন্দেহ। শরৎকুমারের বয়ঃক্রম তখন ছয় বৎসর বড় দুষ্ট। পাড়ার লোকেরা শরতের জ্বালায় অহরহ কেবল শরতের মৃত্যুকামনা করিত। আমার শাশুড়ী ও স্বামী শরৎকে অত্যধিক ভাল বাসিলেও শরতের দৌরাত্ম্যে, মধ্যে মধ্যে বিরক্ত হইয়া গালাগালি দিতেন প্রহার পর্য্যন্ত করিতেন। কিন্তু আমার সে সব ভাল লাগিত না। মনে হইত শরতের সেই প্রহার আমার অঙ্গেই বাজিত। চির হতভাগিনী আমি—আমার কথায় আমার অনেক গৃহবিচ্ছেদ কারিণী নব্যা বউঠাকুরাণী পাঠিকারা হাসিবেন,—হাসুন ক্ষতি নাই ; আমি কিন্তু শরতকে প্রকৃতই ভাল বাসিতাম। আবার অন্যদিকে প্রথম সাক্ষাতের পর হইতেই, শরৎকুমার আমার ভালবাসায়, এতদূর বাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল যে, আমি তাহাকে না ভালবাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। শাশুড়ী ঠাকুরাণী শরতের প্রতি আমার এই ভালবাসা এবং আমার প্রতি শরতের বাধ্য বাধকতা দেখিয়া, সতত আমাকে দেবর বৎসলা জানকীর সহিত তুলনা করিতেন। আমিও আমার পরমারাধ্যা শাশুড়ীঠাকুরাণীর অনন্ত গৌরবে গৌরবান্বিতা হইয়া, অপার স্বর্গসুখ অনুভব করিতাম। এই রূপে যখন আমার সুখের দিন একে একে কাটিতেছিল, তখন একদিন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, আমার ভবিষ্যৎ জীবন ঘোর ঘনঘটায় পরিপূর্ণ।

দৈনিক-ঘটনা-সংগ্রহ।

কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ

কর্ত্তিক।

১লা কার্ত্তিক, ১৮ অক্টোবর। ফরাসী রাজ্য তুরস্কের সহিত অসদ্ভাব হওয়ায় যুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হয়।

৫ই কার্ত্তিক, ২২শে অক্টোবর। সামরিক আইনানুসারে দক্ষিণ আফ্রিকায় রাজবিদ্রোহ-সূচক প্রবন্ধাদি প্রচার নিষিদ্ধ হয়।

৮ই কার্ত্তিক, ২৫শে অক্টোবর। পারস্য সাহের বিরুদ্ধে ভয়ানক ষড়যন্ত্র হয়। এই ষড়যন্ত্রে সাহার ভ্রাতাগণ, তাঁহার জামাতা, এবং প্রধান উজির লিপ্ত ছিলেন।

১২ই কার্ত্তিক, ২৯শে অক্টোবর। মার্কিন-প্রেসিডেণ্ট ম্যাকলিনহন্তা জোলগর্জ্জের ফাঁসি হয়।

১৩ কার্ত্তিক, ৩০শে অক্টোবর। বিথেলের নিকট ইংরাজ ও বুয়ারে বিষম যুদ্ধ হয়। ইহাতে আটজন দলপতি, ২১৪ জন সৈন্য হত ও আহত হয়।

১৪ কার্ত্তিক, ৩১ অক্টোবর। শীবুদ্বীপের পাঁচশত ফিলিপিনো মার্কিনদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করে।

১৬ কার্ত্তিক, ২রা নভেম্বর। সার জর্জ্জ উলসী মান্দ্রাজ সৈন্যের সেনাপতির পদ পুনর্ব্বার গ্রহণ করেন।

১৭ কার্ত্তিক, ৩ নভেম্বর। চীন সাম্রাজ্ঞীর প্রাণবিনাশের চেষ্টা হয়। জেনারেল বোথার ভ্রাতুষ্পুত্র খ্রীস বোথা ইংরাজ কর্ত্তৃক বন্দী হন।

১৭ নং বেঙ্গল পদাতিকের বত্রিশজন গোলন্দাজ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ওয়াজিরিগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ১৮জন হত ও আহত হয়।

১৯ কার্ত্তিক, ৫ই নভেম্বর। ফরাসীগণ মিটীলনীর বন্দরাদি অধিকার করে।

২১ শে কার্ত্তিক, ৭ই নভেম্বর। চীনরাজ্যের প্রধান মন্ত্রী লি হং চং এর মৃত্যু হয়।

বড়লাট শিলচরে গমন করেন।

২২ শে কার্ত্তিক, ৮ই নভেম্বর। চীন দেশের প্রধান দুত (Plenepoten tiary)পয়াস্ত হয়েন সাও লিহঙ চঙ এর স্থানে প্রধান মন্ত্রী হন।

ডিউক অব কর্ণওয়াল, প্রিন্স অব ওয়েলস এবং আরল অব চেষ্টার উপাধি প্রাপ্ত হন।

২৮ শে কার্ত্তিক, ১৪ নভেম্বর। স্যর আণ্টনি ম্যাকডোনেল উত্তর পশ্চিম প্রদেশের শাসন কার্য্যের ভার স্যর জেমস লাটুসের হস্তে সমর্পণ করতঃ বোম্বাই যাত্রা করেন।

কভেন ডনে বুয়ার কর্ত্তৃক ইংরাজদিগের পরাজয় হয়।

২৯ শে কার্ত্তিক, ১৫ নভেম্বর। বড়লাট মণিপুরে পৌছান।

৩০ শে কার্ত্তিক, ১৬ নভেম্বর। বড়লাট মণিপুরে একটী দরবার করেন।

১লা অগ্রহায়ণ, ১৭ই নভেম্বর। ফরাসীগণ মাদাগাস্কার প্রদেশের কতিপয় জাতিকে আপনাদিগের ক্ষমতা মধ্যে আনয়ন করে।

৩রা অগ্রহায়ণ, নভেম্বর। বড়লাট মণিপুর ত্যাগ করিয়া পালেলে পৌছান।

৫ই অগ্রহায়ণ, ২১ নভেম্বর। The Permanent Council of the Hague court of Arbitration (হেগ মীমাংসা সমিতি) স্থির করেন যে যুদ্ধের শেষ করণার্থ বুয়ার দিগের মীমাংসা প্রস্তাব গুলি ন্যায় সঙ্গত নহে।

৮ই অগ্রহায়ণ, ২৪শে নভেম্বর। উড়িষ্যা বঙ্গদেশ ও আরাকানে বিষম ঝড় ও বৃষ্টি আরম্ভ হয়।

১০ই অগ্রহায়ণ, ২৬শে নভেম্বর। বড়লাট মান্দালে পৌছান।

রবিবার যে বৃষ্টীর সূচনা হয় তাহা আজ অতিশয় বৃদ্ধি পায়।

১৪ই অগ্রহায়ণ, ৩০শে নভেম্বর। বাঙ্গালার ছোটলাট কলিকাতায় আগমন করেন।